REGISTERED No. C. 116.

অষ্টাদশ বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩২১ সাল। [১ম সংখ্যা।

হিন্দু-সমাজের মুখ-পত্র

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা

সম্পাদক { শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

সূচীপত্র।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।)

—কার্য্যাধ্যক্ষ—
৫ আলোচনা কার্য্যালয
হাওড়া।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ১॥০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ✓০ আনা।

Printed and published by—J. K. Singha, at the Karmayoga Printing Works, Howrah

ওঁ নমঃ কালীকায়ৈঃ

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

অষ্টাদশ বর্ষ।] বৈশাখ, সন ১৩২১ সাল। [১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

দেখিতে দেখিতে পুরাতন বৎসরের মুমূর্ষু জীবনের ক্ষীণালোক চিরতরে সাগর-গর্ভে ডুবিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে নূতন আশা, নূতন ভরসা, নূতন উদ্যম-উৎসাহ লইয়া নবীনজীবনে নববর্ষের আনন্দ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। এক গেল, আর এক আসিল, একের অন্তিম সমাধির সহিত অপরের অভিনব অভ্যুত্থান। প্রকৃতির এ দৃশ্য বড়ই মনোরম, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

মৃতের অশ্রুবারি শুখাইতে না শুখাইতে নব আশায় বুক বাঁধিয়া কে যেন বলিতেছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উঠ, জাগ, অতীতের দুঃখ-দুর্দ্দশা, মোহ-মলিনতা-মৃতের চিতায় আহুতি দিয়া আমাকে বরণ করিয়া লও। ভবিষ্যৎ গর্ভে কি নিহিত আছে, কিরূপভাবে বর্ত্তমান বৎসর আমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিবে, কিরূপভাবে আমরা তাহার রাজত্বে সুখভোগ করিব, তাহা আমরা জানি না, তথাপি প্রকৃতি দেবীর এ নব আশীর্ব্বাদ, ভগবানের এ অযাচিত দান অগ্রাহ্য করা, হিন্দু আমরা—আমাদের সাধ্য নয়। ভবিষ্যতের তিমির গর্ভে কি লুক্কায়িত আছে, তাহা ভাবিবার বা দেখিবার আমাদের অধিকার নাই। হিন্দু আমরা, আমরা জানি, কর্ম্মই আমাদেব ধর্ম্ম, কর্ম্মই আমাদের করণীয়। কেবল শুভফল ভোগের ইচ্ছা করিয়া কাপুরুষের মত দুঃখকে ত্যাগ করিলে চলিবে কেন? কারণ দুঃখ-সুখত তাঁহারই দান। আমরাত সেই চির-বাঞ্ছিতকে সুখের মধ্যে দেখিতে পাই না, সুখের সময়ত তাঁহার কথা একবার মনে আনি না, বরং দুঃখের মধ্যে তাঁহার সম্যক বিকাশ দেখিতে পাই, তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া থাকি। কয়জন অহংমত্ত, মদ-গর্ব্বিত ধনীর গৃহে ভগবচ্চরণারবিন্দের মধুর মাধুরী প্রতিভাত হইয়া থাকে, কয়জন বিলাসী ধনী সন্তান ভগবানের নামে আত্মহারা হইয়া আত্মত্যাগ করে?

কেবল বুভুক্ষিত, নিষ্পেষিত দরিদ্রের কুঠিরেই সেই সুধামাখা নামের অমিয়-মধুর ধ্বনি ধ্বনীত হইয়া থাকে, দীন আর্ত্ত ব্যক্তিইত ভগবানের জন্য আকুল হয়, তবে দুঃখকে একেবারে অবহেলা করিলে চলিবে কেন? দুঃখের মধ্য দিয়া যে সুখের ভাতি প্রতিভাত হয়, সেই সুখই ত চিরস্থায়ী, সেই সুখইত দুঃখ-নাশের একমাত্র উপায়!

বিগত বৎসরে মহামারী, প্লাবন-পীড়ন,

প্রভৃতিতে দেশ উৎসন্ন গিয়াছে; কত লোক কত প্রকারে যে বিপন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার কারণ কিছুই নহে, দেশে ধর্ম্মের অভাব। ধর্ম্মের দেশে, আর্য্য-নিসেবিত সোনার ভারতে আর্য্য-ধর্ম্মের নাশ হইতেছে বলিয়া, আমরা ঘন ঘন ভগবানের দিক হইতে এরূপভাবে লাঞ্ছিত হইতেছি—যদি তাহাতেও আমাদের চৈতন্য হয়, যদি আমরা পুনরায় সেই মহৎভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে এত অর্থ ছিল না বটে তবে সামর্থ্য ছিল। তখন উদর পুরিয়া আহার করিয়া নিরোগ শরীরে মনের সুখে কাল কাটাইতে পারিতাম। এখন আমরা যত সভ্য, বিলাস-প্রিয় হইতেছি, ততই রোগেশোকে জর্জ্জরিত, অনাহারক্লিষ্ট, অজীর্ণরোগগ্রস্ত হইয়া কোন প্রকারে দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিতেছি।

ধর্ম্ম-হীনতা, বিলাস-প্রিয়তাই ইহার একমাত্র কারণ নয় কি?

পূর্ব্বে এই নববর্ষের মঙ্গলময় দিবসে হিন্দুর গৃহে গৃহে কত দেবারাধনা, বারব্রতসাধনা প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান হইত, নববর্ষের নূতন আনন্দে বঙ্গবাসী বাস্তবিকই নব জীবন লাভ করিত, এখন আর তাহা হয় কি? —প্রায়ই লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, যাহা আছে—কেবল পূর্ব্বগৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র।

দিনে দিনে দিন চলিয়া যাইতেছে, যাহা যাইতেছে—তাহা আর আসিতেছে না, আসিবেও না। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিবৎসর এইরূপে সময়ক্ষেপন করিয়া ছোটও বড় হইতেছে; আমাদের "আলোচনাও" এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সুদীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া এই শুভ বৈশাখে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বাঙ্গালা দেশে এত সুলভমূল্যে এরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী মাসিক পত্রিকা আর নাই। এই সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া "আলোচনা" আপনার কর্ত্তব্য কতদূর প্রতিপালন করিয়াছে—পাঠকগণেরই তাহা বিবেচ্য। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, আমাদের ক্ষমতানুসারে সে কর্ত্তব্যকার্য্যে এ যাবৎ অবহেলা করি নাই। সকল সাধারণ কার্য্যে কিছু না কিছু ত্রুটী হইয়াই থাকে, কারণ ইহার সমস্ত বিষয় একের হস্তে ত সম্পাদিত হয় না?

আজ আমরা নববর্ষের এই শুভবাসরে চৈতন্যময়ী শক্তিস্বরূপিনী জগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মতি রাখিয়া আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্যে পুনরায় বদ্ধপরিকর হইলাম। মহাশক্তির শক্তি ভিন্ন আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি এরূপ গুরুতর কার্য্যে কখনই সফলতা লাভ করিতে পারে না। করুণাময়ী বিশ্বনিয়ন্ত্রীর শুভ আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া—এস প্রিয় পাঠক পাঠিকা, গ্রাহক অনুগ্রাহক ও সুহৃদবৃন্দ! আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। ধর্ম্মপথবিচ্যুত না হইয়া যাহাতে আমরা কর্ত্তব্যসম্পাদনে সাধারণের প্রীতি-সম্পাদন করিতে পারি! মা বিশ্বেশ্বরি! আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনে আমাদিগকে সেই পথে পরিচালিত কর, তোমার শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

নব বর্ষে।

হ'ল অতীত সাগরে লুপ্ত পুরাতন
বিতরিয়া স্নেহ-ঋণ।
এল ঘর্ঘরি রথ তোরণ-দ্বারে
দিল নাবায়ে নবীন।
শত উৎসুক আঁখি চাহিয়া আননে
দাঁড়াল সভয়ে নমি ;
যত সুন্দর হ'ক না সে কেন,
অজানা মানস-ভূমি।
তবু হইবে তাহাবে করিতে বরণ
আন সুরভি কুসুম তুলি ;
থাক গুপ্ত হৃদয়ে সুপ্ত পুরাতন,
দেখো নিভৃতে দুয়ার খুলি।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

চিরনূতন কথা।

(তৃতীয় প্রবন্ধ)

(গত বৎসরের আলোচনার ২০৫ পৃষ্ঠার পর।)

ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যে আনন্দ, যে উল্লাস, যে সুখ বিরাজ করিত, এখন সে দৃশ্য ক্রমে দুর্ল্লভ হইতেছে ; সে আনন্দ, সে উল্লাস, সে সুখ ক্রমে বিরল হইয়াছে। বালিকা বধূটি শাশুড়ির কোলে বসিতেছে, শ্বশুর, ভাসুর, দেবরদের কাছে বসিয়া খাইতেছে ; শাশুড়ী, জা, ননদের যত্নে ও আদরে আনন্দে গলিয়া যাইতেছে ; তাঁহারা স্নান করাইয়া দিতেছেন, খাওয়াইয়া দিতেছেন, গা মুছাইয়া দিতেছেন ; বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে গর্ভধারিণী জননীর প্রতিরূপ দেখিতেছেন—ননদ ও জায়ে পরস্পরে প্রাণসমা প্রিয় ভগিনীর স্নেহ-মমতা পাইতেছেন, সেই সব সুন্দর পবিত্র চিত্র আর কি দেখিতে পাইব ? এখন লজ্জাভয়সঙ্কুচিতা যুবতী বধূকে গৃহে আনিয়া সেই স্বভাবসুন্দর পবিত্র দৃশ্য আর কি দেখিতে পাও ? এখন শ্বশুর বা ভাসুর বধূমাতাকে সম্মুখে ডাকিতে কুণ্ঠিত হন। যে বধূ বঙ্গগৃহে একদিন সকলের সম্মুখে হাসিয়া খেলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, সে বধূ এখন গৃহান্তরালে বসিয়া থাকে, লজ্জায় বাহির হইতে পারে না। বাঙ্গালীর গৃহে এখন আর সে কবিত্ব নাই, বঙ্গগৃহ এখন ঘোর গদ্যময় হইয়া উঠিয়াছে। লজ্জাহীন তোমরা, তোমরা আবার কোন মুখে বল, বিবাহের বয়স এখন ক্রমেই বাড়িতে চলিল, কন্যার বিবাহের জন্য এত ভাবনা, এত ব্যস্ততা এত তাড়াতাড়ি কিসের ? এখন প্রায় সকল ঘরে বুড়ো বুড়ো, হাতি হাতি মেয়ে করে বিবাহ দেওয়া রীতি হইতেছে। তোমরা দিন দিন যেরূপ লঘুচিত্ত হইতেছ, যেরূপ উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন জীবন অতিবাহিত করিতেছ, চরিত্রের দৃঢ়তা, চরিত্রবল হারাইতেছ ; কেবল ভোগ আর আমোদ জীবনের সার করিতেছ ; তোমাদের মুখে ঐরূপ হীন কথাই শোভা পায়, আমরা তাহাতে বিস্মিত হইব না। কিন্তু স্থির জানিও সংসার অচিরে গরলে ভরিয়া উঠিবে, সে বিষে সোণার গৃহ পুড়িয়া ছারখার হইবে !

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা যে উপার্জ্জন ক্ষমতার কথা আলোচনা করিয়াছি, এবং প্রমাণ করিয়াছি, সে যুক্তির ভিত্তি বালুকায় নির্ম্মিত, এই

প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে তাহার আর একটী দিক্ দেখাইব। বাঙ্গালীর চাকুরীর পথ ক্রমে রুদ্ধ হইতেছে, উচ্চ বেতনের পদ হইতে বাঙ্গালীকে ক্রমশঃ বঞ্চিত করিবার নানাবিধ উপায় ও কৌশল অবলম্বন করা হইতেছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে মান্যবর জগদীশ চন্দ্র বসু প্রভৃতির সাক্ষ্য যাঁহারা সংবাদ পত্রে মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতেছেন এবং সে বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, এখন যোগ্যতা পদোন্নতির কিংবা উচ্চ পদপ্রাপ্তির মাপকাটি নহে, বর্ণই তাহার আদর্শ। দেশে যোগ্য লোক থাকিতে বিদেশ হইতে লোক আনিয়া কর্ম্ম দেওয়া হইতেছে। ইহাই যথেষ্ট নহে ; বাঙ্গালীরা আর বিহারে, উড়িষ্যায়, আসামে, উত্তর-পশ্চিম বা ইউনাইটেড-প্রদেশ-সমূহে কিংবা মধ্যপ্রদেশে গিয়া কর্ম্ম পাইবেন না ; সেই সেই দেশের লোক সহস্র প্রকারে অযোগ্য হইলেও বাঙ্গালীর অপেক্ষা তাহাদের দাবীই অগ্রে গ্রাহ্য। অধিক কি বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তার প্রভৃতির বাঙ্গালার বাহিরে ব্যবসা করার পথে কণ্টক নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহার উপর মুসলমানদিগের প্রতি সমধিক অনুগ্রহ। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়—একই দায়িত্বপূর্ণ কোন কোন উচ্চপদে বাঙ্গালীর এক বেতন, সাহেবের বেতন তাহার দ্বিগুণ বা ততোধিক। সাহেবের অপেক্ষা শতগুণ দক্ষতা ও পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিলেও মুখে বাহবা দেওয়া ব্যতীত অথবা একটা উপাধি দান ব্যতীত অন্য পুরস্কার তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। বাঙ্গালী—অভিমন্যুকে সপ্তরথীতে বেষ্টন করিয়াছে ; বাঙ্গালীর পতন অনিবার্য্য। স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করিলেও নিস্তার নাই। বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, রেজোলিউসানে (Resolution) আইন-কানুনে মহানুভবতার, উদারতার, হিতৈষণার পরাকাষ্ঠা ; স্বাধীন ব্যবসা বা Free-trade এর জয়ঢাক পৃথিবীময় নিনাদিত কিন্তু ভারতবর্ষের বস্ত্র অথবা সুতার ব্যবসায়ীরা ৪০ নম্বরের অধিক সুতা বুনিতে পাইবেন না। অবনত মস্তকে তাহা মানিয়া লইবার পরও নিস্তার নাই। কুলীমজুরদের দুঃখে অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া কল-কারখানার আইন (Factory law) প্রচলিত হইল। অষ্টে-পৃষ্ঠে ভারতবাসীকে বাঁধা হইতেছে ; কত কহিব, কত আলোচনা করিব। কৃষি প্রধান বঙ্গদেশে চাষের পথেও অর্দ্ধ শতাব্দির পূর্ব্ব হইতে কণ্টক নিক্ষিপ্ত হইতেছে। নীলের ব্যবসায় বাঙ্গালার সর্ব্বনাশের কথা, বাঙ্গালাময় হাহাকারের কথা, আজও বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে দৃঢ় বিদ্ধ আছে। গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া নীলকরগণের হাত হইতে দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে না করিতে পাটের ব্যবসার স্রোত প্রবলবেগে বহিতেছে। এখন বোধ হয়, বঙ্গদেশের তিন ভাগ ক্ষেত্রে পাটের চাষ হয়। ইহাতেও বাঙ্গালার কৃষক দৃকপাত করিত না, সোনার বাঙ্গালার সোনার ক্ষেত্রে যে স্বর্ণময় ধান্য প্রসূত হয়, যদি তাহারা ভোগ করিতে পাইত ; যদি বুদ্ধিহীন কৃষকগণ অর্থলোভে বিদেশীগণকে তাহার তিনভাগ বিক্রয় না করিত, যদি দেশের কোটি কোটি মন চাউল রপ্তানি না হইত। তাহার পরিণাম দেশে বৎসরে বৎসরে দুর্ভিক্ষ।

চিন্তাশীলগণ ভাবিয়া দেখুন, কেবল দরিদ্রগণের নহে, কেবল কৃষকদিগের অর্দ্ধাশন বা অনশন নহে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী উদর ভরিয়া স্বাস্থ্যকর খাদ্য খাইতে পান না। এরূপ অবস্থায় যাবতীয় বাঙ্গালী আইবুড়ো কার্ত্তিক থাকুক, বঙ্গের সমস্ত কন্যা কুমারী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করুক। পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতি হইলে তাহা সম্ভব হইত কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে, হিন্দুর পক্ষে তাহা অসম্ভব। বিবাহ ব্যতীত হিন্দুর গৃহস্থাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা হইতে পারে না। বিবাহ যে জাতিধর্ম্মের একটা অঙ্গ, বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র নহে, বিবাহ না করিলে যে হিন্দুজাতি ধর্ম্মে পতিত হইবে। তাই মহাভারতে আছে :—

নাস্তি ভার্য্যা সম বন্ধু, নাস্তি ভার্য্যা সম গতিঃ।
নাস্তি ভার্য্যা সমা লোকে সহায়া ধর্ম্ম-সংগ্রহে ॥

কিন্তু দরিদ্র জাতি সন্তানসন্ততি ও ভার্য্যাকে খাওয়াইবেই বা কি! বিষম সমস্যার কথা বটে। কিন্তু ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ এ সমস্যারও পূরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই মহাবাণী, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডং প্রয়োজনং" বৎসরে বৎসরে সন্তান উৎপাদনে তোমার অধিকার নাই; কেবল অনধিকার নহে, পরন্তু অধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম করিতে তুমি বাধ্য; সংসারের ও সমাজের দরিদ্রতা বৃদ্ধির অধিকার তোমার নাই।

এদিকে দেখুন, সুপক্ক বীর্য্যের ও পাকা হাড়ের সন্তান জন্মিবে বলিয়া যত অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, সন্তানসন্ততি বীর্য্যবান না হইয়া ততই দুর্ব্বল হইতেছে; শিশু মৃত্যু-সংখ্যাও ততই বাড়িতেছে। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম এটর্ণি প্রগাঢ় চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ইউনিভার্সিটি ইন্‌সটিটিউটে তাঁহার "হিন্দু বিবাহ সমস্যা" প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন :—

কলিকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ৬২৬ জন স্ত্রীলোক আছেন; তন্মধ্যে খৃষ্টান ৪৭৯; হিন্দু ৩৯; মুসলমান ১৬ অন্যান্য জাতি ১৮। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৮১৫ জন স্ত্রীলোক, তন্মধ্যে ৫৭৪ জন খৃষ্টান, ১৮৯ জন হিন্দু, ৩৯ জন মুসলমান এবং ১৩ জন অন্যান্য জাতি। ১৭নং ওয়ার্ডে ৫৯২ জন স্ত্রীলোক; তন্মধ্যে ৪৭১ জন খৃষ্টান, ৮০ জন হিন্দু, ৩১ জন মুসলমান এবং ৯ জন অন্যান্য জাতি। সুতরাং উক্ত তিন ওয়ার্ডে শতকরা ৭৫ জনের অধিক খৃষ্টান, এবং হিন্দু স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ১৪জন মাত্র। কিন্তু উক্ত কয় ওয়ার্ডে এক বৎসরের অনধিক শিশুর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৪৩ জন। চারুবাবু সেন্সাস রিপোর্ট হইতে দেখাইয়াছেন, যে ২২নং এবং ৩নং ওয়ার্ডে, যেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী সেখানে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা ১৩ হইতে ১৯টি মাত্র। ৪,৯,১০,১১ ও ২১নং ওয়ার্ডে মৃত্যুর সংখ্যা ২২ হইতে ২৫টি মাত্র। তথাপি সত্যের অপলাপ করিয়া নির্লজ্জভাবে বলিবে—বাল্য-বিবাহ শিশু-মৃত্যুর কারণ। সংস্কারকগণ তোমাদিগকে অজ্ঞান বলিব, কি জড়ভরত (idiot) বলিব—ভাবিয়া পাই না।

বাল্যবিবাহ ১২

নহে, অনুসন্ধিৎসু, সূক্ষ্মদ

রিপোর্ট হইতে তাহাও উজ্জ্বলভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা বাহুল্যভয়ে তাহার কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

মারবঙ্গের প্রতি সহস্রে ৫ম বৎসর হইতে ১০ম বৎসর বয়সে বালিকা বিবাহের সংখ্যা ৫৬৫ জন অথচ তথায় শিশুমৃত্যুসংখ্যা শতকরা ১৩ হইতে ১৬টি মাত্র। হাজারিবাগে ২৪৫ জন কিন্তু শিশু বিয়োগ সংখ্যা ১৭ হইতে ১৮। বীরভূমে প্রতি সহস্রে ১৫০ জন মাত্র অর্থাৎ সেখানে বেশী বয়সে বিবাহের সংখ্যাই অধিক, অথচ শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ২৩ হইতে ২৪ টি। যেখানে প্রতি সহস্রে ৫ম হইতে ১০ম বর্ষে বিবাহ আর ও কম অর্থাৎ পাটনা জেলায় ১৪৫ জন মাত্র,সেখানে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ২৫ হইতে ২৭। যেখানে আরও কম, অর্থাৎ সহস্রে ১৭ জন মাত্র, সেই দার্জিলিং জেলায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ২১ হইতে ২২। কটক জেলায় সহস্রে ২৫ জন, কিন্তু শিশু মৃত্যু সংখ্যা ২৩ হইতে ২৪ জন।

কি বিস্ময়-হর্ষ-আনন্দপূর্ণ আবিষ্কার! কি মোহান্ধকার অপগমে জ্ঞান সূর্য্যের বিকাশ! সত্য কখন গোপন থাকে না। "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" দেওয়া কতদিন চলে? জগৎ অচিরে জানিবে "যৌবন বিবাহ" ইংরাজ জাতিকে স্বাধীন, দিগ্বিজয়ী, বিপুল সমৃদ্ধিশালী মহা-জাতি করে নাই; যৌবন বিবাহের বিষময় ফল হউরোপ ও আমেরিকায় ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এবং হিন্দুর অধঃপতন, হিন্দুর পরাধীনতা, হিন্দুজাতির দুর্ব্বলতার কারণ অন্ধ হইয়া, কপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, ৩০।৪০ বৎসর ঋষভের ন্যায় চীৎকার করিতেছ; একবার চেষ্টা করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবে না, এতদিনেও তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি জন্মিল না। জন্মিলে, বুঝিতে পারিতে পাশ্চাত্য জাতিদের উন্নতির মূল কি এবং তাহার ভিত্তিই বা কত দৃঢ় এবং হিন্দুর বা আর্য্যজাতির অবনতির মূল কোথায়?

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

বারাঙ্গনার প্রতি।

নমি তব পদাম্বুজে অয়ি বারাঙ্গনা!
সাধ যায় সাজিতে লো তোমারি মতন,
কি অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা! কি তীব্র সাধনা!
কিবা আত্ম-বলিদান! জীবন্ত মরণ!
নিশীথে, সজল যবে অন্তর-নয়ন
ম্লান নেত্রে হাস্যময়ী-সুধার লহর;
চিত্তে যবে অবরুদ্ধ প্রীতি-প্রস্রবন,
প্রণয়ের কি ভঙ্গিমা মুখে নিরন্তর।
মরমের উপেক্ষিত স্মৃতিমাত্র যার,
চির আকাঙ্ক্ষিত যেন তার পরশন!
যে আসে তোমার পাশে, ভাবে চিত্ত তার
জন্মান্তরে না ভাঙ্গিবে ক্ষণিক মিলন!
সংসারের খেলা ঘরে যে যখন আসে,
প্রিয়া যেন তোরি মত তারে ভালবাসে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম,এ,বি,এল।

সাধন-সঙ্গীত।

(১)

বাঁরোয়া—মধ্যমান।

ওমা দুর্গে কত দুঃখ দিবে এ সন্তানে।
তব পুত্র অবোধ অতি অধম কিছু না জানে ॥
কুসন্তান যদি হয়, কুমাতা কভু নয়,
এ কথা শাস্ত্রে কয় জানে জগজ্জনে ॥
দয়াময়ী নাম তব, জগতে প্রকাশ সব,
নির্দ্দয় হইয়ে কেন মা কাঁদাও সন্তানে ॥
দয়ার চক্ষে দেখনা চাহিয়ে,
বারেক লও কোলে তুলিয়ে,
সর্ব্ব দুঃখ মোচন হবে তব অবলোকনে ॥
দ্বিজ তারিণীর এই মিনতি,
অন্তে যেন হয় সদ্গতি,
রেখ মা কর মা স্থিতি ঐ রাঙা চরণে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

(২)

সংসারে ঘোর যাতনা।
তবু ত চৈতন্য হ'লনা ॥
রোগে শোকে যে যাতনা,
ভোগী বিনে কেউ জানে না,
যম-যাতনা, নিত্য হয় না,
তাই ধনীর দুঃখের নাই তুলনা ॥
যে হয় বিশাল রাজ্যের অধিকারী
দুঃখ লক্ষ গুণে তারি,
তাই হব তব নাম ভিখারী
(ওমা) শঙ্করী পুরাও মম বাসনা ॥

শ্রীতারিণীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আত্মকথা।

আজকাল বিলাসিতা আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে। ইহা নাই কোথা? স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা, সকলেই বৃথা সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত যে শোভায় শোভিত হইলে কোন শোভার আবশ্যক হয় না, যে বিলাস বাসনায় হৃদয় মাতাইলে অন্য বাসনা মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে না, তাহার দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই, কেবল বৃথা আড়ম্বরে আমরা দিন দিন অন্তসারশূন্য হইয়া ঘোর অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছি। পূর্ব্বে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে দেশের লোক সুখে থাকিয়া ধর্ম্মে মাতমান হইত। এখন ধর্ম্মত নাই বলিলেই হয়, তাহার উপর দেশবাসী এত সৌখিন হইয়াছে যে, বিলাসিতাতেই তাহাদের সমস্ত ব্যয় হইয়া যায়। অন্য কার্য্য করিবে কিসে? কিছুদিন পূর্ব্বে সাহিত্য-সেবায় বিলাসিতা ছিল না, এখন তাহাতেও এতদূর বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে যে, সাধারণ দরিদ্র লোকের সাহিত্য-সেবা বা সাহিত্যচর্চ্চা করা সুকঠিন হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে মাসিক পত্রিকা একপ্রকার মোটামুটি ভাবে বাহির করিলেই তাহার গ্রাহক জুটিত, সকলে আগ্রহ করিয়া পড়িত। কাজের কথা, ধর্ম্মেরকথা,দেশের কথা থাকিলে, লোকে তাহার সুখ্যাতি করিত। এখন আর সে দিন নাই। এখন কাজের কথা, ধর্ম্মের কথা যত থাক আর নাই থাক—চক্‌চকে কাগজ, ঝক্‌ঝকে ছাপা, নানা চিত্ররঞ্জিত করিতে পারিলেই তাহার গ্রাহক জুটে, লোক আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে, ভিতরে যত কিছু থাক আর নাই থাক—তাহাতে তত কিছু আসে যায় না। কাঞ্চন ফেলিয়া আজ লোকে কাঁচের আদর করিতেছে। ইহাতেই যে আমাদের কষ্ট বাড়িতেছে তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। ছবি যে সাহিত্য নহে—তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। স্থল বিশেষে ছবি সাহিত্যের সহায়ক হইতে পারে। কিন্তু

আজকাল বড় বড় নামজাদা মাসিক পত্রিকায় এবং কোনও কোনও সাপ্তাহিকে যে সকল ছবি বাহির হয় তাহাদের যথার্থ স্বার্থকতা কষ্ট-কল্পনা করিয়াও বহুস্থলে স্থির করা কঠিন। যে ছবিগুলির কথা বলিতেছি—সেগুলি প্রায়ই বাঙ্গালা দেশের বাহির হইতে এবং অধিকাংশ স্থলে সুদূর সমুদ্রপার হইতে আমদানি করা। বাঙ্গালী যে সেগুলির মধ্য হইতে আপনার ভাব ও ভাবনার কি খুঁজিয়া পাইবে, তাহা বলা বড় সহজ নহে। আমাদের "আলোচনায়" অবশ্য চিত্রের বাহুল্য নাই কিন্তু ইহা যেমন এক বিষয়ে বাহুল্যবৰ্জ্জিত তেমনই ইহার মূল্যও সুলভ, কিন্তু সাহিত্য-সম্পদে এবং বিষয়বৈচিত্র্যে ইহা কোনও মাসিক পত্রিকা অপেক্ষা ন্যূন নহে। ইহা স্পৰ্দ্ধা নহে, যথার্থ কথা। আত্ম-কথা বলিতে গিয়া আত্মগোপন করা বোধ হয় সঙ্গত হয় না, সেই জন্যই আমরা এই কথা বলিতে সাহসী হইলাম। "আলোচনা" বাঙ্গালীর কাগজ; এই জন্যই ইহার পোষাক পরিচ্ছদ, ভাবনা বেদনা, ভাবভঙ্গী বাঙ্গালী গৃহস্থের ন্যায়, বাঙ্গালী সাহেব কিম্বা সাহেবী বাঙ্গালীর মতন নহে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বাঙ্গালীর উপযোগী চিন্তা, কথা ও কামনা প্রচার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের মতে সাহিত্য শব্দযোজনার পারিপাট্য এবং ঝঙ্কার সৃজন মাত্রই নহে; সাহিত্য আমাদের মতে দেশের ও দশের কথা, দুঃখীর কষ্টের কথা, গৃহস্থের গৃহের কথা, আধি-ব্যাধির কথা, অনাহার ও মৃত্যুর কথা, গোয়া-লার গোয়ালের কথা, কৃষকের ক্ষেতের ও উঠানের কথা, শ্মশানঘাটের কথা, খাল ও ডোবার কথা, পুকুর ও পাঁদাড়ের কথা, বিধবার হাঁড়ির কথা, চাষা ও চিঁড়ার কথা ইত্যাদি—আমরা রাজা ও মহারাজা বুঝি না, জমীদার বুঝি না, আমোদ প্রমোদ বুঝি না, নাচ গান বুঝি না, প্রাসাদ ও অট্টালিকা বুঝি না, আস্তাবল বুঝি না, বাগানবাড়ী বুঝি না, ভ্রমণবৃত্তান্ত বুঝি না, বাবুয়ানী ও বিবিয়ানী বুঝি না, বড় বড় সভাসমিতি বুঝি না, পোলাও কাবাব বুঝি না। আমরা বুঝি কেবল বাঙ্গালী সাধারণ। এই সাধারণ নষ্ট হইতে বসিলে আমরা ভীত হই। ইহাদিগকেই আমরা চাই। ইহাদিগের জন্যই আমাদের কাগজ। ইহাদের সংযম ও শিক্ষাই আমাদের শক্তি। টাকার স্তূপ ও পোষাকের বস্তা দেশের শক্তি নহে—সাধারণের চরিত্রবল এবং জ্ঞানবিকাশ দেশের যথার্থ শক্তি।

আত্ম-বিসর্জ্জনে।

মর্ত্ত্যে তুই ফুটেছিলি স্বগর-প্রসুন,
আপনি ঝরিয়া গেলি আপনার ঘায়!
দারিদ্রের কোলে তুই লভিয়া জনম,
জ্বলিলি পুড়িলি এবে আপন চিতায়
সালঙ্কারা তুই যাবি সাথে লয়ে পণ;
অর্থ দিয়ে তোর হবে শুভ পরিণয়।
সর্ব্বস্বান্ত পিতামাতা সব বিসর্জ্জন;
ভিক্ষাবৃত্তি এবে বুঝি চিরতরে হয়!
এ কলঙ্ক দেখিবে কি, স্বরগ-দুহিতা?
(তাই) সরমে মর্ম্ম-জ্বালায় হ'লি ভস্মীভুতা!
অর্থ দিয়ে প্রেম কেনা সহিবি কি ক'রে,
স্নেহময়ী স্নেহলতা অমরার মেয়ে।
উদ্বাহ-বন্ধন এবে রক্তের শোষণ,
বিধ্বস্ত সংসার কত অশাস্ত্র-শাসনে।
ধর্ম্মের অধর্ম্ম-ভিত্তি অর্থের কারণ।
অযৌতিক লক্ষ্মী কভু আসে তার সনে?
চতুর্দ্দশ বরষের (তুই) জননী আমার,
মূর্ত্তিমতী কোমলতা করুণা আধার।
তুই মা দেখালি আজ অর্থে প্রেম নয়।
প্রাণ বিনিময়ে শুধু হয় পরিণয়!
তব এ চিতাগ্নি আজি সমাজের বুকে,
কলঙ্ক লেপিয়া দিল বাঙ্গালীর মুখে।

শ্রীরমণীমোহন মিত্র এম, এ।

জ্ঞান ও অজ্ঞান।

৩৫ নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতির "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর—তিনি ব্রহ্ম, এই অংশটী প্রাগুক্ত সূত্রের লক্ষিত বাণী।

৩৬ (গ) ব্রহ্ম কি? তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগু বরুণ সম্বাদে এই শ্রুতিটী আছে।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি"। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

অর্থ। যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে এবং অন্তে যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম। ইহার নির্ণয়বাক্য যথা। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মদ্বারা জীবিত রহে এবং অন্তে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে।

৩৭ এই বেদবাক্যটী বেদান্তে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রদ্বারা বিচারিত হইয়াছে। শঙ্কর কহেন "অন্যান্যপ্যেবং জাতীয়কানি বাক্যানি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ কারণ বিষয়ান্যুদাহর্ত্তব্যানি।" নিত্যশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম-কারণ প্রতিপাদক এই প্রকার অন্যান্য শ্রুতি সকলও এই সূত্রে উদাহরণের যোগ্য।

৩৮ এই সূত্রে, শঙ্কর কহেন, "অস্যেতি প্রত্যক্ষাদি সন্নিধাপিতস্য ধর্ম্মিণ ইদমা নির্দ্দেশঃ। "অস্য" পদে এই প্রত্যক্ষ জগৎ। জীব ও জড়গৎ।

৩৯ এই প্রকার অনেক কর্তৃভোক্তৃ প্রাণীসংযুক্ত অচিন্ত্যরচনা বিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি ব্রহ্ম। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" শব্দে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা। শ্রুতি কহেন "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। সামান্যরূপে নহে।

৪০ কোন অনিত্য ফলদাতা রূপ নাম গুণ বিশিষ্ট দেবতাকে লোকে যেমন মন্ত্র ও দ্রব্যসমবায়ী যজ্ঞদ্বারা পূজা করে, উক্ত "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" তদ্রূপ নহে। কিন্তু সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত জ্ঞান স্বরূপে তাঁহাকে জানার ইচ্ছাই "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" শ্রুতি। (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৫) কেবল তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। তাহার অন্য পন্থা নাই।—

৪১ এইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু-অধিকারী, সেই ব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থ গুরুর নিকটে গমন করিবেন।

৪২ সদানন্দ যোগীন্দ্র উক্ত "যতো বা" শ্রুতি এবং ঐ দুইটী বেদান্তসূত্র হইতে বেদান্ত কি, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কি, এবং তাহার অধিকার লক্ষণ কি এই সকল অবয়ব বিন্যাস করিয়াছেন।

৪৩ উহাদ্বারা চিত্তশুদ্ধিকর অনুষ্ঠান, ও বেদান্তশাস্ত্র ও তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান যে কি গুরু গম্ভীর পদার্থ তাহা বুঝা যাইতেছে।

৪৪ যোগীন্দ্র সেই ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষণগুলি গুরুবক্তৃ দ্বারা শাস্ত্রতঃ, তত্ত্বতঃ, ও ন্যায়তঃ

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিম্নে তাহা প্রকাশ পাইবে।

৪৫ (ঘ) গুরু।—গুরুপর প্রয়োজন গুরু সন্নিধানে উপযুক্ত পাত্রের গমন এবং গুরভক্তির কথা প্রায় সমস্ত উপনিষদেই শুনা যায়। তাদৃশ গুরু আচার্য্যপদবাচ্য প্রায় সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ।

৪৬ "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদতস্যতাবদেব চিরং যাবন্নবিমোক্ষ্যেথ।" শ্রুতি। আচার্য্য বিশিষ্ট পুরুষ সেই ব্রহ্মকে জানেন। তাঁহার মোক্ষ অচির।—

৪৭ বর্ণাশ্রমাচারী গৃহস্থের পক্ষে তাদৃশ গুরু আবশ্যক ও কল্যাণদায়ক নহে। তাঁহাদের নিমিত্তে তান্ত্রিক মন্ত্রদাতা কুলগুরুর পদ প্রতিষ্ঠিত আছে।

৪৮ মুণ্ডকোপনিষদে প্রথমে ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পর্য্যন্ত এবং তৎসমস্তের উর্দ্ধ উর্দ্ধ স্বর্গফল কীর্ত্তন করিয়াছেন।—

৪৯ পশ্চাৎ তদ্বিপরীত ব্রহ্মবিদ্যার অবতারণা করিয়াছেন। যিনি ঐ প্রকার ধর্ম্মাচারণ পূর্ব্বক তাহার স্বর্গাদি অনিত্য ফলে বিরক্ত, এবং যিনি বেদ স্মৃতি ও আগম শাস্ত্রানুসারে তাহার অনিত্যতা পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি পরাবিদ্যার অধিকারী।

৫০ তাহা জানিবার নিমিত্তে তিনি গুরুর নিকট গমন করিবেন।—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরু মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।"

অর্থ। সেই বৈরাগ্যবান্ পুরুষ, যে পদ অতয় শিব অকৃত ও নিত্য তাহা জানিবার নিমিত্তে সমিদ্‌ভার হস্তে করিয়া শ্রুতির মর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন।

"তস্মৈসবিদ্বানুপসন্নায় সম্যক প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরঃ পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাং' (১ মুঃ ২য় খঃ)

অর্থ। সেই বিদ্বান্ গুরু, সেই উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ প্রশান্তচিত্ত শমান্বিত দেখিয়া যে বিদ্যাদ্বারা সেই সত্য অবিনাশী পুরুষকে জানা যায়, সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বতঃ যথাভূত, তাঁহাকে উপদেশ করিবেন।

৫১ যোগীন্দ্র ঐ শ্রুতিটী উদ্ধৃত করিয়া, গুরু যেরূপ উপদেশ দিবেন, তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা পশ্চাৎ বলিব।—

৫২ "অধ্যারোপ" ও "অপবাদ" এই দুইটী পারিভাষিক বাক্য উত্থাপন পূর্ব্বক অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন। সম্প্রতি তাহারি তাৎপর্য্য বলিতেছি।

৫৩ (ঙ) "আধ্যারোপ" ও "অপবাদ।" আমি প্রথমেই বলিয়াছি—আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য, বস্তুপদবাচ্য এবং নিরঞ্জন। তন্মধ্যে আত্মা কর্ম্মজন্য অনাদি অজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারা বেষ্টিত।

৫৪ অন্তঃকরণ এবং স্থুলদেহ, অজ্ঞান প্রকৃতি দ্বারা গঠিত। সেগুলিকে উপাধি কহে। কাষ্ঠ যেমন অগ্নির আশ্রয়, ঐ গুলি সেইরূপ জীবাত্মার ব্যক্ত হইবার উপাধি। সেগুলি আত্মার ন্যায় স্বতোসিদ্ধ বস্তুতত্ত্ব নহে। কেননা তাহা কর্ম্মজন্য। জ্ঞানোদয়ে, কর্ম্মক্ষয়ে

তাহা থাকেনা ; অতএব অবস্তু।—

৫৫ পরমাত্মা, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা ও উদাসীন। অথচ তাঁহা হইতেই জগৎ প্রসূত হয়।

৫৬ তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যদৃচ্ছাক্রমে, জবরদস্তি দ্বারা সৃষ্টি করেন না। কেবল জীবের কর্ম্মানুসারে, আপনার ঔর্ত্তস্থ প্রকৃতি বীজ হইতে সৃষ্টিরূপ অচিন্ত্যব্যাপারকে বহি প্রসারণ করেন।

৫৭ পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী ও সত্যস্বরূপ। তিনি আকাশাদি সমস্ত পদার্থের এবং সমস্ত জৈবিক উপাধির বস্তুরূপ আশ্রয়। উক্ত আশ্রয়-পটে অজ্ঞানাদি অবস্তুস্বভাব জগতের অন্বয় শ্রুত হয়।

৫৮ তাঁহার অভ্যন্তর হইতে সৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াই স্বভাবতঃ তাঁহাকে আশ্রয় করে। যেমন মনুষ্যের ছায়া উৎপন্ন হইয়াই পৃথিবী পৃষ্ঠে আশ্রয় লয় ; তদ্বৎ।

৫৯ অতএব পৃথিবী যেমন তৎপৃষ্ঠে পতিত ছায়াকে দেখায়, তিনি সেইরূপ আত্ম-শক্তির গর্ভজাত অবস্তু ও অনাত্মধর্ম্মী জগৎকে দেখান। কিন্তু নিজে জগৎরূপে পরিণত হন না, এবং জগৎ ও জীবকে মূলতঃ সৃষ্টিও করেন না।

৬০ এই আশ্রয়-আশ্রিত-সম্বন্ধটী, অবস্তু স্বরূপ অজ্ঞান-উপাধির এবং জ্ঞান ও বস্তু-স্বরূপ ব্রহ্ম-ধর্ম্মের সন্ধি। এই সন্ধিই, অন্বয়, আরোপ, অধ্যারোপ বা অধ্যাস শব্দের বাচ্য।

৬১ উপাধির ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাব শ্রুত হয়। প্রত্যেক জীবগত যে উপাধি তাহা ব্যষ্টি। সকল জীবগত যে সার্ব্বজনীন উপাধি তাহা সমষ্টি।

৬২ ব্যষ্টি উপাধি প্রত্যেক জীবকে তাহার কর্ম্মানুসারে আশ্রয় করে। তাহাতে প্রত্যেক জীবের শরীরাদি ভোগায়তন ও ভোগ্য সংসার সংঘটিত হয়।

৬৩ যাহা সমষ্টি ও সার্ব্বভৌমিক উপাধি তাহা সর্ব্বাত্মস্বরূপ পরব্রহ্মকে আশ্রয় করে। সেই বিরাট আশ্রয়-পটে, নানাবিধ চিত্র-মূর্ত্তির ন্যায়, সর্ব্বভূতের সহ, এই অচিন্ত্য-রচনা-বিশ্ব নামরূপে প্রকাশ পায়—তাহাই সৃষ্টি।

পরব্রহ্মের সহ সমষ্টি-উপাধির যে সন্ধি তাহাই অন্বয়-লক্ষণ। অর্থাৎ অবস্তু-স্বরূপ জগৎ সেই সত্যস্বরূপে অন্বিত হইয়া সত্যবস্তুর ন্যায় অস্তিভাতি রূপে প্রকাশ পায়।

৬৫ তাহাতে সেই সত্যস্বরূপ স্বয়ং বস্তুরূপী ও নিষ্ক্রিয় হইয়াও জগৎকর্ত্তা সংজ্ঞায় উপাধিক ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হন।

৬৬ আমরা ভগবদ্গীতায় শ্রুত আছি, যে ভগবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতিই সচরাচর জগৎ রচনা করে। অর্থাৎ প্রকৃতি জীবের কর্ম্মানু-সারে ঈশ্বরের নিয়মে জগৎরূপে পরিণত হয়। ঐ পরিণামের মধ্যে জৈবিক উপাধি সমস্ত ভুক্ত। এই প্রকৃতিই অজ্ঞান।

৬৭ কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃতি ও তদীয় পরিণাম স্বরূপ জগৎ যেমন স্বভাবতঃ অনাত্মধর্ম্মী ও অবস্তু, সেইরূপ পরব্রহ্মেরও জগৎ-বা ঈশ্বর সংজ্ঞাটিও উপাধিক মাত্র।

৬৮ কেবল জগৎ-সংসর্গাধীন ঐ সংজ্ঞা। ঐ সংজ্ঞা আরোপিত। অনাত্মধর্ম্মিনী, অবস্তু-

স্বরূপিণী অজ্ঞানপ্রকৃতি ও তদীয় জড়পরিণাম রূপী এই বিশ্বব্যাপার উক্ত আরোপের হেতু।

৬৯। অতএব বলা যায় অবস্তুস্বরূপ অজ্ঞান, সেই বস্তুস্বরূপ ব্রহ্মতে আরোপিত হয়। এই আরোপই অধ্যারোপ, অধ্যাস ও অন্বয়। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৭০ শ্রীমদ্‌ভাগবতের মঙ্গলাচরণে আছে, যাহা হইতে এই জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গ অন্বয় দ্বারা সংঘটিত হয়, তিনি আবার জগৎসংসারের অতিক্রান্ত, সর্ব্বকুহকের অতীত স্বরূপে, পরম সত্যস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই সত্যটী বেদান্ত সূত্রেও প্রতিপাদন করিয়াছেন।

৭১ দেহাদি অবস্তুধর্ম্মী উপাধি সম্বন্ধাধীন জীবকেও ঔপাধিক বলা যায়। ফলে জীবের সে ঔপাধিক সজ্ঞা অরোপিত বা অধ্যস্ত মাত্র। কেননা জীব স্বরূপতঃ নির্ম্মল।—

৭২ সাংখ্য শাস্ত্রও জীবত্মাকে স্বরূপতঃ নির্ম্মল বলেন। ঐ মতে জীবাত্মার সংজ্ঞা পুরুষ। যেমন জবাকুসুমের রক্তিম-আভা স্ফটিক-পাত্রে পতিত হইলে তাহা রক্তবর্ণে উপরঞ্জিত হয়, তদ্বৎ পুরুষও অন্তঃকরণ রূপ উপাধিদ্বারা আরোপগ্রস্থ হন। জবাফুল পৃথক করিলে যেমন স্ফটিক পাত্র হইতে ঐ উপরাগ অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ তিরস্কৃত হইলে পুরুষ স্বীয় বিশুদ্ধ স্বরূপে প্রকাশমান্ হন। অনাদি অবিবেকতাই উক্ত অনাত্মধর্ম্মী উপাধির আত্মাতে সংক্রমিত হওয়ার হেতু। আত্মাকে স্বরূপতঃ জানাই—জ্ঞান।

৭৩ যেমন পরব্রহ্মের মধ্য হইতে সৃষ্টি ব্যক্ত হইয়া স্বভাবতঃ তাঁহাকে আশ্রয় করে। সেইরূপ পক্ষান্তরে সৃষ্টি যেমন যেমন "কারণ" "সূক্ষ্ম ও স্থুলাবস্থায়" পরিণত হয়, তিনিও তেমনি তেমনি স্বভাবতঃ তত্তদবস্থ বাহ্যজগৎ ও কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরাদি উপাধি সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করেন।—

৭৪ কেননা তিনি সর্ব্বব্যাপী। অতএব আকাশের ন্যায় তাঁহার সর্ব্বত্র প্রবেশ স্বাভাবিক। কিন্তু জড়াকাশের ন্যায় অন্ধ নিয়মে নহে। তাঁহার এই মহাপ্রবেশ, সর্ব্বভূবনকে রূপ নামে প্রকাশ, পালন ও রক্ষা করার জন্য। সুতরাং জ্ঞান পূর্ব্বক।

৭৫ কিন্তু শাস্ত্র কহেন সে প্রবেশ অংশতঃ। কোথাও কহেন প্রতিবিম্ব মাত্র এবং তাহা জ্ঞানোদয়ে, জ্ঞানীর পক্ষে, তিরোহিত হয়। ঈশ্বরের ঐ আবির্ভাব, কেবল সৃষ্টি ও অমুক্ত পুরুষের অনুরোধে। তাঁহার পূর্ণস্বরূপটী মুক্ত পুরুষের নিমিত্তে সৃষ্টির অতিক্রান্ত।

৭৬ উপাধি অনুসারে উক্ত প্রবিষ্ট অংশ সমূহের নানা সংজ্ঞা। মাণ্ডুক্যোপনিষদে ও সদানন্দের বেদান্তসারে তাহা নিরূপিত আছে।— *

---

* মাণ্ডুক্যোপনিষদে পরব্রহ্মের প্রবেশ তিন অংশে বিভাগ করিয়াছেন। কেননা উপাধি ত্রিবিধ। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই ত্রিবিধ শরীর ও তাহার ভোগ্য ত্রিবিধ জগৎ। এই গুলির নাম উপাধি। তন্মধ্যে পরব্রহ্মের প্রবিষ্ট-অংশ গুলিকে উপহিত চৈতন্য কহে। স্থূলে, স্থূলভুক্, বৈশ্বানর, বহিঃপ্রজ্ঞ। সূক্ষ্মে, প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ, অন্তঃ-প্রজ্ঞ। কারণে, আনন্দভুক্, প্রাজ্ঞ, প্রজ্ঞানঘন। এই ত্রিবিধ অংশই ঔপাধিক। গীতার "একাংশেন স্থিতো জগৎ" বাক্যটী ঐ পাদত্রয়ের ব্যঞ্জক। তাঁহার অবশিষ্ট অংশ নিরুপাধিক ও নিরঞ্জন। তাহা নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং

৭৭ যেমন অন্বয়, অধ্যাস, অধ্যারোপ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ সমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা গেল; সেইরূপ উক্ত বেদান্তসার গ্রন্থে আর একটী পদ আছে। তাহার সংজ্ঞা "অপবাদন্যায়।" তাহার অর্থ ব্যতিরেক-ন্যায়, বিয়োগ, বিশ্লেষ ব্যাবৃত্তি প্রভৃতি।

৭৮ পরব্রহ্ম হইতে প্রাগুক্ত আরোপিত উপাধি সমস্ত ও তাঁহার প্রবেশ স্থান জগৎকে ব্যতিরেক কর, তিনি সর্ব্বোধিবিনির্ম্মুক্ত নিরঞ্জন পূর্ণজ্ঞানানন্দ সত্যস্বরূপে প্রত্যক্ষ হইবেন। অপবাদন্যায়ের এই তাৎপর্য্য।

৭৯ আর তোমার আত্মা হইতে দেহাদি অনাত্মা ও অবস্তু জঞ্জাল সমূহকে ব্যতিরেক কর, আত্মা স্বস্বরূপে মেঘোন্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় দৃষ্ট হইবেন। আর এই অবস্থাই আত্মার নিরঞ্জন-সাম্য। সমতা। *

৮০ এক্ষণ আমরা পূর্ব্বারব্ধ গুরু-শিষ্য সংবাদটী সমাপ্ত করিব।

৮১ (চ) গুরুর উপদেশ প্রণালী। পূজনীয় যোগীন্দ্র "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"। প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বের উদাহৃত যে দুইটী শ্রুতিকে প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এইমাত্র আছে যে, যে বিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, গুরুদেব সেই সমাগত পাত্রকে সেই ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বতঃ প্রদান করিবেন। তাহার নাম পরাবিদ্যা।

৮২। কিন্তু সে বিদ্যার উপদেশ প্রণালী কি প্রকার, তাহা কোন শ্রুতিতে প্রপঞ্চিত হয় নাই। † অথচ তিনি যথোক্ত লক্ষণ "অধ্যারোপন্যায়" ও "অপবাদন্যায়" সংজ্ঞিত দুইটী

ন প্রজ্ঞান ঘনং। তাহা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, এক আত্মপ্রত্যসার,প্রপঞ্চোপশম, শান্ত শিব, অদ্বিতীয় চতুর্থপাদ। তিনি আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। অর্থাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর জানার বস্তু। মোক্ষপদ। বহিঃপ্রজ্ঞ অন্তঃপ্রজ্ঞ প্রজ্ঞানঘন এই সমস্ত শব্দ ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে যে, পরব্রহ্মের জগতে প্রবেশ জড়াকাশের ন্যায় অজ্ঞনিয়ন্তে নহে, কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ডে দ্বিতীয় শ্রুতির ভাষ্যে লেখেন "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" এই বাক্যেতে যে 'প্রবেশ' শব্দ আছে, তাহা পরব্রহ্মের স্বরূপের প্রবেশ নহে। (কেননা সে স্বরূপ ভাব মোক্ষপদ)। সেই প্রবিষ্ট অংশ প্রতিবিম্ব মাত্র; তাহা ছায়া এবং মিথ্যা। শঙ্করের এই উক্তি অসঙ্গত নহে। কেননা জীবের বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণোপাধিতে উহা উপস্থিত চৈতন্য। তাহাতে ঐ প্রবিষ্ট অংশকে ঔপাধিক মাত্র বলা যায়। যে পুরুষের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁহার উপাধি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উপাধির অভাবে উক্ত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব তিরোহিত হয়। কিন্তু কেবল মুক্তের পক্ষে। সাধারণ জগজ্জনের পক্ষে উহা চিরস্থায়ী। জীবের জীবন, জগতের পালক, প্রহরী ও উপাধি সমস্তের দীপ্তিদাতা সুতরাং সত্য।

* "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" (৩য়ঃ মুঃ ১খঃ ৩।

† উক্ত শ্রুতির পরেই নিম্নস্থ শ্রুতিটী দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য জীবের উপাধিক জন্মমাত্র এবং প্রলয়কালে উপাধির সহিত ব্রহ্মেতে প্রবেশ এবং প্রবাহরূপে তদ্রূপে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত। উক্ত বচন মোক্ষপর নহে। পরাবিদ্যার ও প্রতিপাদক নহে।

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্রচৈবোপযান্তি।"

ইতিপূর্ব্বে স্থানে স্থানে এই শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করাগিয়াছে। সেজন্য এস্থানে আর তাৎপর্য্য লেখা গেলনা, ফলে কেহ যেন ইহা মোক্ষপদেশ বলিয়া মনে না করেন। মোক্ষপ্রদ পরা বিদ্যার লক্ষণ পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

পারিভাষিক পদের অবতারণা পূর্ব্বক গুরুর বাচনিক তত্ত্ব্যাখ্যাদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছেন। ঐ পদদ্বয় কোন শ্রুতিতে পাওয়া যায়না।

৮৩ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় বেদান্ত-ভাষ্যে 'অধ্যাস' সংজ্ঞিত পারিভাষিক শব্দটী অধ্যারোপন্যায় স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত অনেক শ্রুতির ভাষ্যে 'অন্বয়' শব্দও পাওয়া যায়। কিন্তু মূল শ্রুতিতে বা বেদান্তসূত্রে তাহা দৃষ্ট হয়না।—

৮৪ কিন্তু জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ ও পরব্রহ্মের অস্তিত্ব বা তত্ত্বভাব প্রতিপাদক যত শ্রুতি আছে,তৎসমস্তের সাধারণ লক্ষ্য উক্ত শব্দ সমূহের বিচার দ্বারাই নিরূপিত হয়।

৮৫। "জন্মাদ্যস্যযতঃ" সূত্রের, ও তাহার মূল „যতোবাইমানী" প্রভৃতি বেদবাণীর এবং কঠোপনিষদের "অস্তীত্যেব" ইত্যাদি শ্রুতির তাহাই তাৎপর্য্য। অর্থাৎ পরব্রহ্মহইতে জগৎ যে উৎপন্ন হয়, তাহা অজ্ঞানাদি অবস্তুর অন্বয় ও অধ্যারোপদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। উক্ত অবস্তুর অস্তিভাতিরূপ প্রকাশস্থান সেই একমাত্র বস্তু স্বরূপ ব্রহ্মাস্তিত্ব।—

৮৬ নতুবা ঈশ্বর যদি জীবের কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট, অবিদ্যাপ্রকৃতি প্রভৃতি প্রবাহ-রূপে আগত নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী কারণপরম্পরা রূপ উপাধি সংঘাতকে অপেক্ষা না করিয়া, বাইবেল ও কোরাণের ঈশ্বরের ন্যায়, আকস্মিক রূপে সৃষ্টি রচনা করিতেন, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তি কারণ-শ্রেণী সব নষ্ট হইয়া যাইত এবং তৎসমূহকে অভিনব রূপে সৃষ্টি করিতে হইত। তাহাতে তিনি স্বয়ংই কাহারো ভাল, কাহারো মন্দাংশের জন্য দায়ী হইতেন।

৮৭। অতএব মুনিগণ ও আচার্য্যেরা শাস্ত্রতঃ উক্ত কারণসমূহকে অনাদি জানিয়া তদ্বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

৺চন্দ্রশেখর বসু।

পুষ্পবতী।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মেজর আল্ডস্।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে রাজ-প্রাসাদ বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে গেট সাজান হইয়াছে, নানারূপ পত্র ও পুষ্প ঐ সব ফটকে শোভা পাইতেছে, রক্তবর্ণ পতাকা বায়ুতে উড়িয়া উড়িয়া নূতন নাবালক মহারাজার কীর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে। মহা-রাজা রামসিংহ নাবালক, মহারাণী তাহার অভিভাবিকা, মেজর আল্ডস্ রাজবাড়ী পরিদর্শ-নের জন্য আসিতেছেন।

সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই নহবৎ বাজিয়া উঠিল, রাজ কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া দ্বারের নিকট অভ্যর্থনার্থ উপস্থিত হই-লেন, বেহারী সান সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান থাকি-লেন। মেজর আল্ডস্, মিষ্টার মার্টিন ব্লেক্, লেফটেনেন্ট লাড্‌লো,এবং কর্ণেল্ ম্যাকিন্টসকে সঙ্গে লইয়া রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

সকলেই তাহাদিগকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিল, তৎপর তাঁহারা মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং ঠাকুরদিগের সহিত রাজ্যশাসন সম্বন্ধে নানারূপ পরামর্শ করিলেন। মহারাণীকে কুমারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পর তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। রাজবাড়ীতে আনন্দের সীমা নাই, সাহেবদিগের আহার্য্যের বিশেষ বন্দোবস্ত হইল।

রাজবাটীর কার্য্য শেষ হইলে মেজর সাহেব সপরিষদ বাহিরে আসিলেন, এবং হাতীর উপর উঠিয়া রওনা হইতে চেষ্টা করিলেন। যখন হাতীর উপর আরোহন করিতেছিলেন, সেই সময় একব্যক্তি অসি হস্তে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং গুরুতর আঘাত করিল। তখনই সে ধৃত হইল। রেসিডেণ্ট সাহেব সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না, তখনই তিনি পাল্কিতে রেসিডেন্সিতে রওনা হইলেন, সঙ্গি লেফটেনেণ্ট লাড্‌লো ও কর্ণেট্ কেমিষ্টন্ গেলেন। রাস্তায় তাঁহারা আর কোন প্রতিবন্ধক পাইলেন না। কর্ণেট্ ম্যাকষ্টেন পুনরায় প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও ফিরিবার সময় কোনরূপ বাধা পাইলেন না। তিনি মিষ্টার ব্ল্যাক্‌কে রেসিডেণ্ট সাহেবের আদেশ শুনাইলেন যে, ঘাতককে তিনি ছাড়িয়া দেন, ঘাতক জয়পুরের রাজকর্ম্মচারীদের জিম্বায় থাকুক। এই আদেশ করিয়াই তিনি পুনরায় রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এবার আর নির্ব্বিঘ্নে হইতে পারিলেন না, নানা রূপ লোষ্ট্র তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, এবং বাহিরের লোকেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল। তিনি বহু কষ্টে অশ্বারোহনে পলাইতে সক্ষম হইলেন, দুই একটী প্রস্তরখণ্ড তাঁহার গাত্রে ও মস্তকে লাগিল, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

সাধারণ লোকদের মধ্যে এই কথা প্রচারিত হইল যে রেসিডেণ্ট সাহেব রাজবাটীতে ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গীগণ বিশেষ সাহায্যকারী। এই সময়ে মিষ্টার ব্লেক্ তরবারি হস্তে বাহিরে আসিলেন, সকলেরই ধ্রুব বিশ্বাস হইল নিশ্চয়ই কোন অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। তখন সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং প্রতিশোধ লইবার মানসে প্রস্তুত হইল। তিনি হস্তীর উপর রওনা হইলেন, চারিদিক হইতে প্রস্তরখণ্ড তাঁহার উপর পতিত হইতে লাগিল। তিনি লোষ্ট্রনিক্ষেপে কাতর হইলেন,মস্তকের একস্থানে বিশেষ আঘাত পাইলেন, ও রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তিনি কোথায় আশ্রয় লইবেন—তাহা ভাবিতে লাগিলেন, রাস্তার একপার্শ্বে একটি সুন্দর দেবমন্দির দেখিতে পাইলেন, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ,তখন গবাক্ষ অবলম্বনে তিনি,চাপরাসি ও মাহুত তিনজনে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের রক্ষকেরা একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থান দিল, তাঁহারা লুকাইয়া রহিলেন। মিষ্টার ব্লেক দেখিলেন জীবনের আশা নাই, বাহিরে লোকের কলরব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাহিরের ক্ষিপ্ত লোকগুলি মন্দির ঘিরিল এবং দ্বার ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইল, লোকগুলি

ছাতের উপর উঠিল। সাহেব দেখিলেন—আর উপায় নাই, তিনি তখন দেশীয় চাপরাশীকে বলিলেন—"এই দ্বার দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, হয়তো তোমাদিগকে কিছু বলিবে না।" চাপরাসী বলিল—"হুজুর! আপনার যে গতি আমার সেই গতি।" মাহুত বলিল—"হুজুর! আমি উপায় দেখছি না, এই লোকগুলি বড় বদ্‌মাইস, ইহাদের মায়া মমতা নাই। কেন যে এরা উত্তেজিত হয়েছে জানিনা।" সাহেব বলিলেন—"এ দিগকে বুঝাইলে বুঝবে ত?" এই কথা বলিতে না বলিতে দ্বার ভগ্ন করিয়া কতকগুলি অস্ত্রধারী লোক গৃহে প্রবেশ করিল। সাহেব বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, সব ব্যর্থ হইল, সকলে সাহেবকে ঘিরিয়া আক্রমণ করিয়া ও তরবারির আঘাতে তাহাকে ধরা শায়ী করিল। চাপরাশী উহাদের পা জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু এক আঘাতেই তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত হইয়া পড়িল। সাহেব ও ইহার পর অনেকক্ষণ জীবিত ছিলেন না, অবিলম্বে তাঁহার জীবনলীলা সম্বরণ হইল। তখন সকলে উচ্চ-হাস্য করিয়া উহাদের মৃত দেহ মন্দির হইতে লইয়া বাহিরে সদর রাস্তায় ফেলিয়া দিল, এবং যে যে দিকে পারিল পলাইল।

দেওয়ান বেহারী সান তখন সৈন্য পাঠাইয়া এই গোলমাল থামাইলেন, এবং কতকগুলি দোষী ব্যক্তিকে ধৃত করিলেন, তখনই রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট এই ভীষণ সংবাদ প্রেরিত হইল, তিনি অবিলম্বে ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট বিস্তারিত রিপোর্ট করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শেষ সময়ে!

বেলা প্রায় শেষ হইল, এখন আর রৌদ্রের তেজ নাই, সূর্য্যদেব তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়া পশ্চিমাকাশে ডুবিবার উপক্রম করিতেছেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এখন সকলে বিশ্রামার্থ প্রস্তুত হইতেছে। মৃদু মৃদু বায়ু বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত করিয়া প্রাণী সকলের জীবন সঞ্চার করিতেছে। এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে কে একজন 'গোঁ' 'গোঁ' শব্দ করিতেছে। নিকটে কেহই নাই. কুটীরমধ্যস্থ বৃদ্ধা 'জল' 'জল' বলিয়া কাতর হইতেছে। বৃদ্ধা একবার দ্বারের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কেহই আসিল না। পিপাসায় প্রায় কণ্ঠ রুদ্ধ. আবার "জল দেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হঠাৎ কে একজন গৃহে প্রবেশ করিল, বৃদ্ধা দেখিল পাগলিনী আসিয়াছে। পুনরায় "জল" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, পাগলিনী একটি মৃণ্ময় পাত্রে করিয়া জল আনিয়া বৃদ্ধার মুখে ধীরে ধীরে দিতে লাগিল। বৃদ্ধার যেন প্রাণ সঞ্চার হইল, সে তাহার পর পাগলিনীর দিকে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া বলিল— "তুমি কে? পাগলিনী এবার "হিহি" করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর উত্তর করিল,— "আমাকে চিন্‌তে পার না? তা পারবে কেমন কার? এখন কি আর সে মায়াবতী আছ।" বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল। সে পাগলিনীএ নাম পাইল কোথায়? পাগলিনীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ দৃষ্টি করিয়া থাকিল, কিন্তু ইহাকে কখনও

দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। পাগলিনী আবার উচ্চহাস্য করিল। বৃদ্ধা বলিল—আমি আর অনেকক্ষণ বাঁচিব না, তুমি একবার রামস্বরূপ ব্রহ্মচারীকে সংবাদ দিতে পার? কথা বলিতে না বলিতে, সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"কি চাও? তোমার কি কিছু বলিবার আছে?" বৃদ্ধা যুক্তকরে প্রণাম করিল। তার পর বলিল,—"প্রভো! আপনার দয়া যথেষ্ট, নতুবা আমার মত পাপী আপনার দর্শন পায়?" ঠাকুর বলিলেন—"সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, অনুতাপ করিলেই পাপ খণ্ডে। তুমি অনুতাপ কর ও ভগবানকে ডাক, তিনি তোমাকে উদ্ধার কর্‌বেন। এখন কি বল্‌বার আছে বল, ইহার পর হয়ত আর বলিতে পারিবে না।" বৃদ্ধা বলিল—"ঠাকুর! আমি একবার শেখর রাজাকে দেখিতে চাই, এই আমার শেষ সাধ, আপনি আমার এ সাধ পূর্ণ কর্‌তে পারেন?" সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তোমার এ সাধ শীঘ্র পূর্ণ হবে, শেখর রাজা বাহিরে দাঁড়ায়ে আছেন। পাগলিনি! রাজাকে নিয়ে এস।" পাগলিনী ছুটিয়া গেল, বৃদ্ধা অবাক হইয়া ব্রহ্মচারীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"প্রভো! আপনি কি অন্তর্যামী? আমার কিসে উদ্ধার হবে? আমি মহাপাপী, বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করিয়াছি, এখন আমার উপায় কি?" রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী বলিলেন—"তোমার উপায় ভগবান, তাঁহাকে মনে মনে স্মরণ কর। আর যাঁহার নিকট দোষ করেছ, তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর।" শেখর রাজা পাগলিনীর সঙ্গে কুটীরে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধাকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধা বলিল—"আপনি আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন ত? বোধ হয় হতভাগিনীকে চিনেছেন। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি মহাপাপী। আপনি ক্ষমা না কর্‌লে আমার মুক্তি নাই। আমি আপনার মেয়েকে বড় ভালবাসিতাম, আমার কোন সন্তান ছিল না। অল্পবয়সে একটি মেয়ে হ'য়ে মারা যায়, তার পর আমি বিধবা হই। সেই অবধি আপনার মেয়েকে পেয়ে আমি নিজ সন্তানের দুঃখ ভুলি। আমি সেই লোভে আপনার কন্যাকে চুরি করি। এতকাল তাকে লালন পালন করেছি।" শেখর রাজা আর তাহাকে কথা বলিতে দিলেন না। উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন—"আমার সে মেয়ে কোথায়?" বৃদ্ধা বলিলেন—"এখন কোথায় জানিনা। আমি ছোটটিকে বড় করিয়াছিলাম, সে আমাকে 'মা' বলিয়াই জানিত। হঠাৎ এক দিন কোথায় গেল, আর ফিরিল না, সেই অবধি পাগলিনীর ন্যায় আমি দেশে দেশে ফিরিতেছি, অবশেষে এই স্থানে আপনার রাজ্যে এসেছি। আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন কি? আমি আর অধিক্ষণ বাঁচবো না।" শেখর রাজা বলিলেন—"তুমি তার ধাত্রী ছিলে, তোমাকে সেই জন্য আমি ক্ষমা কর্‌লেম, ঈশ্বরও তোমাকে ক্ষমা করুন। এখন সে মেয়ে কোথায়?" পাগলিনী হাসিয়া বলিল—"ওগো রাজা! তোমার মেয়ে ভাল আছে, কোন চিন্তা করো না। রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী বলিলেন—"রাজন্! এই পাগলিনীকে চিন্‌তে পাচ্ছেন?" রাজা অনেকক্ষণ পাগলিনীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"না, একবার আমাদের বাড়ী গিয়ে-

ছিল স্মরণ হয়।” ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন—এই পাগলিনী তোমার রাণীর সহচরী—সুখময়ী, এখন পাগল হয়েছে!” রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তিনি ভক্তি সহকারে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“ঠাকুর! সুখময়ীর এই দশা? যা হ’ক, আমার মেয়ে কোথায়?’ ব্রহ্মচারী বলিলেন—“তোমার মেয়ের খবর এই পাগলিনী জানে, পাগলিনী তোমার মেয়েকে বড় ভালবাসে, তাই তার সংবাদ সর্ব্বদা রাখে। যখন সে বিপদে পড়িয়াছিল, এই পাগলিনী তাকে উদ্ধার করে। এই পাগলিনীর জন্যই তোমার মেয়েকে পাবে। আমি তবে যাই, তুমি এই পাগলিনীর সঙ্গে যাও।” পাগলিনী বলিলেন—“ঠাকুর দাড়াও, মায়াবতী মায়াপুরে যাচ্ছে,একবার তার মস্তকে পদধূলি দেও।” বৃদ্ধা কাতর নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিল। রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী নিজ দক্ষিণপদ বৃদ্ধার মস্তকে দিলেন, বৃদ্ধা যেন তৃপ্তি লাভ করিল। তারপর বলিল—“প্রভো! এত দিনে আমি শান্তি লাভ কর্‌লেম। দয়াময়! তুমিই আমার ভগবান, আমাকে এত দিনে উদ্ধার কর্‌লে। রাজা! আমি চল্‌লেম, রাণী-মা’কে আমার কথা বল্‌বেন, তিনি যেন আমার উপর ক্রোধ না করেন। আমি তাঁহাকে অনেক কাঁদায়েছি, নিজেও অনেক কেঁদেছি। পুষ্পবতী রত্ন বিশেষ, তাকে যত্ন কর্‌বেন, অমন মেয়ে আর হয় না। রূপে, গুণে, সে বিখ্যাত। পুষ্পবতী কুটিলতা জানে না। আমার এই দুঃখ, মরিবার সময় তাহাকে একবার দেখ্‌লেম না। আর কথা বলতে পাচ্ছি না। পুষ্প-বতীকে আমার আশীর্ব্বাদ, পুষ্প—এই কথা শেষ হইতে না হইতে তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল।”

ব্রহ্মচারী বলিলেন—“রাজন্! বৃদ্ধার সৎকারের উদ্যোগ করুন,তারপর পাগলিনীর সঙ্গে গিয়া কন্যাকে উদ্ধার ক’রে আনুন। পুষ্পবতী এখন সুখে আছে। তার জন্য আর কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না। রাণীকে এই সংবাদ দেও। রাণী কন্যাশোকে পাগলিনী, এই খবর পেলে একটু শান্তিলাভ কর্‌বে।” রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী এই কথা বলিয়াই চলিয়া গেলেন। শেখর রাজা, পাগলিনীকে ঐস্থানে রাখিয়া লোকজন অন্বেষণে গেলেন এবং কয়েকজন লোক বৃদ্ধার সৎকারের জন্য পাঠাইলেন। তারপর পাগলিনীকে ডাকাইয়া বলিলেন—“সুখময়ি! তুমি রাণীর প্রিয়-সহচরী, এখন পুষ্পবতীকে এনে তার প্রাণ জুড়াও।”পাগলিনী বলিল—“সে ভার আমার, আমার সঙ্গে আসুন।” উভয়ে তখনই রওনা হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

পুষ্পবতী উদ্যানে আসিয়া ফুল তুলিতেছেন। পুষ্পবতীর ফুলে বড় অনুরাগ, সে ফুল তুলিয়া দেব-সেবার জন্য পাঠায়, আবার লীলাবতীকে সাজায়, নিজেও মালা গাঁথিয়া পরে। এখনও সূর্য্যদেব উদয় হন নাই, অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আজ পুষ্পবতী বাগানে আসিয়াছেন। ঝির্ ঝির্ করিয়া হাওয়া প্রাণ জুড়াইতেছে, দুই একটা পাখী ডালে বসিয়া মিষ্ট ধ্বনি করি-

ভেছে। ভ্রমরগুলি গুণ্ গুণ্ করিয়া ফুলে বসিতেছে। এমন সময়ে কে অদূরে গাইল—

"কোথায় গো মা ভবদারা সংসারেতে ডুবে মরি।
দয়া ক'রে দয়াময়ী দে-মা আমায় চরণ তরী।
পাষাণের মেয়ে হ'য়ে, আছিস্ তাই মাগো ভুলিয়ে,
এতদিনে কিগো তারা মনে পড়ে ও শঙ্করী।
জানিনা মা পিতামাতা, তুমি সকলের ত্রাতা,
তুমি ভগ্নী তুমি ভ্রাতা, তুমি সর্ব্বময় হরি।
আমি মা তোমার মেয়ে, রাখ এবার চরণ দিয়ে,
ঐ রাঙ্গা পদখানি মাগো যেন দিবানিশি স্মরি।

পুষ্পবতী এ স্বরে চমকিয়া উঠিল, বুঝিল পাগলিনী আসিতেছে। পাগলিনীর মধুর স্বর তাহার কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দিত। পাগলিনীর শব্দ পাইয়া পুষ্পবতী আতঙ্কিত হইল; এত অন্বেষণে তাহাকে পায় নাই, অদ্য সে নিজেই আসিতেছে। পুষ্পবতী সেই দিকে দৃষ্টি করিল, দেখিল পাগলিনীর সঙ্গে কে একজন ভদ্রলোক আসিতেছেন। পুষ্পবতী আশ্চর্য্যান্বিত হইল। দেখিতে দেখিতে উভয়ে আসিয়া পুষ্পবতীর নিকট উপস্থিত হইল, পুষ্পবতীকে সম্বোধন করিয়া পাগলিনী বলিল—"পুষ্প! এতদিনে তোমার উপায় হ'ল। ইনি শেখর রাজা, তুমি ইঁহার কন্যা। যে বৃদ্ধা তোমাকে প্রতিপালন করেছিল, সে তোমার ধাই মা।" শেখর রাজা আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তিনি পুষ্পবতীকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"মা, এতদিনে তোমাকে পেলেম। তোমার মা তোমার শোকে পাগলিনী, একবার তার তাপিত প্রাণ শীতল করবে চল।" পুষ্পবতীর চক্ষে আজ জল দেখা গেল, সে পিতার ক্রোড়ে বসিয়া প্রাণ শীতল করিল। পিতৃহারা পুষ্পবতী এতকাল পরে পিতা পাইল, হৃদয়ে আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিল। পাগলিনী আজ বড় সুখী, সে এই পিতাপুত্রীর মিলনে বড় আনন্দ পাইল। পুষ্পবতী অনেকক্ষণ পরে বলিল—"বাবা!" আর সে বলিতে পারিল না। এমন সময় কে উদ্যানের দ্বারে উপস্থিত হইল, পাগলিনী তাঁহাকে আসিতে ইঙ্গিত করিলে রাজা অভয় সিংহ তথায় আসিলেন এবং শেখর রাজার ক্রোড়ে পুষ্পবতীকে দেখিয়া অবাক হইলেন। পুষ্পবতী রাজাকে দেখিয়া বড় লজ্জিত হইল, কিন্তু পিতার ক্রোড় হইতে উঠিল না। শেখর রাজা বলিলেন—"এস বাবা, এতদিনে আমার হারাধন পেলেম। তুমিত জান বাল্যকালে আমার স্নেহের কন্যা হারায়ে যায়, তার ধাত্রী মায়াবতী তাকে চুরি করে নেয়। মায়াবতী মৃত্যুকালে আমাকে সব বলেছে, আর এই পাগলিনীর কল্যাণে এর অনুসন্ধান পেয়েছি। এই পুষ্পবতী আমার কন্যা। এর মা কন্যাশোকে পাগলিনী। আমি আজই একে নিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমাদের যাওয়ার উদ্যোগ কর। রাজা অভয় সিংহ এই সংবাদে বিস্ময়াবিষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন, এত দিনে পুষ্পবতীর পরিচয় পাইলেন। তিনি বলিলেন "আমি আহারাদির উদ্যোগ করি, আহারান্তে যাবেন।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। পুষ্পবতী পিতার হস্ত ধরিয়া গৃহে আসিল, পাগলিনী সঙ্গে সঙ্গে গেল। শেখর রাজা বলিলেন "মা! পাগলিনীর কল্যাণে তোমাকে পেয়েছি, তুমি এর স্নেহপাত্রী। পাগলিনীর নাম দুঃখময়ী, সে তোমার মাতার সহচরী। তোমার ধাইমা বৃদ্ধা,

জীবনলীলা সম্বরণ করেছে, আমি শেষ সময়ে উপস্থিত ছিলাম। সে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, এবং মৃত্যু সময়ে তোমাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। মায়াবতী যদিও আমাদিগকে কষ্ট দিয়েছে, তথাপি সে তোমাকে যত্নে রেখেছে, এই জন্য আমি তার উপর সন্তুষ্ট।" পুষ্পবতী তাহার ধাইমার জন্য এক বিন্দু অশ্রু পরিত্যাগ করিল। সে বলিল—"বাবা! বুড়ী-মা আমাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসতো, আমাকে স্নেহ ও যত্নের ত্রুটি করে নাই।" শেখর রাজা পুষ্পবতীর জীবনের ঘটনা জানিতে চাহিলেন। পুষ্পবতী আমূলবৃত্তান্ত বিবৃত করিল, কেবল রাজা অভয় সিংহের বিষয় কিছু বলিল না। শেখর রাজা বলিলেন—"মা! আমার আর বিলম্ব সয় না, কতক্ষণে তোমাকে তোমার মাতার নিকট নিয়ে যাবো, তাই ভাব্‌ছি। তুমি আমাদের হৃদয়ের মণী, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব। এত দিন কষ্ট পেয়েছ, এখন তোমার আর কষ্ট না হয়, তাই আমাদের দেখ্‌তে হবে।" এই বলিয়া পুনরায় পুষ্পবতীকে ক্রোড়ে লইলেন ও তাহাকে চুম্বন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

মিষ্টার মার্টিন ব্রক ও তাঁহার চাপরাশী হত্যা হইলে জয়পুর রাজ্যে একটা হুলস্থুল ব্যাপার বাধিল। যে সব লোককে এই হত্যা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পাওয়া গেল, তাহাদিগকে ধৃত করা হইল। এই সময়ে কতকগুলি লোক বেহারীসানের পক্ষে ও কতকগুলি জোতারামের পক্ষভুক্ত হইল। জোতারাম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেন যে বিহারী সানের প্ররোচনায় এই হত্যা কার্য্য সাধিত হইয়াছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সে বিষয় বিশ্বাস হইল না; এজেণ্ট সাহেব বিহারীসানকে বিশেষরূপে জানিতেন। তাঁহাদের সন্দেহ হইল—জোতারামের উপর। ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্ডার মত আসামীদের বিচার আরম্ভ হইল। রাজবাটীতে বিচার কক্ষে ইহাদের বিচার আরম্ভ হইল, প্রধান প্রধান ঠাকুরেরা ও বেহারীসান উপস্থিত থাকিলেন, রেসিডেণ্ট সাহেব স্বয়ং বিচার দেখিতে একখানি বিশেষ আসন গ্রহণ করিলেন। বিচারের কাউন্সিল বসিল, বেহারীসান প্রেসিডেণ্টের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমতঃ হত্যা সংশ্লিষ্ট আসামীদিগকে আনা হইল, প্রত্যেকের হস্ত পদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ। প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা এরূপ হত্যা করিলে কেন?" উহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল—"বিদেশীয় ও বিজাতীয় লোক আমাদের রাজবাটীর আধিপত্য করে, ইহা, আমাদের অভিপ্রেত নয়, বিশেষতঃ আমরা পরম্পর শুনিলাম, সাহেবেরা আমাদের রাজাকে কয়েদ করেছে ও রাজবাটীতে অত্যাচার করিতেছে"। প্রেসিডেণ্ট পুনরায় বলিলেন—"তোমরা লোকের মুখে শুনে এ কার্য্য করেছ, ইহার পরিণাম কি জান?" সেই ব্যক্তি বলিল—"জানি, পরিণাম জানিয়াই অগ্রসর করিয়াছি, আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না"। পুনরায় প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করিলেন—"তোমরা নিজেরা এ কাজ

করেছ,না কেহ তোমাদিগকে বলে দিয়েছে?" এবার আর সে ব্যক্তি কোন উত্তর করিল না। প্রেসিডেণ্ট আবার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে ব্যক্তি কিছুই বলিল না। তখন প্রেসিডেণ্ট বলিলেন "তোমার ভয়ানক শাস্তি হবে জান? প্রশ্নের উত্তর দেও। তা হলে হয় তো তোমার অপরাধের অনেক লাঘব হবে।" কিন্তু সে লোকটি আর কোন উত্তর করিল না। তখন মেম্বরদের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট কি পরামর্শ করিলেন ও দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন।" তোমার যে অপরাধ, তাহাতে প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য দণ্ড পাইতে পার না, অতএব সাত দিবস মধ্যে তোমার ফাঁসী হইবে।" সে ব্যক্তি কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ করিল না, দুইজন শান্তিরক্ষক তাহাকে লইয়া গেল। তারপর ক্রমে ক্রমে সকল আসামীর বিচার হইল, তাঁহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। অবশেষে এক জন যুবককে আনা হইল, সে বলিল—"জোতারাম আমাদিগকে বলেন যে, ইংরাজেরা রাজাকে হত্যা করবে, সেই জন্য আমরা অস্ত্র ধারণ করেছিলেম।" এই ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইল। অবশেষে জোতারাম, হুকুমচাঁদ ও ফতেখানকে হাজির করা হইল। প্রেসিডেণ্ট বলিলেন—"তোমাদের বলিবার কিছু আছে? এ হত্যা-রহস্যে তোমরা ছিলে কিনা? জোতারাম বলিলেন—"এ হত্যা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, বরং আমরা ইংরেজদিগকে ভক্তি করি। একার্য্য বেহারী সাহেবের। রেসিডেণ্ট সাহেব বলিলেন—"একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনি। তোমার এই সব কার্য্য।" জোতারাম বলিলেন—"সাহেব! তুমি এই স্থানে আসা অবধি বড় গোলযোগের সৃষ্টি, তুমি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায়েছ। এখন যা করিতে হয়—কর।"

প্রেসিডেণ্ট কয়েক জন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন, তাহারা সকলেই বলিল—জোতারামের উত্তেজনায় এ হত্যা সংঘটিত হইয়াছে। তখন কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বরেরা দণ্ডাজ্ঞা স্থির করিতে উঠিয়া গেলেন, ও প্রায় একদণ্ড পরে প্রেসিডেণ্ট আসিয়া বলিলেন—ইংরেজ এ রাজ্যের বন্ধু, তাহাদের কল্যাণে ও সাহায্যে আমরা সুখে আছি, এ অবস্থায় তোমরা যে এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেছ ও একজন প্রধান সাহেবকে বধ কার্য্যে সহায়তা করেছ, সেই জন্য তোমরা কয়েক জনই অপরাধী। অতএব আদেশ দেওয়া গেল যে তুমি জোতারাম, হুকুমচাঁদ ও ফতেখান প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হও।" এই দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া সকলে স্তব্ধ হইল; জোতারাম এত কাল জয়পুরের প্রধান মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন, সকলে মনে করিয়াছিল তাহার অন্য কিছু দণ্ড হইবে। যাহা হউক, এই দণ্ডাজ্ঞার পরে সকলকে কারাগারে লইয়া গেল, এক সপ্তাহ পরে সকলের প্রাণদণ্ড হইবে—এইরূপ আদেশ হইল। প্রেসিডেণ্ট মেজর জণ্ডস্ সাহেব বিচার কার্য্য দেখিয়া রেসিডেন্সিতে চলিয়া গেলেন, সভা ভঙ্গ হইল। এই সংবাদ রাজ্যময় রাষ্ট্র হইল, কেহ বা জোতারামের দণ্ডে দুঃখিত হইল, কেহ বা সুখী

হইল ; কিন্তু রুপা এ সংবাদ শুনিয়া একেবারে অচেতন হইল। সে বুঝিল, পাপের ফল ক্রমে ফলিতেছে, এবার তাহার চূড়ান্ত হইল। সে উন্মাদিনীর ন্যায় হইল এবং জোতারামের প্রাণভিক্ষা করিতে মহারাণীর নিকট যাইবে—এরূপ মনে করিল। সে প্রহরীদিগকে অনেক প্রলোভন দেখাইল—তাহারা ব্রিটিশ সিপাহী—তাহারা কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, তখন সে রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত পাঠাইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আনন্দোৎসব।

দুই একদিন পরেই সুকু আরোগ্য লাভ করিল,তাহার শরীরের আর গ্লানি থাকিল না। তখন সে বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইয়া পুষ্পবতীর অন্বেষণে বাহির হইল। অনেক ঘুরিতে ঘুরিতে সে কৈকেত্রী রাজ্যে আসিল ও সে স্থানে শুনিল যে ঐরূপ একটি মেয়ে রাজার নিকটে আছে। শুনিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তারপর ধীরে ধীরে রাজবাটীতে আসিয়া অনুসন্ধান করিল, সেখানে লীলাবতী ছিল, সে সুকুকে সাদরে গ্রহণ করিল। লীলাবতী সুকুর সমস্ত বিবরণ পুষ্পবতীর নিকট শুনিয়াছিল, অতএব বুঝিতে বাকি রহিল না যে, পুষ্পবতীকে দেখিতেই সুকু এত দূর আসিয়াছে। লীলা তখন সুকুকে সঙ্গে লইয়া পুষ্পবতীর গৃহে গমন করিল, দেখিল পুষ্পবতী তাহার পিতার নিকট বসিয়া কত কথা বলিতেছে। লীলাবতী এতক্ষণ শুনে নাই যে পুষ্পবতী তাহার পিতাকে পাইয়াছে, এখন এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দ হইল। পুষ্পবতী দৌড়াইয়া আসিয়া, লীলাবতীর হস্ত ধরিয়া বলিল—"সই! এত দিনে আমার মা বাবা দুজনকেই পেয়েছি, তুমি এস"। তাহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল, এবং লীলাবতীর পরিচয় প্রদান করিল। লীলা পুষ্পবতীর কর্ণে কি বলিল, পুষ্পবতী ফিরিয়া দেখিল—সুকু এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে। এতক্ষণ সে সুকুকে দেখে নাই, এইবার সুকুকে দেখিয়া আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করিল ও তাহার হাত ধরিয়া বলিল—তুমি এত দূর কষ্ট করে আমার জন্য এসেছ ? এস সই, আমার বাবার নিকট তোমাকে নিয়ে যাই"। সুকু আজ পুষ্পবতীর আনন্দে বড় সুখী হইল। এই সময় রাজা অভয় সিংহ লীলাবতীর পিতাকে সঙ্গে লইয়া শেখর রাজার নিকট আসিলেন। উভয়ের পরস্পর পূর্ব্বেই আলাপ ছিল, বহু কাল পরে এবার দর্শন পাইয়া দুজনে আনন্দে প্রেমালিঙ্গন করিলেন ও আলাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে লীলাবতী চুপে চুপে অভয় সিংহকে বলিলেন—দাদা! পরিচয় ত হল, তার পর ?" অভয় সিংহ বলিলেন—চুপ কর, কিছু বলিস্ না!" এই বলিয়া তিনি ইহাদের সকলের আহারের উদ্যোগে গেলেন। পুষ্পবতী আজ লীলাবতী ও সুকুকে লইয়া বড় সুখী হইল। সে সুকুকে বলিল—সই! আমি আজই আমার বাবার সঙ্গে যাচ্ছি, তুমি সঙ্গে যাবে, আর এখানে থাকার দরকার নাই। সুকু বলিল—

তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারি না, তুমি যেখানে যাবে আমি, আমিও সেখানে যাবো"। এত আনন্দেও পুষ্পবতী অন্ত সুখী নহে, কারণ অন্ত সে অভয় সিংহকে ত্যাগ করিয়া যাবে। আবার দেখা হইবে কি না, কতকালে দেখা হবে, তাহার ঠিক কি? লীলাবতী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—এবার স্বয়ম্বর হবে না। পুষ্পবতী তাহার গালে ঠোনা মারিল, লীলা আবার চুপে চুপে বলিল—আমাকে মারলে কি হবে, রাজার একটা উপায় কর, নইলে পরিণাম শুভ নহে। পুষ্পবতী বলিল—চুপ কর, কেউ শুনবে।" লীলাবতী বলিল—আমি আমার বাবাকে বলবো, দেখি তিনি কি করতে পারেন।" এই বলিয়া সে তাহার পিতাকে ডাকিয়া এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেল, এবং পুষ্পবতী ও অভয় সিংহ ঘটিত সমস্ত বিবরণ বলিল ও শেখর রাজাকে এই বিষয় অনুরোধ করিতে বিশেষ রূপে তখন পিতাকে জেদ করিল। তাহার পিতা তখন আসিয়া শেখর রাজাকে ডাকিলেন, পুষ্পবতী এই অবসরে পলাইল। শেখর রাজা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—এত আমার সৌভাগ্যের কথা, রাজা অভয় সিংহের পিতা আমার বন্ধু ছিলেন, তাহার পুত্রকে আমি কন্যা সম্প্রদান করবো, ইহাপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? তবে একবার বাড়ী গিয়ে রাণীকে সব বলি।" তিনি আসিয়া দেখিলেন—পুষ্পবতী পলাইয়াছে, তখন লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মা! মেয়েকে এতকাল হারায়েছিলেম, এত দিন পরে দেখা পেলাম, আবার তোমরা তাকে চুরি করলে?" লীলাবতী হাসিয়া উঠিল, তাহার পিতা উত্তর করিলেন—পৃথিবীর এই নিয়ম, চিরকাল কিছু কি দখলে রাখা যায়? আবার এই কন্যাকে কে নিবে তাহার ঠিক কি?" এবার লীলাবতী মুখখানি হেট করিল। এমন সময়ে রাজা অভয় সিংহ আসিলেন, শেখর রাজা বলিলেন—বাবা, আমার মাকে এত কাল পরে ফিরে পেয়ে পুনরায় হারালেম দেখেছি। তা ভালই, তোমার পিতা আমার বন্ধু ছিলেন, তুমি আমার কন্যা গ্রহণ করবে—ইহাপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে? আমার ইচ্ছা, একবার আমাদের ও স্থানে যাবে, বিশেষ দরকার? রাজা অভয় সিংহ বলিলেন—"যে আজ্ঞে।" ইহার পরে সকলে আহারার্থ গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি, এ।

গো-বীমা।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! এ দেশে ইংরাজের সভ্যতার প্রভাবে, জীবন-বীমা, বিবাহ-বীমা, সামুদ্রিক-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা, ক্রেডিট্ সোসাইটী প্রভৃতির কথা শুনিয়া থাকিবেন কিন্তু কেহ বোধ হয় গো-বীমার কথা শুনেন নাই। বিলাত, জার্ম্মেনী, ডেনমার্ক, ওলন্দাজ দেশ, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং সুইজরলণ্ড দেশে গোরক্ষণের জন্ত গো-বীমা কোম্পানীর বহুল সৃষ্টি ও বাহুল্য দেখা যায়। এই বীমার বিষয় বিবৃত করিবার জন্ত আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আশা করি, ইহা পাঠে আমাদের

দেশের নিঃস্ব গোয়ালা, গৃহস্থ ও কৃষকগণ যদি উপকৃত হন, তাহা হইলে আমার দেশের একটা কাজ করা হইবে। গো-জাতির রক্ষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ততঃ কৃষি এবং ঘৃত দুগ্ধাদি গব্য খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহের জন্য ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ বঙ্গবাসী বেঙ্গলী, ডেলি নিউস্, আনন্দ বাজার পত্রিকা প্রভৃতি সংবাদ পত্রে ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা পাঠে বোধ হয় স্বদেশবাসীর এদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া থাকিবে। এই প্রবন্ধে তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিব। আমরা কেবল কলম চালকের জাতি বটে, প্রকৃত কার্য্যে আমরা অপর ভারতবাসীর ন্যায় অগ্রসর হইতে বড়ই কুণ্ঠিত এবং পশ্চাৎ পদ। কার্য্য ক্ষেত্রকে আমরা বড়ই ভয় করি, কলম বাজীতে এবং গলাবাজীতে আমরা সিদ্ধহস্ত এবং মুক্তকণ্ঠ! বম্বাই নগরের অধিবাসী গণের মধ্যে বিশুদ্ধ দুগ্ধ যোগাইবার জন্য তত্রত্য ধন কুবের উদ্যোগী টাটা কোম্পানী বিলাতি আদর্শ মতে একটি ডেয়ারি খুলিবার ব্যবস্থা করিয়া এক যৌথ কোম্পানী করিয়াছেন। তাহারও অংশীদারগণ টাকা দিয়া অংশ পাইতেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা দেখুন কি শোচনীয় !! বেলুড়ে ডেয়ারি এবং লাইভ্ ষ্টক্ কোম্পানি একটা কারবার খুলিলেন, কিন্তু দেশের লোক কি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল? এইরূপ কয়েকটি দুগ্ধ ব্যবসায়ের কোম্পানী দেশী লোকের উদ্যোগে অর্থে ও তত্বাবধানে চালিত হইতেছে কিন্তু তাহাদের অবস্থা তত আশাপ্রদ নহে। দেশের হোমরা চোমরাগণ লাট দপ্তরে এবং দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন লইয়াই হুলস্থুল করিতেছেন। আর এ দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা প্রত্যহ দুই স্তম্ভ করিয়া দেশের কৃষি, গো ব্যবসা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতে কদাচ বিরত হন না। কিন্তু আমাদের দেশে কোন দৈনিক পত্রিকা বা সংবাদ পত্র বা মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা তাহার আলোচনা করেন—বলুন দেখি? আজ কাল ২।১টি কাগজ দেশের অবস্থা বুঝিয়া তাহা করিতেছেন বলিয়া দেশের লোকের দৃষ্টি এদিকে পড়িতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের কৃষির উন্নতি বিধান করিতে হইলে গোকুলের উন্নতি করা চাই। তাহা করিতে হইলে রাজার এবং প্রজার সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। প্রজাদের চেষ্টা চাহি, জমীদারগণের অর্থলালসা কিঞ্চিৎ পরিহার করিয়া চারণ ক্ষেত্রের জন্য জমি ছাড়িয়া দেওয়া, বা প্রাচীন গ্রাম্য চারণ-ভূমির প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন এবং রাজার দ্বারা আইন করাইয়া বিনাব্যয়ে একদেশ হইতে অপর দেশে রেল বা জাহাজ সাহায্যে বৃষ ও জনন গাভী, ঘোড়া, গাধা, মেষ, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু লইয়া যাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, দেশে গো বৈজকুলের ধ্বংস ও অভাব হওয়ায় সমস্ত কৃষি এবং মৎস্য বিভাগের অনুকরণে বিনাব্যয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রত্যেক গৃহস্থ, গোয়ালা এবং মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে বিতরণ করার একটা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ইহা কাজে করা-

হইতে হইলে দেশের লোকের এবং দেশের যাবতীয় ইংরাজি ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের কর্ত্তব্য যে আমাদের দেশের এই অভাব দূরীকরণ জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া এবং তজ্জন্য মহারাজ মন্দী, বর্দ্ধমানাধিপতি প্রভৃতি ক্ষমতাশালী লোকের অগ্রণী হইয়া রাজ সদনে ডেপুটেশন পাঠান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দেশে দুগ্ধ ও ঘৃত পুন উৎপন্ন হইবে এবং দেশের দুঃখ কতক পরিমানে হ্রাস হইবে। আমরা কেবল আকাশ-কুসুমের মোহে পড়িয়া সবই হারাইতে বসিয়াছি। আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায়ের যুবকগণ বহুল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া, বন্যা-প্রপীড়িত দেশের শুশ্রূসার জন্য অগ্রণী হইয়া জীবন পণ করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন। এই দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি কতকটা পড়িলে যে শত শত প্রবন্ধ লেখার চেয়ে বেশী কাজ হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। জগতে যেমন বীমা বিস্তারের প্রয়োজন, কৃষি শিক্ষা ও কৃষি জ্ঞান প্রচারেরও তদ্রূপ সমধিক প্রয়োজন এবং ভারত হেন কৃষি প্রধান দেশে তাহার প্রয়োজনীয়তা যে সমধিক তাহা কে না স্বীকার করিবে।

পাশ্চাত্য দেশের সভ্য অধিবাসীগণ শুষ্ক গাভীগণকে পুনশ্চ গর্ভিনী হওয়া পর্য্যন্ত গো-বীমা কোম্পানির হস্তে দেন এবং সামান্য সামান্য মাসিক চাঁদা দেন। যে গাভীটিকে গৃহে রাখিলে মাসিক ১০৲ খরচ পড়ে, তাহা ঐ কোম্পানীর হস্তে দিলে অল্প খরচে হয়. অথচ গাভিটী গর্ভিণী হইলে তাঁহারা পুনশ্চ আপনাকে ফেরৎ দিবেন, কেবল ব্যয়ভার সঙ্কুলানের জন্য আপনাকে সামান্য সামান্য "প্রিমীয়ম" মাসিক দিতে হইবে; হয়ত তাহাতে আপনার মাসিক ৩৲ ব্যয় পড়িল। অতএব আপনার ১০৲ স্থানে ৩৲ ব্যয় হইতেছে। তবেই বেশ দেখা যাইতেছে যে গৃহস্থের মাসিক ৭৲ লাভ হইতেছে। এরূপ হইলে কেন দৈন্যের কামড়ে তাহার কামদুঘা শুষ্ক গাভীকে লোকে ২০।২৫ বা ৩০৲ টাকায় কশায়ের হাতে বিক্রয় করিবে! তাহার পর কলিকাতা হেন বৃহৎ নগরে বাণিজ্যের খুব বিস্তার বলিয়া সহস্র সহস্র লোক পল্লীগ্রামকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া সহরে সমবেত হওয়ায় খাদ্য সামগ্রী মহার্ঘ্য হইতেছে এবং গো মেষ ছাগলের মাংসে ঐ জনসমূহের উদর পুরিত হয় বলিয়া প্রত্যহ শত শত গৃহপালিত পশু কশাইর ছুরিকা রঞ্জিত করিয়া থাকে। আমার বিবেচনা হয় যে, যেমন গোবধ নিয়ন্ত্রিত করার বিশেষ বিধির প্রয়োজন, সেইরূপ দুগ্ধবতী বা শুষ্ক মহিষ বলিরও বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতার বাজারে শুষ্ক মহিষের মূল্য ১৮৲ হইতে ৫০৲। যদি এই গুলি পুনশ্চ কোন কোম্পানি বা জনসাধারণ ঐ দরে খরিদ করিয়া যে দেশ হইতে তাহারা আইসে অর্থাৎ মথুরা দিল্লী বা পাঞ্জাব প্রভৃতি অপরাপর জেলায় ৮৲।১০৲ টাকা রেল খরচা দিয়া প্রেরিত হইয়া তৎতৎ দেশে বিক্রীত হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণ বাঁচে, কোম্পানির আর্থিক লাভ হয় এবং দুগ্ধ সরবরাহের উৎসটি সমূলে নির্মূলিত হয় না।

গো-বীমা সমিতি আমাদের দেশে গো-রক্ষার জন্য বহুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। ঐ

সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং ইহা আমাদের দেশে কার্য্যকারী করিতে হইলে পাশ্চাত্য অনুকরণে তাহা পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দেশের গোবৃন্দের কতকটা রক্ষার আশা হইতে পারে। বিগত প্রাদেশিক কৃষি সমিতির অধিবেশনে কয়েকটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিব। গো-বীমা সমিতি যত শীঘ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে যদি আমার স্বদেশবাসীগণ উদ্যোগী হন, তাহা হইলে আমি সাধ্য মত পারিশ্রমিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আশা করি, দেশের ধনকুবেরগণ ও দেশের মান্য গণ্য ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

আমরা কৃষির দিকে না দৃষ্টিপাত করিয়া অবারিত গো মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণকে খাদ্যের দোহাই দিয়া হনন করিয়া থাকি। কিন্তু গোভক্ষক পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীগণ তাহাদের নিজেদের দেশের অশ্ব, গো মেষাদি পশুগণকে কশাইর ছুরিকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আগামী ৩রা এপ্রেল তারিখে বিলাতি পার্লিয়ামেন্ট গৃহে এক তুমুল বক্তৃতা ও আন্দোলন পেশ করিবেন। গত বৎসর বিলাতে তেজস্কর ষাঁড়ের সংখ্যা কোন অভাবনীয় কারণে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় পার্লিয়ামেন্টের মধ্যে মিঃ রনসিম্যানকে প্রশ্নের বন্যায় সভাগণ ব্যতিব্যস্ত করিতে ত্রুটি করেন নাই। বহুকষ্টে তিনি এক বৎসর কাল বৎস হনন কার্য্য স্থগিত রাখিবার হুকুম জারি করিয়া দেশের কৃষককুলের তুষ্টিসম্পাদন করেন। আমাদের দেশে প্রত্যহ শত শত গো মহিষ, মেষ, ছাগল, ঘোড়া ভোজনের জন্য হত হইয়া থাকে, ইহাতে দেশের কৃষির দৈনন্দীন হীনাবস্থা হইতেছে, তাহার দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না। পূর্ব্বে বৃষোৎসর্গের ব্যবস্থা ছিল, এখন অর্থ লোলুপ জমীদারদের কৃপায় তাহা এককালীন সবই বন্ধ হইয়াছে। তাঁহারা অবাধত্যক্ত বৃষগণকে নিজ গ্রাম্য সাধারণ চারণে চরিতে না দিয়া বরং মিউনিসিপালিটী সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের হস্তে নগরের মলমূত্র আবর্জ্জনা বহনের জন্য শকটে যোজনার কাজে নিয়োগ করিয়া থাকেন। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে কলিকাতা কর্পোরেশানের মলবাহী বৃষের জন্য প্রত্যেকটির ৫০৲ টাকা করিয়া দাম কন্ট্রাক্টারদের তালিকায় নির্দ্ধারিত আছে। ঐ সরবরাহকারীগণ নানাপ্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া বা ভাতি প্রদর্শন করিয়া নদীয়া, শান্তিপুর, রাজসাহী, ২৪ পরগণা, হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পাড়াগাঁ হইতে আবাধ বিচরণশীল তেজস্কর বৃষকুলকে ধরিয়া আনিয়া কলিকাতা সহরে উপরোক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই সকল দিকে দেশের লোকের আদৌ দৃষ্টি নাই। এই সকল বৃষকুল কার্য্যান্তরে নিয়োজিত হওয়ায় দেশের কৃষির কি হানি হইতেছে, তাহা আর বলা যায় না। পোড়া দেশের এদিকে দৃষ্টি পড়িবে কি !!!

তাহার পর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জেলা সমূহে গোপালন ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, দেশের লোক আর গৃহে গো রক্ষা

করে না। বালকদের নেশ্‌লীর বা এংলোসুইশ জমা-দুগ্ধের কৌটাতেই পালন করিয়া থাকে। আমরা যেমন দিন দিন বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে ইহা সুবিধাজনক বটে। পাড়াগাঁয়ে গোপালন করা আজকাল, সহরে গো-পালনের মত, বিশেষ সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন হইয়া দাড়াইয়াছে।

এখন আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে দেখা কর্ত্তব্য যে কি উপায়ে পাড়াগাঁয়ে ও বৃহৎ বৃহৎ নগরে অপেক্ষাকৃত সুলভ ব্যয়ে গোপালন করা যাইতে পারে! প্রথম অন্তরায় গো-ভোজ্য দ্রব্যের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, চারণের সম্পূর্ণ অভাব এবং জনের অভাব। দেশে বহুল কল কারখানার আবির্ভাব হওয়ার পল্লীগ্রামে কৃষির জন্য জন পাওয়া দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া অবাধ গো হননে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা দেশে ক্রমশই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। কৃষাণ বা জনের অভাব জন্য কতকটা আমরাই দায়ী। অনেক পল্লীগ্রামে নিঃস্ব কৃষকগণ জমিদারদের দ্বারায় বিশেষ উৎপীড়িত হইয়া থাকেন এবং বিদ্যাবিস্তারে দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আত্ম-সম্মান-জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হওয়ায় সামান্য রোজগারে আজকাল লোকের সংসার চলে না বলিয়াই অনেক লোক নানাবিধ উপায়ের জন্য সহরে বাস করা বেশী পছন্দ করেন। তাহার পর পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য খুবই অবনতি প্রাপ্ত হওয়ায় লোকে পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছে। কাজেই ঐসকলের সমতা রক্ষা করিতে হইলে সমাজের নেতাগণের বিশেষ মাথা ঘামান দরকার। আমাদের বর্ত্তমান বিলাসিতার মাত্রা কতকটা কমান কর্ত্তব্য। ঘরের কন্যাদের কার্পেট বোনার ও নভেল পড়ার সহিত রন্ধন শালা ও গো-শালার কাজ কতকটা পুনঃ অভ্যস্ত করাইতে পারিলে আমার বোধ হয়, অনেকটা অভিযোগ অন্তর্হিত হয়।

দেশের মধ্যে পাটের চাষে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হইয়াছে বটে কিন্তু আহারীয় সামগ্রীর ত্রীগুণ মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের মধ্যে বৎসর বৎসর আকাল ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। মনুষ্য রাজ্য মধ্যে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় পশু রাজ্যেও খাদ্যের অভাব হইতেছে। কাজেই শত সহস্র গো, মহিষ, মেষ, ছাগল অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

গো-বীমা সমিতি আমাদের দেশে রচনা করিতে হইলে বড় বড় লোকের সমবেত চেষ্টা চাই এবং বিলাতি অনুকরণে আমাদের দেশের দরকারের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া চাই। তিন মাস হইতে উর্দ্ধ বয়স্ক গো-বলদ, মেষ, মহিষ, অশ্ব, বৃষ, গাধা, গাভী, বকনা, ছাগল প্রভৃতিকে বীমা আইনের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন হইলে আমি সমস্ত করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল।

জাতি বিচার।

চতুর্থ কথা।

জাতিভেদ না থাকিলে উদ্দেশ্য লুপ্ত হইত এবং ব্রাহ্মণ্যগুণের পরিপোষণ হইত না।

পাঁচ জনে মিলিয়া কোন কাজ করিতে হইলে গুণ-হিসাবে কার্য্য বিভাগ অতি

প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। সকল কার্য্যেই সকলে কর্ত্তা হইতে চাহিলে সে কার্য্য কখনও সুসিদ্ধ হয় না। গুণ বিচারে কোন একজনকে কর্ত্তা করিয়া, জনগত ক্ষমতানুসারে, তাহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্যাবলী ভাগ করিয়া লইলে, সে কার্য্য সহজে সম্পাদিত হয়। এই জন্য এই প্রকার কার্য্য বিভাগ সকল সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ পুরোহিত, কেহ রাজা, কেহ ব্যবসায়ী, কেহ বা দাস—এ বিভাগ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ইহা ছাড়া চরিত্রানুযায়ী বিভাগ করিলেও প্রধানতঃ চারি প্রকার চরিত্রের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকারের লোক আছে, তাহারা স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, ধীর, নম্র, সত্যবাদী, পরদুঃখে কাতর, চিন্তাশীল, পার্থিব সুখ দুঃখে অবিচলিত, সংসারের সুখে অনুরাগহীন, ধর্ম্মভীরু, সংযতেন্দ্রিয়। আর এক প্রকারের লোক তাহারা তেজস্বী, উদ্ধত, গৌরবাকাঙ্খী, স্বপ্রাধান্যান্বেষী, কার্য্যতৎপর, পরোপকারী, অল্পবহুল-স্বার্থপর, জ্ঞানী, অথচ ইন্দ্রিয়-পরবশ। তৃতীয় প্রকার লোক, প্রথম শ্রেণীর ন্যায় নিরীহ, ধীর চিন্তাশীল, কিন্তু পূর্ণ পার্থিব সুখান্বেষী, ভোগবিলাসী, দুঃখ-কাতর, অতিশয় স্বার্থপর, উদ্যমী, মুখে সরল কিন্তু হৃদয়ে দারুণ খল। মুখে সাহসী হৃদয়ে ভীরু ও তৎপ্রতিবিধান তৎপর। এই শ্রেণীর লোকের সহিত কখনও মিশিও না বা বিশ্বাস স্থাপন করিও না। চতুর্থ প্রকারের লোক দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের ন্যায় বলবান, দাম্ভিক, তেজস্বী, কিন্তু হৃদয়হীন অত্যাচারী, ক্রুর, অজ্ঞ, বুদ্ধি বিবেচনাশূন্য, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন। ইহারা আপনা হতে প্রায় কোন কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু বুঝাইয়া লাগাইতে পারিলে সকল শ্রেণীর লোকেরই বিশেষ সহায়। ইহাদের এই অন্ধ সাহায্যের উপর সমাজ অতিরিক্ত নির্ভর করে।

সাধারণতঃ এই চারি প্রকারের মনুষ্য দেখা যায়। এ শ্রেণীভেদ প্রকৃতিগত; ইহা মানুষকে করিয়া লইতে হয় নাই। ইহা সকল সমাজেই চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। ইহা প্রকৃতিগত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন

"চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্মঃ বিভাগশঃ।"

হিন্দু সমাজ এই চারি শ্রেণীর,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটি নাম দিয়াছে মাত্র।

এই যে প্রকৃতিগত চারি প্রকার গুণ, ইহার সকল কয়টিই সমাজ রক্ষার্থে উপকারী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—উন্নতিই সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং উন্নতির উপায় ধর্ম্ম। অতএব মনুষ্য সমাজের মূল লক্ষ্য ধর্ম্মই হওয়া উচিত। ধর্ম্মই যখন সমাজের একমাত্র প্রধান লক্ষ্য বস্তু, তখন প্রথম শ্রেণীর লোকই যে শ্রেষ্ট পদ বাচ্য এবং সমাজে সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় ও সমাজনেতৃত্বের শ্রেষ্ট পাত্র, সে বিষয়ে কোন কথাই উঠিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—সমাজরক্ষক না থাকিলে বহিঃ সমাজের অত্যাচার হইতে আপন সমাজকে রক্ষা ও সমাজান্তর্গত অত্যাচারীর দণ্ডবিধান হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই এই কার্য্যের উপযুক্ত। শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন ইহারা ব্যতিত অন্যে কেহ করিতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ—সমাজের ধন-

ধান্য সম্বর্দ্ধন,ভরণ-পোষণ—এ কার্য্যের ভার গুণ হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীর লোকের উপরই থাকা উচিত। স্বার্থপর না হইলে সঞ্চয়ী হইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্মণ নাম ধেয় প্রথম শ্রেণীর উপর সমাজ-নেতৃত্ব ও নরজীবনের ধর্ম্মরূপ মহা উদ্দেশ্য সাধনের ভার, ক্ষত্রিয় নামক দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর সমাজ শাসন ও রক্ষণের ভার, বৈশ্য বা তৃতীয় শ্রেণীর উপর ভরণ-পোষণ অর্থাৎ কৃষি, ব্যবসায় ইত্যাদির ভার হিন্দু সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধিহীন, অজ্ঞ চতুর্থ শ্রেণীর লোক বা শূদ্র সকলেরই অঙ্গ সাহায্যকারী। এইরূপ গুণানুযায়ী কার্য্য বিভাগ ও সমাজের উদ্দেশ্যানুযায়ী শ্রেণী বিশেষের প্রাধান্য সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হয়। ইউরোপীয় সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য পার্থিব উন্নতি, অতএব ইউরোপীয় বৈশ্য বা তৃতীয় শ্রেণীর লোকই ইউরোপীয় সমাজের নেতা। তাই ইউরোপীয় সমাজের আজ এ দারুণ অধঃপতন। আজ সেখানে ধর্ম্মটা theory মাত্র; practical ধর্ম্ম নাই বলিলেও চলে। বৈষয়িক উন্নতই আজ সেখানকার practical ধর্ম্ম। ইউরোপীয় সমাজকে বণিক সমাজ বলিলেই যথার্থ নাম ধরিয়া ডাকা হয়। আর ভারত সেই বণিক সম্প্রদায়ের শাসনাধীনে থাকিয়া সেই অন্ধকার আবর্ত্তে নিপতিত। ইউরোপীয় সমাজের এ অধঃপতনের কারণ বলিয়াছি,—দারিদ্র, দেশের ধাতু; আর এক প্রধান কারণ আদর্শহীনতা, ব্রাহ্মণ—যথার্থ ব্রাহ্মণ গুণান্বিত লোক ইউরোপে থাকিতে পারে না। আংশিক ব্রাহ্মণ যাহারা ছিল, বিষয়-বিলাস লোভ ত্যাগে অপারক হইয়া তাহারা কলুষিত হইয়া গেল। বিলাসিতা যে ধর্ম্মের একান্ত বিরোধী, এ কথা তাহারা সামান্যই বুঝিয়াছিল; এবং যেটুকু বুঝিয়াছিল সেটুকুরও লোভ দমনে অসামর্থ্য হেতু practice হইতে theoryতে দাঁড়াইল। সমাজ আদর্শহীন হইল। সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের মস্তিষ্কাংশ বিলুপ্ত প্রায় হইল। এতদিন পরে ভারত সমাজ অর্থাৎ হিন্দু সমাজ ও আজ ভগ্ন প্রায়, ইহাও আমাদিগের ব্রাহ্মণের দোষে। ব্রাহ্মণের নির্ম্মল কর্ত্তব্যময় হৃদয় বিষয় বিলাসের আপাতঃস্নিগ্ধ বিষধারা সম্পাতে আজ রাহু গ্রস্ত শশীর ন্যায় নিস্তেজ ম্লান। তাই আজ হিন্দু সমাজও প্রায় আদর্শহীন। হায় ব্রাহ্মণ! কবে তোমার চক্ষু ফুটিবে?

কিন্তু সে কথা এখন থাকুক। বলিতেছিলাম যে গুণ হিসাবে কর্ম্ম বিভাগ ও উদ্দেশ্য হিসাবে সমাজ নেতৃত্বের ভারার্পণ সকল সমাজেই প্রচলিত। ইউরোপীয় সমাজের উদ্দেশ্য পার্থিব উন্নতি, তাই বৈশ্য উহাদের নেতা। আর হিন্দুদের অর্থাৎ আমাদের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, তাই ব্রাহ্মণ আমাদের নেতা। ইউরেপীয় সমাজ কৃষি, ব্যবসায়, শিল্পাদি কার্য্যের যাহাতে উন্নতি হয়, তাহারই উপায় বিধানে তৎপর। আমাদের ধর্ম্ম-জীবনের যাহাতে উন্নতি হয় তাহাই করিতে বাধ্য। ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি সাধন করিতে ব্রাহ্মণের নেতৃত্ব যে সমাজের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ব্রাহ্মণ কিরূপ ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে মহাত্মা "Comte" বিশেষ রূপে করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—ধর্ম্মসমাজ ব্রাহ্মণের দ্বারাই পরি-

চালিত হওয়া উচিৎ। ব্রাহ্মণেরা ধনহীন হওয়া আবশ্যক। তাহারা মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানে বিভূষিত হওয়া প্রয়োজন। চরিত্রের ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ না থাকিলে তাহারা সাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তিভাজন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণেই শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা করিবে। সাধারণই হউক বা ব্যক্তিগতই হউক প্রত্যেক কার্য্যই ব্রাহ্মণের পরামর্শাধীন থাকিবে। ব্রাহ্মণই ভজনা করিবে, সমাজ বিভাগ করিবে, ধর্ম্ম কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। নিম্নে তাঁহার এই ধরণের মত কতকটা ইংরাজিতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

*"The elaborate and minute systematization of life, proper to the religion of humanity, is to be directed by a priesthood. The priests are to possess neither wealth nor material power, they are not to command but to counsel; their authority is to rest on persuation, not on force **** The power of the priesthood rests upon special knowledge of man and nature. But to this intellectual eminence must also be added moral power, and a certain greatness of character, without which force of intellect and completness of attainment will not receive the confidence they ought to inspire. The functions of the priesthood are of this kind:—To exercise a systematic direction over education, to hold a consultative influence over all the important acts of actual life, public and private, to arbitrate in case of practical conflict, to preach sermons recalling those principals of generality and universal harmony, which our special activities dispose us to ignore, to order the due classification of Society, to perform the various ceremonies appointed by the founder of the religion:"

Encyclo. Brit.

ইহা কি আমাদের ব্রাহ্মণের প্রতিমূর্ত্তি নহে?

কিন্তু এইবার যত গোল। গুণ ভেদে যে চারি প্রকার কার্য্য বিভাগ সমাজে বর্ত্তমান এবং প্রয়োজনীয়, তাহার মধ্যে বিলাস ও সুখভোগের অন্তরায় নহে, সেইটিই সাধারণের অধিক চিত্তাকর্ষক। সেই জন্য সাধারণতঃ লোকে সেই কার্য্যেই লিপ্ত থাকে। ধর্ম্ম কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য, সুতরাং তাহাতে স্বইচ্ছায় লিপ্ত থাকে এমন লোক সকল সমাজেই বিরল। কিন্তু যখন সকল বিভাগই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, বিশেষ হিন্দুর পক্ষে যখন সেই ধর্ম্ম বিভাগই প্রধান, তখন নিশ্চয়ই এমন একটি বাঁধা বাঁধি চাই যাহাতে (১) সে বিভাগ পরিপুষ্ট হয় এবং তাহাতে লোকাভাব না ঘুটে, (২) যাহাতে সেই বিভাগীয় গুণের বিশেষ পরিবর্দ্ধন হয়। গুণ পরিবর্দ্ধনের না হয় অনেক উপায় আছে; কিন্তু সে বিভাগ পরিপুষ্ট করিবার ও তাহাতে লোকাভাব বিনষ্ট করিবার উপায় কি? যে কার্য্যে সভ্য, সুখ, অর্থ, বিলাস, বিষয়-ভোগ—সে কার্য্য সকলেই গ্রহণ করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। কিন্তু যে আসনে ভিক্ষা, উপবাস ব্যতীত বসিবার উপায় নাই, সুখ-বিলাস-ভোগের গন্ধে যে আসন কলুষিত হয়,—দিবানিশি ঈশ্বর আরাধনা, পরমঙ্গল চিন্তা, গভীর জ্ঞানতত্ত্ব আবিষ্কার, ধ্যান ধারণা ও সমাধি যে আসনোপবিষ্টের করণীয়—সম, দম, সত্য যে আসনে

উঠিবার একমাত্র সোপান—নিস্বার্থতা- যে আসনোপবেশনের মূল মন্ত্র, সে আসনে বসে কে? কে সাহস করিয়া পার্থিব সুখ-রস ত্যাগ করিয়া সে দুঃখ সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়? সুখময় কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া কে সেই কঠোর কর্ত্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতে চাহে? হায়! বুঝি ইহার উপায় নাই। ইহার উপায় না জানাতেই ইউরোপীয় ধর্ম্ম-বিভাগ চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় সমাজ বণিক-সমাজে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতার উজ্জ্বল চর্ম্মে মুখাবৃত করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা বিকট হাস্য করিতেছে। ধর্ম্মকর্ম্ম Formality তে দাঁড়াইয়াছে। হায় Pope! তুমি ইউরোপীয় ব্রাহ্মণ হইয়া আপনি স্বর্ণ-সিংহাসনে না বসিয়া যদি হিন্দু ব্রাহ্মণের মত কুশাসনে বসিতে; হিন্দু ব্রাহ্মণের মত যদি পার্থিব ধনরাশী বিলাইয়া দিয়া, আপনার জীবনোপায় ভিক্ষা আর ভগবান বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতে; যদি হিন্দু ব্রাহ্মণের মত কিসে সমাজের এ শীর্ষ বিভাগ উন্নত, রক্ষী, ও পরিবর্দ্ধিত হয়, নিস্বার্থচিত্তে তাহার চিন্তা করিতে পারিতে, তবে বুঝি আজ তোমার সে গৌরব গিরিশিখর হইতে নিম্নে অতি নিম্নে পতন হইত না। তাহা হইলে বোধ হয় তুমি সে উপায় আবিষ্কার করিতেও সক্ষম হইতে। অহোঃ বিষয়-বিলাস-বাসনা! তোমার স্নিগ্ধ কোমল স্পর্শের লোভ লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষা কঠিন! একমাত্র ভারতের ব্রাহ্মণই সে লোভকে, কাল সর্পের ন্যায় দূরে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। সে অমর উপায় আবিষ্কারে ও একমাত্র সেই ভারতের ব্রাহ্মণই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আজ সে ব্রাহ্মণ বিরল,—কিন্তু তাহার সে উদ্ভাবিত উপায় এখনও বর্ত্তমান।

সে উপায়—জাতিবিচার ও তজ্জনিত জাতি বিশেষকে কর্ম্ম বিশেষে আবদ্ধ রাখা। জাতি-বিচার জনিত কর্ম্ম বিশেষকে জাতি বিশেষে আবদ্ধ রাখার প্রথার মত, তত্তৎকর্ম্মকে চির সঞ্জীবিত রাখিবার দ্বিতীয় উপায় আর নাই। এক একটা কাজ এক এক জাতি যদি বংশপরম্পরানুক্রমে করিতে থাকে সে কাজ হইতে তাহাদিগকে খুব আপদ বশত না হইলে, যদি অন্য কার্য্যে যাইতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সমাজের তত্তৎবিভাগীয় কর্ম্ম কখনও সমাজ হইতে উঠিয়া যাইতে পারে না। একথা এক রকম স্থির সিদ্ধান্তের মত বলা যাইতে পারে। হিন্দুর জাতিবিচারের অন্য কোন গুণ থাক বা না থাক এই একটি মহৎ প্রত্যক্ষ ফল। শুধু ফল নহে, ইহারই তেজে হিন্দু সমাজ আজও জীবিত।

হিন্দু সমাজের লক্ষ্য—ধর্ম্ম-জ্ঞান। এ লক্ষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। বিলাস বাসনা সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে, বিলাস বাসনার আপাতঃ স্নিগ্ধ প্রবল আকর্ষণ হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণ সংযত করিতে না পারিলে, এ বিষয়ে পরম উন্নতি সাধনের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এ মায়াবিনী রাক্ষসীর মোহ-মন্ত্রে একবার আকৃষ্ট হইলে, মনুষ্যকে একবার মাত্র একপদ স্থানচ্যুত করিতে পারিলে সত্-র্কতা গণ্ডীর বাহিরে কেশাগ্র মাত্র স্পর্শ করিতে পারিলে,পাপিনী রাক্ষসী তাহাকে আপাদমস্তক গ্রাস করে। পুরুভুজের মত সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন

করিয়া তাহার শোণিত শোষণ করে। এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু কয়জন ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়? কোটি কোটি লোকের মধ্যে কয়জন ইহাকে আপন হৃদয়ের বলে পরিত্যাগ করিতে পারে? কয়জন এমন লোক আছেন বা জন্মিয়াছেন ইন্দ্রিয়সুখের আশায় জ্ঞানবলে জলাঞ্জলি দিয়াছেন? বিরল—নাই বলিলেও চলে। তবে উপায়? হিন্দু ধর্ম্মের উপায় তবে কি? যে ধর্ম্ম বিলাসের নামে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নামে কলুষিত হয়, তার উপায় তবে কি? হিন্দু-সমাজ-শরীরের মস্তিষ্কই ত তাহা হইলে লোকাভাবে নষ্ট হয়। ধর্ম্মহীন সমাজ? সে ত পশু সমাজ। ধর্ম্মহীন মনুষ্য? সে ত সে জন্মের মত প্রকৃতির ত্যজ্যপুত্র। তবে কি এ বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতির বিরাট উদ্দেশ্য বিফল হইবে? অসম্ভব। জানি না কোন্ মহাপুরুষের উপর মায়ের কৃপা কটাক্ষ পড়িল। জানি না কোন্ মহাপুরুষ কতকাল ধরিয়া, কি মন্ত্রে মায়ের পূজা করিয়াছেন। জানি না কিরূপ সাধনার ফলে তিনি এ জাতি-বিচার তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। জাতি বিভাগ হইল। বিধান হইল, ব্রাহ্মণ বংশ-পরম্পরানুক্রমে বিলাস বাসনা ত্যাগ করিয়া সমাজের মস্তিষ্কাংশ পরিপুষ্ট করিবে। ব্রাহ্মণের উপর এ কঠোর কর্ত্তব্যের ভার পড়িল।

এমন করিয়া বংশানুক্রমে করিতে হইবে বলিয়া এ কার্যের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণে যদি না করিত, তাহা হইলে সমাজের এ প্রধান অংশ ইউরোপীয় সমাজের ধর্ম্ম বিভাগের মত কোন্ কালে বিলুপ্ত হইত। এ কঠোর কর্ত্তব্যের ভার ইচ্ছা করিয়া খুব অল্প লোকেই লইতে চাহে। কর্ম্মের এইরূপ বংশগত ব্যবস্থা করার জন্যই এখনও যথার্থ ব্রাহ্মণ দুই চারিটা খুঁজিয়া মিলে। কেননা ইহাতে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণকে বিলাস ত্যাগ করিতে হয়। আর মানুষের মনটা এমনই জিনিষ, নিমিষের জন্য শূন্য থাকিতে চাহে না। বিষয় বাসনার দিক হইতে ফিরাইতে পারিলেই আত্মচিন্তা, আত্ম-জ্ঞানের দিকে আপনি ধাবিত হয়। এইজন্য ব্রাহ্মণ-সন্তান, বাধ্য হইয়া বিষয় চিন্তা হইতে বিরত থাকিতে থাকিতেও ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার অনুযায়ী কার্য্য করিতে করিতেও তাহাদের চিন্তা শেষে জ্ঞানমুখী হইয়া যায়। এইরূপে এ বিভাগে লোকাভাব ঘটে না। তাহা হইলেই, জাতি-বিচার যে হিন্দু-সমাজের ধর্ম্ম-বিভাগ অমরতুল্য করিয়াছে—এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

এইরূপে সুধু ধর্ম্ম-বিভাগ নহে, হিন্দু-সমাজের সকল বিভাগকেই জাতিবিচার অমর-প্রায় করিয়াছে। জাতি-বিচারের এ দীর্ঘজীবন দানের ক্ষমতা এখন সকলেই অল্প বিস্তর বুঝিতেছে।

"Bengal secretariat Book depot', হইতে প্রকাশিত "A monograph on Ivory Carving in Benga." নামক reportএর লেখক লিখিয়াছেন,—Had it not been for the wonderful vitality of the Caste system, it world, I have no doubt, have ceased to exist long ere this,—

শুধু হস্তিদন্তের বেলায় নহে, সকল বিষয়েই জাতি বিচার,এ সুধাময় ফল প্রদান করিয়াছে।

জাতি বিচার সমাজের প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকলের লোপ পাইবার ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে—এ কথা সপ্রমাণিত হইল। এবার দেখাইব তত্তৎ কর্ম্মোপযোগী গুণ পরিবর্দ্ধন করিতে ইহা কত প্রয়োজনীয়।

গুণ পরিবর্দ্ধন করিতে একটি বিষয় দেখিতে হয়। এক পাত্রের প্রকৃতি বা শিক্ষা-শক্তি-মেধা, আর এক শিক্ষা ও অভ্যাস। শুধু শিক্ষাদ্বারাই কেহ বিদ্বান বা বুদ্ধিমান হইতে পারে না। এক রকম শিক্ষা দুইজন ছাত্রকে দেওয়া যাউক, মেধা হিসাবে দুইজনের শিক্ষা দুই রকমের হইবে। একজন বা বিদ্বান শিক্ষিত, গুণ বিভূষিত হইবে। অন্যের হয়ত সে শিক্ষা মোটেই কার্য্যকরী হইবে না। এটা প্রত্যক্ষই দেখা যায়। আর এটা হইবার কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রকৃতির বা মেধাশক্তির—গুণ গ্রহণ শক্তির পার্থক্য। মনুষ্য এ পার্থক্য জন্ম হইতেই লইয়া আসে। মনুষ্য পিতা-মাতার নিকট এ গুণগ্রাহী প্রতিভার জন্য ঋণী। শিক্ষা ও কঠোর অভ্যাসও ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে সত্য কিন্তু ইহা গোটে না থাকিলে ইহাকে আনিতে পারে না।

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুটি আঁখি।

(১)

মরি কি সুন্দর আহা আঁখি দুটি তোর।
দেখি দেখি সাধ কভু নাহি মিটে মোর॥
যত দেখি তত হই ভাবেতে বিভোর।
কাল-তারা-ভরা-বড় আঁখি দুটি তোর॥

(২)

আদরিণী সোহাগিনী পরাণ আমার।
কত ভাব লুকায়েছ নয়নে তোমার॥
সাগরের তল আছে, পার আছে তার।
অতল অপার দুটি নয়ন তোমার॥

(৩)

যবে ও নয়ন তুলি থাকলো চাহিয়া।
সাধ হয় আঁখি মাঝে যাই গো ডুবিয়া॥
যে গভীর প্রেম হৃদে রেখেছ ঢাকিয়া।
ওই আঁখি দুটি তাহা দেয় প্রকাশিয়া॥

(৪)

কোমল হৃদয়ে তোর কত কোমলতা।
কত সরলতা আর কত মধুরতা॥
হৃদি-ভাব জানাবার কত ব্যাকুলতা।
ও চারু নয়ন মোরে দেয় সে বারতা॥

(৫)

স্বর্গ ফুল! যেন ভবে পথ ভুলে আসা।
কি বলিতে চাস্ যেন না যুয়ায় ভাষা॥
মোরেই তুষিতে যেন ভবে তোর আসা।
নীরব নয়ন কহে এ নীরব ভাষা॥

(৬)

আর কহে যা' দিবার দিয়াছ সঁপিয়া।
প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, দিয়া মিলায়েছ হিয়া॥

সব সাধ যেন তোর গিয়াছে মিটিয়া।
পেয়ে এ অজানা দেশে আমারে খুঁজিয়া॥

(৭)

ওই আঁখি-ফাঁদে সখি রেখেছ ধরিয়া।
মন প্রাণ ও নয়নে গেছে বিকাইয়া॥
শয়নে স্বপনে রহি অথবা জাগিয়া।
মন-সরে ওই আঁখি বেড়ায় ভাসিয়া॥

(৮)

না জানি কি গুণ ধরে ওই দুটি আঁখি'
বুঝিতে নারিনু মোরে কিসে দিলে ফাঁকি।
যাহা ছিল সব গেছে, কিছু নাহি বাকি,
সব চুরি করিয়াছে ওই দুটি আঁখি॥

শ্রীধ্রুবলাল দত্ত বর্ম্মা।

পুরী বা জগন্নাথ ক্ষেত্র।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

পুরী বা জগন্নাথ ক্ষেত্রকে শ্রীক্ষেত্র কিম্বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রও বলা হইয়া থাকে। একান্ন পীঠের মধ্যে এস্থান একটী মহাপীঠ; এখানে অর্থাৎ এই উৎকল দেশে ভগবতীর নাভী পতিত হইয়াছিল। এখানে বিমলা দেবী এবং জগন্নাথ নামে ভৈরব আছেন এবং ইহাকে বিরজাক্ষেত্রও বলে।

সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য পুরাণে বর্ণিত আছে। জীবের ভববন্ধন মোচন জন্য শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা আর অন্য কোন শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র নাই, এখানে ভগবান দারুময় রূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন এবং এই জন্য পুরীকে ভূস্বর্গ নাম দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে জগন্নাথক্ষেত্রকে দশাবতার ক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ আছে, কারণ এই নামেই ভগবান পর্য্যায়ক্রমে দশবিধ অবতার হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে লীলা করিয়াছিলেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোন জীব হউক না কেন, এখানে মরিলে তাহার মুক্তি লাভ হয়। এই ক্ষেত্রের আয়তন দশ যোজন এবং ইহা চারিমণ্ডলে বিভক্ত যথাঃ—শ্রীমন্দির এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান শঙ্খমণ্ডল নামে অভিহিত। মহানদী তীরস্থ ভুবনেশ্বর চক্রমণ্ডল; বৈতরণী তীরবর্ত্তী জাজপুর পরগণা গদা-মণ্ডল, এবং চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্ত্তী অর্কক্ষেত্র পদ্মমণ্ডল বলিয়া খ্যাত। শাস্ত্রের উক্তি এই যে বারানসী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থে এক বৎসরকাল বাস করিলে যে ফল হইবে, জগন্নাথ ক্ষেত্রে একদিন থাকিলে সেই ফল লাভ হয়।

উৎকল পঞ্জিকায় ভগবান জগন্নাথ, জগন্নাথ ক্ষেত্র এবং জগন্নাথ মন্দির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চমপুরুষ ভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগে সূর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালবদেশে অবন্তী নগর ইঁহার রাজধানী ছিল। এক সময়ে এক পরিব্রাজক প্রমুখাৎ নীলাচলস্থিত অক্ষয় বটমূলে নীলেন্দ্র-মণিময় ভগবান নীলমাধবের সংবাদ পাইয়া স্বীয় পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে সন্ধান লইবার জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাপতি বসুনামক এক ধীবর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার যত্নে ও কৌশলে বহুক্লেশে নীলমাধব

দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তৎসমভিব্যবহারে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া নারদমুনির উপদেশে ও তৎসাহায্যে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং ভগবৎ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষে বহুব্যয়ে বহু শিল্পীদ্বারা এক অতি বৃহৎ ও মনোহর মন্দির প্রস্তুত করেন। মন্দির প্রস্তুত হইলে তিনি নারদমুনিকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্ম সমীপে উপনীত হইয়া বহু স্তবস্তুতি করাতে ব্রহ্মা বলিলেন—"হে নৃপতে। তুমি যে অল্পকাল এখানে আসিয়াছ, ইহা স্বর্গের অল্পকাল হইলেও পৃথিবীতে শত শত বৎসর গত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে এবং তোমার ভগবান উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত মন্দির ও বালুকা স্তূপে আছন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাল নামক এক রাজা মৃগয়ার্থে তথায় অশ্বারোহণে পরিভ্রমণকালে এক রন্ধ্রে অশ্বের এক পদ প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বালুকা খনন করিয়া দেখিলেন যে লৌহ নির্ম্মিত চক্রবৎ একটী বৃহৎ পদার্থের রন্ধ্র অশ্বের একপদে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি বহুকষ্টে অশ্বের পদ বাহির করিয়া দিলেন পরে কৌতুহল পরম্পর হইয়া সেই লৌহ চক্র উত্তোলনে অনুচরবর্গ নিযুক্ত পূর্ব্বক ক্রমে দেখিলেন যে সেই চক্র কোন মন্দিরের মস্তকস্থিত বিষ্ণুর চক্র। ইহাতে তিনি মন্দির উদ্ধারার্থ বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া দেন। যতই বালুকা অপসৃত হইতে লাগিল ততই এক প্রকাণ্ড মন্দির দেখা যাইতে লাগিল। পরিশেষে যখন সম্পূর্ণরূপে মন্দির নির্ম্মুক্ত হইল, তখন তিনি দেখিলেন, সেই অভ্যুচ্চ বিশাল মন্দির মধ্যে কোন বিগ্রহ নাই। ইহা দেখিয়া তিনি এই মন্দিরে মাধব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হয়েন।" ব্রহ্মার প্রমুখাৎ এই ব্যাপার অবগত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মন্দির মধ্যে মাধব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উহা স্বতন্ত্র মন্দিরে স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পালরাজা প্রথমতঃ ক্রোধান্বিত হইয়া তথায় আগমন করিলে মন্দিরাদি সংক্রান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্ষোভে কাতর হইয়া ভগবৎ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক জগন্নাথ-প্রতিষ্ঠা কার্য্যে মহানন্দে নিযুক্ত হয়েন।

প্রতিষ্ঠার আয়োজনাদি সমস্ত সংগৃহীত হইলে এবং দেবতাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলে ব্রহ্মা হংসরথে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। এইরূপে মূর্ত্তিচতুষ্টয়কে প্রথমতঃ পরিমার্জ্জিত ও রঞ্জিত করিয়া পট্টবস্ত্র ও নানাপ্রকার অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত করণান্তর সমুদ্রজলে অভিষেক করাইয়া ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত করা হইল। শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিকাবাড়ী যাতায়াত জন্য তিনটী রথ প্রস্তুত হইল। ভগবানের রথ গরুড় ধ্বজ রূপে, বলরামের রথ তাল ধ্বজরূপে এবং সুভদ্রায় রথ পদ্মধ্বজ রূপে চিহ্নিত করা হইল।

মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে, আকাশবাণী হইয়াছিল,—'ভগবান নিজেই আপনার প্রতিমূর্ত্তির বিষয় বিচারপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট করিয়া ও নিভৃত মহাবেদীতে আবির্ভূত হইয়া, অনুমতি করিলেন যে, তোমরা এক পক্ষকাল

বেদীগৃহ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখ। যে দীর্ঘহস্ত কৃষ্ণকায় পুরুষ আসিতেছেন, তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে; সে গৃহে অন্য কেহ প্রবেশ করিতে না পারে।' কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, এক আশ্চর্য্য দিব্যগন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল; দেবগণ বেদীর সম্মুখে আসিয়া, ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ দিন আগত হইলে, গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা গেল যে, রত্নময় বেদীর উপর জগন্নাথ, বলরাম মধ্যে সুভদ্রা এবং বামপার্শ্বে সুদর্শনচক্র, এই চারি মূর্ত্তি প্রকাশিত। জগন্নাথদেবকে নীলবর্ণে, বলরামকে শুভ্রবর্ণে ও সুভদ্রা দেবীকে কুঙ্কুম বর্ণে রঞ্জিত ও পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইল এবং নিত্য ভোগ দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল।

শ্রীজগন্নাথ দেবের দিবা রাত্রিতে ছাপ্পান্ন বার ভোগ হয় এবং প্রধানতঃ তিন ধূপ ও পাঁচ বিশ্রাম নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক ভোগেই প্রথমে পুরী-রাজার রাজভোগ, তৎপরে প্রসাদ বিক্রেতাদিগের সাধারণ ভোগ হইয়া থাকে। কণিকাভোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

নিত্য-পূজা-পদ্ধতি মধ্যে প্রধানতঃ প্রথমে—দুন্দুভিধ্বনি ও আরতি দ্বারা জাগরণ; দ্বিতীয়ে—দন্তধাবন জন্য কাষ্ঠ প্রদান; তৃতীয়ে—বস্ত্র-পরিবর্ত্তন; চতুর্থে—বাল্যভোগ বা সকাল ধূপ, ইহাতে ক্ষীর, নবনীত, দধি ও নারিকেল প্রদত্ত হয়; পঞ্চমে—পূর্ব্বাহ্ন-ভোগ, বেলা দশটায় খেচরান্ন ও পিষ্টক; ষষ্ঠে—মধ্যাহ্ন-ভোগ বা দ্বিপ্রহর ধূপ, ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হয়, পরে অপরাহ্ণ ছয়টা পর্য্যন্ত নিদ্রার জন্য দ্বার বন্ধ থাকে; সপ্তমে—নিদ্রাভঙ্গ ও জিলাপীভোগ; অষ্টমে—বৈকাল-ভোগ বা সান্ধ্যধূপ, ইহাতে খাজা, গজা, মতিচুর, দধি প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হয়; নবমে—নৈশভোগ বা বড় শৃঙ্গার ভোগ, ইহাতে নানাবিধ দ্রব্য দেওয়া হয়। রাজবাড়ীর প্রদত্ত ভোগের নাম—গোপালবল্লভ-ভোগ।

প্রত্যেক বার ভোগের সময় একটী করিয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে এবং নাটা-মন্দিরে নৃত্য-গীত ও বাদ্য হইতে থাকে এবং নৈশ-ভোগের পর, দেব-দাসীগণ সুমধুর স্বরে গীত-গোবিন্দ গাইয়া থাকেন।

এখানে জাতিভেদ না থাকাতে মহাপ্রসাদ নীচ জাতিতে স্পর্শ করিলেও তাহা অপবিত্র হয় না। চণ্ডাল-স্পর্শিত মহাপ্রসাদও ব্রাহ্মণে স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিতে পারেন; এই প্রসাদকে সাধারণ অন্ন বলিয়া অবজ্ঞা করিলে, নিরয়গামী হইতে হয়। মহাপ্রসাদ ভক্ষণের পূর্ব্বে মস্তকে ধারণ করিতে হয়। মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। দূরদেশে লইয়া যাইবার জন্য, মহাপ্রসাদ শুষ্ক করিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রসাদের মাহাত্ম্য কমে না, বা নষ্ট হয় না। জগন্নাথক্ষেত্রে বলি দিবার নিয়ম নাই, মাত্র ৺দুর্গাপূজার সময় মহানবমীর দিনে বিমলাদেবীর নিকট বৎসরান্তে একটী মাত্র বলি হয়, কিন্তু তাহাও মন্দির-প্রাঙ্গনের প্রাচী-রের বাহিরে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তীর্থযাত্রিদিগের শ্রীক্ষেত্রে "আটকিয়া-বন্ধন" একটী প্রসিদ্ধ ব্যাপার। আটকিয়া-বন্ধনকারীর প্রদত্ত অর্থ দ্বারা (অর্থের পরিমাণ অনুসারে)

এক বা ততোধিক ব্রাহ্মণ বা সাধু-ভক্ত অথবা দীন-দুঃখীকে, আট্‌কিয়া বন্ধনের পর হইতে, যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য থাকিবে, তাবৎ প্রতিদিন ভোজনে পরিতৃপ্ত করাই আট্‌কিয়া-বন্ধনের উদ্দেশ্য। আটকিয়া পুস্তকে, আট্‌কিয়া-বন্ধন-কারী-পুরুষের—উর্দ্ধতন চারি পুরুষের নাম, ধাম, এবং স্ত্রীলোকের—স্বামী, শ্বশুর প্রভৃতির নাম, ধাম লিখিত হইয়া থাকে।

শ্রীক্ষেত্রের উৎসবের মধ্যে, রথযাত্রা প্রসিদ্ধ উৎসব। ঐ সময় জগন্নাথ, তাঁহার ভ্রাতা বলরাম ও ভগ্নী সুভদ্রা দেবীকে রথারোহণে শ্রীমন্দির হইতে, এক মাইল দূরস্থ গুণ্ডিকা বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়। রথযাত্রার চতুর্থ রজনীতে লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথ দর্শনার্থ শ্রীমন্দির হইতে রওনা হইয়া ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন; এই উৎসবকে হোরাপঞ্চমী বলে। রথের প্রথম দিবস বহুসংখ্যক লোকের সাহায্যে রজ্জুবন্ধনে জগন্নাথ ও বলরামকে রথে উত্তোলন করা হয়; ভগ্নী সুভদ্রাদেবীকে পাণ্ডাগণ কোলে করিয়া উঠান। শ্রীমূর্ত্তি সকল সাত দিন পরে পুনরায় শ্রীমন্দিরে আনা হয়, ইহার নাম—পুনর্যাত্রা। সঙ্গে বড় ভাই বলরাম থাকেন বলিয়া, জগন্নাথ, স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে সঙ্গে না লইয়া, ভগ্নী সুভদ্রাদেবীকে সঙ্গে লইয়া গুণ্ডিকা বাড়ীতে যান, এই কারণ বশতঃ কয়েক দিন স্বামী-বিরহে লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত অধীরা হইয়া, মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকেন। রথোপলক্ষে পনর দিন মেলা হয় ও বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়।

শ্রীমন্দিরের অন্তঃপ্রাঙ্গনে নিম্নলিখিত দেব-দেবীর মন্দির আছে, যথা:—বিমলাদেবী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, গোপীনাথ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাশ্যাম, চৈতন্যদেব, নৃসিংহ, বটেশ্বর, হনুমান, মঙ্গলা, বটকৃষ্ণ, রোহিণীকুণ্ড, কাক-ভূষণ্ডি, মুর্ত্তিমণ্ডপ, মার্কণ্ডেয়, সূর্য্যনারায়ণ, বদরী-নারায়ণ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি একশত বিংশতিটী মন্দির আছে। উৎকলের রাজা গজপতি বংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের অধিকার কালে ১৮১৯ শকাব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রধান মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল দেশবাসীদিগের স্থপতি বিদ্যার পরা-কাষ্ঠার পরিচায়ক, লক্ষ শালগ্রাম শীলার দ্বারা নির্ম্মিত রত্নবেদীর উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ শ্রীশ্রীবলরাম, শ্রীশ্রীচণ্ডী, সুভদ্রা দেবী ও শ্রীশ্রীসুদর্শন চক্র বিদ্যমান আছেন।

শ্রীমন্দিরের বহির্প্রাঙ্গণেও অনেক দেব-দেবী আছেন যথা:—মহাবীর, মহাদেব, লোকনাথ, শীতলা, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। শ্রীমন্দির সমুদ্র হইতে একমাইল দূরস্থ নীলাচলে অবস্থিত। মন্দিরের চারিদিকে চারিদ্বার; তন্মধ্যে প্রধান প্রবেশদ্বারকে সিংহদ্বার বলে, ইহা পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। পশ্চিমে খাঞ্জাদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার ও উত্তরে হস্তিদ্বার। শ্রীমন্দিরটী চারিভাগে বিভক্ত, যথা:—মূল মন্দির বা মণি মন্দির, জগমোহন, নাট মন্দির ও ভোগ মন্দির।

এখানে রথ যাত্রা ভিন্ন আরও অনেক উৎসব হইয়া থাকে যথা:—স্নানযাত্রা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে স্নান-বেদীর উপর বিগ্রহ সকলকে রোহিণী কুণ্ডের জল দ্বারা স্নান করান হয়; এই স্নানের পর এক পক্ষ কাল মন্দির বন্ধ

থাকে, কেবল মন্দির নহে, পাকশালাও বন্ধ থাকে ; এই সময়কে অনবসর বলে, অর্থাৎ এসময়ে জগন্নাথ দেবের অবসর বা ফুরসুদ নাই, যে অন্যান্য কেহ সাক্ষাৎ বা দর্শন করে। চন্দন যাত্রাও একটী প্রসিদ্ধ উৎসব, ইহা অক্ষয় তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া বাইশ দিন থাকে। মদন-মোহনকে চন্দনে লিপ্ত করিয়া নরেন্দ্র সরোবরে নৌকারোহণ করাইয়া ভ্রমণ করাণ হয়। দোলযাত্রাও রথযাত্রার ন্যায় এক প্রসিদ্ধ উৎসব। ইহা ছাড়া ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা ইত্যাদি।

শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে সুবিশাল অঙ্গন মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বাবিংশ হস্ত উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে, তাহার নাম অরুণ স্তম্ভ। এই বৃহৎ স্তম্ভ একটী পাথর কাটিয়া খোদা হইয়াছে। অরুণ স্তম্ভের বিশেষ বিবরণ পুরী সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধে বিবরিত হইয়াছে। এই অরুণ স্তম্ভের নিকট হইতে, মন্দিরের সম্মুখ দিয়া দক্ষিণ দিকে যে পথটী ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে গিয়াছে, তাহার নাম স্বর্গদ্বার ; এখানে বহু মঠ আছে, তন্মধ্যে নিমাই চৈতন্যের মঠ, বিদুরের মঠ, নানক পন্থির মঠ, কবির পন্থির মঠ, শঙ্কর মঠ বা গোবর্দ্ধনমঠ, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। তৎপরে তীর্থ রাজ সমুদ্র, যাহার উত্তর কূলে শ্রীক্ষেত্র বিরাজিত। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের আকৃতি শঙ্খের ন্যায়, উদরভাগ সমুদ্রজলে নিমগ্ন, ইহা সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া তীর্থরাজ নামে অভিহিত। মন্দির প্রবেশের পূর্ব্বে যাত্রীগণকে প্রথমে এই সমুদ্রে স্নান করিতে হয়, শঙ্খের নাভিদেশে অক্ষয় বট অবস্থিত, ইহা ভগবানের বপু স্বরূপ। মন্দির প্রদক্ষিণ কালীন অক্ষয় বট স্পর্শ করিতে হয়, এবং এই প্রদক্ষিণ ক্রিয়াকে পুরিক্রমা করা বলে, অক্ষয় বটের বায়ুকোণে সুদর্শন চক্র দ্বারা যে সরোবর প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাকে মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর বা হরির খাত বলে। অক্ষয় বট ও সমুদ্র তট মধ্যে যে সরোবর আছে, তাহাকে শ্বেতগঙ্গা বলে। নরেন্দ্র সরোবরের নিকট জগন্নাথ দেবের একটি সুবিস্তৃত মনোহর উদ্যান আছে, এই বাগান জগন্নাথ বল্লভ নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিকা বাড়ীর মধ্যস্থানে সোপান বেষ্টিত যে বৃহৎ সরোবর আছে, যেখানে চন্দন-যাত্রা ও স্নানযাত্রা কালে বহুলোকের সমাগম হয়, তাহার নাম নরেন্দ্র তলাও বা নরেন্দ্র সরোবর। ইহার তীরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নূতন মঠ আছে। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে চৈতন্যদেব যে দন্ত ধাবনের কাষ্ঠ মৃত্তিকায় পুতিয়াছিলেন, তাহা শীঘ্রই বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। কোন সময় রাজাজ্ঞায় সিদ্ধ বকুল বৃক্ষ কাটিতে গেলে, গাছের কাণ্ডভাগ পড়িয়া গিয়া কেবল বাহির-আবৃত ছালটী মাত্র থাকে, এখনও উহা তদ-বস্থায় জীবিত আছে,এখনও উহা দর্শনে বিশেষ পুণ্যপ্রদ।

গুণ্ডিকা বাড়ীর নিকট ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর অবস্থিত। সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞকালীন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণ দিগকে কোটী কোটী গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই সকল গাভী যেখানে রাখা হইয়াছিল, তথায় তাহাদের ক্ষুরের দ্বারা মৃত্তিকা খনন হইতে এই

বৃহৎ খাত নির্ম্মিত হয়, ইহাই কিম্বদন্তী। পরে গাভীসকল যখন উৎসর্গীকৃত হয়, তখন হস্তচ্যুত সংকল্প জল সেই খাতে অল্পে অল্পে পড়িয়া জল পূর্ণ হইয়া এই বৃহৎ সরোবরে পরিণত হয় — ইহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। প্রবাদ আছে যে এখানে স্নান করিলে স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়॥

গীত।

হরি, কেজানে তব তত্ত্ব নিরূপণ !
অদ্ভুত অপরূপ-রূপ কর ধারণ॥
কে জানে তব মায়া, অনন্ত অন্ত মায়া,
দিয়ে হে মহামায়া, ভুলালে জগজ্জন।
সত্য যুগেতে হরি দৈত্যাদি সংহারি,
দেবাদিগণে হরি করিলে তারণ।
সেথা ভূভার হরণ জন্য, রাম রূপে অবতীর্ণ,
বলি ছলিবার জন্য, হোলেহে ব্রহ্মবামন।
ত্রেতায় রাম অবতারে, অহল্যা পাষাণীরে
মানবী কল্লে দিয়ে শ্রীচরণ।
অগাধ সিন্ধুজলে, রাম নামে ভাসে শীলে,
জানকী উদ্ধারিলে, বধিয়ে দশানন।
দ্বাপরে বৃন্দাবনে, ফিরিতে গোচারণে,
ভুলালে বাঁশীর গানে, গোপীর মন।
সেথা নানারূপে নানা কেলি,আয়ানের মন ছলি,
হৈলে হে কৃষ্ণকালী, ভুলালে বৃন্দাবন।
কলিতে কল্পতরু, জগন্নাথ জগৎগুরু,
হরিনাম কৈলে প্রভু বিতরণ।
রেখে গয়ায় শ্রীপাদপদ্ম, ত্রিভুবন কৈলে বাধ্য,
তুমি হে দুরারাধ্য তরাও এ অকিঞ্চন॥

শ্রীআনন্দগোপাল সেন বি,এ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সাহিত্য-সম্মিলন।—এবার কলিকাতায় সাহিত্য-সম্মিলনের বৈঠক বসিয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণীর প্রিয় সেবক সুবিজ্ঞ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়! সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন—প্রজাভক্ত মহাপ্রাজ্ঞ আমাদের মাননীয় বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর। দেশ বিদেশ হইতে ভারতীর প্রিয় ভক্তগণ আহূত হইয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কলিকাতার যাবতীয় গণ্যমান্য ধন্য ও বরেণ্য এবং আমার ন্যায় অসংখ্য নগণ্য সাহিত্যিকও সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমে বঙ্গেশ্বর বাহাদুর সভার উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করিলে, সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ, তাহার পর যাবতীয় কৃতবিদ্য মহোদয়গণ কর্ত্তৃক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সাহিত্যিকগণের এইরূপ একত্র সমবেত বড়ই সুখের বিষয়,তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; প্রত্যেক ছোট বড়, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সাহিত্যিকের পরস্পর আলাপ পরিচয়ই সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যেন তাহার নানাপ্রকার ত্রুটি দেখিলাম। সাহিত্যসেবীর মধ্যে অহংভাব না রাখিয়া সকলে সমান, সকলেই এক মায়ের উপাসক, এইভাবে মিলনই বাঞ্ছনীয়।

নববর্ষোৎসব।—নববর্ষ সমাগমে ব্যবসাদার মাত্রেই নূতন খাতার উৎসব করিয়া থাকেন। মণিকার মণিলাল কোম্পানী কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত অলঙ্কার

ব্যবসায়ী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন সাহিত্যিক বলিয়া প্রতি নববর্ষে তাঁহার কারবারের নূতন খাতা উৎসবের সহিত সাহিত্য-সেবীগণের মিলনোৎসবও হইয়া থাকে। এ বৎসরও বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসে সেই সাম্মলনের আয়োজন হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন, কাশিম-বাজারের স্বনামধন্য সাহিত্য-প্রিয় মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর,সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুসঙ্গের মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, উত্তরপাড়ার বদান্যবর জমিদার রায় জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর,কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি ধনকুবেরগণ, এবং মাননীয় জজ্ গুরুদাস বাবু, বিপিনবাবু প্রভৃতি যাবতীয় বখ্যাত সাহিত্যসেবীগণ সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রথমে কবিবর বেহারিলাল সরকার মহাশয়ের রচিত সঙ্গীত গীত হয়; তৎপরে রামপদবাবু সমাগত সভ্যমণ্ডলিকে বক্তৃতাচ্ছলে তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। উদীয়মান সুকবি শ্রীযুক্ত করুণানিদান বন্দোপাধ্যায় নববর্ষে "অলঙ্কার" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার পর মনোরঞ্জন বাবু ও বিপিন পাল মহাশয়ের বক্তৃতা; বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আর অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদ হইয়াছিল। তাহার পর শিশু গায়ক মাষ্টার সেন গুপ্ত বেহারি বাবুর রচিত বিদায় সঙ্গীত গান করিলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

হাওড়ার শ্মশান।—শ্মশান জীবিত ও মৃত সকলেরই আবশ্যক, দেহান্তে সকলেই তো এখানে ভস্মীভূত হইবে—তাহাত স্থিরনিশ্চয়। তখন তো তাহার কোন চৈতন্য থাকিবে না, তখন সে সুখ দুঃখের অতীত, তবে যাহারা তাহাকে দাহ করিতে শ্মশানে লইয়া আইসে তাহাদের কষ্টের কথা প্রকাশ করা এস্থলে আবশ্যক। হাওড়া একটী প্রধান জেলা- অনেক বড়লোক এবং শিক্ষিত লোক এই জেলায় বাস করেন। কিন্তু অন্তিম-শান্তির স্থান—এই শ্মশানের প্রতি কাহার নজর নাই। কেবল হৈ হৈ ও হুজুগ লইয়াই সকলে ব্যস্ত। বাঁশতলা ঘাট নামে একটী শবদাহ স্থান বা শ্মশান এখানে বহু দিন হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু এস্থানে জলের এত অভাব যে, এখানে আসিলে জীবিত ব্যক্তিরও জলাভাবে জীবন নাশ হয়। সকলেই জানেন—হিন্দুর শবদাহ সময়ে গঙ্গাজলে শবদেহ ধৌত করিতে হয় এবং চিতা নির্ব্বাণ করিতেও গঙ্গা-জলের প্রয়োজন। কিন্তু এখান হইতে ভাগিরথী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধান। নিকটে কোন পুষ্করিণী বা জলাশয়ও নাই। যে পুষ্করিণীটি আছে, তাহা মলমূত্র ও আবর্জ্জনা পূর্ণ এবং সকল সময়ে তাহাতে জলও থাকে না। কলের জলের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা না থাকারই মধ্যে। এরূপ অবস্থায় হিন্দুগণকে যে কি কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে আমাদের ন্যায়বান, প্রজাবৎসল ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন তিনি যে প্রকার উপায়েই হউক, এখানকার জলকষ্ট নিবারণ করিয়া মৃতের ও জীবিতের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন, আমাদের এই বহুদিনের অভাব মোচন করিলে তাঁহার নাম যে চির-স্মরণীয় হইবে—তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

হাওড়ায় সাহিত্য-সম্মিলন।—উত্তর-পাড়ার স্বনামধন্য বদান্যবর রায় জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় বাহাদুর মহোদয় কর্ত্তৃক এতদিন পরে হাওড়ার একটী প্রকৃত অভাব মোচন হইল। তাঁহার দানে হাওড়ায় "ডিউক লাইব্রেরী" নামে একটী সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্যোগী আমাদের সাহিত্য বন্ধু দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়। এক্ষণে তাঁহারই উদ্যোগে হাওড়া টাউনহলে, হাওড়ার প্রজাবৎসল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হোপকিন্স বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটী "সাহিত্য-সম্মিলন" সভা গঠিত হইবার চেষ্টা হইয়াছিল। চেষ্টা সফল হইয়াছে।



শ্রীজীবন দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

Mohila Press Calcutta

হিন্দু দেবগণের বাহন।

হিন্দুর দেবগণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক আলোচনাই করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের বাহন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অতি কম আলোচনাই হইয়াছে। তজ্জন্য উপস্থিত প্রবন্ধটীতে মদীয় ক্ষুদ্র শক্তিতে সেই বাহন-প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেছি।

এখানে আমরা হিন্দুর প্রধান কয়েকটী দেবতার বাহন বিষয়েই বিবেচনা করিব, সমস্ত দেবতার বাহনের বিষয় বিবেচনা করিবার অবসর আমাদের হইবে না।

দেবতাদিগের বিশেষ বিশেষ রূপ যেমন পুরাণের সৃষ্টি, তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বাহনও তেমনই পুরাণে সৃষ্ট। কিন্তু দেবতাদিগের মুল কল্পনার সন্ধান যেমন আমরা বেদে পাইয়া থাকি—তাঁহাদের বাহনের মুলকল্পনার সন্ধানও আমরা বেদেই পাইব।

পৌরাণিক দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই দেবরাজ রূপে কীর্ত্তিত বলিয়া আমরা প্রথমে তাঁহার বাহনেরই কথা বলিব। তাঁহার দুইটী বাহন—একটী ঐরাবত-হস্তী, অপরটী উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। এই দুইটী প্রকৃত কি পদার্থ তাহাই আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ঐরাবতকে স্বর্গ-হস্তী বলিয়া জানিলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা হস্তী নহে, প্রত্যুত ইহা হস্তীরই আকৃতিবিশিষ্ট মেঘমাত্র। অভিধানে ঐরাবতেরই একার্থক "অভ্রমাতঙ্গ" একটী শব্দ পাওয়া যায়, যথা—"ঐরাবতোঽভ্রমাতঙ্গৈ রাবণাভ্রমুবল্লভাঃ।" ইত্যমরঃ। ইহা হইতেই ঐরাবতের অর্থ বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়। অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ক্ষীরস্বামী ঐরাবত সম্বন্ধে যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অর্থ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকে না, যথা—"অভ্রমাতঙ্গত্বদাভ্ররূপত্বাচ্চ।" মল্লিনাথকৃত রঘুবংশটীকা। ঐরাবত শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি বিবেচনা করিলে, পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই সমর্থন পাওয়া যায়। "ইরা" শব্দের অর্থ জল যথা—ইরাভূবাক্ সুরাপস্তু স্যাৎ। ইরা অর্থাৎ জলের বিকার বলিয়াই মেঘ ঐরাবত হইয়াছে। গভীর নির্ঘোষযুক্ত বর্ষণ মেঘই ঐরাবত নামে অভিহিত হইয়াছে—ইহাই আমরা ঐরাবতের হস্তীরূপের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া মনে করি। উচ্চৈঃশ্রবাও আমাদের নিকট মেঘ বিশেষ বলিয়াই মনে হয়। বায়ুবেগে দ্রুতধাবিত বর্ষণোন্মুখ শব্দায়মান মেঘই উচ্চৈঃশ্রবা নামে কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হয়। ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন হয় বলিয়া যে প্রসিদ্ধ পৌরাণিক আখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারাও আমাদের অনুমানই বিশেষরূপে সমর্থিত হয়। বেদে জলীয় বাষ্পযুক্ত আকাশই বহুস্থলে সমুদ্র রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ ঋগ্বেদানুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তদীয় ঋগ্বেদানুবাদে লিখিয়াছেন—ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলিয়া

বিশ্বাস করিত এবং অনেক সময় 'সমুদ্র' বলিয়া ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে।" ১৬৮৯পৃঃ। সুতরাং আকাশ রূপ বাষ্প-সমুদ্র হইতে মেঘরূপ ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা উৎপন্ন হওয়া যে সম্পূর্ণ সম্ভবপর, তাহা বুঝিতে আর কোন কষ্ট হয় না। ইন্দ্রের এক নাম—মেঘবাহ * মেঘবাহন। ইহা দ্বারা ইন্দ্রের বাহন যে বস্তুতঃ মেঘ ব্যতীত আর কিছুই নহে—তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়।

বেদে—অগ্নির প্রাধান্য ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক বই কম নহে। বেদে—মেঘকে স্পষ্টাক্ষরেই অগ্নির বাহন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, যথা—

"যেন নপাতমপাং জুনাম মনোজুবো বৃষণোযংবহন্তি।" ঋগ্বেদ ১।১৮৬।৫। "আমরা জলের নপ্তা (অগ্নিদেবকে) স্তুতিকরতঃ প্রাপ্ত হইতেছি। মনের ন্যায় বেগশালী মেঘ সকল তাঁহাকে বহন করিতেছে।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

কিন্তু পুরাণে আমরা অগ্নির মেঘের পরিবর্তে ছাগ-বাহনের উল্লেখ পাই। ছাগের এক নাম— 'অজ।' এই 'অজ' শব্দের অর্থ মেঘও পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ প্রকৃতিবাদ অভিধানে "অজ" শব্দের মেঘ অর্থ প্রদানের পর তৎসমর্থন কল্পে একটী পৌরাণিক আখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে,যথা— "দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গকালে অজ (ব্রহ্মা) মেঘরূপ ধারণ করিয়া পলায়ণ করিয়াছিলেন।" ব্রহ্মা অগ্নিরই বিকাশ। অজ নামের সহিত ব্রহ্মার সম্বন্ধ হইতে অগ্নির সহিতও যে ইহার সম্বন্ধ হইবে,তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ আমরা অভিধানে অগ্নির একটী বিশেষ নাম 'অজগ' প্রাপ্ত হই। তথায় ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে—যজ্ঞাঙ্গরূপে যে অজ প্রাপ্ত হয়। অজ বা ছাগের দ্বারা যজ্ঞ করা হইত বলিয়াই অগ্নির 'অজগ' নাম হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তির তাৎপর্য্য। বেদে আমরা 'অজ একপাৎ' নামে একটী দেবতার উল্লেখ প্রাপ্ত হই যথা—

উত বঃ শংসমুশিজামিব শ্মস্যহির্বুধ্ন্যোজ একপাদুত।
ত্রিত ঋভুক্ষাঃ সবিতা চ নো দধেহবসং নপাদাশু হেমা ধিয়াশমি ॥
ঋগ্বেদ ২।৩১।৬

"হে দেবগণ! তোমরা আমাদের স্তুতি কামনা কর, আমরা তোমাদের স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। অহির্ব্বুধ্ন্য অজএকপাৎ ত্রিত, ঋভুক্ষা ও সবিতা আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন্। শীঘ্রগামী জলের নপ্তা (অগ্নি) আমাদের স্তুতি দ্বারা প্রীত হউন। 'রমেশ বাবুর অনুবাদ। এখানে অজ একপাৎ কোন্ দেবতা তৎসম্বন্ধে রমেশবাবু টীকায় লিখিয়াছেন —পুরাণে অহির্ব্বুধ্ন ও 'অজ একপাৎ' দুইজন রুদ্রের নাম। বেদে শব্দায়মান বজ্রাগ্নিই রুদ্রের প্রকৃত স্বরূপ। এ সম্বন্ধে রমেশবাবু মন্তব্য করিয়াছেন—রুদ ধাতুর অর্থ শব্দ করা, অগ্নি শব্দ করে অথবা বজ্র শব্দ করে, এইজন্য শব্দায়মান অগ্নির নাম রুদ্র হইল॥" ঋগ্বেদানুবাদ ১৬৯ পৃঃ। সুতরাং রুদ্রের সহিত সম্বন্ধ

* রাজ্যবর্ধান্ সম্মাহৃত্য কুর্য্যাদিন্দ্র মহোৎসবম্। প্রীণিতো মেঘবাহস্ত মহতীং বৃষ্টিমাবহেৎ॥" ইতি রঘুবংশ টীকায় মল্লিনাথ ধৃত দণ্ডনীতিঃ।

হইতে, অগ্নির সহিতও যে 'অজ একপাদের' সম্বন্ধ হইবে,তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। 'অজ একপাৎ' রুদ্র বিশেষ বুঝায়—ইহাই আমরা এখানে জানিতে পারিতেছি কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা আমরা এখনও পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি না। অজ শব্দ ছাগলার্থে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত একপাৎ শব্দ একপদ যুক্ত অর্থে যোগ করিলে ইহার এমন কোনই অর্থ গৌরব হয় না, যদ্বারা দেব-ভাবের বোধ হইতে পারে। কিন্তু 'অজ' জন্ম রহিত অর্থে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত একপাৎ এক মূল অর্থে যোগ করিলে তাহাতে অনাদি অদ্বিতীয় মূলতত্ত্ব এইরূপ বিশিষ্ট অর্থে অতি উচ্চ দেবভাবেরই বোধ হয়। ব্রহ্মার 'অজ' নাম এই মহান্ অর্থেরই প্রকাশক। 'অজ' একপাৎ রুদ্রের নাম বিশেষ হইলেও তাহা যে মূলে বিশ্বের আদি অগ্নি বা তেজঃতত্ত্বেরই দ্যোতক, অগ্নির চরম বিকাশ ব্রহ্মার 'অজ' নাম হইতেই আমরা তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হই। অভিধানে 'অজ' একপাদ শব্দের পরিবর্ত্তে 'অজ' পাদ শব্দও দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার অর্থও রুদ্র বিশেষ বলিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে। এই 'অজপাদ' শব্দ হইতে 'অজ' অগ্নির বাহন রূপে কল্পিত হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ 'অজপাদ' শব্দের অর্থ অজই পাদ অর্থাৎ গমনোপায় যার, এইরূপ করিলে অজ যে অনায়াসেই বাহন রূপে কল্পিত হইতে পারে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। অপর পশুর লোম অপেক্ষা ছাগ লোমের অধিক উষ্ণতা হইতে ছাগ বিশেষ-রূপে উত্তাপ অর্থাৎ অগ্নির অধিষ্ঠান রূপে কল্পিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।

রুদ্র যে অগ্নিরই বিকাশ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নিম্নে আমরা একটী ঋক উদ্ধৃত করিতেছি—তাহাতে আমাদের কথা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে ঃ—

"আরোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্ররু দ্রিয়
জাভ্রীর যজ্ঞিয়াসঃ।
বিদন্মর্ত্তো নেমধিতা চিকিত্বানাগ্নিং পদে পরমে
তস্থিবাংসম্॥"

ঋগ্বেদ ১।৭২।৪

'যজ্ঞার্হ দেবগণ বৃহৎ দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া রুদ্রের উপযুক্ত স্তোত্র করিয়াছিলেন। মরুৎগণ ইন্দ্রের সহিত উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।" রমেশ বাবুর অনুবাদ। রমেশ বাবু ইহার টীকায় লিখিয়াছেন "রুদ্র এখানে অগ্নির নাম।"

রুদ্রের মেঘরূপ বৃষবাহন সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত ঋকটিতে আমরা প্রমাণ প্রাপ্ত হই যথা—

"উতনোঽহিবুধ্নো ময়স্কঃ শিশুং ন পিপ্যুষীব
বেতিসিন্ধুঃ।
যেন নপাতমপাং জুনাম মনো জুবো বৃষণোযং-
বহন্তি॥"

ঋগ্বেদ ১।১৮৬।৫

"(অন্তরীক্ষচারী) অহির্বুধ্ন্য আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। সিন্ধু বৎসের ন্যায় আমাদিগকে প্রীত করুন। আমরা জলের নপ্তা (অগ্নিদেবকে) স্তুতি করতঃ প্রাপ্ত হইতেছি। মনের ন্যায় বেগশালী মেঘ সকল তাঁহাকে বহন

... ... " রমেশ বাবুর অনুবাদ। উদ্ধৃত ঋকে অহির্ব্বুধ্ন্য ও অগ্নি এক দেবতারূপে স্তুত হইয়াছেন। অহির্ব্বুধ্ন্য পুরাণে রুদ্র বলিয়া পরিচিত। রমেশ বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"পুরাণে অহির্ব্বুধ্ন্য একজন রুদ্র।" সুতরাং অগ্নি ও রুদ্র একই হইতেছেন। অগ্নি ও রুদ্র যে অভিন্ন তৎসম্বন্ধে আমরা এখানে অপর একটী ঋক্‌ও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"তবশ্রিয়ে মরুতো মর্জ্জয়ন্ত রুদ্রযত্তে জনিম চারুমিত্রম্।
পদং যদ্বিষ্ণোরুপমং নিধায়ি তেন পাসি গুহ্যং নাম গোনাম্॥"

ঋগ্বেদ ৫।৩।৩

হে অগ্নি। তোমার আশ্রয়ার্থ মরুৎগণ (অন্তরীক্ষে) মার্জ্জন করিতেছেন। হে রুদ্র! তোমার জন্ম অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তুমি উদকের গুহ্য নাম পালন কর।" রমেশবাবুর অনুবাদ।

বেদের রুদ্র হইতেই শিবের বিকাশ হইয়াছে। শিবের প্রসিদ্ধ বাহন বৃষভ। বেদে আমরা মেঘকেই বৃষভনামে বর্ণিত দেখিতে পাই যথা—কৃষ্ণো নোনাব বৃষভো যদীদম॥" ঋগ্বেদ ১।৭৯।২ কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণশীল (মেঘ) ও গর্জ্জন করিয়াছে।" রমেশ বাবুর অনুবাদ।

বর্ষ-বৃষ্টি-বর্ষণ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমরা স্বতঃই মেঘের সহিত যোগ বুঝিয়া থাকি। বৃষভ শব্দও ইহাদেরই মূল বৃষধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার ধাতুলভ্য অর্থ দ্বারাই, আমরা ইহাকে বর্ষণকারী মেঘ বলিয়া বুঝিতে পারি। তজ্জন্য আমাদিগকে আর কোন কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না।

মরুৎ বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা। পৃষদশ্ব ইহার এক প্রসিদ্ধ নাম। পৃষৎ শব্দের অর্থ জলকণা-জলকণা সকল অর্থাৎ মেঘরূপে পরিণত জলবিন্দু সকল যাঁহার অশ্ব অর্থাৎ বাহন তাঁহারই নাম পৃষদশ্ব (পৃষন্ত্যম্বুকণা, অশ্বোহাস্য ইতি অমর টীকায়াং মুকুটঃ)। যখন মেঘ-যোগে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হয়, তখনই মরুতের পৃষদশ্ব মূর্ত্তি আমাদিগের নিকট প্রকটিত হইয়া থাকে। 'পৃষৎ' সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—

সিংহইব নানদতি প্রচেতসাঃ পিশাইব সুপিশোবিশ্ববেদসঃ।
ক্ষপোজিন্বন্ত পৃষতিভিঋষ্টিভিঃ সমিৎ সবাধঃ শবসাহিমন্যবঃ॥" ১।৬৪।৮

প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্নমরুৎগণ সিংহের ন্যায় নিনাদ করেন, সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ হরিণের ন্যায় সুন্দর তাঁহারা শত্রুর বিনাশকারী, স্তোতার প্রীতিকারী ও ক্রুদ্ধ হইলে বিনাশক্ষম বলযুক্ত। এতাদৃশমরুৎগণ তাঁহাদের বাহন মৃগের সহিত এবং আয়ুধের সহিত শত্রু নিপীড়িত যজমান-দিগকে (রক্ষা করিতে) যুগপৎ আসিতেছেন।

এখানে "পৃষতীভিঃর" উপর রমেশ বাবু এইরূপ টীকা করিয়াছেন। মূলে পৃষতীভিঃ আছে অর্থাৎ মরুৎগণের বাহন বিচিত্রকায় মেঘ। পৃষতি ইতি মরুতাং বাহনস্য আখ্যা। পৃষ্যতঃ শ্বেত বিন্দ্বাঙ্কিতা মৃগা ইতি ঐতিহাসিকাঃ। নানাবর্ণ মেঘমালা ইতি নৈরুক্তাঃ॥ সায়ণ রমেশ বাবুর ঋগ্বেদানুবাদ ১৫৬ পৃঃ।

বায়ু, মরুতের সাধারণ প্রচলিত নাম। ইহার এক নাম আমরা মৃগবাহন প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মৃগপশুদিগের মধ্যে অধিক বেগশালী বলিয়াই ইহা আশুগ বায়ুর উপযুক্ত বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। মৃগের বাতপ্রমী নামের মধ্যেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্তরীক্ষস্থ বায়ু বা মরুৎ পৃষদশ্ব নামে অভিহিত হইত এবং ভূতলস্থ বায়ু "মৃগবাহন" নামে অভিহিত হইত। ইহাই ইহাদের পৃথক্ বাহনের প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হয়।

আদিত্য বা সূর্য্যও বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা। সূর্য্যের এক নাম সপ্তাশ্ব। ইহার সপ্তবর্ণ কিরণ রেখা সকলই অশ্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই ইহার সপ্তাশ্বনাম সম্বন্ধে প্রচলিত সাধারণ মত। ইহার অপর নাম হরিদশ্ব। হরিদ্বর্ণ রশ্মিজালদ্বারা সূর্য্য-তেজ উদ্ভিজ্জ মধ্যে বাহিত হয়, ইহাই হরিদশ্ব নামের অর্থ। উদ্ভিজ্জ সকলের সবুজবর্ণ এই হরিদ্বর্ণ রশ্মিরই কার্য্য। দেবতাদিগের অশ্ববাহন সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ রমেশ বাবু ঋগ্বেদানুবাদটীকায় যে মন্তব্য করিয়াছেন—তাহা এখানে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্যবোধ করি—

সূর্য্য বা উষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেই জন্য বেদের কবিগণ, সেই আলোকে উপমাচ্ছলে অশ্ব বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, অগ্নির আলোককেও সেইরূপ উপমাচ্ছলে অশ্ব বলা হইয়াছে। এই আলোকসমূহ লোহিত বা উজ্জ্বলবর্ণ, সুতরাং অশ্ব সমূহকে হরি, হরিৎ, অরুণ, অরুষ, লোহিত ইত্যাদি উজ্জ্বলবর্ণ ব্যঞ্জক নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। কালক্রমে লোকে এই উপমাটী ভুলিয়া গেল এবং ঐ বর্ণের নাম গুলি অশ্বের নাম হইয়া গেল। সূর্য্যের অশ্বের নাম হরিৎ; ইন্দ্রের অশ্বের নাম হরি; অগ্নির অশ্বের নাম রোহিত ইত্যাদি।"

এক্ষণে আমরা হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি-ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের বাহন সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিব। ব্রহ্মার বাহন হংস, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, এবং মহেশ্বরের বাহন বৃষ ও ইহা সকলেরই সুবিদিত। এই সমস্ত বাহনের অর্থ কি—তাহাই আমরা অনুধাবন করিয়া দেখিব। হিন্দু ত্রিসন্ধ্যায় যে গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহাতে আমরা পূর্ব্বোক্ত বাহন সকলের প্রকৃতি রহস্য নিহিত দেখিতে পাই। গায়ত্রী মন্ত্রের সবিতাই মূলদেবতা। কিন্তু হিন্দু এই সবিতাতেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া গায়ত্রী মন্ত্রেই তাঁহাদের ধ্যানও উপাসনা করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যায় সাবিত্রী গায়ত্রী দেবীর তিন রূপের ধ্যান হইয়া থাকে। প্রভাতে ব্রহ্মারূপের ধ্যান যথা—

"কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥"

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপের ধ্যান যথা—

"মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যাস্থাং পীতবাসসাম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল সংস্থিতাম্॥"

সায়াহ্নে শিবরূপের ধ্যান যথা—

"সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থাং সামবেদ সমাযুতাম্॥"

প্রভাতালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন সরোবরে কমল সকল প্রস্ফুটিত হয় এবং হংস

সমূহ তাহাতে আনন্দে ক্রীড়া করিতে থাকে—তখনই অরুণ তপন প্রকটিত হইয়া পদ্মবনে ও হংস পৃষ্ঠে আপনার রশ্মিজালের আসন পাতিয়া বসেন। ইহাতেই সূর্য্যরূপী ব্রহ্মা হংসবাহন হইয়াছেন।

মধ্যাহ্নে সমুজ্জ্বল সবিতাদেব মধ্যগগনারূঢ় হইলে একমাত্র গরুড় পক্ষীই তখন ব্যোম-বিহারী হইয়া তাঁহার বাহনরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাতেই সূর্য্যরূপী বিষ্ণু গরুড়বাহন হইয়াছেন।

সায়ংকালে সবিতাদেব পশ্চিমাকাশাবলম্বী হইয়া অস্তগমনোন্মুখ হইলে তদীয় উপসংহৃত তীর্য্যক কিরণ গোষ্ঠে বৃষ সকলের পৃষ্ঠ আশ্রয় করে বলিয়াই সূর্য্যরূপী মহেশ্বর বৃষবাহন হইয়াছেন। সন্ধ্যা সময় যে গবাদির গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত সন্ধ্যার "গোধূলি" নামই তাহার দৃঢ়প্রমাণ। পূর্ব্বোক্ত পর্য্যালোচনা সকল হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে হিন্দু দেবতাদিগের বাহন অমূলক অদ্ভুত কল্পনা নহে—পরন্তু ইহার মধ্যে গূঢ়ভাবে প্রাকৃতিক ব্যাপার সকলেরই সংযোগ রহিয়াছে। শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অতিথি-পূজা।

(পৌরাণিক প্রচলিত ক্ষুদ্র গল্প)

"শত্রু যদি গৃহে আসে অতিথি হইয়া,
করিবে তাহার পূজা আহারাদি দিয়া।
নীচেও অতিথি হ'লে মহতের ঘরে,
করিবে তাহার পূজা অতি সমাদরে॥"

পৌষ মাস, সন্ধ্যা অতীত প্রায়; সুমুখে অন্ধকার রাত্রি। দুইজন নিষাদ বিজন বনে বহির্গমন পথ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া ঘন পল্লবাবৃত এক বিশাল বনস্পতির তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বৃক্ষের উপরে এক কপোত দম্পতির পবিত্র শান্তি নিকেতন। আপন নীড়ে বসিয়া কপোত স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে বলিল,—"দেখ, পত্নি! আমরা বনের পাখী হইলেও গৃহস্থ। গৃহস্থ ভবনে সমাগত অতিথি শীত-বাত ও অনশনে ক্লেশ পাওয়া মহাপাপ। ইহাদিগকে শীত নিবারণার্থ অগ্নি এবং কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমি অগ্নি আনিতে যাইতেছি; যতক্ষণ না গৃহে ফিরি ততক্ষণ তুমি সতর্কতার সহিত সন্তানদিগকে রক্ষা কর।

কপোত-পত্নী বলিল,—"আগুন আনিতে তোমার যাইয়া কাজ নাই; অগ্নিতে তোমার চঞ্চুপুট পুড়িয়া যাইতে পারে। তুমি গৃহে অবস্থান কর; আমিই অগ্নি আনিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া কপোতী লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেল।

বিহঙ্গিনী অদূরস্থিত কৃষক-পল্লী হইতে অগ্নি আনিয়া বৃক্ষতলস্থিত-নিষাদ দ্বয়ের সন্নিধানে নিক্ষেপ করিল। নিষাদগণ দৈবদত্ত পবিত্র দান বলিয়া উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া শুষ্ক পত্রাবলী সংগ্রহ পূর্ব্বক দারুণ শীত নিবারণ করিল।

কপোত বলিল,—"অতিথি সৎকার গৃহীর পরম ধর্ম্ম। অতিথি অভুক্ত থাকিলে গৃহস্থের মহাপাতক সঞ্চয় হয়। ধর্ম্মে অবহেলা করিয়া এ পাপ জীবন রক্ষায় ফল কি? তুমি শাবক-

গণের রক্ষণাবেক্ষণ করিও; আমি অতিথি সৎকারার্থ অনলে প্রাণ উৎসর্গ করিব।" এই বলিয়া ক্ষুদ্র বিহঙ্গম্ সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি প্রদান করিল।

অনন্তর বিহঙ্গিনী স্বীয় শাবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"বৎসগণ! তোমাদের জনক অতিথি সেবায় দেহপাত করিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র দেহে দুইজন ক্ষুধিত অতিথির কি হইবে? তোমরা এখন বড় হইয়াছ; স্বয়ং আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণেও অসমর্থ নহ; অতএব তোমাদিগকে রাখিয়া অতিথির তৃপ্ত্যর্থে আমিও স্বামীর অনুগমন করিব।" এই বলিয়া বিহঙ্গিনী ও সেই প্রজ্জ্বলিত অনলে আত্ম-সম্প্রদান করিল।

জনক জননীর ক্ষীণ দেহে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি-দ্বয়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না ভাবিয়া তন্মুহূর্ত্তে শাবকদ্বয়ও পিতৃমাতৃ নির্দ্দিষ্ট পবিত্র পথে প্রয়াণ করিল!

কি অদ্ভুত আতিথেয়তা!—কি পবিত্র দৃষ্টান্ত!! হায় যে দেশের কাব্য-ইতিহাসে—যে দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর কণ্ঠে এমন শত সহস্র আদর্শ অতিথি সেবার অপূর্ব্ব কাহিনী প্রতি নিয়ত শ্রুত হওয়া যায়, সে দেশের গৃহস্থের দ্বারে আজ মুষ্টিভিক্ষাও বন্ধ প্রায়! কি ভীষণ পরিণতি!! কি বিষম কালপ্রভাব!!!

পাষণ্ড দলন।

(সত্য ঘটনামূলক গল্প)

ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য বংশ চির সম্ভ্রান্ত বলিয়া ঢাকা জিলার সে অঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ। সরলা ও চপলা দেবী এই সুবিখ্যাত সম্মানীত ব্রাহ্মণ বংশের অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ। সরলার পতির নাম কুঞ্জমোহন এবং চপলার স্বামীর নাম প্যারীমোহন। কুঞ্জমোহন ও প্যারী-মোহন দুই সহোদর ভ্রাতা। ইহারা উভয়েই কর্ম্মবশে অর্থ অর্জ্জনের দুর্লঙ্ঘ্য উদ্দেশে জীবনের অধিকাংশ কালই বিদেশে বাস করিয়া থাকেন।

সরলা ও চপলা যুবতী ও রূপসী; অথচ বিদুষী না হইলেও চরিত্র প্রভাবে সর্ব্বত্র গরীয়সী। তাঁহারা উনবিংশ ও অষ্টাদশবর্ষ বয়স্কা সরলা বালিকা বা কিশোরী যুবতী মাত্র। বঙ্গদেশে এ বয়সের মেয়েদিগকে বালিকা, কিশোরী, কিশোরী-যুবতী কি যুবতী সবই বলা যায়। সুতরাং মহিলাদ্বয় বয়ঃধর্ম্মে কিশোরী যুবতী বা সদ্য বিকশিত মল্লিকা হইলেও শিক্ষা মাহাত্ম্যে ও চরিত্র প্রভাবে পুণ্য পবিত্রতাময়ী দেব-বালিকা।

সরলা ও চপলা পল্লীগ্রাম নিবাসী বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ-কন্যা। সুতরাং আধুনিক সভ্য সমাজের অনুযায়ী কোনরূপ সুশিক্ষা লাভ তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহারা পল্লী সমাজের অশিক্ষিতা মহিলাগণের সংসর্গে—হিন্দু পরি-বারের মধুর অবরোধ আবরণে আজন্ম প্রতি-পালিত এবং তাঁহাদেরই প্রাচীন স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় নিয়ত শিক্ষিতা। সুতরাং চির-

দিনই লজ্জার মধুর আবরণে অবগুণ্ঠিতা। পল্লব-পত্রাচ্ছাদিত বন্য যুথিকার ন্যায় তাঁহারা হিন্দুর অন্তঃপুরোদ্যানে ফুটিয়া আপনাদের-অমল ধবল অনিন্দ্য চরিত্র-সৌরভে ও অতুল রূপ-গৌরবে আপনি আনতা। আত্মীয় স্বজনে প্রীতি, গুরুজনে ভক্তি ও পতিপদে ঐকান্তিক-আশক্তি তাঁহাদের পবিত্র বধূজীবনের নিত্যব্রত। সরলা ও চপলা স্বভাবগুণে ধীরা, স্থিরা, ও গম্ভীরা হইলেও সতী-ধর্ম্ম প্রভাবে মহা তেজস্বিনী—বীর্য্যবতী—বীরমহিলা।

প্রতিবেশী নব্যযুবক বিনোদবিহারী সম্পর্কে কুঞ্জ ও প্যারীমোহনের জ্ঞাতি ভ্রাতস্পুত্র। বিনোদ তাঁহার পিতার দত্তক পুত্র। পোষ্য পুত্রেরা অধিকাংশ স্থলেই অশেষ দোষের আকর হইয়া দত্তক-গৃহীতা পিতার নাম উজ্জ্বল করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও সে কথার ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় নাই। বিনোদ কুশিক্ষায় সর্ব্বগুণে গুণধর হইয়া পিতা মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী মণ্ডলীর যারপরনাই অশান্তির নিদান হইয়াছিল। বিনোদ বিংশতি বর্ষ বয়স্ক বিংশ শতাব্দীর অর্দ্ধ-শিক্ষিত উৎশৃঙ্খল প্রকৃতির নব্য যুবক; সুতরাং এ শ্রেণীর অনেকের ন্যায় পঞ্চমকারে নিত্য সিদ্ধ। মদ, গাঁজা, সিদ্ধি ও সিমন্তিনীতে তাহার পুর্ণ আশক্তি। দত্তক গৃহীতার অপরি-মিত অর্থে বিলাসী বিনোদের বিলাস-লীলা সীমা অতিক্রম করিল। হতভাগ্য স্বগ্রামে এক গুণ্ডার দল সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহার নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিল। এ মণি-কাঞ্চন সংযোগে গ্রামের শান্তি অন্তর্হিত হইতে চলিল।

সরলা ও চপলার স্বামী বৈষয়িক কর্ম্ম ব্যপদেশে বিদেশে আছেন। পাপিষ্ঠ বিনোদ রক্ত সম্পর্কে মাতৃস্থানীয়া স্বাধ্বী আত্মীয়া সরলা ও চপলার রূপে মুগ্ধ। সে আজ দুই বৎসরের অধিক কাল তাঁহাদিগকে নরকের কুপথে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য নিয়ত প্রয়াসী। যখন তাঁহাদের প্রতি গুণ্ডারূপী বিনোদের প্রলোভন প্রদর্শন ও উৎপাত-উৎপীড়ন অত্যা-চার অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সতী রমণীদ্বয় স্বীয় স্বীয় স্বামীকে সে সব কথা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থিনী হইলেন। ক্রমে কথাটা আত্মীয়-স্বজন ও বিনোদের পিতামাতার কর্ণ-গোচর হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বরং ফল বিপরীত হইল। দৈনন্দিন সতী-দ্বয়ের প্রতি পাষণ্ডের পাশবিক অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিয়ত গুণ্ডা দলের গুপ্ত অত্যাচারে সতী সাধ্বী অবলাদ্বয় অস্থির হইয়া উঠিলেন।

বিগত ১৩১৬ সালের ১১ই চৈত্র সরলা ও চপলার স্বামী বাড়ী না থাকায়—উপযুক্ত আপনার জন অভাবে, প্রোষিত ভর্ত্তৃকা সতী দ্বয় এক ঘরে এক শয্যায় শয়ন করিলেন। নিস্তব্ধ নিশীথ যামিনী। ক্ষুদ্র পল্লীতে তখন জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য কুক্কুরের বিকট চীৎকার নিনাদ, নিশাচর বিহঙ্গমগণের কণ্ঠস্বর এবং গ্রাম্য শিশুর অস্পষ্ট ক্রন্দন ধ্বনি সে নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ধরিত্রীর সজীবতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এমত সময় সতীদ্বয় প্রয়োজন বশতঃ একবার গৃহের বাহিরে গমন করিলেন।

গৃহে ফিরিবার কালে তাঁহারা অদূরে দুইজন লোক দেখিতে পাইয়া সভীত অন্তরে দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাড়াতাড়ি দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের হাতে ও শয়ন-গৃহে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। সতীদ্বয় শয্যাপার্শ্বে উপনীতা হইয়া শয্যাপ্রান্তে পাপিষ্ঠ বিনোদকে দণ্ডায়মান দেখিয়া সর্পদর্শনভীত পথিকের ন্যায় মহা-আতঙ্কে বিচলিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন—গুণ্ডার অত্যাচারে পবিত্র সতীত্বধর্ম্ম বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে তাঁহাদের হৃদয় শুকাইয়া গেল। রমণীদ্বয় ধর্ম্মনাশ ভয়ে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলশায়িনী হইবার উপক্রম হইল।

চিরমঙ্গলময় বিধাতা অন্ধকে পথ দেখাইলেন। ভীতি-বিহ্বলা অবলার প্রাণে কর্ত্তব্য-বুদ্ধির উদয় হইল। বুদ্ধিমতী সরলা, চপলাকে অস্ত্র আনিতে ইঙ্গিত করিয়া, স্বয়ং বিনোদের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাহাকে আশা পরিপূরণের অলীক-ইঙ্গিতে বঙ্গনারীর সর্ব্বগ্রাসিনী কটাক্ষে মোহিত করিলেন। অবোধ বিনোদ কদলী-লুব্ধ শাখামৃগের ন্যায় লম্ফ দিয়া একেবারে শয্যায় উঠিয়া অর্দ্ধোপবিষ্ট, অর্দ্ধশায়িত ভাবে সরলার হস্ত ধারণ করিয়া প্রেম-সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মৃদু ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে চতুরা চপলা বিনোদের অলক্ষিত ভাবে একখানি খরধার অস্ত্র আনিয়া, তীব্রবেগে পাষণ্ডের গ্রীবাদেশে সবলে আঘাত করিলেন। আঘাত প্রাপ্ত বিনোদ সরলার হস্তত্যাগ করিয়া, বজ্রমুষ্টিতে অস্ত্র সহ চপলার হস্ত চাপিয়া ধরিল। এদিকে সরলা বীরাঙ্গনার ন্যায় আর একখানি অস্ত্র লইয়া বিনোদের সর্ব্বাঙ্গে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিলেন। সতীর আঘাতে কামুক কুক্কুরের অনিবার্য্য পাপ প্রবৃত্তির—বিষম লালসার চিরনির্ব্বাণ হইল। দানব-দলনী মহাশক্তির প্রভাবে পাষণ্ড অসুরের নিপাত হইল। সতীত্বের জয় হইল।

বিনোদের পতন হইল। কিন্তু তখনও পাষণ্ডের পাপ সহচরগণ গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া, গৃহপ্রবেশ জন্য নিয়ত চেষ্টা ও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক অবলাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছিল। কিন্তু মঙ্গলময় বিধাতার শুভ ইচ্ছায় পাষণ্ড-গণের পদাঘাতে সে দৃঢ় দ্বার ভগ্ন হইল না। সতীদ্বয় গুণ্ডার অত্যাচারের ভয়ে সে রাত্রিতে আর দ্বার উন্মোচন করিলেন না। তাঁহারা শোণিতসিক্ত-বসনে পাষণ্ডের শব সন্নিধানে নীরবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া রহিলেন।

সে কাল নিশা—সে ভয়ঙ্করী রজনী প্রভাত হইল। সতীদ্বয় সর্ব্বজন সাক্ষাতে অকপট-হৃদয়ে আমূল ঘটনা বর্ণন করিলেন। অনন্তর নরহত্যা-অপবাধে তাঁহারা বিচারার্থ ধর্ম্মাধি-করণে প্রেরিতা হইলেন।

পবিত্র ধর্ম্মাধিকরণের সূক্ষ্ম বিচারে—ন্যায় ধর্ম্মের অখণ্ড প্রভাবে, সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী বলিয়া যথাসময়ে পুণ্য-পবিত্রতাময়ী সতীরমণী-দ্বয় মুক্তিলাভ করিলেন। জগতে সতীধর্ম্মের বিজয়-নিশান প্রতিষ্ঠিত হইল। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী জগদম্বার কৃপায় তাঁহারই অংশ-স্বরূপিনী অবলার অপূর্ব্ব সতীধর্ম্মের দুর্জ্জয় তেজঃ-প্রভাবে, সতীত্বের জয় হইল—সতীধর্ম্ম রক্ষা পাইল। সতীত্বের মহীয়সী-শক্তির নিকট পশুর পাশবিক বল পরাভূত হইল। সতী সরলা ও চপলা আর্য্য-কুল-বরণীয়া আদর্শ-সতী সম্প্রদায়ের অন্তঃভুক্ত হইয়া, চির-অমরতা

লাভে কৃতার্থ হইলেন। ধর্ম্মের জয়, সতীর জয় ও সতী-ধর্ম্মের জয় হইল।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

জাতি বিচার।

পঞ্চম কথা।

তবেই গুণ-পরিবর্দ্ধনের জন্য মনুষ্যকুলকে পিতামাতার উপরই একান্ত নির্ভর করিতে হয়। পিতামাতা যদি কোন উপায় করিতে পারেন, যাহাতে তাহাদিগের সন্তান মেধাবী, সদ্গুণ-সম্পন্ন হয়, তবেই দেশের লোকের গুণ পরিবর্দ্ধনের পথ সহজ হইয়া যায়, নতুবা শুধু শিক্ষার উপর নির্ভর করিলে চলে না। এখন দেখা যাউক কি উপায়ে পিতামাতা সৎসন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন।

বীজ-শুদ্ধিই ব্যক্তিগত গুণ পরিবর্দ্ধনে ও নির্ম্মল করণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যখন পিতা-মাতার দোষ, গুণ, পুত্রে বিকাশ পায়, তখন সৎপুত্র পাইতে হইলে সৎপুরুষের সহিত, সৎরমণীর সম্মিলন চেষ্টা যে অতীব আবশ্যক, সে কথা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই সৎপুরুষের সহিত সৎরমণীর সম্মিলনেরই প্রকৃত উপায়, জাতি-বিচার। হিন্দুর বিবাহে যে এত আঁটাআঁটি, সে কেবল বীজ-শুদ্ধির জন্য। বিবাহ বিচারই জাতি-বিচারের মর্ম্ম। কোন্‌রূপ পাত্রের সহিত, কিরূপ পিতৃগুণ-প্রাপ্ত বা বংশানুগত-গুণ-প্রাপ্ত পাত্রের সহিত, কিরূপ বংশানুগত-গুণ-প্রাপ্ত কন্যার বিবাহ হইলে, মিশ্রগুণী সন্তান হইবে না, সন্তানে অভিষ্টগুণ পরিবর্দ্ধিতাকারে প্রকাশ পাইবে, এই বিচারের জন্যই বিবাহ-বিচার ও জাতি-বিচার।

সন্তানে যে পিতামাতার গুণ পরিস্ফুট হয়, সে কথা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত। ইউরোপীয়েরাও এ কথা স্বীকার করেন। আজকাল সকল কথাই ইউরোপীয়দিগের মতামতের ভিতর দিয়া, আমাদিগকে বুঝিতে হয়। ইউরোপ যেটাকে "হাঁ" বলিয়াছে, সেটা "হাঁ" বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহ আর আপত্তি করে না। সুতরাং ভাল হোক, মন্দ হোক, আমরাও গোটা-কত ইউরোপীয় মত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(1) Changes produced in the mind of a parent by association of ideas or otherwise tend to bc inherited by his offspring.

(2) The tendency of the germ to reproduce characters of its immediate parents, combiend in the case of sexual "generation with the tendency to reproduce the characters of the male is the source of the singular phenomena of hereditary transmission. No structural modification is so slight and no functional peculiarity is so insignificant in either parent that it may not make its appearence in the offspring. But the transmission of parental peculiarities depends greatly upon the manner in which they have been acquired. Such as have arisen naturally, and have been hereditary through many anticident generations, tend to appear in the progency with great force. Vide Encyclo: Brit: Biology.

তবেই—শুধু পিতৃগুণ নহে, পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণ অবধি সন্তানে সঞ্চারিত হয়। যিনি এ বিষয়ে কখনও চিন্তা করেন নাই, তাঁহাকে বুঝান অপেক্ষাকৃত শক্ত। Darwin বলিয়াছেন—

It is hardly possiule within a moderate compass to impress on those who have not attended to the subject, the full conviction of the force of inheritance :—বাস্তবিকই এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করিতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে।

সন্তানের গুণাগুণ পিতামাতার উপর যখন নির্ভর করে, তখন সদ্‌গুণান্বিত পুত্র উৎপন্ন করিতে হইলে সৎ-পিতামাতার সংযোগ একান্ত আবশ্যক। কোন্ পুরুষের সহিত কোন্ স্ত্রীর মিলন হইলে, পরস্পর পরস্পরের গুণ বিরোধী হইবে না, সেইটিই জাতি-বিচারের দ্বারা হিন্দু বাছিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-গুণান্বিত পুরুষের সহিত, ব্রাহ্মণ-গুণান্বিত স্ত্রীর সম্মিলন হইলেই পূর্ণ ব্রাহ্মণ-গুণান্বিত সন্তান পাইবার আশা করা যায়। আবার শুধু ব্রাহ্মণ-গুণান্বিত হইলেই চলিবে না, অনেক শূদ্রও ব্রাহ্মণ-গুণাবলম্বী থাকিতে দেখা যায়। যাহারা পুরুষ পরম্পরাক্রমে ব্রাহ্মণ, এমন স্ত্রী পুরুষ চাই। কেন না, পূর্ব্বপুরুষের গুণও সন্তানে সঞ্চারিত হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই জন্যই আমাদের ব্রাহ্মণ-পুত্রের সহিত ব্রাহ্মণ-কন্যার, ক্ষত্রিয়-পুত্রের সহিত ক্ষত্রিয়-কন্যার, বৈশ্য-তনয়ের সহিত বৈশ্য-তনয়ার বিবাহ দিবার নিয়ম হইয়াছে। ইহার দ্বারা জাতিগত গুণ বংশানুক্রমে পরিবর্দ্ধিত, নির্ম্মলীকৃত ও পরিপুষ্ট হইবে; তাহা হইলেই, সমাজের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। হিন্দুর জাতিভেদ—বিবাহ-অনুশাসনের জন্য; বিবাহ-অনুশাসন—বীজ-শুদ্ধির জন্য; বীজ-শুদ্ধি—গুণ-পরিবর্দ্ধনের জন্য; গুণ-পরিবর্দ্ধন—সমাজের উন্নতির জন্য; সমাজের উন্নতি—ধর্ম্মের জন্য; ধর্ম্ম—প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার জন্য। প্রকৃতির বাসনা পূরণ—নির্ব্বাণ লাভ। হায় জাতিভেদ! তোমায় যাহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মনুষ্য নহে—দেবতা।

এই যে নির্ব্বাচন, ইহা অপেক্ষা শক্ত কর্ম্ম আর নাই। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যকুলের উপকারী বিজ্ঞান আর হইতে পারে না। ইউরোপীয়েরা, পশুপালন ও পশুসৃষ্টির বেলায় এ কথা মানেন, আপনাদের বেলায় (বুঝি courtshipএর লোভে) এ কথা ভুলিয়া যান। "Darwin" পশুদিগের methodical selection সম্বন্ধে বলেন;—

"To be successful in this respect a man must not only possess in the highest degree the powers of discrimination, enabling him to determine which individuals are tending in the right direction, that is which most nearly approach his ideal, but he must be able to decide in the most Judicious manner, as to which of his selected individuals ought to be paired together."

যখন পশুর বেলাতেই এমন, তখন মনুষ্যের বেলায় কত শক্ত, কত উপকারী, সে কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। তবেই, জাতি-ভেদ না করিয়া লইলে, এ নির্ব্বাচন যে মনুষ্য

মধ্যে অসম্ভব হইয়া উঠে, সে কথা আর বুঝাইতে হইবে না।

"Close in-and-in breeding must be practised, or the race cannot be fixed." ইহা সাহেবের কথা। এই in-and-in breeding কতকটা হিন্দুর জাতি-বিচার।

শিক্ষাও গুণ-পরিবর্দ্ধনের প্রকৃষ্ট উপায় সত্য, কিন্তু বীজ-শুদ্ধি বা জাতি-বিচার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"In improving the blood of Domesticanimals is the best attention given to the training of the blood?"

The truth is that mankind has never investigated the subject, but strangely neglected what might be positively ascertained with comparative ease; if the laws of heredity were as well known as they might and should be; the knowledge of them would greatly conduce to health and length of days and to the transmission to our posterity of the higher and better elements of our nature."

এই Mankind এর ভিতরে অবশ্য হিন্দু নহে। বীজ-শুদ্ধি-জ্ঞান ভারতের অস্থি-মজ্জা-গত।

তবেই দেখা গেল, তুমি যদি পৈতৃক-কার্য্যে লাগিয়া থাক, তবে তোমার স্বকৃত বহুদর্শিতা ও জ্ঞান, তোমার পিতৃপুরুষদিগের তদ্বিষয়ী-জ্ঞানের সহিত, তোমার পুত্রে অর্শাইবে। তাহা হইলেই তদ্বিষয়ক-জ্ঞান, সুন্দররূপে পরিবর্দ্ধিত হইল। আবার, সেই জ্ঞানের সহিত, তোমার পুত্রের বহুদর্শিতা ও জ্ঞান, একত্রিত হইয়া, তোমার পৌত্রে বিকাশ পাইবে। এই রূপে বংশানুক্রমে সে জ্ঞান পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আর যদি যাহার যাহাতে ইচ্ছা নিযুক্ত হয়, তবে ব্রাহ্মণের কার্য্যে ও কতকটা ক্ষত্রিয়ের কার্য্যে, নিতান্ত অন্নাভাব না হইলে, আর কেহ লাগিবে না। তার সাক্ষী দেখ ইউরোপ। যথার্থ ব্রাহ্মণ ত নাই, যুদ্ধকার্য্যে ও কেবল পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে, বড় পদ পাইবার জন্য, আর যাহাদের সাতকুলে কেউ নাই, যাহারা পিতার নাম জানে না, এমন লোককেই নিযুক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাও পূর্ব্বে কেহ লাগিত না। কত Lecture, কত Reformation এর পর, তবে যাহা হউক, এ বিভাগ চলিতেছে। নতুবা সকলেই ব্যবসায়-অনুরাগী।

যদি কেহ বলেন যে, "যখন আমাদের সমাজের উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম, তখন ইউরোপীয় সমগ্র সমাজ যেমন ব্যবসায়কার্য্যে মন দিয়াছে, তেমনি আমরাও সকলে ধর্ম্মকার্য্যে মন দিলেই হইতে পারে।" সে কথায় প্রথম আপত্তি—সকলের মন সে দিকে কখনও যাইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ—অন্যদিকে সকলে একেবারে লক্ষ্যহীন হইলে, সমাজ অঙ্গহীন হয়, সমাজ টিকিতে পারে না। যদিও একবার একতার আবেগে সকলে চেষ্টা করিলে, আসিতে পারে বটে, কিন্তু সে আবেগ কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সে আবেগে সমাজ ভগ্ন হইবে, আবেগও যাইবে। আমাদের দেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশা কতকটা এই ধরণের। ইউরোপীয়-সমাজ এখনও জীবিত আছে, এখনও যুঝিতেছে। তাহার কারণ—বিষয়-বাসনাই ইহার উদ্দেশ্য। সকলেরই মন সাধারণতঃ সে দিকে আকৃষ্ট

থাকে। ধর্ম্মের দিকে তাহা হইয়া উঠে না।

শিক্ষা, অভ্যাস, প্রভৃতি আর যে সকল, গুণ-পরিবর্দ্ধনের উপায় আছে, বীজ-শুদ্ধির নিকট তাহারা কিছুই নহে। শিক্ষা যে মানুষকে মানুষ করিবার প্রধান উপায়, সে কথা সত্য। সর্ব্ব প্রকার মূর্খতা বিনাশের ইহা যে অমোঘ ঔষধ, সে কথাও খুব যথার্থ। কিন্তু শিক্ষার আবার প্রণালী আছে। আজকাল যে প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষা-বিকার অধিক হয়। কোন্ প্রকার লোকের পক্ষে, কোন্ প্রকারের শিক্ষা আবশ্যক, কাহাকে কি মাত্রায় এ ঔষধ দিতে হইবে, কাহার পক্ষে, কোন্ শ্রেণীর Education উপকারী, কাহার এ ঔষধ কত সহ্য করিবার শক্তি, বড় বালকের পক্ষে Sugar of milkএর Globule ভাল; দুর্ব্বলকে, অল্পবয়স্ককে কম মাত্রায় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত; চাষা ও ভদ্রলোকের বীর্য্য সমান নহে, সেখানে মাত্রার তারতম্য আবশ্যক। এ সব কথা, শিক্ষার বেলায় ইউরোপ বুঝিতে পারে না। যে পিশাচী সাম্যনাম্নী মহাদেবীর রূপ ধারণ করিয়া, ইউরোপকে ধ্বংশ বিধ্বংশ করিতেছে, সেই পিশাচীর মোহ—মন্ত্রেই শিক্ষা সার্ব্বজনীন অধিকার্য্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাদ-বিচার নাই। সহ্য ক্ষমতার ন্যূনাধিক বিচার নাই। শিক্ষা বড়বাজারের মাতাবি মণ্ডার মত স্তরে স্তরে সাজান আছে, যাহার যত ইচ্ছা, টাকা ফেল, (ব্যবসায়টা এ কার্য্যেই বা কেন ফাঁক পড়ে) আর স্তরে স্তরে গলাধঃকরণ কর! গিলিতে পারিলেই পণ্ডিত! তার পর ঘরে গিয়া—বঙ্কিম বাবুর কথায়—বিদ্যাজীর্ণ উপস্থিত কাপড়, চোপড়, স্থান, অস্থান কিছুরই বিচার নাই, বিষ্ঠার-স্রোত হু হু বহিতে থাকে! যেন "বেগোর হানা" ভেঙ্গেছে।

কোন বিখ্যাত ইউরোপীয় লেখক এ বিষয়ে কি লিখিয়াছেন দেখুন। Any one who has passed through the regular gradations of a classical education and is not made a fool of it,may consider himself as having had a very narrow escape." Hazalitt.

শিক্ষা রীতিমত হইলে, ইহার তুল্য গুণ-পরিবর্দ্ধনের সহজ উপায় আর নাই। আবার বিকৃত-শিক্ষা তদনুরূপ অনিষ্টকারী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজকাল যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহা যে একান্ত দোষণীয় ও ইহার সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক, সে কথা দুই একজন সাহেব মাত্র বুঝিয়াছেন। আমাদের ধুরন্ধর বাবুরা, কিন্তু নিজেরা শিক্ষিত হইয়া, আশা মিটে না; কুল-মহিলাদিগকেও এইরূপে শিক্ষিতা করিতে চাহেন। আমি স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কিন্তু প্রকারভেদ প্রার্থী। বাবু-শিক্ষা মাতৃমহলে প্রবেশ করিতে দিতে আমি একান্তই নারাজ। বাহির, অন্দর, দু'য়ে বিদ্যাজীর্ণ উপস্থিত হইলে, গৃহে বাস করা দায় হইবে।

আজকালকার শিক্ষার দোষ এই যে, ইহাতে practical শিক্ষা নাই। দ্বিতীয়তঃ—শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের যেন কোন সংশ্রব নাই। এই ধরণে আজকাল শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে; তৃতীয়তঃ—শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা কণ্ঠস্থ করিতে পারিলেই আজকাল

মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়। ইদানিং ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকও এই কণ্ঠস্থ করারূপ পক্ষী-বিদ্যার প্রভাবে কালীদাসের সমালোচনা করে। Philosophy Theory প্রমাণ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে "জাতি-বিচার ভাল নয়; হিন্দুরা Idolators, হিন্দুর বেদ কৃষকের-গান।"ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যাবলী যাত্রারদলের নট-নটীর ন্যায় উচ্চারণ করিতে থাকে। আমরা হাসি, আর তাহাদের পিতা-মাতার সদ্‌গতি কামনা করি। ফলতঃ—বিনয়ী, সত্যবাদী,জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মভীরু-লোক, আজকাল যে এত বিরল, ইহার কারণ—শুধু শিক্ষার অভাব,এখনকার শিক্ষা (বিজ্ঞানমুখী) অর্থমুখী। কার্য্যতঃ চরিত্র মার্জ্জিত করিবার শিক্ষা, দেশে আর নাই। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রাপ্ত বিজ্ঞ যুবক Science এ হয়ত M. A. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম হইয়াছেন, হয়ত কেহ সুদূর বিলাত বা প্যারিসের কোন মহাসভার সভ্য হইয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা কর দেখি,—'হিন্দুর প্রতিমা-পূজা কেন?"খুব ভাল মানুষ হইলে, হয়ত বলিবে,—"এটা বোধ হয় অসভ্য অবস্থার প্রবর্ত্তিত-প্রথা, দেশের লোকের অজ্ঞতাবশতঃ এখনও প্রচলিত আছে।" বিদ্যার বালাই নিয়ে মরি।

বীজ-গুণের এত যে ক্ষমতা, শিক্ষার দোষে সেটুকুও নষ্ট হতে বসিয়াছে। আমাদের দেশে যদি একটুমাত্রও পূর্ব্বের মত Practical শিক্ষা, চরিত্র-সংশোধন-অভ্যাস, একটুমাত্র ধর্ম্ম—এ শিক্ষাপ্রণালীর সহিত সংলিপ্ত থাকিত তাহা হইলে, পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণে এদেশের বালকদিগের অনেকটা উন্নতির আশা করা যাইতে পারিত। (অবশ্য হালের শিক্ষা যে ভাল নহে, সে কথা বলিতেছি না; এটাও প্রয়োজনীয়) তবে মূল প্রয়োজনীয়—ধর্ম্ম ও চরিত্র। তাহার সংশোধনের কাছে এটি কিছুই নহে। শুধু এটা দেশের ধর্ম্ম-উন্নতি-সাধন করিতে পারে না। আর স্ত্রীলোকের পক্ষেও এ বিদ্যা কোন প্রয়োজনে আসে না। আমাদের সমাজের উন্নতি ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে।

কিন্তু আসল বিষয় হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, বীজ-শুদ্ধি গুণ-পরিবর্দ্ধনের জন্য নিতান্ত আবশ্যক, এবং সকলেই তাহা স্বীকার করেন। আর গুণ-পরিবর্দ্ধনের উপকারিতা সকলেই জানেন। মনুষ্য যতই জ্ঞানবান হইতে থাকে, ততই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, এবং সমাজও ততই উন্নত-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখন যদি কেহ বলেন,—"ইউরোপ যে এত উন্নত হইয়াছে, ইহাকে ত জাতি-বিচারের আশ্রয় লইতে হয় নাই।" ইহার উত্তর এই যে, —"ইউরোপ পার্থিব-উন্নতির জন্য লালায়িত। পার্থিব উন্নতি ইহাদের সমাজের ও ব্যক্তিমাত্রেরই লক্ষ্য।"এ বিষয়ে ব্যক্তিমাত্রেরই উদ্যম ও আন্তরিক যত্ন থাকে। যখন দেশের সমস্ত লোকেই সে বিষয়ে মনোযোগী, তখন তাহার উন্নতিলাভ আশ্চর্য্যজনক নহে। সে কথা পরে আলোচনা করিব; এখন আমরা কয়েকটী বিষয় দেখিতে পাইলাম।

১। জাতিবিচার, সমাজকে অমরতুল্য করে; জাতি-বিচার থাকিতে সমাজের এককালীন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।

২। জাতি-বিচার ব্যক্তিগত গুণ-পরিবর্দ্ধন

করিয়া, সমাজের বিভাগ করিয়া, গত-কর্ম্মের ও এমতে সমগ্র সমাজের উন্নতি-সাধন করে।

৩ ধর্ম্মজ্ঞান পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে ও সমাজের ধর্ম্মবিভাগকে লোকাভাব হইতে রক্ষা করিতে, ইহা অদ্বিতীয়। জাতি-বিচার, ধর্ম্মের জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন সমাপ্ত হইল। এইবার আমরা প্রমাণ ক'রব যে, পার্থিব সুখ-শান্তিসাধনে ইহা কোন বিঘ্ন ঘটায় না, বরং পরিবর্দ্ধিত করে।

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংযম ও সম্ভোগ।

(গত বৎসরের ৩২০ পৃষ্ঠার প্রকাশিতাংশের পর)

পূর্ব্বে আহার সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পরমারাধ্যা গীতাতেও সে বিষয় সুব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। যথা ;—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারারাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময় প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

যে আহারের দ্বারা আয়ু, বল, চিত্তের স্থৈর্য্য, আরোগ্য, অকৃত্রিম-সুখ এবং প্রীতি বিবর্দ্ধন করে; যে আহার রসযুক্ত এবং স্নেহ-প্রধান, যে দ্রব্য আহার করিলে, তাহার ক্রিয়া অধিক-কাল স্থায়ী হয়, আর যাহা হৃদ্য (উগ্ররসযুক্ত নহে) ঈদৃশ দ্রব্য সকল সাত্ত্বিক-লোকের প্রিয়, অর্থাৎ সংযমলাভেচ্ছু পুরুষের উপভোগ্য।

সংযমে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভোগে শক্তি হ্রাস হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। সংযম আমাদিগকে সংসার-রূপ অন্ধকার হইতে মোক্ষমার্গে লইয়া যায় ; সম্ভোগ আমাদিগকে সংসার-জালে আবদ্ধ করে, বস্তুতঃ মানবের এক শরীরের পর অন্য শরীরের পরিগ্রহ, সম্ভোগের জন্যই হইয়া থাকে। বিষয়-তৃষ্ণা আছে বলিয়াই,জীব,কখনও কৃমি, কখনও বা পশু, কখনও বা পক্ষী, কখনও বা কীট-পতঙ্গ আর কখনও বা সুদুর্লভ মানব-জন্ম পরিভ্রমণ করিয়া, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু সংযমী-পুরুষ, ইন্দ্রিয়-নিরোধ-পূর্ব্বক ভগবদারাধনায় জ্ঞান লাভ করিয়া,তাহার সেই জ্ঞানরূপ সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা ভোগ-বাসনা এক একটী করিয়া ছেদন করে ও ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়। যেমন একটী বৃক্ষকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিতে হইলে, তাহার শিকড়সমূহ সমূলে উৎপাটিত না করিলে, আর তাহাকে উর্দ্ধে উত্তোলন করা যায় না—সেইরূপ বিষয়-ভূমিতে মানব-বৃক্ষ, বাসনা-শিকড়সমূহে সম্বদ্ধ হইলে, জ্ঞান-অসি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মূলোচ্ছেদন করিয়া, তবে উঁহাকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে হয় ; তখন তাঁহাকে আর বিষ-য়ীর ন্যায় ঘোরাবর্ত্তে পড়িয়া চীৎকার করিতে হয় না ; তখন তাঁহাকে আর দারা পুত্র-পরিবারের জন্য অলীক-ক্রন্দনে রত হইতে হয় না। তখন, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কারুণ্য-চন্দ্রিকা লাভ করিয়া উদ্ভাসিত হইতে থাকে ; তখন তিনি সমুদ্রতীরে বসিয়া প্রবল-

ঝটিকার সময়েও উত্তাল-সাগরের বক্ষ আলোড়িত মানব-তরী আনন্দ-হৃদয়ে নিরীক্ষণ করেন। আহা! সম্ভোগীর নিকট সে প্রেম, সে সুখ, সে আনন্দ, সে স্ফূর্ত্তি কদাচ স্থান পায় না। অনেকে বলেন যে,—'বিষয়-ভোগ দোষণীয় নহে, কারণ—ভগবান্ মানবগণের উপভোগের জন্যই যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং ভোগ করিতে আপত্তি কি?" কিন্তু একটু নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, অনায়াসেই উপলব্ধি হয় যে, ভগবান্ পদার্থসমূহ, অনাসক্ত-ভাবে ভোগ * করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের সম্যক উপভোগই আমাদের জীবনের চরম-উদ্দেশ্য নহে। অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে, জীব যাহা ইচ্ছা তাহা উপভোগ করিতে পারে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"যোহি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ময়ি তৎপরঃ।
কর্ম্মভির্নসবধ্যতে নলিনী দলমম্ভথা॥
কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

(গীতা)

যিনি সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া, ভগবানকেই সর্ব্বদা ধ্যান করেন, তিনি কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন না, যে প্রকার, পদ্ম-পত্র জলপূর্ণ হইলেও জল তাহাতে সংলিপ্ত হইতে পারে না। বিষয়-বাসনাদি প্রাকৃতিক বস্তু-নিচয় ভোগ করিতে হইলেও সেইরূপ-ভাবে ভোগ করা উচিত।

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, স্নানে, ক্রীড়াদিতে, সকল সময়েই ভগবানের মনোমোহন-মূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া সকল কর্ম্মই তাঁহাকে অর্পণ করার ন্যায় ভোগমার্গে ইন্দ্রিয়াদির সদ্ব্যবহার আর কিছুই নাই। অনেকে বলিবেন,—"যদি ভোগই না করিলাম, তবে ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন কি? তবে ষড়্‌রিপুর আবশ্যকতা কি?" তাহার উত্তর এই যে, ভগবানের বিশ্ব-বিমোহন-মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য—চক্ষুর আবশ্যক; ভগবানের পাদপদ্মের গন্ধে আমোদিত হওয়ার জন্য—নাসিকার আবশ্যক; ভগবৎ-প্রেমের রসাস্বাদন করার জন্য—রসনার সৃষ্টি; ভগবানের শ্যামাঙ্গ পরশনে চিদানন্দ অনুভব করার জন্য—ত্বকের প্রয়োজন। কামনা করিতে হয়,—ভগবানের জন্য কামনা কর; ক্রোধ করিতে হয়,—ভগবানের উপর ক্রোধ কর; লোভ করিতে হয়,—ভগবানকে পাইবার লোভ কর; মোহিত হইতে হয়—ভগবানের অসামান্য রূপরাশীতে মোহিত হও; মত্ত হইতে হয়—ভগবৎ-প্রেমরসে মত্ত হও। দেখিবে,—সংসারের লজ্জা, ভয়, শোক, সকলি ভগবৎ-প্রেমের গঙ্গা-প্রবাহে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে; দেখিবে,—মায়াজাল-বিস্তারিণী ভোগ-বাসনা, জ্ঞানাগ্নে নিরস্ত হইবে; দেখিবে,—বিষয়ের আস্বাদ—বিষ ভক্ষণের ন্যায় কার্য্যকারী ও ভগবানের প্রেমাস্বাদন—অমৃত; দেখিবে,—তোমার মন-তরী এক অভিনব আনন্দ-হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া মহাসিন্ধুপানে চলিয়া যাইবে,

* "তুমি সংসারী, সংসারী থাক, পুত্র আমার, কন্যা আমার, স্ত্রী আমার, ঘর আমার, বাড়ী আমার বল, কিন্তু মনে মনে ভাবিবে যে এ সকল আমার কিছুই নহে, সকলই ঈশ্বরের।" এই প্রকার ধারণা করিয়া ভোগ করার নামই—অনাসক্তভোগ।

দেখিবে, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়-নিচয় ও রিপুসমূহ তোমারই আজ্ঞা শিরে বহন করিয়া, তুমি যে পথে চালাইবে, সেই পথেই চলিবে। তখন তুমি পুত্রহীনা-জননীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে আকুল হইয়া পড়িবে না; তখন তুমি দুরাশার মোহিনী-মন্ত্রে মুগ্ধ হইবে না, তখন তুমি পাপ-চিন্তা-রূপ পিশাচিকা দ্বারা পৃষ্ট হইবে না। তখন জাগিবে—ভক্তি, তখন থাকিবে,—প্রেমের অনন্ত-বিস্ফুরণ, তখন আসিবে,—হৃদয়োন্মাদ-কর ভগবানের পবিত্র-ছবি।

বস্তুতঃ গভীর-গবেষণা-তৎপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিরোধ করাকে সংযম ও তাহার অযথা চালনা করাকে সম্ভোগ বলিয়া থাকেন। জগতের প্রায় সমস্ত জীবই ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দমন করিতে অক্ষম। জন্মজন্মান্তরের বিষয়-বাসনা-সম্ভূত সংস্কার-প্রণোদিত হইয়াই তাহারা ভোগমার্গে পরিধাবিত হয়। পাশ্চাত্য-বাসিগণ ভোগমার্গে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের মুক্তির আশা সুদূর-পরাহত। স্বীকার করি,—তাঁহারা বিজ্ঞানবলে অনন্তব্যাপী বায়ু-রাশির চাপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের শরীরাভ্যন্তরে অনবরত যে বায়ু প্রধাবিত হইতেছে, তাহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি? স্বীকার করি,—তাঁহারা বিজ্ঞানবলে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির গতি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কি এই ক্ষুদ্র দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্থিত চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভৃতির গতি নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন? স্বীকার করি,—তাঁহারা বাষ্পীয়যান, বৈদ্যুতিক-আলোক প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া, বহির্জ্জগতের পরম শ্রেয়ঃ-সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের কি শ্রেয়ঃ-সাধন করিলেন? বস্তুতঃ এই দেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ। জগতে যাহা আছে, ইহার মধ্যেও তাহা আছে। যাঁহারা সংযমী, তাঁহারা যোগাসনে বসিয়া ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু-নিচয় নিজ দেহমধ্যে নিহিত দেখিয়া, বিমলানন্দ উপভোগ করেন। প্রাচীন ঋষিগণও ইচ্ছা করিলে, বহির্জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেন; তাঁহারাও বাষ্পীয়যান, ষ্টীমার প্রভৃতি নির্ম্মাণের ক্ষমতা রাখিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বহির্মুখ অর্থাৎ ভোগ-বাসনায় পরিতৃপ্তি করিতে অভিলাষী ছিলেন না, এবং জনসাধারণের ইন্দ্রিয়-বৃত্তিও যাহাতে তদ্রূপ না হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে, উহা নির্ব্বাপিত না হইয়া, যেরূপ দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণও উপভোগ দ্বারা নিবৃত্তি না হইয়া, বর্দ্ধিত হওত জীবগণের সংহার সাধন করে।

তাঁহারা ইহাও জানিতেন,—কামভাব প্রবল হইলে, জগৎ শান্তির পরিবর্ত্তে আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হয়, সুখের আশায়—দুঃখ ভোগ করে, স্বর্গের আশায়—নরক-যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, মুক্তির আশায়—সংসারের বন্ধন-দশায় অধিকতর জড়ী-ভূত হয়। সুতরাং ঐ সকল বৈজ্ঞানিক ভোগ-সাধন তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং

যাহাতে জীবগণ সংযমের পথে যথাশক্তি অগ্রসর হইয়া, বিষয়-মদে প্রমত্ত না থাকে, তাহারই চেষ্টা পাইয়াছেন। তাই আমরাও বলিতেছি,—আর বিষয়-মদে মত্ত থাকিও না; আর পাপলিপ্ত হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইও না; আর অমৃত বলিয়া বিষভক্ষণ করিও না; স্বর্ণ বলিয়া তপ্ত-অঙ্গার স্পর্শ করিও না; রজ্জু বলিয়া সর্প ধরিও না; স্পর্শমণি বলিয়া, পাথর কিনিও না, এখন হইতে সংযমের প্রতি আস্থাবান হইয়া, খাদ্যাখাদ্য বিচারে প্রবৃত্ত হও। খাদ্যাখাদ্য বিচার না মানিলে ভারতের জাতীয়ত্ব কর্ম্মনাশার গভীর জলে বিলীন হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইবে। ধর্ম্মই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। ধর্ম্মই মানবগণের একমাত্র বন্ধু। মৃত্যুর পরও ধর্ম্ম সকলের অনুগামী হইয়া থাকেন। অপরাপর সমস্তই শরীরের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই অশেষ গবেষণা-তৎপর প্রাচীন-ঋষিগণ মানবগণকে কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য সকল সময়েই স্বধর্ম্মাচরণে মতি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। কেন না, মরণের নির্দ্ধারিত কাল নাই। ভাগ্য ও পুরুষকার * এতদুভয়ের যোগেই মানবের আয়ু অপেক্ষা করে। এবং ঐ আয়ুর বলাবল ও দীর্ঘদীর্ঘত্ব ভাগ্য ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। যেমন কোন ব্যক্তি নানা প্রকার অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও দীর্ঘজীবি হইয়াছে এবং কেহ বা কতকাংশে সংযম শিক্ষা করিয়া, অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন,—আয়ুর পরিমাণ বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যক্তিভেদে নির্দ্দিষ্টই আছে। বস্তুতঃ আয়ুর পরিমাণ বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নাই, কোন অজ্ঞানিত কর্ম্ম-বিপাকই আয়ুর হেতুরূপে পরিণত হয়। অপিচ, যদি আয়ুর নির্দ্ধারিত-কাল বিধাতা কর্ত্তৃক ব্যক্তিভেদে নির্দ্দিষ্টই থাকে, তবে দীর্ঘায়ুলাভের জন্য লোকে মন্ত্র-প্রয়োগ, ঔষধ-সেবন কবচাদি ধারণ, বলি, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস প্রভৃতি হিতাচরণ ক্রিয়া কেন স্বীকার করেন? যেমন তৈলবর্ত্ত্যাদি বিদ্যমান থাকিলেও প্রবল বায়ু কর্ত্তৃক দীপ নির্ব্বাপিত হয়; সেইরূপ আয়ু থাকিতেও যুদ্ধ-গমন, মারিভয়, দুঃসাহস, অতিশয়-মৈথুন, গুরুদার-হরণাদি নানাবিধ অকার্য্য দ্বারা অকালে প্রাণনাশ হইয়া থাকে। কোন্ সময়ে কাল আসিয়া মানবগণের কেশাকর্ষণ করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, কাজেই মানবগণের ধর্ম্ম সাধনের কোন অবধারিত কাল নাই, যখন মানবগণ কালের করাল-গ্রাসে নিয়ত পতিত হইতেছে, তখন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, সকল সময়েই করা উচিত। এই সকল বিবেচনা করিয়া, আর্য্য-ঋষিগণ বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি রাখিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সংযম অভ্যাসই ধর্ম্মলাভের শ্রেষ্ঠতম উপায়। অতএব আর ভোগমার্গে ধাবিত হইয়া, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ঐহিক সুখে মত্ত থাকিয়া, জগতের সার সর্ব্বস্ব-ধনকে ভুলিয়া থাকিও না। আমরাও একদিন পরম শান্তিদাতা পরমেশ্বরের শান্তিক্রোড়ে ছিলাম, একদিন বিষয়

* পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের নাম—ভাগ্য। আর ইহজন্মকৃত কর্ম্মের নাম—পুরুষকার।

তৃষ্ণা কেমন তাহা জানিতাম না। পাপ কি, তাহা বুঝিতাম না, সংশয় কি, তাহা চিনিয়াও চিনিতাম না। কিন্তু আজ পাপের কোন্ দুরত্যয় গহ্বরে পড়িয়া আছি; কোথায় বা সেই বিশ্বপিতার শান্তিময়-ক্রোড়, আর কোথায় বা এই সংসারের পাপময়ী বিভীষিকা। ভোগমার্গে ধাবিত হইয়া, কত যন্ত্রণা, কত ক্লেশ, সহ্য করিতেছি, কীট হইতে পতঙ্গ—পতঙ্গ হইতে পশু পক্ষী প্রভৃতি কত শত শত জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াও বিষয়-বাসনা অতৃপ্ত থাকায় পুনঃ পুনঃ মানব-জন্ম ধারণ করিতেছি। আরও কত জন্ম এইরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, কে জানে? আরও কত বার পিতামাতার করুণ-উচ্ছ্বাস, পুত্র-কন্যার আকুল-ক্রন্দন, বন্ধুজনের বিয়োগ-জনিত দুঃখ, অকাতরে সহ্য করিতে হইবে—কে জানে? তাই বলি, ভোগবাসনা সংযত কর, সংযমশীল হও। ধর্ম্মকে আর হেলায় হারাইও না। একমাত্র সনাতন ধর্ম্মই পরলোকে সাহায্যকারী হইয়া থাকেন। তাই মনের আবেগে বলিতে হয়, সময় থাকিতে, দিন থাকিতে, ধর্ম্ম-সেবায়, সংযম-সেবায় মনোযোগী হও। কেবল পার্থিব-সুখে মগ্ন হইয়া, জগতের নিত্য-সার-সর্ব্বস্ব-ধনকে হেলায় পদদলিত করিলে, ইহকালে নানা যন্ত্রণা ও পরকালে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। তোমার মধ্যে কে আছে, তাহা চিনিয়া লও। ভগবানের শান্তি-নিকেতনে স্থান পাইবার জন্য যত্নশীল হও। সেই নিত্য-প্রেমরাজ্যে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হও। আমরা তাঁহারই সন্তান, একথা চিরদিন সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

জ্ঞান ও অজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৮৮ সে সব ধারাবাহিক কৃতকর্ম্ম ও তৎসহ জড়িত জীবের অজ্ঞানপ্রকৃতি যে, জগতের অনাদি উপাদান-কারণ তাহা তাঁহারা শাস্ত্ররূপ দিব্যচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন।

৮৯ কিন্তু ব্রহ্মই জগৎ-যোনি ও জগৎকর্ত্তা। ব্রহ্মশক্তির মধ্য হইতে ঐ সব উপাদানের বীজভূতা অজ্ঞান-প্রকৃতির সহিত জগৎরূপ বিশাল কার্য্য প্রসূত হয়; অথচ তিনি নিষ্ক্রিয় এই পরম সত্যটীও তাঁহারা শাস্ত্রতঃ জ্ঞাত ছিলেন।

৯০ সুতরাং তাঁহারা অবস্তু-স্বরূপিণী জড়-উপাদানময়ী অজ্ঞান-প্রকৃতির শক্তিসম্ভূত কার্য্য সকল সেই সত্যস্বরূপ ক্রিয়াহীন নির্ম্মল ব্যোম-কল্প অমূর্ত্ত ব্রহ্মেতে অন্বিত রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। এই অন্বয় দর্শন ও অধ্যাস আবিষ্করণ সম্পূর্ণ শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত।

৯১ "অতএব জন্মাদ্যস্য যতঃ" এবং 'যতো বা ইমানি ভূতানি" প্রভৃতি বাক্যজাত ব্রহ্ম ও জগৎকে, মানবের স্বাভাবিক যুক্তি অনুমানের বিষয়রূপে প্রতিপাদন করে না; কিন্তু আগমার্থ অনুসারে জ্ঞাপন করে।

৯২ অধ্যারোপ ও অপবাদন্যায় প্রয়োগদ্বারা গুরুদেব সেই ব্রহ্মবিদ্যা শিষ্যকে তত্ত্বতঃ অর্থাৎ শাস্ত্রতঃ উপদেশ দিতেছেন। যথা ঃ—

৯৩ রজ্জু কখনও সর্প নহে। তাহা একটী আশ্রয় রূপ বস্তু। তাহাতে যে সর্প ভ্রম হয়, তাহা দ্রষ্টার মনের সাপ। তাহা অবস্তু। বস্তু

রূপ আশ্রয়ের উপরি অবস্তুর অধ্যারোপ বা অধ্যাস স্বাভাবিক। এটী দৃষ্টান্ত মাত্র।

৯৪ এই দৃষ্টান্তকে দার্ষ্টান্তিকে যোজনা কর ব্রহ্ম সত্যবস্তু। আর অজ্ঞান ও তদুৎপন্ন জগৎ ও দেহাদি উপাধি অবস্তু। জীবের বাসনা ও কর্ম্ম ও তদুভয়ে জড়িত অজ্ঞান প্রকৃতি তাহার হেতু ও উপাদান। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তৎসমস্ত ব্রহ্মশক্তির মধ্যে অব্যক্ত থাকে।

৯৫ সৃষ্টিকালে সে সকল তত্ত্ব পরস্পর মিলিত হইয়া বস্তুস্বরূপ ব্রহ্মের আশ্রয়-পটে বিচিত্র সৃষ্টি কার্য্য রূপে প্রকাশ পায়। জীবই সৃষ্টির মুখ্য-পাত্র। তাঁহারই কর্ম্মানুসারে তাঁহারই ভোগ ও মোক্ষের জন্য সৃষ্টিপ্রবাহ। ঈশ্বর তাহার নিয়ন্তা এবং তারতম্যরূপে ফলদাতা।

৯৬ অতএব বলাযায়—তাহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়। কথার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি স্বয়ং জগতের উপাদান নহেন এবং বিনা উপাদানেও সৃষ্টি করেন নাই।

৯৭ তথাপি জগতের কারণতা ও কর্তৃত্ব এই দুইটী ধর্ম্মই তাহাতে প্রয়োগ করা যায়। শাস্ত্রতঃ ন্যায়তঃ, অনুমানতঃ ও স্বভাবতঃ।

৯৮ কিন্তু কিরূপ কারণ? শাস্ত্র, উত্তর দেন—তিনি উপাদান বা পরিণামী কারণ নহেন। স্বয়ং জগৎ রূপে পরিণত হন না। অথচ জগৎ দেখান; যেমন রজ্জু সর্পরূপে পরিণত না হইয়া আপনার কলেবরের আশ্রয়ে ভ্রম-সর্পের মূর্ত্তি দেখায়, তদ্রূপ।

৯৯ কিন্তু সর্পভ্রমের মূল কি? রজ্জু জড়বস্তু, তাহা ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ঐ ভ্রম উৎপন্ন করিতে অশক্ত, তবে তাহার মূল কোথা? ভাবিয়া দেখ, পাইবে। তোমার মানস-বিবর তাহার নিবাসস্থান। তোমার পূর্ব্ব স্মৃতিমাত্র * তাহার আকার। রজ্জুর সাদৃশ্য জন্য তাহা তোমার মানস-বিল হইতে নির্গত হইয়া রজ্জুতে অধ্যস্ত হয়। অতএব সেই অবস্তুরূপ সর্পের বাসস্থান তোমার মন; তোমার মনই তাহা রজ্জুর দেহে ভ্রমে প্রক্ষেপ করে এবং তোমার মনই আবার সেই ভ্রমসর্পের দ্রষ্টা। রজ্জু নিরীহ।

১০০ কিন্তু সর্পভ্রমের মূল যে স্মৃতভুজঙ্গ তাহা কি একেবারে অকাশকুসুমবৎ অলিক? কখনই না। তাহা হইলে, রজ্জু পৃষ্ঠে অর্পিত হইত না। তাহা একেবারে অস্তিশূন্য নহে; অত্যন্তাভাবের বাচ্য নহে; তাহাই তোমার মানসাঙ্গীভূত সর্পবীজ।

১০১ এখন সর্পদৃষ্টান্ত ত্যাগ কর। উহার স্থলে তোমার মনাদি অন্তঃকরণোপাধিকে দৃষ্টি কর। বুঝিতে পারিবে অবস্তু উপাধি হইয়াও তাহা জগতের উপাদান-বীজ। তাহা হইতে জগৎ প্রসূত হইয়া ব্রহ্মরূপ সত্যবস্তুর আশ্রয়ে প্রকাশ পায়। অতএব উক্ত উপাধি সমস্ত তাহাদের মূল কারণ অজ্ঞান প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মেতে উপন্যস্ত হয়, এবং তৎসমস্তকে তাঁহার বিশ্ববৃত্তিসম্পন্ন সহকারী-কারণ বলা যায়।

১০২ সিদ্ধান্ত এই যে তিনি স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত না হইয়া সেই সব উপাদান কারণদ্বারা জগৎ রচনা করেন এবং জীবকে জগৎ দেখান।

১০৩ এই উপলক্ষে অনেকে মনে করেন সর্প-দৃশ্য যেমন মিথ্যা, সেইরূপ জগৎও মিথ্যা-

* "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ" (শারীরভাষ্য—)

বৃক্ষ। কেবল ব্রহ্মই সত্য। "রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহিদরশন, প্রপঞ্চ জগৎ মিছা সত্য নিরঞ্জন।"

১০৪ কথাটা ঠিক। কিন্তু কেবল জ্ঞানীই যে সত্য ধারণ করিবার অধিকারী। জীবন্মুক্তই হউন অথবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুই হউন। তদ্ভিন্ন, জন সাধারণের পক্ষে অনাদি কাল হইতে প্রবাহ রূপে জগৎ জাজ্জ্বল্যমান চলিয়া আসিতেছে।

১০৫ কিন্তু জগৎ পদার্থটী কিরূপ? তাহা অজ্ঞান প্রকৃতির বিকার। উক্ত প্রকৃতি, সৃষ্টির পূর্ব্বে, নামরূপ বিহীন হইয়া অব্যক্ত অবস্থায় ব্রহ্ম-শক্তিতে লীন থাকে। যেন ছিল না। তাহাই সৃষ্টির আকারে পরিণত হয়। যদি না থাকিত তবে বাহির হইত না। *

১০৬ এইস্থানে কেহ কেহ বলেন ও সমস্ত ছিল না। কেবল "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহা হইতে জগৎ বাহির হইয়াছে।

১০৭ কিন্তু তাহার উপাদান কোথা? তাঁহাদের উত্তর—ব্রহ্মই উপাদান। কিন্তু যাহা উপাদান তাহা তো পরিণামী—তবে কি ব্রহ্ম পরিণামী কারণ? উত্তর—তাহাও নহেন। তবে তিনি কিরূপ কারণ?

১০৮ এ কথার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, রজ্জু যেমন স্বয়ং সর্পরূপে পরিণত না হইয়া সর্পভ্রম জন্মায়, ব্রহ্ম সেই রূপ জগৎরূপে বিকৃত না হইয়া জগৎভ্রম জন্মায়। তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম এইরূপ সূক্ষ্মতম ভ্রমোৎপাদক কারণ। তাহার নাম "বিবর্ত্ত—উপাদান—কারণ"। *

১০৯ কেহ কেহ বলেন—এই জগৎ, মায়ার কার্য্য ও রজ্জুসর্পবৎ অসত্য। তাঁহারা 'মায়া' শব্দে কোন একটা ব্যাপকধর্ম্মী আকাশকুসুমবৎ অলৌকিক শক্তি মনে করেন। তাহাকে মিথ্যা বলেন, অথচ তাহার শক্তি মানেন।

১১০ কিন্তু আমাদের পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত অবস্তু সংজ্ঞিতা উপকরণবতী অজ্ঞান প্রকৃতির নামই যে মায়া, তাহা তাঁহারা শাস্ত্ররূপ লোচন উন্মীলন পূর্ব্বক দেখেন না। পরিণাম, বিকার, পরিবর্ত্তন, জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, ও মৃত্যু তাহার স্বভাব।

১১১ অযথা অর্থে গৃহীত "মায়া" শব্দটী, সৃষ্টি-নিরাসক ও জীবাত্মা সকলের অস্তিত্ব-বিনাশক অদ্বৈতবাদাভিমানী পণ্ডিতমণ্ডলির হস্তের অলৌকিক অস্ত্র। কিন্তু সেরূপ মায়ার অস্তিত্ব নাই।

---

* "কার্য্য কারণয়োরভেদাং কারণ পরিণাম ভেদ এবং কার্য্যং।" (বাচস্পতি ৭১) "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (গীঃ ২।১৬) অভাবস্তু কারণত্ব বিরোধাৎ (অধিকরণমালা)।

* "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ" মনুস্মৃতির এই বচনে (১।৮) কুল্লকভট্ট লেখেন "স্বাচ্ছরীরাৎ অব্যাকৃত রূপাৎ অব্যাকৃত মেব ভগবতাংস্বরীয় বেদাস্তদর্শনে প্রকৃতিস্তদেব চ তস্যশরীরং অব্যাকৃত শব্দেন পঞ্চভূত বুদ্ধিন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণমনঃ কর্ম্মাবিদ্যা বাসনা এবং সূক্ষ্মরূপতয়া শক্ত্যাত্মনাস্থিতা অভিধীয়ন্তে, অব্যাকৃতস্য চ ব্রহ্মণা সহাভেদ স্বীকারাৎ ব্রহ্মাদ্বৈতং শাক্ত্যাত্মনা চ ব্রহ্মজাগদ্রূপ তয়া পরিণমত ইত্যুভয়মপ্যুপপদ্যতে।"

তাৎপর্য্য। "অব্যাকৃত" প্রলয়ে লীনা প্রকৃতি। তাহাই পরব্রহ্মের শরীর। তাহাই পঞ্চভূত জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ, মন, কর্ম্ম, অবিদ্যা ও বাসনারূপী সূক্ষ্ম শক্তি। অব্যাকৃত প্রকৃতির সহ ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করায় ব্রহ্ম অদ্বৈত অপরিনামী। অথচ জগদ্রূপে প[illegible]হাও বলা যায়। উভয় মতই সঙ্গত।

ভাবার্থ। তিনি অপরিনামী। তাঁহার ইচ্ছামাত্রে প্রকৃতিই পরিণত হয়। তিনি স্বয়ং বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহার আশ্রয়ে প্রকৃতির আবর্ত্তন। তাহা ভ্রম নহে। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রবাধর্ম্মী।

১১২ তাহা বন্ধ্যার পুত্র বা আকাশ কুসুমবৎ অলিক। পরম সত্য পরমানন্দধামস্বরূপ পরব্রহ্মের সহ তাদৃশ মিথ্যা আম্বত হইতে পারেনা। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

১১৩ যাহার কোনরূপ অস্তিত্ব আছে, যাহা জগতের উপাদান, যাহা জীবের সংসার-ভোগের উপাধি-স্বরূপ, এমন পদার্থ ঈশ্বরে ও অধ্যারোপিত হইবার যোগ্য।

১১৪ তাহা অবস্তুধর্ম্মী হইলেও জগতীয় উপাদান-রাশির মূল। তাহা প্রকৃতিরূপ মহা-সূক্ষ্ম দ্রব্যবীজ। তাহারই নাম মায়া * পূর্ব্বে বলিয়াছি এই মায়া জীবের। তদ্ভিন্ন মহামায়া স্বতন্ত্র। তিনি পরব্রহ্মের মহাশক্তি এবং জৈবিক মায়ার আধার। আধারাধেয়ত্ব জন্য নামের সাদৃশ্য।

১১৫ জৈবিক মায়া বা প্রকৃতি স্বতোসিদ্ধ নহে। তাহা আশ্রয়াপেক্ষী। একদিকে প্রত্যেক জীবকে তাহার কর্ম্মানুরূপ আশ্রয় করে; অন্যদিকে জীবসমষ্টির পুরুষার্থ পুরণার্থ জগৎ-সৃষ্টির প্রবর্ত্তকরূপে পরব্রহ্মকে আশ্রয় করে।

১১৬ আশ্রয়-নিষ্ঠ বলিয়া তাহা অবস্তু শব্দের বাচ্য। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি অবস্তু নহে। না হইলেও অচেতন। সুতরাং পুরুষের ন্যায় বস্তুতত্ত্ব নহে। তথাপি তাহা ঈশ্বরকে অপেক্ষা না করিয়া জগদুৎপাদনে সম্যকরূপে সমর্থ। কিন্তু পুরুষার্থই তাহার হেতু।

১১৭ ফলে সদানন্দ যোগীন্দ্রের ব্যাখ্যাতে যে "অজ্ঞান" ও "অধ্যারোপাদি" পদগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তলাইয়া বুঝিলে কোন সন্দেহ থাকিবে না। "অজ্ঞান" পদটীকে সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় উপাদানরূপে বুঝা যাইবে, এবং অদ্বৈতবাদের প্রবল প্রতিবন্ধক-রূপে মনে হইবে। "অধ্যারোপ" পদটী সাংখ্যের "জবাস্ফটিক-ন্যায়" ও শঙ্করের 'অধ্যাসের' সহ তুল্যার্থবাচী বোধ হইবে। এইরূপে যোগীন্দ্রের বেদান্তসার গ্রন্থখানি, পরস্পর শাস্ত্রার্থ বিনিময় দ্বারা, সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত বোধ

* এই মহাসূক্ষ্ম তত্ত্ব বোধগম্য নহে। কিন্তু তাহাই বিশ্বের উপাদান কারণ। যাহ কারণ তাহা প্রায়ই সূক্ষ্ম। তাহার সেই অব্যক্ত অবস্থা মনেতে ধারণ করা যায় না। কেবল তাহার কার্য্য দর্শনে তাহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। পঞ্চদশী শাস্ত্রে, ভুতবিবেক প্রকরণে কহেন—'নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।" এই মায়া কেবল কার্য্যগম্য অর্থাৎ তাহার কার্য্য দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব বুঝা যায়, যেমন দাহাদি শক্তিদ্বারা অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। 'কার্য্যগম্য' 'বিয়দাদি কার্য্যলিঙ্গগম্য, বিয়দাদি কার্য্যজনন সামর্থ্যং মায়েত্যুচ্যতে।' "বিয়দাদি" আকাশাদি পঞ্চভূত ও মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি এই সকল কার্য্য দ্বারা মায়ার অস্তিত্ব বোধগম্য হয়। অতএব মায়া ইন্দ্রজাল নহে। মায়া ও সাংখ্যের প্রকৃতি একই পদার্থ। বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদীতে (কারিক ৮) লেখন "সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ, কার্য্যতস্তদুপলব্ধেঃ, মহাদাদিতচ্চ কার্য্যং।" প্রকৃতিকে উপলব্ধি করিতে না পারার হেতু তাহার সূক্ষ্মত্ব, নতুবা অস্তিত্বের অভাব নহে। কেননা তাহার কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মহদাদি' অর্থাৎ মহত্তত্ব অবধি ভুরাদি লোক সমূহ তাহার কার্য্য। মায়া ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐ উভয় মহ শাস্ত্রের সমান সিদ্ধান্ত। এস্থানে 'মায়া' অজ্ঞান প্রকৃতিবাচক। ইহা জীবের অদৃষ্টের সহ জড়িত বিধায় অদৃষ্টই। ন্যায়মতে এই অদৃষ্টই মায়া। তাহা বিশ্ববৃত্তিসম্পন্ন। এতদ্ভিন্ন মহামায়া। তিনি পরব্রহ্মের মহাশক্তি এবং তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র। তিনি বিমলা এবং পূজ্যা। কেবল যুক্তিতঃ নহে, কিন্তু শাস্ত্রতঃ, তাঁহার পূজার মন্ত্র সকল বেদ পুরাণ ও আগম শাস্ত্রে আছে। তদনুসারে তাঁহার মহাপূজা ও তদঙ্গীভূত হোম, চণ্ডীপাঠ, জপ, কুমারী পূজা ও অনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সকল মন্ত্র নিত্য। সাংখ্যাচার্য্যেরা "আনুশ্রবিকোবেদবিহিতত্বাৎ" বলিয়া তাহার প্রশস্ততা শিরোধার্য্য করেন। এই মহাশক্তি (পরমা-প্রকৃতি) হইতে ভিন্ন! জৈবিকীমায়া। তাহা সমলা, অবিদ্যা, অজ্ঞান প্রকৃতি এবং জীবের ভববন্ধনরূপী। তাহা ত্যজ্য।

হইবে। মায়ার ইন্দ্রজাল সূর্য্যোদয়ে ধ্বান্তরাশিবৎ বিধ্বংস হইয় যাইবে।

১১৮ অতঃপর যোগীন্দ্র যে "অপবাদ-ন্যায়টী" উদ্ভাবন করিয়াছেন,তাহার তাৎপর্য্যও অশাস্ত্র নহে। উপনিষদের অনেক শ্রুতিতে সে তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্য সমূহে তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন।

১১৯ ঐ "অপবাদ ন্যায়টীর" যে ব্যাখ্যা, তাহাই মোক্ষের উপদেশ। তাহাই পরাবিদ্যা। তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। তাহা কর্ম্মকাণ্ড নহে, যজ্ঞবিদ্যা নহে, হৈরণ্যগর্ভবিদ্যা নহে, শাণ্ডিল্য বিদ্যাও নহে। তাহা পরমাত্মা ও আত্মাকে নিরুপাধিকরূপে দর্শন। স্বাভাবিক ও মনোকল্পিত যুক্তি বা অনুমান্ উপন্যাস দ্বারা সে উপদেশ সম্ভব নহে। কেবল বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা তাহা সম্ভবে।

১২০ উপনিষদে আছে "তাং তত্ত্বতঃ ব্রহ্মবিদ্যাং।" গুরুদেব, সমাগত শিষ্যকে তত্ত্বতঃ সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেছেন।

১২১ তিনি অধ্যারোপ ব্যাখ্যা দ্বারা পরমাত্মা ও আত্মাতে, অজ্ঞান ও তদ্বিকারজ জগৎ ও দেহাদি অনাত্মধর্ম্মী উপাধির যে উপন্যাস হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন।

১২২ এক্ষণে তদ্বিপরীত অপবাদ ন্যায় দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ করিতেছেন। মোক্ষই তাহার উদ্দেশ্য।

১২৩ সে উপদেশের প্রণালী এই। পরমাত্মা হইতে জগৎ ও জীবসমষ্টির স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদি দেহোপাধিরূপ আরোপিত ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত হইলেই তাঁহার নিরঞ্জনতত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

১২৪ আর আত্মা হইতে তাঁহার অনাদি-কর্ম্ম ও অজ্ঞান প্রকৃতিজ স্থূল সূক্ষ্ম করণাদি দেহোপাধিরূপ অনাত্মসংযোগ বিযুক্ত হইলেই তাঁহারো নিরঞ্জন তত্ত্ব বিকশিত হইয়া পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়।

১২৫ তাহাই মোক্ষ। তদবস্থায় অজ্ঞানের সৃষ্টি প্রবাহ, অনাদি বন্ধন, অলৌকিক জ্ঞান-বিরোধি আত্মাবরণ-শক্তি ও জন্ম-জরা-মরণ স্রোত রহিত হয়।

১২৬ যাহার মোক্ষ হয়,তাঁহার সম্বন্ধে সৃষ্টির প্রযোজন নিবৃত্ত হয়। অন্যের সম্বন্ধে নহে। এই তাৎপর্য্যে কেবল তাঁহারই পক্ষে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

১২৭ কিন্তু মুক্তাবস্থাতেও তাঁহার জ্ঞান রহিত হয়না। অর্থাৎ তাঁহার স্বায় ও পরমাত্মজ্ঞান প্রবল হইলেও তাঁহার জগতীয় জ্ঞান ও স্মৃতি নষ্ট হয় না, কেননা শাস্ত্রের উক্তি আছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সকল বস্তুতে প্রবেশ করেন।

১২৮ অতএব তাঁহার সম্মুখে জগৎ একেবারে অলিক হয়না। তিনি জানেন যে, জগৎ বিদ্যমান আছে ও প্রবাহ রূপে থাকিবে। তিনি জানেন যে ঈশ্বরের নিয়মে, অনন্ত কোটি জীবের পক্ষে জগৎ প্রয়োজনীয়।

১২৯ জগৎ ও দেহাদি পদার্থের আকর্ষণ, প্রলোভন, মোহজনকতা, আর তৎসমস্তে আত্ম ও মমত্ব বুদ্ধি এই, সকল অনাত্মাভিনিবেশ

মুক্তাত্মাকে বদ্ধ করে না—এইমাত্র। নতুবা তাহাদের সত্তা রহিত হয়না।—

১৩০ শুরূপদেশের সমাপ্তি এই যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েরই ঔপধিক অবস্থার ব্যতিরেক দ্বারা উভয়েরই নিরঞ্জন নিরাময় স্বরূপ প্রকাশিত হয়।—

১৩১ মোক্ষাবস্থায় তাঁহাদের স্বরূপের সমতা জন্য প্রমেয় পরমত্মার সহিত ব্রহ্মবাদী প্রমাতৃপুরুষের ঐক্য সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে।—সে সম্বন্ধ "একএব-সংখ্যার" ব্যঞ্জক নহে। কিন্তু যুগ্মাত্ম-মিথুনাত্ম, যুগলাত্ম। *

১৩২ জীবাত্মা একটী নহে। অনেক। তন্মধ্যে যাঁহাদের মোক্ষ হয়, তাঁহাদের সকলেরই ঐ রূপ মিলন হয়। পরমাত্মার সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ বিভুত্বের,অর্থাৎ ব্যোম কল্প সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্মের, সহিত তাঁহাদের বিকশিত বিভুত্ব-ধর্ম্মের সম্মিলন হয়।—

১৩৩ ঐ সংযোগ, মুক্তপুরুষদিগের পক্ষে জ্ঞানানন্দস্বরূপ, অভযানন্দস্বরূপ, ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, অজরামৃতস্বরূপ, শান্তমঙ্গল স্বরূপ জগদ্বৈতশূন্য একানন্দরূপ। এই মিলন দ্বারা মুক্তগণ নিরঞ্জন সাম্য প্রাপ্ত হন।—

১৩৪ যদি তাহা না বল এবং যদি জীব ও ব্রহ্মে সংখ্যাতে এক বল; অথবা নিদানে মোক্ষকালে, যদি মুক্তপুরুষের ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া বিশ্বাস কর, তবে বলিতে হইবে যে, শ্রীমান্ সদানন্দের, প্রমাতৃপুরুষের অবতারণা সঙ্গত হয় নাই; ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ নিরর্থক-হইয়াছে; মোক্ষের প্রসঙ্গও অযোগ্য হইয়াছে; বেদান্তকে মোক্ষশাস্ত্ররূপে গ্রহণ না করিয়া আত্মবিনাশী-শাস্ত্র করা হইয়াছে এবং জনসমাজে একপ্রকার অমঙ্গল জনক নাস্তিক দর্শনরূপে প্রচার করা হইয়াছে।—

১৩৫ (ছ) মোক্ষ। উপরিভাগে,/অপবাদ ন্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক মোক্ষের লক্ষণ প্রচুর রূপে বর্ণন করা গিয়াছে। এক্ষণে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, উপনিষদে মোক্ষ প্রতিপাদক যত শ্রুতি আছে তৎসমস্তের বিবৃত মোক্ষলক্ষণ তত্ত্বতঃ সেই প্রকার। প্রণালীর ভেদ থাকিলেও তাৎপর্য্যের ভেদ নাই।

১৩৬ তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধীর পাঠক তাহা হইতে মোক্ষের উপাদেয় মর্ম্ম গ্রহণে সক্ষম হইবেন।

বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের শান্তি-বচনে আছে—

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র পূর্ণ। এই সোপাধিক নাম-রূপাত্মক জগৎ-কার্য্য তাঁহার দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। এই কার্য্য সকল তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এতএব এই পূর্ণ কার্য্য হইতে ঐ পূর্ণস্বরূপ কারণকে পৃথক্‌রূপে দৃষ্টি করিবেক। তাহাতে ভূতমাত্রোৎপন্ন উপাধিস্বরূপ কার্য্য তিরস্কৃত হইয়া প্রজ্ঞানৈক-রস-

* অদ্বৈত পক্ষে প্রমাতৃ ও প্রমেয় চৈতন্যের একতা স্থাপনার্থ অনেক কূট তর্ক আছে। তাহা কষ্ট কল্পনা মাত্র। অদ্বৈতবাদীগণ, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিন কে এক করিতে চান। সমাধি যোগে ঐ তিন পদার্থের একতা যে উক্ত হইয়াছে তাহা বৈষয়িক জ্ঞান; জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার লয় মাত্র। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের জ্ঞাতৃত্ব সদাজাগ্রত। ব্রহ্ম কে জানার নিমিত্তে জ্ঞানের লয় করিতে হয়না। (পঞ্চদশী ধ্যানদীপ ৯১ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য)

ভাব-স্বরূপ পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন।

কঠোপনিষদে এসম্বন্ধে একটি সংক্ষেপ শ্রুতি আছে :—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরংকিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ †

এই শ্রুতিতে সূক্ষ্ম তারতম্য ক্রমে মোক্ষ নিরূপণ করিতেছেন। তাবৎ ইন্দ্রিয় স্থূল পদার্থ। তৎসমূহ অপেক্ষা তাহার বিষয় সকল অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধাদি পদার্থ 'পরা' সূক্ষ্ম। তাহাদের সংজ্ঞা 'অর্থ' ইন্দ্রিয়ার্থ। সেই অর্থ হইতে 'পর' সূক্ষ্মতর মন। মন হইতে সূক্ষ্মতর বুদ্ধি। বুদ্ধি হইতে মহান্-আত্মা শ্রেষ্ঠ। সেই মহানই প্রথমজাত হৈরণ্যগর্ভ-তত্ত্ব অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে তাঁহার জননী সর্ব্বজগতের বীজভূতা অব্যক্ত প্রকৃতি পরমসূক্ষ্মতরা। সেই অব্যক্ত হইতে 'পর' সূক্ষ্মতম সর্ব্বকারণের কারণ 'পুরুষ'। "পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ"। পুরুষ হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই পর্য্যাবসান। তিনিই পরমগতি। "অতএব চ গন্তৃণাং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং পরা প্রকৃষ্টাগতিঃ।

১৩৭ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের নিম্নস্থ শ্রুতিটী, উক্ত শ্রুতির সমভাবি।

ততোযদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-
থেতরে দুঃখ মেবাপিয়ন্তি।

"ততঃ, কার্য্য হইতে উত্তর যাহা, তাহা সেই কার্য্যের কারণ। সেই কারণ হইতে যাহা উত্তর তাহাই 'উত্তরতরং'। তাহাই সর্ব্বকারণের উত্তরতর-কারণ। 'যৎ ব্রহ্ম- যিনি ব্রহ্ম। 'তৎ অরূপং' তিনি রূপরহিত; 'অনাময়ং দেহাদিরহিত বিধায় রোগ শোক শূন্য। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাহারা 'অমৃতা' অমর হয়েন! অর্থাৎ আর জন্ম মৃত্যুর স্রোতে ভাসেন না। তদ্ভিন্ন 'ইতরে' অপরে, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন না, তাঁহারা দুঃখ পান। জন্ম জরা মরণ প্রবাহে পতিত হন। †

† উপরি উক্ত শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর কার্য্য-কারণ-পরম্পরা ভেদ পূর্ব্বক যে পরমগতি স্বরূপ পুরুষকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনিই এই শেষোক্ত শ্বেতাশ্বতরীয় বচনে উত্তরতর, অরূপ ও অনাময় শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদি হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বের তিনি অতিক্রান্ত, তাঁহাকে জানিলেই মনুষ্য অমর হয়। ইহাই প্রতিপাদন করা উক্ত শ্রুতিদ্বয়ের উদ্দেশ্য। এই উভয় শ্রুতিতেই সমুদায় প্রাকৃতিক তত্ত্বশ্রেণী হইতে তাঁহাকে ব্যতিরেক করা হইয়াছে। তাঁহাকে তদ্রূপ অরূপ অনাময় ও নিরুপাধিক রূপে জানা ব্যতীত অমৃতত্ব লাভ হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। বেদান্ত ও সাংখ্য শাস্ত্রের পাঠার্থীগণের তাহা মোদনীয় হইবে। বেদান্ত, উক্ত পুরুষকে ব্রহ্ম বলেন। ইহা সরল বাক্য। কিন্তু সাংখ্য, ব্রহ্ম মানেন না, কিন্তু মোক্ষ মানেন। আর মানেন অসংখ্য আত্মা। কপিল সূত্রে (৬।৪৫) আছে— "পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ"। আত্মার অসংখ্যত্ব বেদসিদ্ধ। তন্মধ্যে কেবল মুক্ত আত্মা সকলই প্রবৃত্তির উৎপাৎ হইতে স্বতন্ত্র। নির্ম্মল ও ভোগরহিত। যাঁহারা বিবেক জ্ঞান দ্বারা আত্মকে সমস্ত তত্ত্বশ্রেণীর অতিক্রান্ত রূপে জানেন তাঁহারা তাঁহাকে অরূপ ও অনাময় রূপে নিশ্চিত হয়েন। তাঁহারা অমর হয়েন। তাঁহাদের আর জন্ম মৃত্যু আদি দুঃখ হয়না। তদ্ভিন্ন অন্য সকলে দুঃখ ভোগ করেন। বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রের টীকায় ঐ শ্রুতির প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই শ্রুতিতে আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১৩৮ এই প্রকার আরও অনেক মোক্ষশ্রুতি আছে। তৎসর্ব্বত্রেই অজ্ঞান-প্রকৃতিকে এবং তৎসম্ভূত জগদাদি ও দেহাদি উপাধিকে তিরস্কার পূর্ব্বক নিরঞ্জন স্বাত্ম ও পরমাত্ম-জ্ঞান প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহাই মোক্ষ। তাহাই পূর্ণ নির্ম্মলজ্ঞান। সেই জ্ঞানোদয়ে মুক্তাত্মার নিকট হইতে আরোপিত-অজ্ঞান সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

১৩৯ এখন পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিলেন যে, একমাত্র জ্ঞানই বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য

১৪০ যেমন ভূচ্ছায়া সরিয়া গেলে চন্দ্রমণ্ডল এবং দ্রষ্টৃগণের চক্ষু তাহার আবরণ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান সরিয়া গেলে পরব্রহ্ম স্বয়ম্প্রকাশরূপে দৃষ্ট হন, এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণের আত্মাও যুগপৎ মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত নিরঞ্জন-সাম্য লাভ করেন।

১৪১ এই মোক্ষলাভ পরমাত্মা ও আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান লাভ মাত্র। গুরুদেব ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দ্বারা সেই জ্ঞানটী বুঝাইয়া দিলেন।

১৪২ জ্ঞান শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ দ্বারা তাহা বিশদরূপে বুঝান যায় না। পরমাত্মা ও আত্মাকে জানা ব্যতীত শ্রুতিতে অমৃতত্ব লাভের অন্য পন্থা নির্দ্দেশ করেন নাই।

১৪৩ "আত্মাবাঅরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য, মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সে সমস্ত কথার তাৎপর্য্য "জানা"। তদ্রূপ আত্মপ্রকরণে, ধ্যান, ধারণা চিন্তন, ভাবনা, স্মরণ প্রভৃতি আর যত শব্দ ব্রহ্মবাদিরা ব্যবহার করেন, সে সব কথারও ভাবার্থ ব্রহ্মকে "জানা" অথবা জ্ঞানপ্রবাহে মগ্ন হওয়া। *

১৪৪ সে শব্দ গুলি কোনরূপ বাহ্য অথবা মানসিক ক্রিয়ার ব্যঞ্জক নহে। শঙ্করাচার্য (শারীরকভাষ্যে ১।১।৪) লেখেন।

"ননুজ্ঞানংনামম নসীক্রিয়া ন বৈলক্ষণ্যাৎ;" জ্ঞানের নাম মানসিক-ক্রিয়া নহে। ক্রিয়া ও জ্ঞান উভয়ের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন। ক্রিয়া কেবল বিধি জন্য এবং কর্ত্তার অধীন।

১৪৫ দেবতার পূজা ধ্যান, সন্ধ্যাবন্দনা, ইহাই ক্রিয়ার লক্ষণ। তৎসমস্তই কর্ত্তৃতন্ত্র ও রূপ, নাম, নির্দ্দেশ ও গুণনিষ্ঠ। বস্তুনিষ্ঠ নহে। "জ্ঞানন্তু কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব"। কিন্তু জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র। তাহা বিধির অথবা কর্ত্তার অধীন নহে। তাহা স্বয়ম্প্রকাশ এবং অজ্ঞানাবরণ তিরোহিত হইলে দৃষ্ট হয়।

* সেই জ্ঞানপ্রবাহ কিরূপ তাহা মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। [১ মুঃ ১ খঃ ৬ শ্রু]। যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অগোত্র, রূপরহিত, চক্ষুশ্রোত্রবিহীন, তিনি অপানিপাদ, নিত্য, বিভু, [সর্ব্বব্যাপী, যিনি আকাশকেও ব্যাপিয়া আছেন], তিনি সর্ব্বগত সর্ব্ব পদার্থে প্রবেশ করিয়া আছেন, সুসূক্ষ্ম (তিনি আকাশাপেক্ষাও সূক্ষ্ম), তিনি অব্যয়, তিনি ভূতযোনি (সর্ব্বভূতের যোনি, ব্রহ্মা অবধি সর্ব্ব জীবের ও সর্ব্বপদার্থের জন্মস্থান)। তিনি অক্ষর ব্রহ্ম। ধীরের তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। "যদ্দৃশ্যমক্ষরং যয়াবিদ্যয়া অধিগম্যতে সা পরা বিদ্যা" (শা ভাঃ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা। এইরূপ জ্ঞান প্রবাহ যাঁহার আত্মাতে সঞ্চরিত হয়, তিনি ঐ সমস্ত ব্রহ্মভাব লাভ করেন। এইরূপ ব্রহ্ম ভাবনা বেদ বিহিত। স্বকপোল কল্পিত নহে। তাহা মন্ত্রসমন্বয়ী ক্রিয়া নহে।

১৪৬ অতএব" "শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বান্মনন নিদিধ্যাসনয়োঃ"। শ্রবণের ন্যায় মনন ও নিদিধ্যাসনের অর্থ অবগতি মাত্র। ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে ব্রহ্মকে বিশেষরূপে "জানার" আদেশ। কেননা তাঁহাকেই জানিলে সাক্ষাৎ মুক্তি হয়।

১৪৭ সেই জ্ঞানের সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড, সমাধিযোগ, ধ্যানযোগ, ও ভক্তিযোগের অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ নাহি। তাদৃশ অনুষ্ঠান সমূহ চিত্তশুদ্ধির হেতু মাত্র, এবং জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হইবার পরম্পরা উপায়। ইতি।

৺চন্দ্রশেখর বসু।

পুষ্পবতী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যাবজ্জীবন কারাবাস।

হুকুমচাঁদের প্রাণদণ্ডের কথা তাঁহার বাটীতে অচিরে সকলে জানিতে পারিল; এ সময়ে তাঁহারা সকলে একগ্রামে বাস করিতেছিলেন। প্রেমচাঁদ তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছিলেন। যখন এই ভীষণ সংবাদ তাঁহারা পাইলেন, তখন হুকুমচাঁদের স্ত্রী একেবারে অচেতন হইল, প্রেমচাঁদ বসিয়া অশ্রু ফেলিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী নিকটে মৃত্তিকা-শয্যা গ্রহণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। রেণুকা এক পার্শ্বে বসিয়া পিতার জন্য কাঁদিতেছিলেন। প্রেমচাঁদ বলিলেন,—"আর কেঁদে কি হবে, এখন রক্ষার কোনও উপায় আছে কি না দেখতে হবে।" তখন সকলে মিলিয়া জল সিঞ্চন করিতে করিতে হুকুমচাঁদের স্ত্রীর চৈতন্য সম্পাদন করিল। প্রেমচাঁদ বলিলেন,—"আর বৃথা সময় নষ্ট করিয়া দরকার নাই। এখন কেবল এক উপায় আছে। রায়চাঁদ আমার বিশেষ বন্ধু, রায়চাঁদ ইংরেজের প্রজা। যদি সে চেষ্টা করে, তবে কোন উপায় হতে পারে। আমি এখনই অশ্বারোহণে তার বাড়ী যাবো। রেসিডেণ্ট সাহেব তাহার বড় বাধ্য, দেখি কিছু করা যায় কি না। তোমরা সব এখন আর কেঁদো না, আমার জন্য অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া তিনি একবার রেণুকার দিকে দৃষ্টি করিলেন, রেণুকা বলিল,—"যেরূপে হ'ক বাবাকে বাঁচাতে হবে, আপনি চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।" প্রেমচাঁদ অশ্বারোহণে রওনা হইলেন।

রায়চাঁদ নিজ বাটীতে বসিয়া আছেন, প্রেমচাঁদের বিবাহের প্রস্তাব তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার মাতা সম্মতি দিয়াছেন। এই সংবাদ প্রেমচাঁদকে পাঠাইতে হইবে ইহা বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বারোহণে প্রেমচাদ তথায় পৌঁছিলেন। প্রেমচাঁদের মুখ শুষ্ক দেখিয়া রায়চাঁদ ভাবিলেন, কোন বিপদ উপস্থিত, তিনি বন্ধুকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেও ভুলিয়া গেলেন। প্রেমচাঁদ অশ্ব হইতে নামিয়াই বলিলেন,—"ভাই! বড় বিপদ। আমার শ্বশুরের প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে, এখন তুমি ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই। একবার রেসিডেণ্ট সাহেবকে ধর, তিনি যদি ইহার কিছু উপায় করতে পারেন। আর সময় নাই।" রায়চাঁদ একেবারে অবাক্ হইলেন, তিনি বন্ধুর হস্ত ধরিয়া

লইয়া একটী গৃহে বসাইলেন, তারপর বিস্তারিত বিবরণ শুনিলেন। বলা শেষ হইলে রায়চাঁদ বলিলেন,—"কতদূর কৃতকার্য্য হব বল্‌তে পারি না, তবে আমি এখনই যাবো। মেজর আওস্ আমাকে স্নেহ করেন, তিনি চেষ্টা করলে কিছু উপকার হতে পারে। তুমি আহারাদি করেই বাড়ী যাও, আমার সঙ্গে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমি একাকী সাহেবের নিকট যাবো, ও কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি তাহা তোমাদের বাড়ী গিয়ে বলে আস্‌বো। কোন চিন্তা করো না, আমার দ্বারা যতদূর উপায় হতে পারে, তাহা আমি কর্‌বো। কিন্তু ইংরেজ হত্যা হয়েছে, বড় বিষম ব্যাপার, সহজে এ গোল মিটবে না। ইংরেজ সদ্বিচারক, ইংরেজের নিকট ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে।" এই বলিয়া বন্ধুর আহারের উদ্যোগ করিয়া দিলেন ও স্বয়ং কিছু আহার করিয়া লইলেন। তৎপরে অশ্বারোহণে উভয়ে গন্তব্য পথে রওনা হইলেন। আজ উভয়ের মনই মেঘে ঢাকা। কতকদূর গিয়া প্রেমচাঁদ এক পথে গেলেন, রায়চাঁদ অন্য পথে রওনা হইলেন।

মেজর আওস্ বারেন্দায় বসিয়া হাওয়া খাইতেছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে রায়চাঁদ সওদাগর সাক্ষাৎপ্রার্থী। রায়চাঁদ ইংরেজদের একজন বিশিষ্ট প্রজা ও মেজর সাহেব তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করেন, অতএব অবিলম্বে তাহাকে নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন। রায়চাঁদ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন। একজন ভৃত্য আসিয়া আর একখানি চেয়ার আনিয়া দিল। সাহেব তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। রায়চাঁদ বলিলেন,—"সাহেব! আজ একটী বিশেষ কার্য্যে এসেছি, আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, আমার অনুরোধ আজ রাখতেই হবে।" সাহেব বলিলেন,—"তুমি আমাদের হিতৈষী বন্ধু, কিসের জন্য এসেছ বল দেখি।" রায়চাঁদ বলিলেন,—"সাহেব! আমি তোমাদের প্রজা, যখন যে দরকার হয়; আমাকে ডাক। আজ আমার কথা রাখ্‌তেই হবে।" সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বল না কি চাও? তুমি আমার ছেলের মত, তোমার কথা অবশ্যই রাখ্‌বো।" তখন সাহস পাইয়া রায়চাঁদ সওদাগর বলিলেন,—"শুনলেম, সে দিন মিষ্টার ব্রেকের হত্যার জন্য বিচার হয়েছে। তাহাতে জোতারাম ও হুকুমচাঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে, এই আদেশ রদ কর্‌তে হবে। এই দুজনকে বাঁচাতে হবে।" সাহেবের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন,—"তোমার কি স্বার্থ?" রায়চাঁদ বলিলেন,—"হুকুমচাঁদের জামাতা প্রেমচাঁদ আমার বিশেষ বন্ধু, তিনি আমার বড় উপকারী, এই বিপদ সময়ে যদি উপকার না কর্‌তে পারি, তবে আর আমি বন্ধু কিসের। সাহেব! আমার এই অনুরোধ রক্ষা কর।"

সাহেব বলিলেন,—"আমার ক্ষমতা নাই, জয়পুরের কাউন্সিলে বিচার হয়েছে।" রায়চাঁদ বলিলেন,—"আপনি গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে লিখুন। আপনার আদেশে এখন ফাঁসি স্থগিত থাকবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশ না আসা পর্য্যন্ত যেন প্রাণদণ্ড না হয়।"

সাহেব কতকক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন,—"তোমার অনুরোধ আমায় রাখ্‌তেই হবে। আমি আজই ভারত গবর্ণমেন্টকে পত্র লিখ্‌ছি, তুমি কোন চিন্তা করো না। আর জয়পুর কাউন্সিলে এক পত্র পাঠাচ্ছি।" রায়চাঁদ এই কথায় সুখী হইলেন এবং সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া হুকুমচাঁদের বাটীর দিকে রওনা হইলেন।

মেজর আগুস্ সাহেবের গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি. তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল, ভারত গবর্ণমেন্ট জয়পুরে এই বিষয় অনুরোধ করিয়া লিখিলেন। অতএব জোতারাম, হুকুমচাঁদ, ফতেপালের প্রাণদণ্ড হইল না, তৎপরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইল। কিন্তু তাঁহারা আর জয়পুর রাজ্যে বাস করিতে পারিবেন না, বৃটীশ রাজ্যে গিয়া বাস করিবেন এইরূপ আদেশ হইল। যাহারা একেবারে হত্যা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইল। আর কতকগুলি লোকের কারাবাসের আদেশ হইল।

এই সময় হইতে জয়পুরে স্থায়ী রেসিডেন্ট থাকিলেন, এবং নছিরাবাদ হইতে একদল সৈন্য রেসিডেন্সি রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইল। জয়পুরের সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইল এবং শাসন কার্য্যের বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। এখন হইতে পলিটিক্যাল এজেন্ট সাহেব রীতিমত কাউন্সিলে বসিয়া জয়পুর রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মা ও মেয়ে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আজ একটু মেঘাচ্ছন্ন, অতএব নক্ষত্র দুই একটি মাত্র দেখা যাইতেছে। বায়ু আজ প্রবল বেগ ধারণ করিয়াছে; অতএব সন্ সন্ শব্দে গাছের পাতা দুলিতেছে। রজনী অন্ধকারময়ী, তবে এখনও লোক চেনা যায়। এমন সময়ে রাণী নিজ প্রকোষ্ঠের বাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার স্বামী দেশের রাজা, কয়েক দিন হইল কোথায় গিয়াছেন, এখনও সংবাদ আসে নাই। হঠাৎ এরূপভাবে গেলেন—কোথায় গেলেন, কবে ফিরে আসিবেন, এই জন্য তিনি বড় চিন্তিত হইয়াছেন। আজ হঠাৎ প্রকৃতির অবস্থা দেখিয়া আরও চিন্তিত হইলেন, হয়ত এই দুর্য্যোগে রাজা কষ্ট পাইতেছেন। তিনি এক একবার বাতায়নের নিকট গিয়া দূরে লক্ষ্য করিতেছেন, এক একবার আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেছেন। বাহিরে হঠাৎ কোলাহল উঠিল, রাণী গোলমালের কারণ জানিতে উৎসুক হইলেন এবং সংবাদ জানিতে একজন দাসীকে প্রেরণ করিলেন, শেখররাজা পুষ্পবতীর হস্তধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন ও রাণীকে বলিলেন,—"একটী মেয়ে ফিরে এলেম; একে প্রতিপালন কর্‌তে পার্‌বেত?" পুষ্পবতীর আর সহ্য হইল না. সে এতক্ষণ পরে মাকে পাইয়াছে, একেবারে মাতৃ ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া "মা! মা!" বলিয়া মায়ের—বক্ষঃস্থলে মুখ লুকাইল। রাণী কিছুই

বুঝিলেন না বটে কিন্তু সন্তানের স্নেহ তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইল, তিনি পুষ্পবতীকে চুম্বন করিয়া বলিলেন—"মেয়েটী বেশ, কাহার এমন মেয়ে?" রাজা হাসিয়া উঠিলেন, পুষ্পবতী বলিল—"মা! আমি তোমার মেয়ে।" রাণী কিছুই বলিলেন না। তখন রাজা বলিলেন—রাণি! এই তোমার সেই হারানো মেয়ে। এই মেয়ে ওর ধাত্রী চুরি করে লয়, এত দিনে একে পাওয়া গেল।" এমন সময়ে পাগলিনী ঐ কক্ষে আসিল, রাজা বলিলেন—"এই তোমার সেই সুখময়ী, সুখময়ী এত দিন পাগলিনী ছিল, আজ পুষ্পবতীকে তোমার হাতে দিয়ে ভাল হয়েছে। কিন্তু ওর পাগলিনী নাম আর ঘুচ্‌বেনা।" রাণী আজ আনন্দে আত্মহারা, তিনি পুনঃ পুনঃ মেয়েকে বক্ষঃস্থলে ধরিতে লাগিলেন—পুনঃ পুনঃ তাহার সুন্দর মুখে চুম্বন করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন,— "ভগবন! এত দিনে দাসীর প্রতি দয়া হল।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে ধাই কোথায়?" রাজা বলিলেন—"ধাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, সে অন্তিম সময়ে তোমার ও আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছে,আমি ক্ষমা করেছি,তুমিও ক্ষমা কর।"তারপর রাণী সুখময়ীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন—"তোমাকে আমি চিনিতে পারি নাই। তুমিই পূর্ব্বজন্মে এ মেয়ের মা ছিলে,তাই তোমার কৃপায় একে ফিরে পেলেম। এখন আর ঘুরে ঘুরে বেড়াবার দরকার নাই। মেয়ে নিয়ে এখানে বাস কর।" সুখময়ী হাসিয়া বলিল— "আমার সাধ পূর্ণ হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, এ মেয়ে তোমার হাতে সমর্পণ করব, তাত হল, আর আমাকে কেন সংসারে জড়াও। আমি এখন ভগবানের নাম করবো। জীবনের প্রায় শেষ হয়ে এল, এখন যদি তাঁকে না ডাকি,তবে আর সময় কই? প্রভু রামস্বরূপ ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হ'য়েছি, আর সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ হচ্ছি না। তবে পুষ্পবতীর বিবাহটা দেখ্‌বো, সে সাধ পূর্ণ করে, তবে আমি যাবো।"রাণী সুখময়ীকে কত বুঝাইলেন রাজা কত বলিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। পাগলিনী আর সে পাগলিনী নাই, সে আজ ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছে। ইহার পর সে বলিল—"আজ বড় আনন্দের দিন, মা আমার আজ গৃহে এসেছে, আজ ঘর আলো হল। তোমরা সব আনন্দ কর, আমি যাই।" পাগলিনী আর থাকিল না, তখনই বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়া গেল। রাণী সুখময়ীর জন্য বড় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু কতদিন পরে মেয়েকে পাইয়া সে সব দুঃখ ভুলিলেন। তিনি পুষ্পবতীকে বলিলেন—"মা! এতদিন কেমন করে ছেড়ে ছিলে, আমি যে' উন্মাদিনী হয়েছিলেম।" পুষ্পবতী আজ নূতন মাতৃস্নেহ পাইয়াছে, যদিও সে বৃদ্ধাকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিয়াছে, তথাপি স্বভাবের গুণ কোথায় যায়। পুষ্পবতী মাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বলিল— মা! মা! আমি কি জেনেছি যে আমি তোমার মেয়ে, তাহলে তখনই ছুটে আস্‌তেম, ধাই মা একদিনও আমাকে কিছু বলে নাই। ধাই মা আমাকে বড় ভালবাস্‌ত, একদিনও কষ্ট দেয় নাই। নিজের কন্যার ন্যায়ই স্নেহ করত। মা! তুমি তাকে ক্ষমা করলে? রাণী

বলিলেন—"মা! তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আবার পৃথিবী আমার কাছে স্বর্গ হ'য়েছে,আমি সব দুঃখ ভুলেছি। আমি তাকে ক্ষমা করলেম, ঈশ্বর যেন তার মঙ্গল করেন। কিন্তু সুখময়ীর জন্য আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, সুখময়ী আমার বড় ভালবাসার পাত্রী ছিল। সুখময়ী ও আমি কন্যাকাল থেকে একত্রে খেলা করেছি, উভয়ে একত্র বেড়াইয়াছি। সুখময়ী—আমার হৃদয়ের সখী ছিল। সে আমার সুখে সুখী ছিল, দুঃখে দুঃখী ছিল। যা'হক তোমাকে পেয়ে আমি সব ভুলেছি, শীঘ্র তোমাকে আর ছাড়ছিনা। মা! একবার মা ব'লে কোলে আয়। পুষ্পবতী মা মা বলিতে বলিতে মায়ের ক্রোড়ে বসিল, বহুদিন পরে মা ও মেয়ের মিলন হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ সঙ্কটে

লীলাবতীর পিতা রাজা উদয় সিংহ এত দিন পরে নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। এখন তাঁহার পরম শত্রু সুজাওন খাঁ বন্দী, অতএব ভয়ের কারণ নাই; সুজাওন খাঁর অত্যাচারেই তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বনে ঘুরিয়াছেন। উদয় সিংহ নিজ স্ত্রী ও কন্যা সহ রাজা অভয় সিংহের নিকট বিদায় হইলেন, রাজা বড় দুঃখিত হইলেন। অভয় সিংহ বলিলেন—"আপনারা ত শেখররাজার রাজধানী হইয়া যাইবেন, আমাকে যাওয়ার জন্য তিনি ব'লে দিয়াছিলেন,চলুন এক সঙ্গে যাই। সকলে গিয়ে সেই বৃদ্ধ রাজার অতিথি হই। লীলাকে আমি ভগ্নীর ন্যায় ভাল বাসি, ওকে ছেড়ে দিতে মন চায় না; কিন্তু কি করা যায়, আপনারা রাজ্যে যাবেন, আপনারা সুখী হন, এই আমার ভগবানের নিকট প্রার্থনা। লীলাবতীও অভয় সিংহকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিত, তাহারও এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। সকলে এক সঙ্গে যাবেন—ইহাই স্থির হইল,আহারাদির পর সকলে একসঙ্গে রওনা হইলেন। লীলাবতী ও তাহার মাতা দুখানি দোলায় উঠিলেন, আর উদয়সিংহ ও অভয় সিংহ অশ্বারোহণে চলিলেন, কতিপয় অস্ত্রধারী অনুচর তাহাদের অনুসরণ করিল।

পথে রাত্রি হইল। তখন সকলে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্রয় পাওয়া কঠিন হইল, কারণ প্রান্তর মধ্যে লোকালয় ছিল না। অভয় সিংহ বলিলেন—"প্রান্তর পার হয়ে চল, নিশ্চয়ই কোন বাসস্থান পাবো"। তদনুসারে সকলে প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এই মাঠ পার হইয়া তাঁহারা একটি ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন, অতএব সকলেই সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থানে কোন লোকের যে সমাগম হয়, এরূপ বোধ হইল না। উঁহাদের সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য ছিল, অতএব আহারাদি করিয়া সকলেই শয়ন করিলেন। রাজা অভয়সিংহ নিদ্রিত হন নাই, তিনি ইহাদের রক্ষকরূপে জাগরিত থাকিলেন। রজনী এখন দ্বিপ্রহর, সেই অট্টালিকার স্থানে স্থানে বসিয়া পেচক কর্কশ ধ্বনি করিতেছে। দুই একটি শশক ও শৃগাল দৌড়াইয়া বাহির

হইতেছে। অন্ধকারে. কিছুই দৃষ্টি গোচর হইতেছেনা। রাজা অভয়সিংহের এই সময় একটু নিদ্রার আবেশ হইল, কিন্তু নিকটে মনুষ্যের কোলাহল তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। তিনি অমনি জাগরিত হইয়া উঠিলেন এবং সশস্ত্রে বাহিরে আসিলেন। দোলার মধ্যে লীলাবতী ও তাহার মাতা নিদ্রা যাইতেছেন, উদয় সিংহ ক্লান্ত হইয়া দোলার নিকট গভীর নিদ্রায় ছিলেন। অভয় সিংহ অন্যস্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচরদের মধ্যে এক জন মাত্র বাহিরে পাহারা দিতেছেন, আর সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন।

রাজা অভয় সিংহ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কয়েকটি লোক অগ্রসর হইতেছে, সকলের হস্তেই অস্ত্র। তিনি ভাল লক্ষণ দেখিলেন না, অতএব তাড়াতাড়ি গিয়া উদয়সিংহ ও তাঁহার অনুচরদিগকে জাগরিত করিলেন। উঁহাদিগকে আড়ালে রাখিয়া রাজা অভয় সিংহ একাকী সশস্ত্র দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন।

আগন্তুকেরা অগ্রসর হইয়া ভগ্ন অট্টালিকায় না গিয়া, অট্টালিকার দক্ষিণ পার্শ্ব ধরিয়া মাঠের দিকে চলিল। অভয় সিংহ গা ঢাকা দিলেন, অনর্থক বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। তিনি উহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে নিঃশব্দে চলিলেন। দেখিলেন কতক দূর গিয়া উহারা এক স্থানে আসিল, এবং স্কন্ধ হইতে কি একটি ভারি দ্রব্য নামাইল। অভয় সিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক জন মানুষ, স্ত্রীলোক কি পুরুষ তাহা দূর হইতে ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি উপযুক্ত অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। ঐ সকল লোক তখন বোঝা নামাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। রাজা অভয় সিংহ আরও প্রচ্ছন্নভাবে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক, তাঁহার হাত ও মুখ কাপড় দ্বারা বাঁধা। উঁহারা সকলে কি পরামর্শ করিল, ও একটি আলোক ঐ স্ত্রীলোকটির মুখের নিকট রাখিল, তারপর মুখের বন্ধন খুলিয়া দিল। স্ত্রীলোকটি বলিল—"আমাকে কি জন্য তোমরা এনেছ, আমি তোমাদের কি অন্যায় করেছি?" একটি লোক উত্তর করিল—"তুই কি করেছিস্? তুই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছিস্, আমরা তোকে এই স্থানে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখ্‌বো।" তিন চারি জনে কোদালি ধরিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল, অবশিষ্ট কয়েক ব্যক্তি স্ত্রীলোকটির নিকট বসিয়া কথা কহিতে লাগিল। পুনরায় স্ত্রীলোকটি মিনতি করিয়া বলিল,—"আমিত কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়ে ভগবানের নিকট অপরাধী হবে।" একজন কর্কশস্বরে উত্তর করিল—"রেখে দে তোর ভগবান। তুই কি করেছ জাননা? তুই পুষ্পবতীকে ছল ক'রে উদ্ধার করেছিস্, তোর জন্য সুজাওন খাঁ বন্দী, তোর জন্য আমাদের সেনাপতি ধিরাজ সিংহ চির-নিদ্রিত। এত দিন তোকে পাই নাই, আজ আর যাবে কোথায়? এখনি সজীব পুতে ফেল্‌বো, এখন নিজ কর্ম্মফল ভোগ কর।" পাগলিনী বলিল—"তোদের কর্ম্মফল তোরা ভুগবি। দেখ্‌চিস্ না, তোদের রাজা সুজাওন খাঁর কি হল? দেখলি না, ধিরাজসিংহের কি হল? তোদেরও সেই রূপ হবে। আমি

ইহার বিন্দুবিসর্গও জানি না। তোরা অনর্থক আমাকে বধ কচ্ছিস্, ঈশ্বর তোদের শাস্তি বিধান করবেন। নরাধম! পিশাচ! তোদের কি একটু পরকালের ভয় নাই?” উহারা “হো” “হো” করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, এক ব্যক্তি বলিল—“এই ত পরকালের কার্য্য কচ্চি। তোকে বধ করতে পারলেই আমাদের স্বর্গলাভ।পাগলিনী আর উত্তর করিল না, বুঝিল ইহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা বৃথা, সে তখন ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিল।

রাজা অভয় সিংহ এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া একেবারে অবাক হইলেন; মনুষ্য এত নরাধম হইতে পারে—ইহা তাঁহার ধারণা ছিল না। দেখিলেন—গর্ত্ত প্রায় শেষ হইল, পাগলিনীকে শীঘ্রই ধরিয়া গর্ত্তে ফেলিয়া পুতিয়া ফেলিবে। তিনি একাকী ইহাদিগকে আক্রমণ করিবেন কিনা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোক জন অনেক দূরে, এখন গিয়া সঙ্গে করিয়া আনার সময় নাই। অথচ তিনি যদি ইহাদিগকে আক্রমণ না করেন, তাহা হইলে পাগলিনীর জীবনলীলা এই ভাবে শেষ হইবে। পাগলিনী পুষ্পবতীকে উদ্ধার করিয়াছে, অতএব তাহার উদ্ধারের জন্য ইতস্ততঃ করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু তিনি একাকী, আর উহারা প্রায় দশজন অস্ত্রধারী পুরুষ। যাহা হউক, তিনি আর ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া হটাৎ আক্রমণ করিলেন। উহারা প্রথমতঃ এই নির্জ্জন স্থানে বাধা পাইয়া চমকিয়া উঠিল,তারপর দেখিল একজন মাত্র লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তখন আর অপেক্ষা করিল না, অস্ত্র-হস্তে উঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। যাহারা মৃত্তিকা তুলিতেছিল, তাহারা কোদালী হস্তেই আক্রমণ করিল। রাজা অভয় সিংহ দেখিলেন—দশজনের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করা মূর্খতা, তথাপি অসি হস্তে যুঝিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে একজন লোক ধরাশায়ী হইল, তখন তাহারা সকলে ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রতিহিংসা লইবার মানসে চারিদিক হইতে অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। রাজা অভয় সিংহ দেখিলেন তিনি আর অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, তথাপি অস্ত্র ত্যাগ করিলেন না। উহারা অস্ত্রে সুশিক্ষিত, রাজা অভয়সিংহ আর উহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। সরিতে সরিতে একেবারে গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, ও হটাৎ পা পিছলিয়া গর্ত্তের মধ্যে পতিত হইলেন। উহারা তখন আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। একজন বলিল—“বেশ হ’য়েছে, দুটাকে এক সঙ্গে পুতে ফেল।” সকলেরই এই পরামর্শ স্থির হইল, তখন ধরা ধরি করিয়া পাগলিনীকে গর্ত্তের মুখের নিকট আনিল, এবং তাহাকে গর্ত্তের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। তখন সকলে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল ও মৃত্তিকা ক্রমে ক্রমে গর্ত্ত-মধ্যে ফেলিতে আরম্ভ করিল।

“হর হর ব্যোম্ ব্যোম্”। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—“আরে নরাধম! কি কচ্ছিস্? শীঘ্র এই দুইজনকে উদ্ধার কর্”। উহারা থতমত খাইয়া বলিল—“আপনি কে?” এক ব্যক্তি রামস্বরূপ ব্রহ্মচারীকে চিনিত, সে তখন মৃদুস্বরে বলিল—“রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী”।

ব্রহ্মচারীকে ভয় না করিত, এমন লোক রাজস্থানে ছিল না। সকলে তখন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী হস্ত বাড়াইয়া রাজা অভয় সিংহকে তুলিতে গেলেন। রাজা প্রথমতঃ পাগলিনীকে তুলিয়া দিলেন, তারপর নিজে উঠিলেন। পাগলিনীর বন্ধন খুলিয়া দেওয়া হইল, উভয়ে ভক্তি সহকারে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। অভয় সিংহ বলিলেন—"প্রভো! আপনার কৃপায় আজ প্রাণ রক্ষা হল।" ব্রহ্মচারী হাসি হাসি মুখে বলিলেন—আমি উপলক্ষ মাত্র, রক্ষা ঈশ্বর করেছেন। তুমি এখন তোমাদের দলের সঙ্গে মিশ গে। পাগলিনী! আমার সঙ্গে এস। ব্রহ্মচারী পাগলিনীকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা অভয় সিংহ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেলেন এবং রাজা উদয় সিংহের নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলেন। একাকী কেন তিনি এরূপ ভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন, তজ্জন্য উদয় সিংহ তাহাকে তিরস্কার করিলেন। লীলাবতী এই ঘটনা শুনিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিল, আর কখনও তাঁহাকে একাকী যাইতে দিবে না তাহা বলিল, অভয় সিংহ এই কথায় একটু হাসিলেন।

তৎপর দিবস উঁহারা সকলে শেখর রাজার বাটীতে পৌঁছিলেন, বৃদ্ধ রাজা সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। লীলাবতী দৌড়াইয়া পুষ্পবতীকে দেখিতে অন্তঃপুরে গেল, সেই স্থানে দুই জনের মিলন হইল, সুকুও সে আনন্দের অংশ পাইল। পুষ্পবতীর নিকট লীলাবতী রাজা অভয় সিংহ ও পাগলিনীর বিপদের কথা জানাইল, পুষ্পবতীর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। লীলাবতী বলিল—"আর ভয় নাই, এখন যুগল মিলন দেখলেই আমাদের নয়ন স্বার্থক হয়"। পুষ্পবতী হাসিয়া বলিল "নিজের মিলন কবে হবে, তাই এখন চিন্তার বিষয় হয়েছে।" শেখর রাজা রাণীকে অভয় সিংহ ও পুষ্পবতীর বিবরণ বলিলেন। রাণী বলিলেন "আমার এই ছোট মেয়ের আবার বিয়ে কি? এত দিন পরে যাহাকে পেয়েছি, আমি তাহাকে ছাড়বো না"। রাজা বলিলেন "এখন ছাড়তে হবে কেন? যেমন আছে তেমি তোমার কাছে থাকবে, যখন নিজ সংসার চিনবে তখন যাবে"। রাণী এই কথায় রাজী হইলেন, অতএব এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। রাজা ও পুষ্পবতী উভয়েই এ সংবাদে সুখী হইলেন, সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইল লীলাবতী ও সুকু। উভয়ে আনন্দে মালা গাঁথিয়া পুষ্পবতীর গলায় দিল ও অভয় সিংহকে আনিয়া তাহার দক্ষিণে দাঁড়াইতে বলিল। সেই স্থানে আর কেহ ছিল না, অতএব রাজা অভয় সিংহের লীলাবতীর সাধ পুরাইতে আর ইতস্ততঃ হইল না।

শ্রীঅমলানন্দ বসু, বি-এ।

আমাদের আদর্শ।

ক্ষুদ্র আদর্শ অবলম্বন করিয়া মানুষ কখন বড় হইতে পারে না। যে বিভাগেই হউক, ক্ষুদ্র আদর্শ গ্রহণ করিলে মানুষ খর্ব্ব হইয়া যায়। জগতের ইতিহাসে বর্ত্তমান সময়ে

যাহারা ঐহিক উন্নতির দিকে বেগে ধাববান হইতেছে তাহারা ঐহিক উন্নতির নিয়মগুলির শুধু মুখে প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত নহে, কিন্তু সর্ব্বদা সেগুলি প্রাণপণে পালন করিতে যত্নপর। ইহাদের ধনার্জ্জনের জন্য পুরুষার্থের আদর্শ খুব বড়—প্রাণ যায় যাউক ক্ষতি নাই, কিন্তু ধন লাভ করা চাই। ইহাদের বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সমস্তই ধনের জন্য; ধনার্জ্জনই ইহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য, সেই জন্যই কুবেরের ভাণ্ডার ইহাদের দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠিত। হয়ত ইহারা পরের ধন লুণ্ঠন করিয়া ধনী হইয়াছে; হয়ত ইহারা পরকে প্রতারণার দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তাহার ভোগের সামগ্রী আপনার করায়ত্ত করিয়াছে; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাদের পুরুষকারের অভাব ছিল বলিয়া অনুমান করিতে পারি না। এই পুরুষকার সকল স্থলেই প্রশংসনীয় এবং বাঞ্ছনীয়।

ভারতের কাছে আর এই সত্য গোপন থাকিতে পারে না। "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যম্" আত্মাতেই শক্তি বিরাজ করে। ভারতের জাগরণের দিনে ভারতের এই সনাতন আশ্বাসবাণী ভারতের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবেই হইবে। তরবারীর মধ্যে যথার্থ শক্তি নাই; প্রকৃত শক্তি মানবের উদ্বুদ্ধ হৃদয়ে স্পন্দিত, নতুবা ভীরুর হস্তে তরবারীর অবমাননা ভিন্ন মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় না কেন?

ভারতের জাগরণ অন্নের মনুকণার মধ্য দিয়া হইবার নহে। আচারপুত ভারতবর্ষ, তপস্বিষ্ট ভারতবর্ষ, ভক্তিপ্রাবিত ভারতবর্ষ ধন লালসায় জর্জ্জরিত হইতে পারে না। অন্যান্য দেশের ন্যায়, ভারতবর্ষে বিপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান নহে; ইহার তপোবনই ইহার মঙ্গলনিকেতন। ঋষিরাই ভারতের নেতা—রাজশক্তি তাহাদের নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে বাধ্য। এই আরাধ্য নেতৃত্ব, যাহা সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহাসন অবধি অধিকার করিতে পারে, তাহা বড় সহজে লাভ হয় না। সর্ব্বত্যাগী হইয়া পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিলে এবং সকল সহায় ত্যাগ করিয়া সকল সহায়ের সহায়কে অবলম্বন করিলে—লাভ হয়। ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূলে সেই অপূর্ব্ব শক্তি—ঋষিশক্তি, সেই পরম বল ব্রাহ্মণ্য বলের অভাব। ভারতের ক্ষাত্রমহিমা হ্রাস করিতে চাহি না এবং পারিও না। যদি কোথাও যথার্থ বীর হৃদয়ের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ভারতে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে সেই অত্যাশ্চর্য্য বীরত্বের মধ্যে অলক্ষিতে ব্রাহ্মণ্য শক্তিই কার্য্য করিত। স্বেচ্ছায় লক্ষ্মীছাড়া হইয়া ব্রাহ্মণেরাই লক্ষ্মীপূজার সকল উপকরণ রক্ষীর ন্যায় যত্নে রক্ষা করিতেন—আপনারা পরম আনন্দে দারিদ্র্যভোগ করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মপরায়ণ বৈশ্যগণকে অনুপ্রাণিত এবং পরিচালিত করিতেন। আশা করি, কালে আমরা সেই নেতৃত্ব আবার ফিরিয়া পাইব! নিরাশ হইবার কোনও কারণ দেখি না—অমৃতের পুত্র আমরা, অমৃতের সন্ধান পাইলেই বাঁচিয়া উঠিব।

ভারত এখন কেবল শূদ্রাচ্ছন্ন। ঋষিত্ব নাই-ই। ব্রাহ্মণগণও নির্ব্বিষ সর্পের ন্যায় কেবল ফণা আস্ফালন করিতেই সক্ষম। কারণ,

আর অন্য কিছুই নহে—কেবল বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বৈদ প্রদর্শিত আচার এবং নিয়ম পালনের অভাব। যতদিন না ভারত আপনার সর্ব্বোচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইবে তত দিন ভারতে উন্নতির আশা নাই। মনে রাখা উচিত, ভারতের পরম বিদ্যা ধনার্জ্জনী বিদ্যা নহে, তাহা পরমার্থ বিদ্যা। আমাদের কথা হইল—"বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"—বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ। আমরা এই বিদ্যা হইতে দূরে সরিয়া আসায়, দিন দিন কেবল মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছি—বিলাস বাসনায় আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

ভারতবাসী নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলিয়া ভারতের মিলন হইবে না বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করেন এবং যাহাতে মিলন হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যাকুল। এই মিলন সম্পাদনের জন্য এত মস্তিষ্ক বিলোড়নের মোটে আবশ্যক হয় না। যাহারা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিয়া থাকিতে পারিবেন যে ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই, বোম্বাইবাসী, উৎকলবাসী, মান্দ্রাজবাসী নির্ব্বিশেষে সকলেরই শাস্ত্রগ্রন্থাদি এক—বিশেষতঃ বেদের প্রামাণিকতা কেহই অস্বীকার করেন না। মিলনসম্পাদন করিবার এমন প্রকৃষ্ট উপায় থাকিতে, অন্য উপায় খুঁজিতে হইবে কেন? ভারতবাসীর প্রাণের মিলন, শাস্ত্র চর্চ্চার ভিতর দিয়াই হইবে এবং ইহাদের আন্তর্জাতিক ভাষার স্থান সংস্কৃত ভাষাই অধিকার করিবে।

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মিত্র।

আত্মকথা।

(সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সম্পাদকগণের প্রতি)

গত সংখ্যায় আমরা "আত্মকথায়" আমাদের সমস্ত কথা বলিবার অবসর পাই নাই। সেই কারণে বর্ত্তমান সংখ্যায় আরও দুই চারিটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের "আলোচনা" অষ্টাদশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে অনেক পত্রিকার সহিতই আমাদের আদান প্রদান আছে; নিম্নে কতকগুলির নাম লিখিত হইল:—

বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, আনন্দবাজার, Amrita Bazar Patrika (Daily), Telegraph, সঞ্জয়, রঙ্গপুরদর্পণ, পাবনা হিতৈষী, মেদিনীপুরহিতৈষী, খুলনাবাসী, বীরভূমবার্ত্তা, বীরভূমবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, ব্রহ্মবিদ্যা, মানসী, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ত্রিশূল, সাহিত্য-সংবাদ, জগজ্জ্যোতি, শিশু, কাজেরলোক, গৃহস্থ প্রভৃতি। যাঁহারা আমাদের পত্রিকার বিনিময়ে তাঁহাদের পত্রিকাদি আমাদিগকে নিয়মিত পাঠাইতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা কৃতজ্ঞ সত্য, কিন্তু শুধু কাগজ পাই বলিয়া নহে, নিয়মিত পত্রিকাপ্রেরণের মধ্যে যে আত্মীয়তার পরিচয় পাইয়া থাকি, মুখ্যতঃ তাহারই জন্য। সম্পাদকীয় খাতির, আমাদের বিবেচনায়, যথার্থ সহানুভূতির সহিত তুলনা করিলে, নিকৃষ্ট জিনিষ। লোকে নিকৃষ্টকে ছাড়িয়া শ্রেষ্ঠকেই চাহে;—আমরাও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যথার্থ সহানুভূতি প্রাপ্তিরই অভিলাষ করি।

আমাদের বিশ্বাস আমরা সেই প্রকৃত সুহানুভূতিই সম্পাদকগণের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি; সম্পূর্ণ আশা আছে যে, ভবিষ্যতে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে আমরা সম্পাদকগণের নিকট সহানুভূতি ভিক্ষা করিতেছি। ভিক্ষা-বৃত্তি নিন্দনীয় সত্য, কিন্তু পরার্থে ভিক্ষা করা খুবসম্ভব অগৌরবের নহে। আমাদের এই সহানুভূতিভিক্ষা আমাদের জন্য নহে,—"আলোচনা"র জন্য। "আলোচনা" আমাদের সম্পত্তি নহে,—সাধারণের সম্পত্তি। সেই আপামর সাধারণের যাহাতে উপকার হয়, এই উদ্দেশ্যে আমরা সকল পত্রিকার নিকটই মতামত যাচ্ঞা করি। অনুকূল প্রতিকূল সমালোচনার বিচারের দ্বারা আমরা আমাদের পন্থা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করি। আমরা অতি বড় গলা করিয়া বলিতেছি যে, আমরা প্রশংসায় আত্মহারা এবং নিন্দায় ক্ষুব্ধ হইব না। যতদূর পারিয়া উঠি,—নিন্দাস্তুতিকে মাথার মাণিক করিয়া নিন্দনীয় বিষয়ের পরিহার এবং প্রশংসনীয় বিষয়ের সেবা করিব। পরের জন্য মজুরি করিতে যাইলে গায়ে ধূলা মাটি লাগিতেই পারে কাজের গরজ হইলে লোকের তাড়া খাইতে প্রস্তুত আছি—এই হইল আমাদের প্রথম কথা।

আমাদের দ্বিতীয় কথা।

আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি "আলোচনার," বিনিময়ে পাই না। প্রবাসী, সাহিত্য, আর্য্যাবর্ত্ত, শাশ্বতী, উৎসব, বিজয়া, হিন্দু পত্রিকা, প্রভৃতি।

সত্য কথা বলিতে হইলে এই সকল পত্রিকা গুলি না পাওয়ায় আমরা দুঃখিত। কাগজই কাগজের অবলম্বন, ভ্রাতাই ভ্রাতার সহায়। এই সহায়তা যে আমরা কেন পাই না, তাহা বুঝিতে পারি না। "আলোচনার" ন্যায় ১৮ বৎসরের পুরাতন স্থায়ী কাগজের প্রতি এই উপেক্ষা কি শোভা পায়! স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য যে উপরোক্ত কাগজগুলি মূল্যবান। মূল্যবান বলিয়াইত আমরা সেগুলি পাইতে ইচ্ছা করি। আমরা যে সকল কাগজ পাইয়া থাকি সেগুলিওত অমূল্যবান নহে। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে আমরা এই সকল কাগজ প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত। আশা করি উপরোক্ত কাগজগুলির সম্পাদকগণ আগামী মাস হইতে আমাদিগকে এই বিষয়ে আর বঞ্চিত রাখিবেন না।

সম্পাদক

গীত।

মা মা মা মা বলে,
কেঁদে যায় মা দিন-যামিনী।
শুনেও কি না শুন তারা
ওমা শ্যামা ত্রিনয়নী?
ভাঙ্গলো গলা 'মা' 'মা,' ব'লে,
(তবু) দয়া হ'লোনা (মা) কোন (ও) কালে;
জান্‌লে তোমায় 'মা' 'মা' বলে
ডাকতাম না মা পাষাণী

শ্রীপ্রকলাল দত্ত বর্ম্মা।

ঠিকানা।

(১)

ঠিক ঠিকানা কেহ জানেনা।
এসেছি বা কোথা হ'তে, যেতে হবে কোন্ পথে
ঊর্দ্ধে কিম্বা অধঃদেশে ভেঙ্গে ত কেহ বলেনা।
ঠিক ঠিকানা কেহ জানেনা।

(২)

চক্রীর চক্র যায়না জানা।
চালুছে কেমন চাল, উড়ায় মট্‌কা জাল,
করছে হাড়ির হাল, এ ভুবহুনিয়া খানা।
ঠিক ঠিকানা কেহ জানেনা।

(৩)

লক্ষযোনি হয় আনাগোনা।
কত শত বারে বার, উপায় নাহিক তার,
সূক্ষ্ম চক্ষু ফুটি তার, দেখে পথের ঠিকানা।
যাতায়াত পথ কেহ জানেনা।

(৪)

নম্বর লেখা পরওয়ানা।
সে যে করে গো বাহির, সদা হইয়া অধীর,
তবু ও ত নতশির, তার পায় জগজনা;
করে শ্রীপদে লয় কামনা।

(৫)

বলি হেথা আর আস্‌বনা।
দেহান্তে যাওহে কন্তি, জন্ম মৃত্যু যে অনন্ত,
দুঃখ যাতনা নিতান্ত, সে শুনেও ত শুনেনা;
বুঝেনা জন্ম-মৃত্যু যাতনা।

(৬)

দিয়ে নয়ন, রাখ্‌বে কাণা।
'মাতৃগর্ভ-কারাগারে, যাতায়াত বারে বারে,
সঙ্গে দিবে দু'জনারে, একি বিষম যন্ত্রণা;
জ্বালা সাধ্‌বে নিজ মন্ত্রনা'।

(৭)

ফুটিলে আঁখি খুঁজি ঠিকানা।
সবে আসে একা একা, খেয়ে কত ভেবাচেকা,
কারো সনে কারো দেখা, হয় না কভু হয় না।
কে ব'লে দিবে সেই ঠিকানা॥

(৮)

যে কভু জনমেনা মরেনা,
শুধু সে জানে সকল, বাকি সবাই নকল,
নিজ স্থানের দখল, কেহ পাবেনা পাবেনা;
ঠিক ঠিকানা জীব জানেনা।

(৯)

হিসাব নিকাশ লেনাদেনা,
দিতে হবে যেজে বসে, যখন বাঁধ্‌বে কসে,
শমন চতুর এসে, মেলে কি না ঐ ভাবনা;
অন্ধে গোঁজা মিলন চলেনা।

(১০)

চৌদ্দপো মানব দেহখানা
বাণিয়ে কলের গাড়ী, রেখে চাবি দেছে, ছাড়ি,
(তার) বাহাদুরী বাড়াবাড়ী, কারিকুরি পন্থা নানা
অদূরে আছে বসে সে জনা।

(১১)

চতুর্ম্মুখ কভু নয় কাণা,
মানব ইঞ্জিনে দম, সিদ্ধ হস্ত সর্ব্বক্ষম,
যাহে আগম নিগম, বদ্ধ চৈতন্যে চেতন;
দেহে প্রবেশিলে চিৎ ফেরে না।

(১২)

যে দিন ধরার অন্নদানা,
তুলে দিবে মুহূর্ত্তেতে, দম বন্ধ কোন মতে
করে লবে নিজ হাতে, ইঞ্জিনে আর চল্‌বেনা,
কল খুলে সে আর দিবে না।

(১৩)

সাধের সাথী কপাল খানা,
লিখে দেছে আগা গোড়া, নয়নে যায়না পড়া,
সেই ত মন্দের গোড়া, অদৃশ্য অক্ষর নানা,
তাতেই লেখা ঠিক ঠিকানা।

(১৪)

দিলে এঁটে চর্ম্মের ঢাকনা।
সেটা যে যায়না কেটে, কর্ম্মভোগ যাতে ঘটে
যোগী ভোগী যায় চোটে, খেটে খেটে আধখানা
মূল ভিত্তি ঐ কপালখানা।

(১৫)

ঠিক ঠিকানা ভাল জানিনা।
লিখি যদি দশ ছত্র, পাইনা ত্রিদিব পত্র,
(সেথা) আছে ভদ্র কি অভদ্র,বুঝবে কেবা বেদনা
ভবে জীব-দেহে যে যাতনা।

(১৬)

আর কত জ্বাল এব জ্বালানা।
আমি হয়ে শশব্যস্ত, করলেম কত কস্ত
তবু হল'নী সাব্যস্ত পথের ঠিক ঠিকানা;
হায়রে বিধির বিড়ম্বনা।

(১৭)

আত্মা অমর আছে ঘোষণা
শরীর শারীর যন্ত্রে, সুষুম্নাদি তিন তন্ত্রে,
ব্রহ্ম হতে যাদুমন্ত্রে, সতত হয় চালনা;
আত্মা ভোগের ঘট ভাঙ্গেনা।

(১৮

দশ ইন্দ্রিয় পায় চেতনা।
যাহার আদেশ মতে, দেহ যাবে পঞ্চভূতে
করে ক্রীড়া অলক্ষ্যেতে, কেহ দেখ্‌তে পায়না
আত্মা বিনা কোথায় রইলো

(১৯)

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,
দেহে সৃজিয়াছে যেই, পরাপর ব্রহ্ম সে
নির্ব্বাণ যে তাহাতেই ইহা কভু নহে ভ্রম;
ঠিক ঠিকানার ঐ আশ্রম।

(২০)

ব্রহ্মতে লয় ঠিক ঠিকানা।
কল্প কল্প সাধনায়, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পায়,
মিশিয়া জীব তাহায়, পায় কৃপাবিন্দু কণা;
নশ্বর জগতের সার কিছুনা।

শ্রীধ্রুব লালের মাতা।

প্রেম-পদ্ম।

বিমলিন কাম-পঙ্কে
বিজড়িত মূল,
ঊর্দ্ধে তার দুগ্ধ-শুভ্র
নিবৃত্তি—মৃনাল;
তদুপরি ফুটে, মরি!
প্রেম পদ্মফুল।
গন্ধে তার আমোদিত
জগৎ বিশাল।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধরী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নিবেদন। "আলোচনা" বিগত বৈশাখ মাস হইতে অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ইহার ন্যায় বহুদিবসপ্রচলিত, সুলভ অথচ সারগর্ভ মাসিক পত্র বঙ্গদেশে আর নাই। এব্যার আমরা পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছি, প্রতি মাসে রয়েল ৪০ পৃষ্ঠা করিয়া "আলোচনা" প্রকাশ হইতেছে। অথচ মূল্য সেই

ডাকমাশুল সমেত ১।√০ টাকা রাখা হইয়াছে। বঙ্গদেশে ১।০ টাকা মূল্যে এত বড় মাসিক পত্র আর একখানিও নাই। আমাদের কার্য্য-সম্পাদনে আমরা প্রাণপণ করিতেছি। তবে গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টির উপর ইহার সম্পূর্ণ নির্ভর, কারণ ইহার পরিচালকবর্গ নিতান্ত দরিদ্র এই জন্য সকলের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এই সংখ্যা প্রাপ্তিমাত্র তাহাদের ১৩২১ সালের সাহায্য সত্বর প্রেরণ করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। যাহারা এখন ১৩২১ সালের সাহায্য প্রেরণ করেন নাই, আমরা তাহাদের নিকট আগামী মাসে ভিঃ পিতে পত্রিকা পাঠাইব। কেহ যেন ফেরৎ দিয়া আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ না করেন—ইহাই প্রার্থনা। পত্রিকা পরিচালন কার্য্যে বিশেষরূপে উন্নতি করিতে হইলে গ্রাহকগণের এবং সাধারণের কৃপা দৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। তাই আজ গ্রাহকবর্গের নিকট করযোড়ে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের জন্য সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি।

নবীনলেখক। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্যই আলোচনার জন্ম। এ উদ্দেশ্য "আলোচনা" আজন্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। নূতন লেখকগণের প্রবন্ধ ও তাহাদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনীও ইতিপূর্ব্বে "আলোচনায়" প্রকাশ হইয়াছে। আজ আমরা পুনরায় আর একজন সাহিত্য সেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রাহকবর্গকে উপহার দিতেছি। শ্রীযুক্ত জীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ার অন্তর্গত সাঁৎটিশিবপুরের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতা হাওড়ার একজন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। জীবন বাবু ইতি পূর্ব্বে অনেক ইংরাজী সংবাদ পত্রে দেশের অভাব অভিযোগের বিষয় লিখিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়া ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ Indian Mirror সংবাদ পত্রেই প্রবন্ধাদি লিখিতেন-উক্ত পত্রের স্বনাম ধন্য প্রবীণ সম্পাদক স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ সেন বাহাদুর তাঁহার লিপিচাতুর্য্যের বড়ই প্রশংসা করিতেন। সম্প্রতি জীবন বাবু বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং হিতবাদী, সম্মিলনী, সাহিত্যসংবাদ প্রভৃতিতে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তদীয় প্রবন্ধে যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন,তাহার কয়েকটী অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে এবং বাস্তবিক তাহাতে লেখকের বহুদর্শীতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবানের নিকট প্রার্থনা—জীবন বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপে মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধনে যত্নবান হউন।

পরলোক। বিগত ১১ই বৈশাখ হাওড়ার স্বনামধন্য সবজজ গিরীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর হইয়াছে। ইনি বহুবৎসর গভর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া আজ কয়েক বৎসর অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু ন্যায়পরায়ণ বিচারক ছিলেন। হাকিমী কার্য্যে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। বিত্ত-বিভব বা পদমর্য্যাদার অহঙ্কার তাঁহার ছিলনা—সকলের প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স, ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্গতি প্রদান করুন। এবং তাঁহার একমাত্র কৃতীপুত্র শ্রীযুক্ত মণিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দীর্ঘজীবী করুন, ইহাই প্রার্থনা।

পুতুল পূজা। *

আমাদের দেশে সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ উপাসনা প্রচলিত আছে বলিয়া অবস্থা ও অধিকারীর হিসাবে মূর্ত্তি পূজা আবশ্যক, একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করেন। অচিন্ত্য অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় যাঁহার স্বরূপ তাঁহাকে নিরাকার বা সাকার কল্পনা করিয়া আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করা একান্ত আবশ্যক। মূর্ত্তি কল্পনা না করিলে উপায় নাই। ইউরোপে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত Image Worship প্রচলিত ছিল,এখনও পর্য্যন্ত রোমে পৌত্তলিকতা বিদ্যমান আছে। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্বেও পূর্ব্বভাব এখনও অটুট রহিয়াছে। মার্টিন লুথারের মতাবলী এখনও সকল স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। যখন আমরা বলি সমুদায় উপনিষদ গাভী, অর্জ্জুন বৎস, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্ত্তা, গীতারূপ অমৃত দুগ্ধ এবং সখীগণ ভোক্তা তখন আমাদের মনে করিতে হইবে যে অর্জ্জুনের মত আমাদের ধ্যান ও ধারণা হওয়া সম্ভবপর নহে— এই যে অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরাগাংশ্চ দিব্যান্।
অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।

১৫।১৬ গীতা ১১শ অধ্যায়।

আমরা কি এত সহজে ভগবানকে দেখিতে পাই।

শুদ্ধ ব্যক্তির ক্রিয়মান কার্য্যে কর্ত্তৃত্ববোধ থাকে না বলিয়া কি আমরা কামনা বহিত হইয়া বালকের ন্যায় সকল কর্ম্মের আরম্ভ করিতে পারি। ঈশ্বরকে আমরা স্রষ্টা পাতা বিধাতা প্রাণকর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা বলিয়া জানি, তিনি নির্গুণ হইলে এ সকল ক্রিয়া পাওয়া যায় না। জগত দেখিয়া আমরা ঈশ্বরের রূপ গুণ নিরূপণ করিতে পারি বটে কিন্তু মূর্ত্তি পূজা না থাকিলে ভক্তি বিকাশের উপায় কি? যতদিন মনুষ্য পূর্ণত্ব প্রাপ্ত না হয় ততদিন সে নিবৃত্তি মার্গের অধিকারী হয় না, প্রবৃত্তি মার্গানুসরণ পূর্ব্বক ক্রমে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে আসিতে হইবে। এই জন্যই মহা পণ্ডিত ইমার্সন বলিয়াছেন,—

We must have idolatries mythologies—some swing or verge for the creative power lying coiled and cramped here, driving ardent nature

* সনাতন ধর্ম্ম সভার অধিবেশনে বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

into insanity and crime if it does not find vent.

"প্রতিমা পূজায় এই বিশেষ উপকার হয় যে বাহ্য বিষয়ে একান্ত আসক্ত চিত্ত অজ্ঞান মানবকে পরম পুরুষার্থ বিষয়ে সহজে আকর্ষণ করিতে পারে। ইহাতে নানা প্রকার বাহ্যাড়ম্বর আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত, আহার ব্যবহার সমস্তই আছে সুতরাং এরূপ কোন লোক নাই যে ইহাতে আকৃষ্ট না হয়। সকল প্রকার লোককে ধর্ম্মপথে আনিতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৌশল আর নাই।"

প্রথমে 'পূজা, অর্চ্চনা নানাবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য নিবেদন, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দান করিলে ভক্তির বিকাশ হয়।"

দ্বিতীয়তঃ—সাধকের নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির সংযত করা (মূর্ত্তিপূজা)।

চিত্ত সংযমের প্রথম অবস্থায় ধ্যান করিতে হয়, আবার ধ্যান করিতে হইলে একটি প্রত্যক্ষ অবলম্বন আবশ্যক হয়। জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা সাধকের সাহায্যের জন্য মন সর্ব্বদাই লিঙ্গে, গুহ্যে ও নাভিতে বাস করে। মনের আসক্তি কেবল সংসারে কামিনী কাঞ্চনে। হৃদয় যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরের জ্যোতি দর্শন হয়, কণ্ঠ যখন মনের বাস হয় তখন কেবল ঈশ্বরের কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা হয়, এইরূপে ক্রমোন্নত হইতে থাকে। তাই বলিয়া পুতুলের কেহ পূজা করে না। উহা কেবল উপলক্ষ মাত্র। পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা হয় এবং পূজা করা হয়। যাহার চিন্ময়-রূপ ধারণা করিবার উপযুক্ত মানসিক উন্নতি হয় নাই তাহার পক্ষে জড়রূপ ধারণা করাই স্বাভাবিক। উপাসকদিগের কার্য্যের জন্য গুণ ও ক্রিয়ানুসারে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে —কালীরূপ কৃষ্ণবর্ণ কেন না যেমন শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে লয় হয় সেইরূপ সমস্ত ভূতাদি কালীতে লয় হয় তিনি যে কালপাত, তিনি যে নির্গুণা তিনি যে নিরাকারা তিনি যে যোগীদিগের মঙ্গল স্বরূপা তন্ত্রকার তাহাও বলিয়াছেন। তারপর নিত্য কালরূপা অব্যয়া অমৃত স্বরূপা বলিয়া তাঁহার ললাটে শশিচিহ্ন নিরূপণ করা হইয়াছে কেননা চন্দ্রই সুধার আকর। তিনি চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি এই তিন নেত্র দ্বারা দর্শন করিতেছেন সেইজন্য "ত্রিনেত্রং" তিনি সমুদায় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কাল দন্তের দ্বারা চর্ব্বন করেন বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীর রুধির সমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্ত বসনরূপে কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার হাতে অভয় রহিয়াছে। বিপদকালে তিনিই অভয়দায়িনী। তিনি সমস্ত জীবকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন তাই তাঁহার হস্তে বর আছে। এই জগত রজোগুণে সৃষ্ট এবং তিনি ইহা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাই রক্তপদ্মাসন-স্থিতা। দেবতাদিগের বীজমন্ত্র ধ্যান ইত্যাদিতে কত সুক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। Esoteric Significance চেষ্টা করিলে কত সুফল লাভ হইতে পারে তাহা বোধহয় কেহ ভাবেন না। মহাদেব জ্ঞানের অবতার বা আদর্শ বলিয়া পঞ্চ মুখে সমুদায় জ্ঞান সংগ্রহ

করিতেছেন এবং পঞ্চমুখে জ্ঞান প্রচার করিতেছেন। লোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করে। এই জন্যই মহাদেবের পঞ্চমুখ। তারপর কৈলাসপুরী যাহার বাসস্থান, কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী পার্ব্বতী যাঁহার গৃহিণী ইত্যাদি পার্থিব সম্পদের যে তিনি পূর্ণমাত্রায় অধিকারী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু এ সকল সত্বেও তিনি দিগম্বর ছাই ভস্মমাখা, শ্মশানবাসী একাধারে ভোগের ও ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীজীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্মময় জগৎ। জলে স্থলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, অবনীতে, বিটপীতে, অণুতে পরমাণুতে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব। মানুষেও ভগবানের প্রকাশ হইয়া থাকে, ইহাই অবতারবাদ।

মানুষের মধ্যে, মানুষের বেশে, শ্রীভগবানের পূর্ণ ভগবত্তার প্রকাশ পাইলে এতাদৃশ ভগবান অনন্ত কোটী বিশাল ব্যাপ্তিময় ব্রহ্ম হইতে অনেক বড়, গুণে বড়, শক্তিতে বড়, দয়ায় বড়, জীবের প্রতি কর্ত্তব্যতায় বড়। অচ্যুত শিব অদ্বৈত, নিজের অনন্ত-অশেষ কল্যাণ-গুণ প্রকাশ করিয়া যখন নিষ্ঠাবান, উচ্চতম সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রকটিত হয়েন, তখন সেই সাধক, ভূমা ব্যতিত কখন তাঁহাকে অল্প বলিয়া মনে করিতে পারেন না, পূর্ণ ব্যতিত অপূর্ণ বলিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। তিনি সার্দ্ধ ত্রিহস্তপরিমিত হইয়াই আবির্ভূত হউন, অথবা ক্রীড়াকন্দুকপরিমিত সালগ্রাম রূপেই পূজিত হউন, নিষ্ঠাবান সাধক, তাঁহাকে ভূমা ব্যতিত কোন অল্প বা ক্ষুদ্র বস্তু বলিয়া মনে করেন না।

শ্রীভগবান সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিগণের বিনাশ-জন্য ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন নিমিত্ত সময়ে সময়ে মানবসমাজে মানুষের বেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ইহা শ্রীভগবানের ঐতিহাসিক প্রকাশ অর্থাৎ historical revelation; মহানুভবগণ এই অবতারকে চিনিতে পারেন।

আবার শ্রীভগবানের ইচ্ছায়, সময়ে সময়ে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও জগৎ অতীত ভাব-বিশিষ্ট সাধু ভক্তগণও জগতে প্রেরিত হইয়া থাকেন, তখন সূক্ষ্মদর্শী মহাপুরুষেরা প্রকৃত অবতার ও সাধু, এই উভয়ের পার্থক্য বিচার করিতে সমর্থ।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সনাতনকে বলিয়াছিলেনঃ—

"অবতার নাহিক হে, আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে, লক্ষণে বিচার॥"

মানুষের ইতিহাসে আমরা ধর্ম্ম বীরের পরিচয় পাই, সাধকের পরিচয় জানিতে পারি, সিদ্ধ ভক্তের প্রসঙ্গও দেখিতে পাই। আবার সূক্ষ্ম বিচারেও জানা যায়, সময়ে সময়ে জীবের কল্যাণসাধনার্থ পূর্ণব্রহ্ম প্রকটিত হইয়া মানব সমাজে জ্ঞান ভক্তি বিস্তার করেন; তাঁহার প্রভাব লৌকিকবৎ হইলেও, সেই প্রভাবের প্রতি বিন্দুতেই অনন্ত অলৌকিকত্ব প্রকাশ

পায়। তাঁহার জন্মস্থান লৌকিক হইয়াও অলৌকিক বিভূতিময়; তাঁহার জন্ম সময় লৌকিক সময় হইলেও, উহাতে অলৌকিক ভাবের যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ নবদেহ প্রতিভাত হইলেও উহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় কিরণ ছটায় মানুষ মাত্রেই বিস্মিত, চমৎকৃত ও আকৃষ্ট হয়, এমন কি, বনের পশু ও গাছের পাখী, সে রূপের প্রভায় তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অধিক আর কি বলিব, উদ্ভিদগুলিও পুলকিত হয়, স্থাবরেও আনন্দস্পন্দন অনুভূত হয়।

শ্রীভগবান জীবের পরিত্রাণের নিমিত্ত, মানব সমাজে আবির্ভূত হইয়া কি অপূর্ব্ব লীলা বিস্তার করিয়া থাকেন; জীবের অনন্ত জীবনের কি প্রকার সংগতির বিধান করিয়া থাকেন, ইহা মনে ধারণ করিতে না পারা, জীবের নৈতিক অধোগতি।

যিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজাধিরাজ, সেই বিশ্বেশ্বর, রাজরাজেশ্বর, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এই দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কাঙ্গালের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া পতিত জীবের সমক্ষে, গোলকের প্রেম ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কলির জীবের মলিন দশা দেখিয়া কলিকল্মষহর পতিতপাবন শ্রীভগবান, সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদসহ বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত জগন্মঙ্গলময় হরিনাম লইয়া শ্রীগৌররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জীবের সৌভাগ্যের সীমা নাই যে জীবশিক্ষার জন্য শ্রীগৌর গোপনে ভক্তাধীন স্বয়ং ভক্তভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"আপনে করিমু ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে।
আপনে আচরি ধর্ম্ম, শিখাইমু সবারে॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।
চারিভাগ ভক্তি দিয়া, নাচাইমু ভুবন॥"

(চৈতন্য-চরিতামৃত)

যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যাঁহার প্রসাদে কীটানুকীট হইতে চরাচর জীব আহারীয় ও সুখ-সচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হইতেছে, যাঁহার ইঙ্গিতে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, শিব, ব্রহ্মা যাঁহার কৃপা-ভিখারি, ইন্দ্র, চন্দ্র বরুণ, পবনাদি দেববৃন্দ যাঁহার আজ্ঞাধীন, যাঁহার কৃপা-কণিকা প্রাপ্তি লালসায় যোগী ঋষিগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া বনবাসী, সুরধুনী যাঁহার চরণউদ্ভূতা হইয়া পতিতপাবনী হইয়াছেন, সেই ভবভয়হারী, কমলা-সেবিত শ্রীহরি,সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়, সর্ব্বোচ্চ গোলকপুরী পরিত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গালবেশে, অযাচিত হইয়া ব্রহ্মার অগোচর নাম ও প্রেম বিতরণ জন্য জীবের দ্বারে—

"অশ্রু কম্প পুলক প্রেমে শরীর।
কৃষ্ণ বোল কৃষ্ণ বোল বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
এক বিন্দু প্রেম যাঁর জগৎ ভাসায়।
হেন প্রেমসিন্ধু গৌর, এনেছে ধরায়॥"

আবার তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বরূপ পরমানন্দ, পাষণ্ডদলনকারী নিত্যানন্দ রায় ও ক্ষিরোদশায়ী সর্ব্বান্তর্য্যামী অদ্বৈতরূপী নারায়ণ, তাঁদের করুণার সীমা নাই; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কোন যুগেই জীবের এরূপ সৌভাগ্যোদয় হয় নাই, অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ

"একবার মনে প্রাণে ঐক্য কোরে।
বল হরিবোল বদন ভোরে॥"

শ্রীভগবান যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে

জগতে আবির্ভূত হয়েন। প্রত্যেক অবতারেরই পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য আছে। জগৎবাসীকে ক্রমশঃ পূর্ণাবিতার দিকে অগ্রসর করাই ইহার উদ্দেশ্য। সুতরাং কৃষ্ণাবতারের পর শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার কেন হইল, অনুধাবন করিলে এটুকু বুঝিতে পারা যায় যে এ অবতারে তিনি "চিরাৎ অদত্তং নিজ গুপ্ত চিত্তং" মানবকে অযাচিতভাবে দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাহা হয় নাই। সর্ব্বশক্তির আধার না হইলে এ দান কেহ বুঝিতে সক্ষম হয় না।

পরমতত্ত্ব শ্রীবিশ্বম্ভর উপাসনা অতি প্রাচীন। অথর্ব্ববেদেও বিশ্বম্ভরের উপাসনা মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ঋষিদের মধ্যে যাঁহারা প্রেমভজনের শ্রেষ্ঠতম অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই শ্রীবিশ্বম্ভরের উপাসনা করিতেন। বেদে নারায়ণ নাম বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যাহারা ব্রহ্মময় ভগবানের উপাসনাই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের উপায় বলিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের এক শ্রেণী নারায়ণের এবং অপর শ্রেণী রুদ্রদেবের উপাসনা করিতেন। শক্তি উপাসনাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর যুগল উপাসনার ভাব ক্রমেই হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে লক্ষ্মীনারায়ণ, শিবদুর্গা, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ পূজিত হইতে থাকেন। ক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রত্যভিজ্ঞাদ্বারা শ্রীগৌর সুন্দরের পরিচয় পাইয়া জীব কৃতার্থ হইতে থাকে। এই গৌরলীলাই কৃষ্ণলীলার ভাণ্ডার। তাই শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় সিদ্ধ-কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণ লীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চড়াও তাহাতে ॥
চৈতন্য লীলামৃত পুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ॥"

আমাদের এই বঙ্গদেশটী মহাতীর্থ। কারণ এই বঙ্গদেশে স্বয়ং ভগবান সোণার ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন গৌররূপই তাঁহার স্বয়ংরূপ। বেদ বেদান্ত তন্ত্র মন্ত্র সকলেই সমভাবে তাঁহার সেই রূপেরই প্রভা দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সেই রূপেই এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই রূপই বিশুদ্ধ প্রেমের রূপ। বেদ সংহিতায় তাঁহার বিশ্বম্ভর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বিশ্বম্ভর নাম মন্ত্রেই বৈদিক ঋষিগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাচীনতম সোণার ঠাকুর এই বঙ্গদেশ মধ্যে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়া জগতে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এমন মহৎ প্রেমের অবতারের কথা আর তো কখন শুনা যায় নাই, তাই কবি বলেন—

"সর্ব্ব অবতার সার গোরা অবতার।"

প্রেমই ভগবানের বিশুদ্ধ স্বরূপ; আর ঐশ্বর্য্য কেবল বহিরঙ্গ ব্যাপার। ঐশ্বর্য্য ভগবানের বহিরঙ্গ; এই বিশ্ব জগতের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অনলে অনিলে, চন্দ্রে সূর্য্যে, ক্ষিতিতে জলেতে ও অনন্ত গগনে তাঁহারই মহিমা ও তাঁহারই ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইতেছে।

প্রেমই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব; আর শ্রীগৌরলীলা খাঁটী প্রেমলীলা; সুতরাং শ্রীগৌরতত্ত্বই চরম তত্ত্ব। এই যে গৌরহরি আমাদের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য, আমাদের জাতীয় গৌরবের উচ্চতম নিদর্শন। তবু লোকে এখনও ইহাঁকে চিনিতে পারেন নাই, জানিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাব জগতে প্রচার করা বাঙ্গালীদের যে একটা প্রধানতম কর্ত্তব্য এখনও লোকের চিত্তক্ষেত্রে সে ধারণাই আসে নাই। আসল কথা, বাঙ্গালীরা এখন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়াল গৌরহরি আমাদের অন্তরে বল দাও যেন নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাইতে পারি, তোমার প্রেমসুধা পান করাইয়া জগতকে মাতাই—

গীত।

"মাতিয়ে দেও মহাপ্রভু, একেবারে যেতে যাই
তোমার প্রেম সুধাপান করিয়ে, সদানন্দে
নাচি গাই।
২। যেই সুধা পান করিলে, বিষয়বুদ্ধি যায়
চলে,
হয় মহাভাবের উদয় সেই সুধাপান কর্ত্তে চাই।
৩। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, তব প্রেমসুধা
পানে,
মাতুক সব নরনারী, দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই।
৪। যুগে যুগে ভক্ত জনে, মাতাও যে সুধাপানে,
আমরা সেই সুধাপানে, মাতিয়ে সবে মাতাই।
৫। তব কৃপা বিতরণে, তব প্রেম সুধাপানে,
মাতুক জগৎবাসী, দেখে পরলোকে যাই॥"

অতএব প্রভু শেষ নিবেদন এই :—

"মধুসুদন, দীনশরণ, দুর্ম্মদ দনুজারি।
করুণাসাগর ভৃগুবর চরণচিহ্নধারী।
২ দেহি মে পদ পতিতপাবন, নীল নভোনিভ
নিখিলকারণ।
বজ্রাঙ্কুশধ্বজশোভন, কৌস্তুভ বলিহারী।
৩ দিব্যধামনিবাসীসেব্য, অভ্যুদয়সাধনলভ্য
সর্ব্বহৃদি ভাবয়িতব্য, দুর্ব্বলদুঃখহারী।
৪ এ অকিঞ্চন পতিত অতি, তুমি তো পতিত
জনের গতি,
চারুচরণে শরণাগতি, ভক্তির ভিখারী॥"

ভগবান, ভক্তের উপাস্য ধন, পর তত্ত্ব। শ্রীভগবানই প্রতিপাদ্য বিষয়, তাঁহাকেই ভক্তগণ আস্বাদন করিয়া থাকেন, যে কোন অবতার রূপে, রাধাকৃষ্ণরূপে, বা শ্রীগৌরাঙ্গরূপে সেই ভগবানই ভক্তের আশ্রয় ও উপাস্য। নিজ নিজ উপাস্যের মধ্যেই ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ রূপে বা শ্রীকৃষ্ণরূপে বা শ্রীরাধারূপে, শ্রীরামরূপে, ব্রহ্মরূপে বা পরমাত্মারূপে দেখিতেন। সেই উপাস্য দেবতাই সাধকের মঙ্গলের জন্য, তাহার অধিকার অনুরূপ আকার ও মূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। তিনি দুর্জ্ঞেয় হইলেও সাধকের অধিকার অনুরূপ রামরূপ, বা নৃসিংহরূপ, বা কৃষ্ণরূপ, বা রাধারূপ, বা নারায়ণরূপ বা গৌরাঙ্গরূপ প্রকট করিয়া থাকেন।

গৌর অবতারে ভগবৎ লক্ষণগুলি অতি সুস্পষ্টভাবে তাঁহাতে প্রকাশিত। দয়া গুণে অন্য কোন অবতারই তাঁহার তুল্য নয়। তাঁহা কর্ত্তৃক মাধাই উদ্ধার, বেশ্যা ও দস্যু উদ্ধার, জগতে এক অভিনব ব্যাপার। এই ব্যাপারের নিকট অজামিলের হরিপাদপদ্মলাভ হীনপ্রভ। অজামিল যে কোন রকমেই হউক, নারায়ণের

নাম করিয়াছিলেন, তাঁহার মুক্তিলাভ, বৈকুণ্ঠারোহণ, সাধারণ জীব স্বচক্ষে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু এই জগাই মাধাই উদ্ধার নবদ্বীপের প্রকাশ্য পথে সংঘটিত হইয়াছিল এবং কেবল যে জগাই মাধাই উদ্ধার হইল, তাহা নহে, মুক্তির অতীত পদার্থ প্রেম পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন।

জয় বিজয় ব্রহ্মশাপে অধঃপতিত হইয়া তিন জন্ম ঘুরিয়াছিলেন; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইয়াও মুক্তির অতীত পদার্থ প্রেম পান নাই। আর ভগবান গৌর অবতারে, বিনা অস্ত্র প্রয়োগে, তাহাদের জীবিতাবস্থায় উদ্ধার সাধন করেন এবং প্রেমধনও তাঁহাদের ভাগ্যে মিলিয়াছিল।

দক্ষিণদেশে ধর্ম্ম প্রচার মহাপ্রভুর অসীম দয়া ও ঔদার্য্যের পরিচায়ক। গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছেন আর এক এক জন মহা ভাগবৎ হইতেছেন। প্রভু বলিতেছেন ঃ—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম॥"

বাকিই বা কি? সুদূর আমেরিকায় তাঁহার নাম ও উপাসনা প্রচারিত হইয়াছে। জ্ঞানীগণ সার্ব্বভৌমের দৃষ্টান্তে, যোগীগণ প্রকাশানন্দের দৃষ্টান্তে এবং পাপী জগাই মাধাই আদির দৃষ্টান্তে গৌরগত প্রাণ হইবে। তাঁহার বৈরাগ্যও তাঁহাকে জগৎগুরুরূপে পূজা করিবে। কল কথা, এমন ভগবত্তার দৃষ্টান্ত, এমন দয়াময়ত্বের দৃষ্টান্ত, এমন মানবচরিত্রের দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই, কখন হইবেও না। তিনি জীবগণের নিজ জন, সর্ব্বদা সকলের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত।

নাগরীগণের স্বভাবই এই যে তাহারা গৌর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া, বা গদাধর বা নিত্যানন্দ বা নরহরি ইত্যাদির মিলন দেখিতে ইচ্ছুক, ইহাই তাহাদের যুগলভজন। যুগলকে সুখী করাই তাহাদিগের চির ঈপ্সিত কর্ত্তব্য। দীনাতিদীন হইয়া গৌরভক্তগণের নিকট গৌরপ্রেম প্রার্থনা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। পুরুষ অভিমান ত্যাগ করিয়া তত্ত্ব ছাড়িয়া প্রেম পথের পথিক হইতে হইবে। হে অগতির গতি, আমার গতি কর, নাথ।

শ্রীকৃষ্ণলীলার প্রত্যভিজ্ঞ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ গৌর সুধাকরের প্রথম প্রকাশে জন সাধারণের চক্ষু তাঁহার চরণনখছটায় অভিমুখে আকর্ষণ করেন। উপাসকগণ বুঝিয়া দেখুন যে শ্রীগৌরসুন্দর মহাবতারী; তিনিই ব্রজলীলা মাধুর্য্য প্রকাশের জন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হয়েন। কলিযুগে সেই রূপ এক হইয়া স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত করেন। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরই উপাস্যতম-তত্ত্ব ইহাই সুসিদ্ধান্ত। তাই সাধক শ্রীরাধার প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর স্বরূপ গীত রচনা করিয়া প্রকটন করেন যে—
একা গৌর হব না রাইকিশোরী।

আমি একা গৌর হব না রাইকিশোরী।
তোমার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি,
সঙ্গোপাঙ্গে সঙ্গে করে, নবদ্বীপে অবতরি।
একা গৌর হব না রাইকিশোরী।
রাই তুমি পরশমণি, তোমার পরশে অমনি,
অন্তে কৃষ্ণ, পাছে গৌর, মাধুরী।
তোমার আমার এক দেহ, একযোগে এক
আত্মা ধরি,

একা গৌর হব না রাইকিশোরী।
দাদা বলরাম, নিত্যানন্দ গুণধাম, প্রেমে জগৎ
ভাসমান কিবা আ-মরি।
শচীগর্ভে অবস্থিতি, ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি,
চন্দ্রগ্রহণ ছলে জন্মিব প্যারি।
গ্রহণ ছলে বল্‌বে লোকে, হরি বল, হরি হরি,
একা গৌর হব না রাইকিশোরী।
হব চব্বিশ বৎসর ঘরে, সন্ন্যাসী হইব পরে,
যুগল করে দণ্ড কমণ্ডলু ধরি ;
উদাসীন সন্ন্যাসীর বেশে, বেড়াইব দেশে দেশে,
ডোর কপিন কটি দেশেতে পরি।
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে, দিব ধূলায় গড়াগড়ি।
একা গৌর হব না রাইকিশোরী।
এসে চৌষট্টি যোগিনী, চৌষট্টি মতে,
ছয় গোস্বামী হবেন ছয় সহচরী ;
ব্যাস বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, হবেন ভক্ত সর্ব্ব অষ্ট
কবিরাজ বর্ণিবেন লীলা বিস্তারি।
গৌর লীলা, শুন্‌লে জীব, দ্রব হবে ভূমে পড়ি।
একা গৌর হব না রাইকিশোরী।
ওহে অর্পিত প্রেমধন, অযাচকে বিতরণ,
কলিযুগে ঘরে ঘরে বিস্তারি।
দাস কৃষ্ণধন বলে, প্রভু তুমি গৌর হলে,
শ্রীমতীর ভাণ্ডারের প্রেমের ভাণ্ডারী ;
গৌর ভক্ত সঙ্গে করি, ও গৌর মণ্ডলে ফিরি॥"
একা গৌর হব না রাইকিশোরী।

শ্রীআনন্দগোপাল সেন।

জাতি-বিচার।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সাম্য।

সাম্য কথাটি পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আজ সাম্যের গীত গাহিয়া দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। কথায় কথায় সাম্যের দোহাই দিয়া থাকে। 'সাম্যের তাড়ণায় পিতা পুত্রের উপর প্রভুত্ব হারাইয়াছে। পত্নি সাম্যের জোরে স্বামির উপর স্বামিত্ব করিতেছে। সদ্যপ্রসূত শিশু বৃন্তচ্যুত না হইতেই Equality, Liberety, Fraternity প্রভৃতি কথাগুলি বহুবিজ্ঞ সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত উচ্চারণ করে, আর আমরা অবাক হইয়া থাকি ও মনে মনে হাসি।

কিন্তু ইহাতে তত ক্ষতি ছিল না। লঙ্কাকাণ্ডের সময় যে অগ্নি শুধু লঙ্কাই দগ্ধ করিয়াছিল, ক্ষুদ্র প্রণালীটুকুও অতিক্রম করিয়া ভারতে সঞ্চারিত হয় নাই। ভারতবাসী নিশ্চিন্ত ছিল। "আজ সভ্যজগতের সাম্যাগ্নি ভারতের অধিকাংশ খড়ের চালে লাগিয়াছে এবং চালগুলি একেবারে জ্বলিয়া না উঠিলেও তাহার ধূম এত অধিক হইয়া উঠিয়াছে যে ভারতবাসী অন্ধপ্রায় হইয়াছে'। সাত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া এ অগ্নি আনিয়া যাহারা ভারতে লাগাইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ত্রেতার বীর অপেক্ষাও যে ঘোরতর বীর তাহাতে আর কথা বলা চলে না। কি ব'লে প্রশংসা করিলে কি বিশেষণে বিশেষিত করিলে ঐ সকল ঘোরতর বীর মহাশয়দের উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করা

হয় তাহা আমাদের বুদ্ধিতে ত আসেই না, অধিকন্তু বড় বড় অভিধানেও এমন উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাই না, তজ্জন্য বড়ই দুঃখিত। যাই হউক কথাটি বুঝিতে হইল।

সাম্য জিনিষ ভাল। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিষ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হয়। স্তূপীকৃত সুগন্ধী কুসুম স্তবকও পচিলে দেশব্যাপী ম্যালেরীয়ার আকর হইয়া উঠে। সাম্য বিকৃত হইয়া হল্লায় পরিণত হইয়াছে তার আর আশ্চর্য্য কি? ইউরোপ সেই বিকৃত সাম্য সেবনে উন্মত্ত. "হিন্দু সমাজে আদৌ সাম্য নাই" "হিন্দু সমাজ বিষম বৈষম্যময়" বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন। এখানকার আগুণ লাগা ঘরের লোক বিশেষতঃ হিন্দুরা এ অভাবটা বেশ দেখিতে পেয়েছেন। হায় হিন্দু! এই এক কথাতেই তোমার বিদ্যার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তুমি অধঃপাতে যাও তোমার জাতি-ভেদ-জীর্ণ শরীরে সাম্য নাই।

দেখা যাউক হিন্দুর স্থূল বুদ্ধিতে একথাটী ঠেকিয়াছিল কি না এবং জাতি ভেদের সহিত সাম্যের সম্বন্ধই বা কি?

সাম্য অর্থে সমতা। সমতার ভাবকে সাম্য কহে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় কোন্ দুইটি সৃষ্ট পদার্থই পরস্পর ঠিক সমান নহে। মনুষ্যে মনুষ্যে দূরের কথা, দুইটি বালুকা-কণাও পরস্পর সর্ব্ব বিষয়ে সমান নহে। অসংখ্য সৃষ্ট পদার্থের অসংখ্য রূপ, অসংখ্য গুণ। বাস্তবিক সমান হইতেও পারে না। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। গুণ বা শক্তি হইতেই জগতের সৃষ্টি। এ হিসাবে সৃষ্ট পদার্থ অন্ততঃ তিন প্রকারের হইবে। কিন্তু তার উপর আর এক কথা আছে—কাল। প্রকৃতির প্রত্যেক অণু-পরমাণু প্রত্যেকের সহিত বিশিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রত্যেক পরমাণুর উপর অবশিষ্ট সমস্ত প্রকৃতির শক্তি বা গুণ সর্ব্বক্ষণ সংসাধিত হয়। আবার সেই প্রকৃতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সৃজিত বস্তুর উপর যে প্রকৃতি আধিপত্য করিয়াছে পরমুহূর্ত্তে সে প্রকৃতি বিশিষ্টরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য সৃজিত বস্তুর উপর বিভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ করে। অতএব দুইটি সৃষ্ট বস্তু ঠিক সর্ব্বাঙ্গিন সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। আবার এক স্থানের কোন পরমাণুর উপর প্রকৃতির ক্রিয়া, অন্য স্থানীয় পরমাণুর উপরের ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। কেন না প্রকৃতির কোন এক বিশেষ অংশের ক্রিয়া নিকটস্থ পরমাণুর উপর যেমন হইবে, দূরস্থ অন্য পরমাণুর উপর সে অংশের ক্রিয়া তেমন হইবে না। দূরস্থ পরমাণুর উপর তন্নিকটস্থ প্রাকৃতিক অংশের ক্রিয়াই প্রবল হইবে। সুতরাং দুই ভিন্ন স্থানে সৃজিত বস্তু দুই প্রকারের হইবে। ইহার নাম—স্থান, কাল, মাহাত্ম্য।

অতএব দেখা গেল, সৃজিত দুইটি পদার্থ পরস্পর সমান হইতে পারে না। সুতরাং ভাষাগত অর্থে সাম্য জগতে অসম্ভব।

অধিকারের সমতা—এই অর্থেই সাম্য কথাটি ব্যবহৃত হয়। সাম্যবাদীরা বলেন, মানুষ যে বংশেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন সামাজিক হিসাবে সকলেই সমান।

মান্যে, আচার-ব্যবহারে, বৈষয়িক কর্ম্মে,

সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে, কোন বিষয়েই মনুষ্যে মনুষ্যে ইতর বিশেষ নাই। আর বলেন যে, হিন্দু-সমাজে এ সাম্য নাই। জাতি-বিচার ঘোর বৈষম্যের উপর সংস্থাপিত। নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়ে তাহারা হিন্দু-সমাজের বৈষম্য সপ্রমাণিত করিবার চেষ্টা করেন।

১। কর্ম্ম বিচার জাতি-বিচার সকল কর্ম্মে সকলকার অধিকার বঞ্চিত করিয়াছে।

২। সম্মান। জাতি-বিচার সামাজিক মনুষ্যের মধ্যে মানের তারতম্য স্থাপিত করিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মান্য হিন্দু-সমাজে সমান নহে।

৩। অন্ন-বিচার।

৪। বিবাহ-বিচার।

৫। সহানুভূতি ও একতা।

জাতি-বিচার পূর্ব্বোক্ত চারিটি বিষয়ে ইতর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির পথ নষ্ট করিয়াছে। এবং ইউরোপের ন্যায় জাতীয়শক্তি জন্মাইতে দেয় না।

আমরা এক একটি অধ্যায়ে এক একটি করিয়া এগুলির আলোচনা করিব।

কর্ম্ম-বিচার।

তুমি আমি সকলেই যখন মানুষ, তখন কার্য্য মাত্রেই সকলের সমান অধিকার। তোমার সাধ্য তুমি রাজা হও, কেহ তোমাকে এ কার্য্যে বাধা দিবে না। তুমি যে বংশেই জন্মাও না কেন, যে অবস্থারই লোক হও না কেন, যে কার্য্যে ইচ্ছা তুমি নিযুক্ত হইতে পার, সমাজ এ বিষয়ে তোমায় বাধা দিবে না। হিন্দুর জাতি-বিচার মানুষকে এ স্বাধীনতা দেয় না। সুতরাং হিন্দু-সমাজ বৈষম্যময়।

ইউরোপ এই কথা বলে। দেখা যাউক হিন্দু সমাজ কি বলে। হিন্দু বলেন,—তোমার পিতা, পিতামহ যে কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে, তুমিও সেই কার্য্যে নিযুক্ত হও। কেন না পিতার গুণ পুত্রে বর্ত্তে। তুমি ঐ কার্য্যে পিতৃগুণবলে অধিক দক্ষ। তোমার মত লোক এ কার্য্য যেমন সুন্দররূপে সাধন করিতে পারিবে, অপর ব্যক্তি যাহার পিতা পিতামহ ঐ প্রকার কার্য্য করে না সে তেমন পারিবে না। তুমি যদি উক্ত কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া অন্য কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ কর, তাহা হইলে তোমার নিজের মেধার দ্বারা তুমি হয়ত সে কার্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পার; কিন্তু তোমার পুত্র পৌত্রাদিতে তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণ যে বর্ত্তাইবে না,সে কথা কে বলিতে পারে? তখন তোমার স্বকৃত কর্ম্মগুণ তোমার পিতৃ-পিতামহাদির গুণের সহিত মিশ্রিত হইয়া তোমার পরবংশীয়দিগের গুণের ব্যাঘাৎ ঘটাইবে। তাহারা মিশ্র গুণান্বিত হইবে। অর্থাৎ তাহা হইলেই বর্ণসঙ্কর সৃজিত হইবে। যদিও জাতিতে তোমরা স্বজাতি থাকিবে সত্য, কিন্তু গুণে এক মিশ্রজাতি হইয়া উঠিবে। গুণ পরিবর্দ্ধনের জন্যই জাতি-বিচার। তুমি পিতৃ-কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমার পরবংশীয়ের তোমার পূর্ব্বপুরুষের গুণ কতকটা বিনষ্ট হইবে। বংশগতগুণ উত্তমরূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারিবে না। তাহা হইলেই বিশুদ্ধ গুণ তোমা হইতে নষ্ট হইল। যদি গুণই নষ্ট হইল, তবে

আর জাতি-বিচারে ফল কি? জাতি-বিচার তুলিয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে জাতি-বিচার ভিন্ন কোন সমাজ, বিশেষতঃ ধর্ম্ম-সমাজ চিরকাল টিকিতেই পারে না। সুতরাং তুমি নিজে যদিও বুঝিতে পার যে, পিতৃ কার্য্য অপেক্ষা আমি অন্য কার্য্যে বৈষয়িক উন্নতি সাধন করিতে পারি, তাহা হইলেও সমাজের মুখ চাহিয়া তোমায় পর-বংশীয়দিগের মুখ চাহিয়া সে কার্য্য হইতে বিরত হও। এইজন্যই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

গীতা—৩য় অঃ ২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যা মিমাঃ প্রজাঃ॥

২৪—৩য়॥

যদি আলস্য-বর্জ্জিত হইয়া আমি স্বকর্ম্মে না নিযুক্ত হই, তবে কর্ম্মে অনধিকারী মনুষ্যগণ সর্ব্বথা আমারই অনুগমন করিবে। আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে সকল লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে। তাহা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া প্রজা বিনষ্ট হইবে এবং আমিই তৎসমস্তের কারণ হইয়া উঠিব।

আরও বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

৩য় অঃ। ৩৫॥

সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহানি সত্ত্বেও স্বধর্ম্ম সাধন শ্রেষ্ঠ। কারণ পরধর্ম্ম ভয়াবহ। স্বধর্ম্ম সাধনে নিধন হইলেও কল্যাণ লাভ হয়।

আর এক কথা। যদি সমাজের লোকে স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে কোন একটী কর্ম্ম সমাজ হইতে এককালে উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীরই বিশেষ গতি। এই দুই শ্রেণীতেই লোকাভাব ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। কেন না ব্রাহ্মণের ত কথাই নাই, ক্ষত্রিয়ের কার্য্যও বড় কষ্টসাধ্য। তার উপর ক্ষত্রিয়ের কার্য্যে যদি বৈশ্য বা শূদ্র গিয়া অধিকার করে, যদিই বৈশ্য বা শূদ্রকে তাহাদের কার্য্যে অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়কেও বৃত্তি অভাবে নিম্ন কার্য্যের চেষ্টা দেখিতে হইবে। সুতরাং ক্ষত্রিয়-সমাজের ও সামাজিক উদ্দেশ্যের অকল্যাণ ও মিশ্র-গুণান্বিত সন্তান হইয়া ক্ষত্রিয়বীর্য্যশালী পুরুষের অভাব হইবে। এইজন্যই উচ্চজাতি বরং আপৎপাতে নিম্নজাতীয় কর্ম্ম করিতে পারে, তবু নিম্নজাতি উচ্চ জাতির কর্ম্ম করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ দিনকতক ক্ষত্রিয় কার্য্য করিলে শুধু তাহার বংশেরই কতকটা দোষ ঘটিতে পারে; সমগ্র সমাজের বা বিভাগের তত কোন ক্ষতি হয় না। এইরূপ সকল শ্রেণীর বেলাতেই। তাই মনু আপৎকালীন ধর্ম্মের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়-কার্য্যে, ক্ষত্রিয়কে বৈশ্য-কার্য্যে, বৈশ্যকে শূদ্রের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন, তবু নিম্নজাতিকে উচ্চ জাতির কর্ম্মে অধিকার নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের এটুকু একান্ত প্রয়োজনীয়।

যাঁহাকে কেবল আধ্যাত্মিক চিন্তায় জীবন যাপন করিতে হইবে, যে কেবল স্বপরিবারের উদরান্নের উপযুক্ত আয়ের অধিকারী এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট। যাহাকে সেইটুকুর উপর নির্ভর করিয়া মনুষ্যকে পরমোন্নতির দিকে লইয়া যাইতে হইবে, মর্ত্তকে স্বর্গে পরিণত করিতে হইবে, স্বর্গের আলোকে মর্ত্তের অন্ধকার ঘুচাইতে হইবে, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব গঠিত করিতে হইবে, তাহার সে বৃত্তিটুকুর সাতন্ত্র্য কি যুক্তিসিদ্ধ নয়? যদি তাহার বৃত্তিতে অপরের অধিকার রাখা যায়, তবে পূর্ব্বে যেমন ক্ষত্রিয়ের বেলায় বলিয়াছি, তেমনই তাহাকেও দায়ে পড়িয়া অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তাহা হইলেই তাহার আধ্যাত্মিক চিন্তার বিঘ্ন ঘটে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণস্বরূপ গুরুতর কার্য্যের অবসর কমিয়া যায় এবং অন্য বিভাগের সহিত মিশ্রিত হওয়ার জন্য মানসিক অবনতি ও বিলাসের মোহ আসিতে পারে। তবেই ব্রাহ্মণত্ব ঘুচিল। সমাজ-শরীরের মস্তক—ব্রাহ্মণ, বক্ষঃ—ক্ষত্রিয়, উদর—বৈশ্য, শূদ্র—পাদ। শারীর বিধান বুঝিলে দেখা যায়, মনুষ্য শরীরের সকল অংশই মস্তিষ্কের পোষণ করে। মস্তিষ্ক কাহারও পরিপোষণ করে না। কিন্তু মস্তিষ্কই সকল অঙ্গের সুখ-তৃপ্তির কেন্দ্র। ইহা দ্বারাই পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব সৃজিত হয়। তেমনই সমাজ-শরীরের পক্ষে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ দৃষ্টে কাহারও পরিপোষণ করে না সত্য কিন্তু সমাজকে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে লইয়া যাইবার ব্রাহ্মণই একমাত্র কর্ত্তা। তাই বলিতেছিলাম ব্রাহ্মণকে বৈষয়িক ঠেলাঠেলির ভিতর না ফেলিয়া উহার জীবিকোপায়ের স্বাতন্ত্র্য রাখাই কর্ত্তব্য।

এইসকল কারণেই ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি-সাতন্ত্র্য শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে। দেখ, এত সাতন্ত্র্য রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের স্বঃ স্বঃ বৃত্তিতে সঙ্কুলান হইল না বলিয়া, মহর্ষি পরাশর কলির ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে কৃষিকার্য্যে অনুমতি দিলেন। তবেই আপনা হইতে যে বৃত্তিতে অসঙ্কুলান হয়, তাহাতে অন্যজাতির অধিকার দিলে কি আর রক্ষা ছিল! তাহা হইলে আমাদের ব্রাহ্মণেরা কখনও ত গৌরব শিখরে আরোহন করিতে পারিতেন না। ক্ষত্রিয়ও জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া পারকীর্ত্তিত হইত না। ইউরোপে এই যে বৈশ্য শ্রেণীর অপরিমিত স্ফূর্ত্তি, ও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোপ হইয়াছে, ইহার কতকটি কারণ—এই কর্ম্মবিচার। একাঙ্গের অযথা স্ফূর্ত্তি অপেক্ষা সমাজের সার্ব্বাঙ্গিন পরিবর্দ্ধনই প্রার্থনীয়। সুতরাং জীবিকা-কর্ম্মের বিচার যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এসম্বন্ধে 'শূদ্র" নামক শেষ অধ্যায়ে আরও দুই চারিটি যুক্তি দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুক্তি কোন্ পথে?

জীব মাত্রেই জগতে কি আকাঙ্ক্ষা করে? মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, সুখেই হউক, আর দুঃখেই হউক, এক প্রকারে জীবের জীবন অতিবাহিত হইয়া, পরিণামে একদিন তাঁহাকে

সেই করাল-কৃতান্তের করে পতিত হইতে হয়। তখন জীব কি প্রার্থনা করে? তখন প্রার্থনা করে,—মুক্তি। কিন্তু মুক্তির উপায়-পথ পূর্ব্ব হইতে পরিষ্কার করিয়া না রাখিলে, তখন আর সে উপায় থাকে কি? পুনরায় জীবকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিলে আর তাহাকে ভব যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মৃত্যুর পরে সে সেই পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। সেই মুক্তির পথ পরিষ্কার রাখিতে হইলে, হৃদয়ে বিশ্বাসের ধ্বজা দৃঢ়রূপে প্রোথিত করা চাই। বিশ্বাস অতি রমণীয় ও সুখপ্রদ জিনিস এবং বিশ্বাসই অন্তর্জগতের পথ-প্রদর্শক-বন্ধু। যদি আত্মার ভিতরে পরমাত্মার লীলারাজি দেখিয়া, অপার আনন্দ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা থাকে,তাহা হইলে হৃদয়-ভূমিতে বিশ্বাস-রূপ সুন্দর বীজ রোপণ করিতে শিক্ষা করা উচিত। সত্য বটে, আজকাল আমাদের সমাজে বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে, কিন্তু মানবের প্রাণের অভাব, অসদ্ভাব দূর হইতেছে কি? রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত না হইলে, যেমন রাজ্যাধিকারীর ঐশ্বর্য্য লাভ হয় না, সেইরূপ বিশ্বাস সহায় না হইলে, অবিশ্বাসী জ্ঞান-বিস্তারে কোন ফলোদয় হয় না। আমাদের সমাজে এখন যে জ্ঞান-বিস্তৃতি দেখা যায়, তাহার কোন সারবস্তা নাই, কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর পূর্ণ। কেন না, যাহার প্রভাবে জীবনের সমস্ত সন্তাপ, সকল দুঃখ দূর হইতে পারে, যাহা আসল বস্তু এবং যাহা সমুদয় প্রাণকে সমুজ্জ্বল করে,ইদানীং পাশ্চাত্য-শিক্ষায় তাহার কোন একটীরও অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হয় না। অধিকন্তু আজকালকার পাশ্চাত্য-শিক্ষিতগণের মন ক্রমশঃ সম্ভোগের দিকেই অগ্রসর হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস হয়।

যে বিদ্যা মনের অন্ধকার দূর করিয়া, অন্তরকে সুস্থ ও উজ্জ্বল করে না, তাহাকে অবিদ্যা বলে। যে জ্ঞান আত্ম-জ্যোতিঃ বিকাশের সহায় হয় না, তাহাকে অপরা-জ্ঞান বলিয়া উক্ত করা যায়। আজকাল মানব যে বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহা অনেকাংশে অবিদ্যা বলিয়া উল্লেখযোগ্য। কেন না, এই বিদ্যা আমাদিগকে বাহ্যিক জ্ঞান ও বিলাসিতা শিক্ষা দিতেছে। কিন্তু আত্মদৃষ্টি শিক্ষা দিতে পারিতেছি কি? যে শিক্ষার মূলে ধর্ম্ম নাই, নীতি নাই এবং বিশ্বাস নাই, সে শিক্ষা, শিক্ষাই নহে, তাহাতে আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল লাভের আশা করা যায় কি? আজকালকার আমাদের শিক্ষাকে একমাত্র বিশ্বাসের অভাবে অসম্পূর্ণ শিক্ষা বলা যাইতে পারে। এই বিশ্বাসের অভাব প্রযুক্তই আমাদের প্রাণ সদা সন্দেহপূর্ণ ও অস্থির হইয়া থাকে। যেমন নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার গভীরতা বৃদ্ধি না হয়, তবে তাহা প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপে শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া মরুভূমে পরিণত হয়, সেইরূপ বিশ্বাসহীন শিক্ষায় ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্য লব্ধ হইলেও তাহা স্থায়ী হইয়া শান্তিপ্রদ হয় না এবং তাতে পরকালের কোন আশাই থাকে না।

মানব, জ্ঞানের প্রভাবে বড় বড় রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা ও রাজ্যভার বহন

করিতে সক্ষম হন বটে কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ জগতের আদি, অন্ত, কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁহার ইচ্ছায় সম্পন্ন হয় ; যিনি রক্ষা-কর্ত্তা ও অন্নদাতা; যাঁহা হইতে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব পাইয়াছি, তাঁহাকে স্মরণ করিতে, তাঁহার প্রতি ভক্তি-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সক্ষম হন কি ? 'তিনিই' আমাদের সহায়, সম্বল, একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্তা, অথচ তাঁহার প্রতি আত্মনির্ভর করিতে আমাদের রুচি নাই। অন্ধের পক্ষে বাহ্যজগৎ যেমন শূন্য ও সৌন্দর্য্যবিহীন, অন্তর্জগত সম্বন্ধে আমরাও সেইরূপ অন্ধ। বাহ্যজগত সম্বন্ধে যেমন চক্ষের দৃষ্টি, অন্তর্জগত সম্বন্ধেও সেইরূপ বিশ্বাস-দৃষ্টি থাকা একান্ত আবশ্যক।

আজকাল পাশ্চাত্য-শিক্ষিত যুবকবৃন্দের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে বাহ্য-সভ্যতার আড়ম্বর, বাহ্যজ্ঞানের শোভার জন্যই লোলুপ, ইহা ভিন্ন উহাতে অন্য কোন আশাপ্রদ ছবি দেখা যায় না। প্রাণহীন দেহ যেমন কদর্য্য, বিশ্বাসহীন জ্ঞানাভিমানী মনও ঠিক তদ্রূপ। শস্যলাভ করিতে হইলে যেমন সুক্ষেত্র ও সুবৃষ্টি হইলেই সুফলের আশা করা যায় না, পরিপক্ক বীজেরও আবশ্যক হয়, সেইরূপ যতদিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের সাধন-প্রণালী শিক্ষা না হয়, ততদিন মুক্তির উপায় কোথায় ? বিশ্বাসে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা না হইলে আমাদের ঐহিক ও পারলৌকিক কোন বিষয়েই মঙ্গল হওয়ার আশা নাই, মুক্তির আর কোন উপায় নাই। অতএব যদি জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পরম-রমণীয় ও সুখ-প্রদ বিশ্বাসরূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলেই অভীষ্ট ফল অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মে লীন হইয়া ভববন্ধন মুক্ত হইতে পারিবে।

"বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

তুমি।

তুমি নীরব নিথর নির্ম্মল রাতে
অমল উজল চাঁদিনী।
তুমি নব ফুটন্ত কুঞ্জ ভবনে
মধুর মধুর রাগিনী।
তুমি আসিয়া পূরিত ঝিল্লির তান
নৈশ উদার গগনে।
তুমি সুবাস জাগ্রত অলি গুঞ্জন
কুসুমের হাসি কাননে।
তুমি ফুল্লপ্রসূন পরাগ-ধূসর
মৃদু মলয় হিল্লোল।
তুমি প্রেম শীতলা পুণ্য-সলিলা
তটিনীর কল কল্লোল।
তুমি পূরব গগনে কুহেলি জড়িত
কনক কিরণ-গরিমা।
তুমি দিগন্ত কোলে বিশাল সান্ধ্য
আবেশ মাখান নীলিমা।
চৌদিকে দেব 'মঙ্গল' 'মঙ্গল' বলে
তোমার মহিম মুরতি
নিখিল ভুবনে রবি শশধরে
করে তব শুভ আরতি।

ওগো প্রিয় সখা হৃদি টুকু মোর
বেঁধেছ তোমার মোহনে !
চিত্ত আমার ওগো চিতচোর
বিকোয়ে দিয়েছি চরণে ।
তোমাতে মিশিতে ধাই হৃদে ল'য়ে
মত্ত আকুল বাসনা ;
কাছে তবু দূরে একি প্রহেলিকা
ধরা দিতে দিতে দাওনা ।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস ।

মা হোয়ে থাকনা কেন ?

মা হোয়ে আছিস শ্যামা, মা হোয়ে থাকনা কেন
জন্ম দিয়ে মার পুন, কেন কর লীলা হেন ?
তুমি মাতা, আমি পুত্র, আছি তোর মুখ চেয়ে
আছে মা তোমার স্নেহ, জগত সংসার ছেয়ে ।
কোন মায়ে করে থাকে, ছেলের মরণ আশা
কোন মায়ে নাহি দেয়, অফুরন্ত ভালবাসা !
তবে কেন লীলাময়ি, কেন কর লীলা খেলা
দেখা'ও বিবিধ মূর্ত্তি, বাপের ভীষণ মেলা !
কভু শ্যামা কভু ভীমা, জগত কাঁপায়ে নাচো
কভু কর রক্ত পান, অন্ন দাও আর্ত্ত যাচো ।
কখনো বিকট হাসি, শোনিত শুখায়ে যায়
কোন মায়ে চণ্ডি হোয়ে, সন্তানের রক্ত খায় ?
কখনো প্রকৃতি তুমি, কখনো পুরুষ হও
কখনো জননী হোয়ে, আমার হৃদয়ে রও ।
লোয়ে তুমি অর্দ্ধ পূজা, জীবনের ভক্তি সার
পাগল করিয়া দাও, রক্ত শুষে শেষে মার ।
চিনিতে পারি না আমি, কালোরূপ মুছে ফেল
আমি জানি কালো তুমি, কালোই জগত আলো ।
কভু নীল, কভু শ্বেত, লোহিত বরণা হও
ভয়ে মরি চিন্তে নারি, যবে ছদ্মবেশে রও ।
নেহারি মা রূপান্তর, তোমারে হারায়ে ফেলি
পাই না তোমারে কোথা, বিশ্বজুড়ে আঁখি মেলি ।
তখন তরাস আসে ভূত প্রেতে টানা টানি
সংশয় দন্তের ঘায়ে, পিষে তারা মর্ম্ম খানি ।
ক্ষুদ্র প্রাণ স্বল্প আয়ু, মা বই জানেনা যেই
কত সব তার প্রাণে, মা ছাড়া বাঁচেনা সেই ।
রক্ত খায় শ্বাস বন্ধ, মরণ শিয়রে নাচে
জননী ছাড়িলে তারে, সেজনা কেমনে বাঁচে ।
পরিণাম ! জনয়িত্রি, একান্ত ছেলের তোর
অকাল মরণ আর, আঁধার নরক ঘোর !
তাই বলি ওমা শ্যামা, মা হোয়ে থাকনা কেন
ত্যজো না সন্তানে আর, করণা গো বাদ হেন ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু ।

পুষ্পবতী ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

মুক্তির সোপান ।

আরাবল্লী পর্ব্বতের একটি নিভৃত গহ্বরে রামস্বরূপ ব্রহ্মচারী ধ্যানে নিমগ্ন, পাগলিনী সম্মুখে বসিয়া আছে। এই ভাবে এক প্রহর অতিত হইল, সুখময়ীও ধৈর্য্য সহকারে ধ্যান ভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিল। এক প্রহর পরে ব্রহ্মচারী চক্ষুরুন্মিলন করিলেন, দেখিলেন সুখময়ী যথা স্থানে বসিয়া আছে। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"সুখময়ী ! তোমার সাধ মিটেছে ত ?" সুখময়ী উত্তর করিল—"প্রভো ! আর একটি শেষ সাধ আছে সেটি আর অপূর্ণ

রাখ্‌বেন না। পুষ্পবতীর বীয়ে দেখ্‌লেই আমার সর্ব সাধ পূর্ণ হয়"। ব্রহ্মচারী এবার হাসিলেন, কতকক্ষণ কিছুই বলিলেন না, তার পর সুখময়ীকে বলিলেন "মহামায়ার বন্ধন ছিন্ন করা বড় কঠিন। তুমি সব বন্ধন ছিন্ন করেছ এখনও পুষ্পবতীর বিবাহ দেখ্‌তে সাধ। সহজেই লোকে এই জন্য গৃহত্যাগি হইতে পারে না। পুষ্পবতী তোমার কে?" সুখময়ী বড় লজ্জিত হইল, ব্রহ্মচারীর পা দুখানি ধরিয়া বলিল—"আমার আর সাধ নাই, আপনি যা আদেশ কর্‌বেন তাই কর্‌বো। আপনি এই ক্ষুদ্র প্রাণ রক্ষা করেছেন, এখন এই প্রাণ নিয়ে যা ইচ্ছা করুন। "ব্রহ্মচারী আবার হাসিয়া উঠিলেন' সুখময়ীর মস্তকে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন—"তুমি কি কর্‌বে? আমার খাতিরে শেষ সাধটি না মিটান কি ভাল? পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার যায় না। এ জন্মে পুষ্পবতী তোমার কেহ নয়, কিন্তু পূর্ব্ব জন্মে সে তোমার কন্যা ছিল। তাই তার মায়া ছাড়্‌তে পাচ্ছ না।" সুখময়ী শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল,সে বলিল—"প্রভো! তাই কি তাকে এত ভালবেসেছি? পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার কি থাকে? প্রভু বলিলেন—"সংস্কার যায় না, তবে সামান্য মানবের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত কিছু মনে থাকে না। তুমি কি ছিলে তাকি তোমার স্মরণ আছে? তাহা নাই। পূর্ব্ব জন্মে তুমি এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী, ছিলে, পুষ্পবতী তোমার কন্যা ছিল। তুমি সেই সময় থেকেই ধর্ম্মে মতি দিয়াছিলে, কন্যাকে বেশী স্নেহ কর্‌তে না। তার পর তুমি কন্যাকে ফেলে তপস্যার জন্য বনে যাও, সেখানে তোমার মৃত্যু হয়। এক জন্মে উদ্ধার হওয়া কঠিন, তাই এ জন্মেও তুমি ভগবানকে ভুলিতে পার নাই, তবে কন্যাস্নেহ তোমার ভগবৎ ভক্তির অন্তরায়। এই বন্ধন ছিন্ন হলেই তোমার মুক্তি হবে। তুমি আমার সঙ্গে চল, আর বিয়ে দেখে পরকাল নষ্ট করো না। এই সব পুতুল নাচ দেখ্‌লে কি কোন উপকার হইতে পারে? সংসারে এসে খেলে বেড়াচ্ছ, সে খেলা ত প্রায় শেষ হ'ল, যাহাতে চিরস্থায়ী খেলার স্থানে যেতে পার যে স্থানে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, শুধু আনন্দের খেলা—যাহাতে সেই স্থানে যাইতে পার সেই চেষ্টা কর। একবার ভগবানের খেলার দিকে দৃষ্টি কর। তুমি সেদিন দস্যু-হস্তে সজীব মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হচ্ছিলে, তিনি তোমাকে রক্ষা কর্‌লেন কিসের জন্য? তিনি একজন ভক্তকে বাঁচালেন—যেন তাঁর সুধাময় নামে কলঙ্ক না হয়। তুমি সে সময় কি কচ্ছিলে? অন্তরে ভগবানের নাম জপ কচ্ছিলে, বাহ্যিক কোন বিষয়ে আর মন যায় নাই। যে ব্যক্তি তাঁকে প্রাণ দিয়ে ডাকবে, তিনি তার কাছে আস্‌বেন। তবে তোমরা সাধারণ চক্ষে দেখ্‌তে পাও না। যখন মুক্তির সময় হবে—যখন সেই পরম পদার্থের সঙ্গে তোমার আত্মা মিলিত হবে, তখন তিনি দেখা দিবেন। যদি ঘাটে পথে হরিকে পাওয়া যেত, তবে আর কেহ হরির আদর কর্‌তে শিখ্‌তো না। তবে তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, সব কার্য্য দেখ্‌ছেন, সকলে বিচার কচ্চেন, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। যেমন তোমার উপর ঈশ্বরের কৃপা,

তেমন তুমিও তাঁকে কখনও ভুলো না, ক্রমে যাহাতে উচ্চতর সোপানে উঠ্‌তে পার, তার চেষ্টা করবে। অবশেষে তুমি তাঁকে লাভ করতে পারবে। দয়াময়ের অশেষ দয়া, তিনি ভক্তকে সর্ব্বদা চক্ষে চক্ষে রাখেন। এখন তুমি সংসারের কাছে বিদায় লও, আমার অনুসরণ কর।” সুখময়ী ঠাকুরকে প্রণাম করিল, সে যেন ভক্তি-রসে গদ্‌গদ্‌ হইল। চরণ দুখানি ধরিয়া বলিল—“পিতঃ! আপনি আমার উপায় করুন। আমি সংসার চাই না, আমি কন্যা চাই না, আমি কাহাকেও চাই না, শুধু ভগবান্‌কে চাই, কি ভাবে তাঁহাকে পাবো, তা বলে দিন। আমি হতভাগিনী, পাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হ’চ্ছে, এমন সন্তানকে কি তিনি আশ্রয় দিবেন?” ব্রহ্মচারী বলিলেন—“যে তাঁকে ভাবে, তিনি তাহারই, সন্তান আবার ভাল মন্দ কি? যতই কেন দোষী হও না, একবার প্রাণের সহিত তাঁকে ডাক, তিনি সব দোষ ভুলে তোমাকে কোলে নিবেন। শত পাপী হ’লেও তাঁর ক্রোড়ে স্থান পায়, নতুবা তাঁকে লোকে দয়াময় পিতা বল্‌বে কেন? এখন তোমার মনের অন্ধকার ঘুচেছে? তবে এখন চল, আর সময় নষ্ট করিও না। সময় অমূল্য জিনিস, বৃথা এ সময় নষ্ট করিতে নাই, সর্ব্বদাই ভগবানকে ডাক্‌বে।” ব্রহ্মচারী “মা! মা!” বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গান ধরিলেন—

“ওমা তোর মায়া কে বুঝ্‌তে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে,
রেখেছ সব পাগল করে।”

সুখময়ী এ গানে মুগ্ধ হইয়া গেল। ব্রহ্মচারী গাইতে গাইতে আবার ধ্যানস্থ হইলেন, এ ধ্যান ঠিক ভোরের সময় ভাঙ্গিল। তিনি তখন উঠিলেন, সুখময়ী সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ইহার পর আর কেহ ব্রহ্মচারী ও পাগলিনীকে দেখিতে পাইল না।

উপসংহার।

ইহার কিছু দিন পরেই রাজা অভয়সিংহের সঙ্গে পুষ্পবতীর ও মথুরা সানের সঙ্গে লীলাবতীর বিবাহ হইল। পুষ্পবতী কিছুদিন মায়ের নিকটেই রহিল। সুকু আর বিবাদ করিল না। পুষ্পবতীর নিকট আসিল, তাহার পিতা কন্যার অন্বেষণে আসিয়া ঐ স্থানেই থাকিয়া গেল।

জোতারাম ও হুকুমচাঁদের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইলে, উহাদিগকে ব্রিটিশ কারাগারে আবদ্ধ করা হইল, প্রেমচাঁদ ও রায়চাঁদ গিয়া উহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলেন। এখন প্রেমচাঁদের উপর সংসারের ভার পড়িল, তিনি রেণুকার সঙ্গে রায়চাঁদের বিবাহ দিলেন।

পুষ্পবতীর বিবাহে ব্রহ্মচারী পাগলিনীকে লইয়া সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, তাহার শেষ সাধ মিটাইয়া দিলেন। পাগলিনী আর সে সুখময়ী নাই, সে বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইল। রাণী তাহাকে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল। ইহার পর রাজস্থানে ব্রহ্মচারীকে ও পাগলিনীকে আর কেহ দেখিল না।

যে কয়েকজন ধীরাজসিংহের অনুচর রাজা

অভয়সিংহকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা ধৃত হইয়া, বিচারার্থ প্রেরিত হইল ও সকলেরই কারাবাসের আদেশ হইল।

রূপার আর উদ্ধার হইল না, সে ব্রিটিশ-সিপাহীর জিম্বার-গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিল। রূপার অবশেষে অনুতাপ হইয়াছিল। মহারাজা রামসিংহ অনেক দিন নাবালক ছিলেন, তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট বড় যত্নে ও সতর্কতার সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। বেহারী সান তাঁহার একজন বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আট লক্ষ টাকা কর দিতে হইত। কিন্তু মহারাণীর ও কুমারের চেষ্টায় ১৮৪২ খৃঃ অব্দে আট লক্ষ স্থলে চারি লক্ষ টাকা কর ধার্য্য হইল ও বকেয়া বাকী ৪৬ লক্ষ টাকা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে মহারাজা রামসিংহ পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন, এবং সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি তাঁহার সমস্ত সৈন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলেন। এবং নানারূপ সাহায্য করিলেন; তাহার পুরস্কার স্বরূপ তিথি কোট-কাসিম পরগণা লাভ করিলেন। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি পাইলেন, ও ১৮৬৮খৃঃ অব্দে রাজপুতনার ভীষণ দুর্ভিক্ষে তিনি বহু অর্থ দান করেন, এইজন্য তিনি তাঁহার সম্মানের জন্য ২ তোপ অধিক পাইলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লী-দরবারে তিনি ২১ তোপের আদেশ পাইলেন, এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একজন কাউন্সিলার নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে তিনি সি, আই, ই উপাধি পাইলেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে তিনি পুত্র না রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যু সময়ে মহারাজা জগৎ সিংহের দ্বিতীয় পুত্রের শাখা ও ইসাদির ঠাকুরের কনিষ্ঠ সহোদর কায়েম সিংহকে মনোনীত করেন। কায়েমসিংহ দ্বিতীয় মাধুসিংহ নাম ধারণ করিয়া ১৮৮০ খৃঃ অব্দে জয়পুরের সিংহাসনে বসিলেন, তিনিই জয়পুরের বর্ত্তমান অধীশ্বর। মহারাজা মাধুসিংহ জি, সি, এস্, আই; জি, সি, আই, ই, ও জি, সি, ভি, ও. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তিনি বিটিশ-গবর্ণমেণ্টের একজন বিশেষ বিশ্বস্ত নৃপতি, ১৯০৪ খৃঃ অব্দে ১৩ নং রাজপুত-সৈন্যের অনারারি-কর্ণেল নিযুক্ত হন। ঈশ্বর ইঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন। (সম্পূর্ণ)

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

জাপানী নীতি।

(উদ্ধৃত)

১। দিন রাত কাজ কর; এ সংসার কর্ম্মের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।

২। অলস ব্যক্তিদের কথায় ভগবানও কর্ণপাত করেন না।

৩। সৌভাগ্য অধ্যবসায়ের ফল।

৪। পেটুক লোকেরাই মহাপাপী।

৫। সংযমেই সুখ; মুর্খেরাই সীমা লঙ্ঘন করে।

৬। রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়ার মত অধঃপতন আর নাই।

৭। ডাক্তারদের সঙ্গে ঝগড়া করিবে না।

৮। মুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিবাহ করিবে না, হৃদয় দেখিয়া বিবাহ করিবে।

৯। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকা মূর্খেরই শোভা পায়।

১০। সর্ব্বাগ্রে মিতাচারী হইবে।

১১। পরিবার মধ্যে একজন সহিষ্ণু হইলে গোলযোগ থামিয়া যায়।

১২। পুত্র কন্যার অন্যায় আবদার কখন রক্ষা করিও না।

শ্রীরাধারঞ্জন দে।

গোচারণ ও গোরক্ষা।

——:০:——

গোচারণ ও গোরক্ষার জন্য বিশেষরূপ প্রয়োজন। সে বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এখন আমাদের দেশে ধর্ম্মজগতের আদর্শ শ্রীকৃষ্ণভগবান। কর্ম্মজগতে, কৃষ্ণ ও বলরামের নাম শীর্ষস্থানীয়। উভয়েরই জীবন বহু প্রকার উচ্চতম আদর্শে আমাদের সম্মুখে প্রতিফলিত। সেকালের প্রেমজগতে কৃষ্ণ গোপিনী-বল্লভ, ভক্তি ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। যোগীগণ মধ্যে যোগীশ্বর, কুট-নীতিতে আধুনিক বিস্‌মার্ককে উল্লঙ্ঘনকারী, মোক্ষের পথ প্রদর্শক, গীতার রচয়িতা, প্রধান শাসক, বেদান্তের প্রধান শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক, দুষ্টের দমনকারী, কংশ-ঘাতক, অবাশুর সংহারক, আর্য্যযুগের অর্থ ও নীতি শাস্ত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটক, প্রধান এডমিনিষ্ট্রেটার ও ফিল্ড মার্শেল ও জেনারেল এবং মাষ্টার বংশী বাদক বা সংগীতজ্ঞ। কিন্তু তিনি যে প্রধান গোরক্ষক গোউৎপাদক এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ বলরাম যে—আদি ও আদর্শ কৃষক তাহা আমরা জানিয়াও জানিনা—দেখিয়াও দেখি না। কৃষক এবং গোপালকগণের আদর্শ যে "কৃষ্ণ ভগবান" হওয়া উচিত, তাহা আমরা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছি। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও ভক্তি রসাত্মিকা প্রেম লইয়াই তাহাতে বিভোর হন। কিন্তু ভগবানের রম্য গোকুলের জন্য তাঁহারা কি কিছু করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম আদর্শ কৃষক এবং উৎপাদক। তাঁহারাই আমাদের দেশের বেট্‌স্‌, বুথ এবং কলিং উডের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহাদের শিক্ষিত কৃষি-নীতি গুলি কি আমরা অনুসরণ করিয়া চলি? এ সম্বন্ধে আমি ক্রমশঃ ক্রমশঃ সবই আলোচনা করিব। দেশের লোক মনোযোগ দিয়া পাঠ করিয়া একটু দেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলেই আমার কষ্টের স্বার্থকতা মনে করিব। আমাদের দেশে শিক্ষার দোষে অনেক কুসংস্কার আসিয়া সমাজ-দেহে পরগাছার মত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সে গুলি কুশিক্ষার ফল বৈ আর কিছুই নহে। এ সম্বন্ধে সে দিন ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহে কয়েকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মধ্য হইতে কতক কতক এই প্রবন্ধে পরে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গোজাতির উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় জমীদার-সভা বিশেষ উৎযোগী হইয়াছেন। চারণাভাবে গোকুল শীর্ণ ও হীনবল হইতেছে বলিয়া

তাঁহারা বঙ্গের জমীদারদের নিকট চারণ ছাড়িবার জন্য অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস ইঁহাতে স্থায়ী কাজ হইবে না, কারণ যে ভক্ষক সে কি রক্ষক হইতে পারে? গভর্ণমেণ্টের নিজে দাঁড়াইয়া এ বিষয়ে আইন ও বিধি প্রবর্ত্তনে পথ প্রদর্শক হওয়া কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি সবিস্তার ঐতিহাসিক-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। এখন শুধু লেখাতে কাজ হয় না। ব্যবহারিক ও কার্য্যকরী লোক চাই। আমাদের বাক্ সর্ব্বস্ব দেশে তাহারই অভাব খুব বেশী! দেশের কুসংস্কার একদিনেই উৎপাটিত হয় না। ইহা দেশ-কাল ও পাত্রের বিষয়-সাপেক্ষ। দেশের লোক সেইরূপ দৃঢ় হওয়া চাই, রাজার সহায় চাই এবং আমাদের চেষ্টা, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায় চাই। আগুনে পোড়া-রোগ দেশের মেয়েদের সংক্রামক রূপে ধরিয়াছে। তাহার হাত হতেই তাহাদের আগে বাঁচান দরকার, তারপর সমাজ সংস্কারের চিন্তা!!! আমরা এমনই অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে সেণ্টিমেণ্ট লইয়াই আছি। আমাদের মধ্যে মিরাবো সেলিয়ার ভিক্টর হিউগোর মত সমাজ সংস্কারক লেখক কে? ইতিহাস-পাঠক কি জানেন না যে ইহাদের জ্বলন্ত লেখা ফরাশী দেশের কুসংস্কার গুলিকে দুই এক দিনেই উৎপাটন করিয়া সমাজকে সেই দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছিল, যাহার বলে আজও ফরাশী-সমাজ বিজ্ঞান-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের গগণে তাহা ঘটে নাই। আমরা পরাবিদ্যাও হারাইয়াছি, বিজ্ঞানও হারাইয়াছি, গিয়া পড়িয়াছি অপরা-বিদ্যার গণ্ডির মধ্যে, তাই আমরা পথহারা ও পশ্চাৎপদ। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আমাদের আদর্শ করিয়া, গো-পালন ও কৃষি-কার্য্যে অবতীর্ণ ও মনঃসন্নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের কৃষকগণ কৃষিবৃত্তি ছাড়িয়া সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া বিলাসী হইয়া চাকুরী চাকুরী করিয়া হাহাকার করে এবং দেশে দৈন্যের পল্টন বাড়ায়। আমার বিবেচনা হয় যে ইংরাজ রাজ যেমন এক সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেইরূপ কৃষককুলের জন্য দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি-স্কুল, বিদ্যালয়, পরীক্ষাক্ষেত্র, উৎপাদকের ক্লাশ, বৃত্তি, প্রদর্শনী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বস্তুতই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধিত হয়।

বঙ্গের মধ্যে মাহিষ্য-সম্প্রদায় একটি প্রধান কৃষি কর্ম্মানুরত জাতি। তাঁহাদের নেতাগণ দেশের এই ইকনমিক অবনতি ও ভবিষ্যৎ বিষময় ফল উপলব্ধি করিতে পারিয়া বড়লাট সদনে গোরক্ষার জন্য আবেদন পত্র পাঠান। তাঁহারা বিলাতি সংবাদ পত্রে এ বিষয়ে আন্দোলনও করেন কিন্তু ফলে কোন কাজই হয় নাই। শেষে তাঁহারা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট সদনে আবেদন করায় তৎপক্ষ হইতে ভারত ও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশে কৃষিবিভাগ হইতে ইহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এখন দেশের লোকের সমবেত-চেষ্টার আবশ্যক। এই সকল দেশ-হিতকর-বিষয়ে আমি আলোচনা, বসুমতী, বসুধা, হিতবাদী বঙ্গবাসী,—ব্যবসায়ী প্রভৃতি পত্রিকায় বহু

প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তাহা পাঠে যদি আমার দেশের নাটক-নভেল-উপন্যাস পড়া বাবুদের ও বাক্পটু স্বদেশ হিতৈষী মহোদয়গণের কুম্ভকর্ণী-নিদ্রা ভাঙ্গে, তাহা হইলে আমার পরিশ্রমের সার্থকতা হয় বলিয়া মনে করিব।

পূর্ব্বে লোক সকল আপনি না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইত। বৃদ্ধগণ গ্রামের চতুষ্পথে লোক বসাইয়া রাখিতেন, অভুক্ত অতিথি দেখিলেই তাঁহাকে গৃহে আনিয়া অতিযত্নে ভোজন করাইয়া তবে দম্পতি ভোজন করিতেন। গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিলে তাহাকে না খাওয়াইয়া বৃদ্ধেরা ভোজন করিতেন না। বৃদ্ধের ভোজন শেষ হইলে তবে বৃদ্ধাপুরস্ত্রী তাঁহার ভুক্তাবশেষ খাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন, আর এখন গৃহিণীর ভুক্তাবশেষ জগন্নাথের প্রসাদ স্থানীয় হইয়াছে। অতিথি সেবা ও আতিথেয়তা দেশ হইতে একেবারে অন্তর্দ্ধান পাইয়াছে। পূর্ব্বে গৃহে গৃহে অতিথিশালা ছিল। উহা চতুর্থীতৎ-পুরুষ সমাস নিষ্পন্নপদ ছিল,—

অতিথয়ে শালা।

অতিথির নিমিত্ত যে গৃহ। কিন্তু এখন যুবকদিগের আমলে উহা কর্ম্মধারয় সমাসে পরিণত হইয়াছে—

অতিথি যে শালা।

বাবুরা এ-বি হইতে আরম্ভ করিয়া বি-এ পাশ করিয়া উকীল আমলা হইলেন—অমনি কেতাব ছাড়িয়া তাস-পাশা-দাবা ধরিলেন। হুঁকা, গুড়গুড়ি চা চুরট ও আরও কিছু ধরিয়া পাঠ সমাপ্ত করিলেন। ইউরোপীয়গণ বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সমগ্র জীবন ভরিয়া মা সরস্বতীর সেবা করেন, আর আমাদিগের দেশের যুবকেরা ইহার বেলা ইংরেজের অনুকরণ না করিয়া পাতসাহগণের শরণ লইয়া থাকেন। সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ কি হইবে—তাহা একবার ধীর মনে স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখুন।

বালকেরা বিদ্যালয়ে সুনীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা করে না, যুবকেরা অপাঠ্য, অস্পৃশ্য ও পূতিগন্ধ-ময় নভেল নাটক পাঠ করে—থিয়েটার দেখে ও যাত্রা শুনে তৎপর রাত্রি জাগরণে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অকালে কাল কবলে পতিত হয়। কেহই স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, রাজাও এ সকল বিষয়ে আইন করিয়া উৎপথগামিগণকে পথে আনিতে চেষ্টা পান না। তদুপরি অভক্ষ্য ভক্ষণ। গলিতে গলিতে অসংখ্য সয়তান-আশ্রম প্রতিষ্ঠাপিত। মিউনিসিপালিটী বা রাজ-পুরুষগণ ইহার প্রতিও লক্ষ্য করেন না। প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করা যখন দেশের রাজার কর্ত্তব্য তখন কঠোর আইন লিপিবদ্ধ দ্বারা এই সকল আশ্রম উঠাইয়া বা এই সকল স্থানে যাহাতে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের আমদানী হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অতি কর্ত্তব্য। যে সকল মাংস শৃগাল কুক্কুরেরাও স্পর্শ করে না, তাহা এই সকল স্থানে সাদরে রক্ষিত ও ভক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপুরুষগণের সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দোকানের ভেজাল ঘৃত মিষ্টান্ন ও তৈলাদি খাইয়া শত সহস্র নরনারীগণ অকালে কাল কবলে পতিত হইতেছে, তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না, অথবা দেশ-ধুরন্ধর-বক্তৃতা-

বাগীশগণের মনোনিবেশ হয় না। দিন দিন শত শত বালক বালিকা. রোগী আতুর কলিকাতা প্রভৃতি দেশের বড় বড় নগরের অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত বীজাণুমিশ্রিত দুধ খাইয়া শমন সদনে গমন করিতেছে, তাহার দিকে না আছে দেশের লোকের ও না আছে মিউনিসিপালিটীর দৃষ্টি। এদিকে আমাদের হতভাগা দেশের একজন দেশবাসীরও চিত্ত ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না।

দেশের মধ্যে নাটক, নভেল, গল্পের বই, নবোন্মাসাদি সময় নষ্টকারী, আলস্য আনয়নকারী সাহিত্যে দেশ প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। সকলেই ত লেখকাভিমানী কিন্তু মোলিয়ার, বঙ্কিম বাবু বা বাঁইরন, ড্রাইডেন, এডিসনের মত কয়টি লেখক দেশে জন্মিয়াছে? দেশের মধ্যে কুশিক্ষা ও নির্জ্জীবতাকারী সাহিত্য এই সকল দেশব্যাপী মাসিক পত্রিকা গুলির দ্বারায় বিকীর্ণ হইতেছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাই বলি যে—হে বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং মহাজনগণ, একবার তোমাদিগের অধ্যবসায় এবং মূলধন লইয়া, একবার বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া, একবার ভেদ ভুলিয়া দরিদ্রের পার্শ্বে তোমার কর্ম্মের নিশান তুলিয়া দাঁড়াও ত, অগ্রে কৃষি এবং গো বংশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনযোগী হও ত। তোমাদের গোলায় গোলায় ধান এবং গোয়ালে গরু যে দিন ভরিয়া উঠিবে—সে দিন জানিও তোমাদের লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমরা বাক্যবাগীশ বাঙ্গালী,—কথায় কথায় প্রতিজ্ঞা করি,—কিন্তু কাজের বেলায় সকলেই প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইয়া নিজের ষোল আনা স্বার্থ বজায় রাখিতে চেষ্টা করি। হায়। আমাদের এই অধঃপতিত দেশের বাক্যবাগীশ ও বাক্যবীরের সমাজ দেশের উপকারের জন্য সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু বঙ্গের অবলা বালিকারা পিতা মাতার কষ্ট দূরীকরণার্থ আপনার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

হিন্দু-সমাজ আজ মৃতকল্প-নির্জ্জীব! সমাজদেহে বোধ হয় প্রাণ নাই। যদি সমাজ-দেহে প্রাণ থাকিত, তাহা হইলে সমাজ এত নির্ম্মমতার পরিচয় দান করিতে পারিত না। যে দিন স্নেহলতা মরিয়াছিল, সেই দিন হইতেই এ পাপ পণ-প্রথার অবসান হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই,—তখন আর শীঘ্র হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে আপাততঃ ইহার প্রতিবিধানের কোনই সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে এই পণপ্রথারূপ দুর্নীতি যখন চরম সীমায় উঠিয়াছে, তখন একদিন ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এই যে আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে বালিকাগুলি আপনাদিগের অমূল্য জীবনের আহুতি দান করিতেছে, ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

আমাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, ইহা ভাবিয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই চিন্তিত হইয়াছেন। আমাদিগের ভবিষ্যতে কি হইবে, আমরা কি উপায়ে আমাদিগের জাতীয়তা রক্ষা করিব? মানুষ স্বার্থশূন্য, পরহিতৈষী, ন্যায় ও কর্ত্তব্য পরায়ণ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা দেশ ও সমাজের কল্যাণ হইয়া থাকে; কিন্তু সেরূপ স্বার্থ-

ত্যাগী মহানুভব লোকের সংখ্যা ভারতে অতি বিরল। ভারত মাতা কি আর তেমন সন্তান একটীও প্রসব করিতেছেন? আজ ভারত আপন লইয়া ব্যস্ত, কিন্তু সেই "আপন"টা যে কি, তাহা কেহই জানেন না ও সে আত্মসুখে গ্রাম, নগর, জনপদ স্বজাতি ও স্বদেশের মঙ্গল নিহিত আছে কি না, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। ডাক্তার বাউটন পাতসাহের নিকট পুরস্কার লইতে গিয়া স্বজাতির কল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আজি তোমারা ভারতে যে ইংরাজের এত সুখসৌভাগ্য ও অভ্যুদয় দেখিতেছ, মহাত্মা বাউটনের স্বার্থ-ত্যাগই তাহার একমাত্র নিদান। আমরা ভারতবাসীরা কি মহান্ ইংরাজের নিকট, তাঁহাদিগের এহেন স্বার্থত্যাগ ও স্বজাতিপ্রেম শিক্ষা করিয়াছি বা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি? কখনই না। তাহা হইলে ইংরেজ-শিষ্য—আমরা এতদিনে শিল্প,বাণিজ্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি-সাধন করিয়া অধঃপতিত ভারতবর্ষকে আবার সুখস্বাচ্ছন্দ্যবান্ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমরা ইউরোপীয়দিগের অদম্যউৎসাহ, অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও বুভুৎসা ইহার কিছুরই অনুকরণ না করিয়া আমরা তাঁহা-দিগের যতগুলি ভীষণ দোষ রাশি আছে, তাহারই আশ্রয় করিয়া দিন দিন রসাতলের দিকে ধাবিত হইতেছি। অহো! যে ভারত একদিন সমগ্র ভূমণ্ডলের আদর্শ জ্ঞানভূমি ছিল, যাহার অণুমাত্র গুণের আস্বাদ পাইয়া সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সভ্যভব্য, সাধু সদাশয় ও পুণ্যবান্ হইয়াছে আজি সেই ভারতসন্তানেরা সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ও পরের দোষরাশির আশ্রয়-স্থান। এখন দেশে পিতৃভক্তি, মাতৃপূজা ও সৌভ্রাত্র নাই। যুবকেরা স্ত্রীসর্ব্বস্ব, প্রৌঢ়েরা স্ত্রীসর্ব্বস্ব এবং বৃদ্ধেরাও গৃহিণীগত প্রাণ। কিন্তু পূর্ব্বকালের ভারতসন্তানেরা কি স্ব স্ব সহধর্ম্মি-ণীর প্রতি প্রীতিমান্ ছিলেন ও থাকিতেন না? তাঁহারা যেমন স্ত্রীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন, তেমনই তাঁহারা পিতা মাতা গুরুজন ও ভ্রাতা-দিগকেও ভক্তি ও প্রেমের চক্ষে দেখিয়া এই সংসার-মরুকেই আনন্দনিকেতনে পরিণত করিয়া রাখিতেন। আমাদের সে দেবভাব সে কর্ত্তব্যপরায়ণতা আজি কোথায় গেল? কেন আর ভারতের গৃহে গৃহে সে পিতৃভক্তি মাতৃপূজা ও সৌভ্রাত্রের জয় বৈজয়ন্তী সমুড্ডীন দেখা যায় না? কেন আমরা এত স্ত্রৈণ হইলাম? কেন এত নাস্তিক্য আসিয়া আমা-দের সকল কল্যাণ বিনষ্ট করিল।

অথবা আমরা যে কেবল এই সকল গুণেই বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা নহে। আমাদি-গের সে ধর্ম্মপ্রাণতা, সারল্য, বিনয়, সৌজন্য ও সর্ব্বজীবে সমভাব কোথায় গেল? কোথায় গেল হিন্দুর সে সত্যবাদিতা ও জিতেন্দ্রিয়তা? কোথায় গেল হিন্দুর সে পরদুঃখকাতরতা ও পরহিতৈষণা? কেন আমরা আর প্রতিবেশ-বাসীর সুখদুঃখের সন্ধান লই না? কেন আমরা এত স্বার্থপর হইলাম? কেন আমাদি-গের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিনিষ্ট হইল? সকল ফুরাইল?

আদর্শ মন্দ হইলে সকল মন্দ হয় এখন কোন্ পিতামাতা আদর্শস্থানীয়? কোন্ পত্নী-

বাসী আদর্শস্থানীয়? পিতা চুরট, সিগারেট, তামাক, চা খাইতেছেন। কিশোরবয়াঃ, বালক বালিকা ও যুবকেরা উহার অনুকরণ করিতেছে। মাতা ও পিতা একবারও ভগবানের নাম করেন না, বালক বালিকারাও নাস্তিক ও ভগবানে অবিশ্বাসভাজন হইতেছে। তৎপর পিতামাতা শ্বশুর শাশুড়ীগণ পুত্র কন্যা ও যুবতী বা বিধবা পুত্রবধুগণকে লইয়া বেশ্যা ও মাতালদিগের লীলাভূমি থিয়েটারে যাইতেছেন,যুবক যুবতী ও বালক বালিকাদের সুশিক্ষার বিশেষ ব্যতিক্রম হইতেছে, তাহারা ঐ সকল অভিনয় দেখিয়া উহার অনুবর্ত্তন করিতেছে, গাছ মন্দ হইলে তাহার ফল কোথা হইতে ভাল হইবে? ইহার উপর কলেজ স্কুল বিদ্যালয় হইতে কুশিক্ষা আসিয়া আমাদের ঘর প্লাবিত করিতেছে। বালক-বালিকাগণ এই কুশিক্ষা পাইয়া দুর্গতির দিকে ধাবিত হইতেছে। তরুণ অশিক্ষিত বালক বালিকাগণ তথা কথিত বিদ্যালয় স্কুল পাঠশালা হইতে নানা দুর্নীত ও দুর্ব্যবহার শিক্ষা করিয়া সেই আবর্জ্জনারাশি গৃহে আনিয়া গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে; শিক্ষাপ্রণালীর দোষে বিদ্যালয়সমূহ উপকার না করিয়া অপকার আমদানী করিয়া দিতেছে। সব পঙ্কিল জল যাইয়া ডরায় (নৌকার খোলে) জমিতেছে। বোচ্‌কা ভিজিতেছে।

যাঁহারা স্কুল হ'তে কৃতবিদ্য হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তাঁহারাও জগতের উপকার না করিয়া যেন অপকারই করিতেছেন। ব্যারিষ্টার উকিল ও মুক্তারেরা যে বৃত্তির সমাশ্রয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাহাতে সত্যের সংশ্রব আদবেই নাই। তাঁহাদিগের বালক বালিকারা সেই সেই পিতার নিকট অধর্ম্ম, অসত্য ও প্রবঞ্চনাপ্রতারণার বহু উপকরণ পাইয়া মন্দ হইয়া চলিতেছে। বহু স্থলে ডাক্তারেরা মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন তাঁহাদের সন্তানেরা তাহা অহরহ দেখিয়া মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাপরায়ণ হইতেছে। সুতরাং ইহাতে তোমরা ভারতের ভবিষ্যতের কি শুভ আশা করিতে পার? পূর্ব্বে একে অন্যের জন্য প্রাণ দিত, এখন যে অন্যের প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ, সেই যেন ধন্য ও অগ্রগণ্য। সাত্বিক দান ভারতে আর নাই। এত টাকা দিলে রাজপুরুষেরা আমাকে কি কি উপাধি দিবেন, তাহা যেন ঠিক করিয়াই ধনীরা লোহার সিন্দুকের চাবি খুলিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু যে প্রকৃত দানে দেশের দরিদ্রসন্তানেরা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, নির্ধন স্বদেশবাসীর দুরবস্থা বিদুরিত হইবে, সে বিষয়ে কাহারই দৃষ্টি নাই ও সেরূপ প্রকৃত দান করিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। অসংখ্য তামসিক অন্ধের অসাত্বিক দানে দেশের ভূরি ভূরি অর্থ বিদেশ চলিয়া যাইতেছে, দেশ ক্ষতি বহন করিতেছে।

জগতের যে দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি, আমরা দেখি যে,—কেবল বাঙ্গালী ছাড়া সকল জাতিই স্ব স্ব ধনাগম চিন্তায় ও কর্ম্মপ্রাণতায় ব্যস্ত ও অনুপ্রাণিত হইতেছে। কেবল বাঙ্গালীই তাহার একাধারে অলসতা ও বিলাসিতা লইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বাঙ্গালী কেবল সদাশয় ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট অভাব ও অভিযোগ জানাইতেই শিখি-

য়াছে,নিজের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে কিম্বা এক আনা অধ্যবসায় খরচ করিতে বাঙ্গালী প্রস্তুত নহে। কেবল মাছের তেলে মাছ ভাজিব, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিব, ইহাই আমাদের চেষ্টা। বাঙ্গালী নির্ব্বিবাদে ও নিরাপদে বাস করিতে চাহে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর যুগে, এই দারুণ অন্নসমস্যা ও প্রতিযোগিতার যুগে বিবাদ এবং আপদ ব্যতীত মানব জীবনে উন্নতি কোথায়?—গতিতেই শক্তি, গতিতেই মুক্তি। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহিয়া থাকেন। কিন্তু এ জগতে যাহারা বাঙ্গালীর মত দুরদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়াছে, অলসতায় এবং বিলাসিতায় তাঁহাদের জীবনধারণ চলে কি? বাণিজ্য আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বাণিজ্য করিতে হইলে সর্ব্বোপরি মূলধন,বিশ্বাস ও মহাজনগণের একপ্রাণতার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট সে বিশ্বাসের প্রত্যাশা কোথায়? যাহারা দুর্ভিক্ষের চাঁদা হজম করিয়া দেশের শ্মশানে পিশাচের ন্যায় নৃত্য করিয়া স্বার্থ সাধন করে, যাহারা সুবিধা পাইলেই সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া থাকে,যাহাদের উচ্চশিক্ষা জাল জুয়াচুরির নামান্তর মাত্র. ওকালতি, ডাক্তারি এবং কেরাণীগিরিই যাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও অবলম্বন, যাহারা পরমুখাপেক্ষী, তাহাদের এ জগতের অপর জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নিশ্চেষ্টতায় ও অধ্যবসায়বিহীনতায়, ভিক্ষায় বা দাসত্বে জীবনের উন্নতি সুদূরপরাহত। হয় অল্পে সন্তোষ, নয় আসমুদ্র পিপাসা, হয় কৃষি, নয় বাণিজ্য এই দুইটি একটী হইলেই মানব জাতির উন্নতি। এখন আমাদিগের যে অবস্থা,—তাহাতে আমাদিগকে উন্নতি ও শান্তি সুখের প্রথম সোপান—আর্য্যের সেই কৃষিকার্য্যে (agriculteral stage) পুনরায় নামিয়া যাইতে হইবে। দেশের জনসংখ্যার আশাতীত উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু তদুপযোগী অন্ন সংস্থান ও সংকুলান ব্যবস্থা আমরা কি করিতেছি? কেবল শৃগাল, কুক্কুরের ন্যায় বংশবৃদ্ধি করিলেই ত হইবে না—কেবল কামজ উপভোগেই জীবন যাত্রা ত সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হইবে না;—দেখিতে হইবে, তদনুপাতে দেশের ধনধান্য বৃদ্ধি পাইতেছে কি না, অন্নসমস্যার পূরণ হইতেছে কি না? তাহা না হইলে কেবল আমরা অকাল মৃত্যুর পথই উন্মুক্ত এবং প্রশস্ত করিব। বংশ বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে আমরা কতকগুলি কামোদ্ভব ও পাপোদ্ভব পশু বলিরই মহা যজ্ঞবেদী প্রস্তুত করিব।

এ কথাটি কেবল অধমাধম ও দাসানুদাস বাঙ্গালীর উপরই খাটে না—সমগ্র বিলাসভাবাপন্ন পাশ্চাত্য জাতিরও ইহা ভাবিবার বিষয়। তাঁহারা মোটর গাড়ীতেই চড়ুন,বিমানেই উড়ুন, মদ্য মাংসে জগত মাতাল এবং মাংসাশী করিয়াই তুলুন, অসৎ পথাবলম্বীগণের ধ্বংস অনিবার্য্য। পাশ্চাত্য সমাজে ভাগ্যবানদের বোঝা ভগবান বহিতেছেন বটে. কিন্তু যাহারা দুর্ভাগা তাহাদের কি হইতেছে? চারিদিকেই ক্ষুধিতের হাহাকার, দরিদ্রের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও উদর কন্দর ভরিয়া উঠিতেছে না।—এই কি জগতের উন্নতি? মানব দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্রলোকই দেখুক কিম্বা মঙ্গল গ্রহের অধিবাসিগণের সহিত সঙ্কেত করিতে সমর্থই হউক, তাহার প্রাণ যতদিন না

ক্ষুধিত ও পতিতের জন্য কাঁদিয়া উঠিতেছে, যত দিন না তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি জগতের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হইতেছে, তত দিন মানবের সুখ শান্তি ও স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আশা নাই। ততদিন মানব—মানব নামের যোগ্য নহে – তাহার পশু প্রকৃতিই থাকিয়া যাইবে।

এমিলে জোলা ফরাসী দেশে যখন বংশ লোপ পাইতে'ছিল ও কৃত্রিমতা ও ব্যভিচার যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন ফরাসী বংশ রক্ষার জন্য "Fecondite" নামে এক উপদেশমূলক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গালীর এখন যে অবস্থা পড়িয়াছে,যে কামতৃষ্ণার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জলন্ত বহ্নির ন্যায় সমাজকে ভস্মীভূত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে ও বালদানের জন্য বাঙ্গালীর সংসারে 'কাঙ্গালীর পল্টন' দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রতিকার কল্পে এখন বাঙ্গালীর পক্ষে সংযম অভ্যাস ও বংশ বৃদ্ধির সঙ্কোচন একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এ ত ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ বা পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ নহে, এ যে কাঙ্গালীর পল্টন প্রস্তুত হইতেছে, এ যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার হইতেছে, এ যে যদুকুল নির্ম্মূলের আয়োজন হইতেছে। কে জানে বাঙ্গালীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? অধীনতার প্রায়শ্চিত্ত কবে? উকীল, ডাক্তার, কেরাণীর প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? দেশে যত মক্কেল নাই তাহার অধিক উকীল হইয়াছে, যত রোগী নাই,তাহার অধিক ডাক্তার হইয়াছে, যত কর্ম্মখালি নাই, তাহার অপেক্ষা সহস্রাধিক কেরাণীর আবেদন পড়িয়া যায়। শেষে হবে কি জান! ঘরে ঘরে মকদ্দমা বাঁধিয়া উঠিবে,ঘরে ঘরে রোগী গড়াগড়ি যাইবে! যদুকুলের মুষলের সৃষ্টি হইয়াছে, একবার সর্ব্ব-নিয়ন্তার ইঙ্গিত পাইলেই হয়। হিন্দুর নাম ঘুচিবে না--কিন্তু অহিন্দু বাঙ্গালীর নাম ঘুচিয়া যাইবে। বাক্‌-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী আর কতদিন তাহার কথায় বাঁচিয়া থাকিবে? কথায় কি চিড়া ভিজে? উদর কন্দর পূর্ণ হয়? চাই অনুপ্রাণতা—চাই অধ্যবসায়। বাবুগিরি এবং বিলাসিতায়, ঋণে এবং দাসত্বে আর কতদিন চলিবে? পল্লী যে শ্মশান হইয়া যায়, নগরে বাস বাঙ্গালীর যে একটা ব্যাধির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। নিরক্ষর চাষারা প্রাণের দায়ে, পেটের দায়ে পাটের চাষ করিতেছে; কিন্তু হে বাবু নামধারী বাঙ্গালীর সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়! তোমরা কি করিতেছ? তোমরা লাঙ্গল ধরিতে বা গো-সেবা করিতে অপমান বোধ করিতেছ কেন? দেশ হইতে দলে দলে প্রতি বৎসর যে এত যুবক বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজ হইতে পাশ করিয়া বহির্গত হইতেছে, তাঁহারা সরকারী পদের জন্য লালায়িত হইতে চান কেন? তোমরা তাহাদের সাহায্যে আদর্শ গোশালা স্থাপন করিয়া বঙ্গের যুবকবৃন্দকে একটা উন্নতির পথ দেখাইতে পার না? গো জাতির অবনতিতেই আজ তোমাদের এইরূপ অধোগতি। অতি শৈশবেই বাঙ্গালী গো জাতির অভাবে মাতৃহীন, মৃত্যুমুখীন ও কঙ্কালসার হইয়া পড়ে। শৈশবে দুগ্ধহীন, যৌবনে দাসত্ব ও সংসার জড়ীভূত এবং আজীবন কন্যা দায়ে বাঙ্গালীর এই দৈহিক দুর্ব্বলতা। সুজলাং সুফলাং মলয়জ

শীতলাং জন্মভূমিকে দোষ দিতে পারি না, এই ধনধান্যময়ী বঙ্গলক্ষ্মী স্বর্গাদপি গরীয়সী! যে দেশ সুন্দরবনের বাঘকে অঙ্কে স্থান দেয়, সে দেশের মানুষ কেন দুর্ব্বল হয়—আমরাত বুঝিযা উঠিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

——:০:——

অবসান।

——

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজধানীর সম্মুখস্থ উদ্যান।

সুমন্ত্র। হে কুমার! কহ অকপটে,
কেন হেন বিষণ্ণ-বদন?
কোন্ চিন্তা কীট পশেছে অন্তরে তব?
আজি কয় দিন হ'তে,
অলক্ষিত ভাবে—
মূর্ত্তি তব দেখিছি চাহিয়া;
যেন কি উদাস ভাব।
গতি লক্ষ্যহীন, বদন মলিন,
চিন্তা-রেখা ললাট-ফলকে।

লক্ষ্মণ। হে সুমন্ত্র! সত্য অনুভব তব;
ব্যথিত পরাণ—আকুল কি জানি
কেন!
অশ্বমেধ যবে অবসান--
প্রাণ মম সতত কাঁদিত সেই হ'তে,
পুনঃ কয়দিন হতে
বরিয়াছে যেন,
জীবনের সে অলস ভাব।
সদা কার রোদনের ধ্বনি—
শূন্য-পথে পশিতেছে কাণে,
দাঁড়াই নির্জ্জনে,
আনমনে ভাবি কি ভাবনা;
মনে হয়, কে যেন পশ্চাতে মোর,
ছায়া সম দাঁড়ায় আসিযা।

সুমন্ত্র। দেব! বীর-হৃদি সহজেতে
না হয় চঞ্চল।
মলয়-হিল্লোলে—
আন্দোলিত হয কি বাবিধি?
এ বৃদ্ধ হৃদয়ে
হযে গেছে শত-বজ্রাঘাত;
বহু ঝড় বয়েছে জীবন-পথে
মা জানকী সনে,
হ'য়ে গেছে জীবনের সুখ অবসান;
এবে শুধু তোমা সবাকার,
স্নেহেতে আবদ্ধ আছি;
তাহে যদি ঘটে অকুশল,
তবে মোর বৃথা সুখ আশা—
বৃথা এ জীবন ভার।

লক্ষ্মণ। সুখ সাধ স্বপন এখন!
অযোধ্যার সুখ শান্তি জনমের মত
ডুবেছে অতীত কোলে।
যাও আছে তাও নাহি রবে;
দেখ আজি কয় দিন হ'তে,
ভাবি-অশুভের চিহ্ন
সদা হতেছে উদয়।
ছায়া সম তরল আঁধারে
ঢাকা যেন রয়েছে ধরণী।
রক্ত বৃষ্টি, ক্লেদ বৃষ্টি,

আসে যবে সুপ্ত-নিশীথিনী।
শূন্যপথে রোদনের ধ্বনি—
আসি পশে শ্রবণ-বিবরে।
অযোধ্যার সুখ-সূর্য্য চির-অস্তাচলে—
অস্তমিত হয় বুঝি!

সুমন্ত্র। হায় দেব! রাজ-লক্ষ্মী বিনা
রাজ্যে সদা অমঙ্গল!
কি কুক্ষণে অশ্বমেধ অনুষ্ঠান
জানকীর প্রাণ বিনিময়ে
হ'ল তার শেষ উদ্‌যাপন।
সেই হ'তে নাহি আর কুশলের ছায়া,
ঘেরিয়াছে বিকট আঁধার—
অযোধ্যার সুখ-শশী;
এ আঁধার ঘুচিবে কি আর?
দিব্য চক্ষু দেখি উন্মিলিয়া
পরিণাম শুধু অন্ধকার।

(নেপথ্যে)
প্রাণ যায়; কে আছ ত্বরায়
রক্ষা কর আর্ত্তজনে,
যম-দূত পিড়িছে নির্দ্দয়।

লক্ষ্মণ। (সচকিতে) ঐ শুন রোদন নিনাদ;
কাঁদে কোথা অশরিরী প্রাণী,—
অগ্রসরি দেখ মতিমান;
কেবা কাঁদে অলক্ষিতে।
(সুমন্ত্রের প্রস্থান)।

লক্ষ্মণ। একি অকস্মাৎ প্রাণ
কেন উঠিছে কাঁদিয়া!
রুদ্ধ-খাস হয় যেন মুহুর্মুহুঃ!
একি বিভীষিকা! ঐ দূর ছায়া পথে!
না,না, কিছু নয় অদৃশ্য মেঘের আড়ে!
একি পুনঃ! রোমাঞ্চ কিসের তরে;
বুঝেছি বুঝেছি—
আসন্ন বিপদ রাশি আসিছে গর্জ্জিয়া।
নহে শত রাক্ষস সমরে,
বাসব বিজয়ী সহ রণে
যে হৃদয় নহে বিচলিত,
সে হৃদয় কিসের লাগিয়া
অলসে শিথিল যেন অবলার মত;
উভরোল উঠিছে কাঁদিয়া।
ভয় কারে বলে
লক্ষ্মণ তা নাহি জানে কভু!
আজি তবে কেন শতবার
ভয়ে ঘন হৃদয়স্পন্দন!
একি চমৎকার! আকাশ ছাইয়া
অগ্নি পিণ্ড জ্বলে শত শত—
ভস্ম রাশি হবে কি কোশল পুরী!
না না কিছু নাই, নিবিড় মেঘের স্তর!
ভীত প্রাণ হ'ও স্থির;
অদৃষ্টের সনে, সংগ্রাম কারণে
সতত প্রস্তুত রহ।

(নেপথ্যে)
প্রাণ যায় অনাথিনী আমি,
রক্ষিতে কি কেহ কোথা নাই?
রাজা নাই রাজ্যের মাঝারে?
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
শীঘ্র এস মোর পাশে।

লক্ষ্মণ। একি মায়া বুঝিতে না পারি,
হরি! হরি!! জানকীর কণ্ঠস্বর,
জানকীর প্রেত-আত্মা করিছে সম্ভাষণ!
দূর দূর প্রমত্ত হৃদয়

পাপ চিন্তা কিসের কারণ ?
ভয় নাই দিলাম অভয় ;
দেবী কি মানবী যেবা হও
রাখিবারে চলিল লক্ষ্মণ !

লক্ষ্মণের বেগে প্রস্থান।

কালপুরুষের প্রবেশ।

কালপুরুষ। আসন্ন মরণ
লক্ষ্মণ সম্মুখে যেন হেরে ;
হায়, যেন উন্মাদের প্রায়
ছুটে যায় বীরমণি।
কোন প্রাণে পাষাণ বাঁধিয়া
হেন বীরে করিব হরণ।
এক দিকে দেব কার্য্য দেবের আদেশ,
অন্য দিকে শোকের আগার,
উভয় শঙ্কটে আমি পড়েছি বিষম।
মহামায়া বিভীষিকা ছায়া,—
পাতিয়াছি চারি দিকে ;
লক্ষ্মণের প্রাণ
ব্যাকুল নেহারে সব।
বৃথা চিন্তা কেন করি আর !
ধরিয়া সন্ন্যাসী বেশ
ভেটিবারে যাই রঘুনাথে।

(কালপুরুষের প্রস্থান)

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র। অযোধ্যার একাল রজনী—
পোহাবে না, পোহাবে না আর,
চারি দিকে সুকরুণ আর্ত্তনাদ ;
অন্তরীক্ষে সদা অগ্নি ক্রীড়া ;
অথচ অজ্ঞাত হেতু তার ;
অচিরে ডুবিবে পুরী শোকের সাগরে।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মণ। সুমন্ত্র !
দেখিতে কি পেলে কিছু !
কেবা করে করুণ নিনাদ ?

সুমন্ত্র। এ সকল দৈব আর্ত্তনাদ অলক্ষিতে !
কেমনে বুঝিব মায়ার মোহিনী ছলা ;
অগ্রসরী যাই যত দূর
কাঁদিতে কাঁদিতে
কে যেন অগ্রেতে চলে ;
দেখিতে দেখিতে উঠিল
বিমান পথে
বিকট মূরতি এক হেরিনু অম্বরে ;
হুঙ্কারী হাসিছে যেন
মুহূর্ত্ত অন্তরে
কিছু নাই অদৃশ্য সকল।

লক্ষ্মণ। আমিও এখনি
রমণীর আর্ত্তনাদ শুনি
অনুগামী হয়ে ছিনু তার।
মরি মরি চির পরিচিত
জানকীর কণ্ঠ রবে যেন ;
আহ্বান করিল বার বার।
কি যে মায়া কিছু না বুঝিতে পারি।
প্রতিধ্বনী তার এখনও বহিছে প্রাণে।

(বেগে প্রহরীর প্রবেশ)।

প্রহরী। সর্ব্বনাশ হয়েছে কুমার !
কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষ জনেক
শোণিতাক্ত দেহে,পশিয়াছে অন্তঃপুরে।
মোরা চারি জনে,
গতি রোধ করেছিনু তার,
কিন্তু হায় বিফল প্রয়াস

নিবারিতে নারিনু তাহায়।

লক্ষ্মণ। ভয় নাই, দৈব ইন্দ্র জাল
জ্বালাইতে পুরবাসী
শ্মশান অনলে ;
প্রেত মূর্ত্তি পশেছে নিশ্চয়,
না পারিবে নিবারিতে কেহ
ফিরে যাও নির্ভয় হৃদয়ে
অস্ত্রধারী হয়ে
পশ্চাতে যেতেছি মোরা।

(সকলের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

ক্ষমার শক্তি।

(ক্ষুদ্র গল্প)

একটী সুসজ্জিত কক্ষে ধপ্‌ধপে বিছানার উপর হেলেন নিত্যকার মত আজও বসিয়া আছে। আজিও তাহার অবনত মুখ গাঢ় চিন্তাছায়া সমাছন্ন। কি এক অব্যক্ত ভাষা তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিতে ছিল। হেলেন পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা, সবে দুই বৎসর তাহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ হইয়াছে বটে কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে সুখী হইয়াও হেলেনের অভাব দুর হইল না। তাহার স্বামী—"জনষ্টন" সুপুরুষ কার্য্যদক্ষ উদারচেতা, পরোপকারী ও ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন বটে কিন্তু তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছেলে মানুষের মত হেলেনকে আদর করিতে, ভালবাসা দেখাইতে তিনি জানিতেন না। জানিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে পারিতেন না। এজন্য হেলেনের মন সর্ব্বদা বিষাদ পূর্ণ থাকিত। যদিও বা কখন হেলেন তাহার স্বামীর কাছে যাইত, তবে স্বামী তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর প্রশান্ত মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"কি দরকার ?" কেন—স্বামীর কাছে স্ত্রীর কি বিনা দরকারে আসিতে নাই ? হেলেনের ক্ষুদ্র হৃদয় দুঃখে অভিমানে পূর্ণ হইয়া উঠিত। বালিকা তাই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিত না কিন্তু হেলেন সর্ব্বদাই ভাবিত—"এরূপ উপেক্ষিত-জীবন থাকা না থাকা সমান কথা।"

আজিও তাহার স্বামীর ব্যবহারের কথাই বুঝি সে ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে হেলেনের মুক্ত কুন্তল তাহার আনত বদন ঢাকিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সাঁঝের বায়ু ধীরে ধীরে গবাক্ষ পথে প্রবেশ করিয়া তাহার চিন্তা দগ্ধ দেহকে শীতল করিতে প্রয়াস পাইল, সহসা কার পদশব্দে হেলেনের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল। ব্যস্ত ভাবে হেলেন আপনার বস্ত্র বিন্যস্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, পদশব্দে গৃহদ্বার ও হেলেনের ভীতা চকিতা হৃদয়খানি কম্পিত করিয়া জনষ্টন ও শেলবি গৃহে প্রবেশ করিল। শেলবি হেলেনের বাল্য-বন্ধু। শেলবীকে দেখিয়া হেলেনের হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। হেলেনের সম্ভাষণে—শেলবিও যে আহ্লাদিত হইয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বহুদিন পরে বাল্য সহচরী হেলেনের হস্ত হইতে চায়ের পেয়ালা পাইয়া শেলবির হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, তাই বুঝি পাত্র গ্রহণের সময় শেলবির হস্ত কম্পিত হইল।

জনষ্টন তাহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক মৃদুহাস্থে শেলবির বদন মণ্ডল লাল করিয়া দিলেন।

নানাবিধ কথা বার্ত্তার পর শেলবি সহসা বলিয়া উঠিল—"মিঃ জন্! আজ চলনা আমাদের "কে" সাহেবের নূতন বাগানে বেড়াইতে যাই।

ব্যস্তভাবে জনষ্টন বলিল—"না ভাই, আজ আমাকে ক্ষমা কর। ৫৷৷৹ সাড়ে পাঁচটার আমার মিটিং, পাঁচটা বেজে গেছে—আমি চল্লুম। আজ না হয়, তোমরা দুইজনে যাও, আমি আর একদিন যাব।"

এই বলিয়া জনষ্টন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। শেলবি ও হেলেন যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহাদের পরস্পরের কথা-বার্ত্তা বলিবার ও মিশিবার স্রোতের পথে জনষ্টনকে তাহারা প্রবল বাধ স্বরূপ মনে করিত।

হেলেন বলিল—"শেলবি, তুমি সেই কবে একদিন এসেছিলে আর এতদিন আসনি কেন?"

শেলবি মুখভার করিয়া বলিল—"ঘন ঘন এলে পাছে তুমি বিরক্ত হও, পাছে তোমার সুখের অমূল্য সময় আমি বৃথা নষ্ট করিয়া ফেলি, এই ভয়ে আমি আসিনি। তোমাদের নূতন সুখ নিরাপদে ভোগ করিতে দেওয়াই উচিত।" এই বলিয়া শেলবি হেলেনের মুখের উপর আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিল। অপ্রতিভ সরলা হেলেন কাতরভাবে বলিল—তোমার বুঝিবার ভুল শেলী; আমি বিরক্ত হইব কেন? আর আমার এমন কি সুখ শেলবী যে তোমার আসায় আমার সে সুখে বাধা পড়িবে?"

এই বলিয়া সুখের ভিখারিণী হেলেন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল—দুইটী সমুজ্জ্বল মুক্তাবিন্দু তাহার নয়ন কমলে ফুটিয়া উঠিল। শেলবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেলেনের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন দেখিয়া লইল; তাহার নয়ন উজ্জ্বল হইল; হৃদয় এক অভাবনীয় আশার হিল্লোলে নাচিয়া উঠিল।

শেলবি বলিল—'আর দেরী করে কাজকি হেলি? চল যাওয়া যাক।"

প্রফুল্লমনে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হেলেন শেলবির সহিত উদ্যান ভ্রমণে বহির্গত হইল।

(২)

স্বভাব সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হেলেন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে শেলবির কর চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"শেলি, শেলি, তুমি আমাকে এ কোথায় আনিয়াছ? আমি যে আত্মহারা হইয়া যাইতেছি। এমন ফুল, এমন সুবাস, এমন মন-মাতানো হাওয়া, এমন মধুর চাঁদের আলো আমি আর তো কখন দেখি নাই! যেদিকে চাহিতেছি, সবি যেন সুমধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি আমাকে এ কোন্ কল্পনার রাজ্যে—কোন্ স্বপ্নের দেশে আনিলে?

হেলেনের চোখে সবই সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছিল সত্য—কিন্তু শেলবির কাছে সকলই এক প্রবল বিভীষিকার ন্যায় বোধ হইতেছিল। কি এক উৎকট ভাবনা তাহার মুখে চোখে নানা প্রকার ভঙ্গির সুচনা করিতেছিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে উভয়ে একটী গোলাপ

কুঞ্জের পার্শ্বে উপবেসন করিল। ফুলের গন্ধে হেলেনের হৃদয় ভরিয়া গেল, বলিল—'শেলৃবি কি মধুর গন্ধ!" শেলৃবী কথা বলিল না—বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল। একবার দুইবার বহুবার ডাকার পর শেলৃবী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হেলেনের মুখ পানে চাহিল—তাহার গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ কেশ-সমাচ্ছন্ন সুন্দর গৌরবর্ণ কপোলের নিম্ন দেশে সুবঙ্কিম ভ্রু-বিশিষ্ট আয়ত-নয়ন যুগল ছল ছল করিতেছিল।

হেলেন ব্যথিত চিত্তে বলিল—"সহসা তোমার মনে কি দুঃখ উঠিল শেলি?—অমন করিতেছ কেন"?

"সুখ শূন্য, আশা শূন্য, দুরাকাঙ্খান্বিত জীবন বহনে কি প্রয়োজন হেলি? দীর্ঘ নিশ্বাসে হেলেনের মুখ-কমল-শোভিত চূর্ণ কুন্তলগুলি কম্পিত করিয়া দিয়া অতি কাতর ভাবে শেলৃবী এই কথাগুলি বলিল। কথাগুলি হেলেনের হৃদয়ের প্রত্যেক তারে আঘাত করিল। তাহার বেদনার সুরের সহিত-শেলীর কথাগুলি মিশিয়া যেন বাজিয়া উঠিল।

সমবেদনার স্বরে হেলেন বলিল—"সে কথা সত্য শেলী.– আমারও প্রায়ই এই কথাগুলিই মনে হয়। আমার মনে হওয়ার কারণ থাকিতে পারে—কিন্তু তোমার এ কথা মনে হইল কেন? শুষ্ক হাসি হাসিয়া শেলৃবী বলিল—"আর আমার বুঝি কোন কারণ থাকা বিধাতার বিধি নয়?"

অপ্রতিভ হেলেন বলিল—"না না তাহা কেন থাকিবে না, তবে তোমার কি দুঃখ, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শেলৃবি বলিল—"আমার দুঃখ তুমি বুঝিবে কেন? হেলি, যে সুখী সে কি দুঃখীর দুঃখের বেদনা বোঝে? না—বুঝিবার চেষ্টা করে?

কাতরভাবে হেলেন বলিল—"না না শেলী, তুমি জাননা, তাই আমাকে এ অনুযোগ দিতেছ! জগতে কেহই সম্পূর্ণ সুখী নয়। তাহা না হইলে আমিই বা কেন—এই টুকু বলিয়াই হেলেন চুপ করিল। বুঝিতে পারিল—কথায় কথায় শেলির কাছে তাহার হৃদয়ের গুপ্তদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু চতুর শেলীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হেলেনের কিছুই গোপন রহিল না। হেলেনের কি অভাব, হৃদয়ের কোথায় ব্যথা, শেলৃবীর বুঝিতে বাকি রহিল না কিছুকাল নীরব থাকিয়া হেলি বলিল—"তোমার কি দুঃখ আমায় বলিবে শেলি?

শেলি—বলিয়া আর কি ফল হইবে?

হেলেন—ফল কিছু নাও হইতে পারে বটে, কিন্তু তবু আমার যতটুকু শক্তি তোমার দুঃখ মোচনের জন্য নিয়োজিত করিতে পারি।

শেলৃবীর নয়ন উজলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ছল ছল চোখে আকাশের পানে চাহিয়া মর্ম্মভেদি স্বরে বলিল—"তবে শুন হেলি, বাল্যকাল হইতে এক দেবীমূর্ত্তি এই হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—সে মূর্ত্তি ফুলের চেয়ে, চাঁদের জ্যোছনার চেয়ে, আমার চোখে মধুর ছিল। বড় সাধ ছিল যৌবনে যখন হৃদয়-কুসুমগুলি প্রস্ফুটিত হইবে, অতি আদরে তাহার চরণে সেই কুসুম-রাশি ডালি দিয়া ধন্য হইব—জীবনকে সুখময় করিব। আজ

সেই ফুল প্রস্ফুটিত কিন্তু সেই দেবী কোথায়? হেলি, হেলি আমার এত সাধের ফুলগুলি কি অনাদরে শুকাইয়া যাইবে?

হেলেনের বিস্ময়-বিমুগ্ধ নয়ন শেলুবীর নয়নে স্থাপন করিয়া বলিল—"কে সে হত-ভাগিনী শেলী—এমন অমূল্য রত্ন পায়ে ঠেলিল?"

হেলেনের হৃদয় কম্পিত করিয়া শেলুবী বলিল—"এখনো বুঝিতে পারিলে না হেলি? দুরাশা-বিমুগ্ধ হৃদয়ে একদিন ভাবিয়াছিলাম আমার বড় সাধের, বড় আদরের হেলেন আমার হইবে। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অজস্র প্রেম-সুধা ঢালিয়া সুখের উৎস ছুটাইব। এই মরুভূমির ন্যায় জীবনকে নন্দন-কাননে পরিণত করিব, শুষ্ক হৃদয়ে আমার সুধাময়ী হেলেন সুধা-ধারা বর্ষণ করিবে। কিন্তু হেলি আজ তুমি পরের! আজ আমিই বা কোথায়, তুমিই বা কোথায়!!

সেই মুহূর্ত্তে হেলেনের সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলেও বুঝি হেলেন এত চমকিয়া উঠিত না। হেলেনের সমস্ত দেহে কি এক বৈদ্যুতিক আলো ঝলসিয়া উঠিল, দেহ অবশ হইল। হৃদয়ে ভয় অথচ কি এক অভিনব আশার আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল। এমন মর্ম্মস্পর্শী কথা, এমন প্রেমের ভাষা, এমন ভাব-সৌন্দর্য্য হেলেন তো জীবনে কখন দেখে নাই—জীবনে কখন শুনে নাই! হেলেনের চোখে এক নূতন আলো ফুটিল। সে প্রতি ফুলে শেলীর মধুর প্রেমের ভাষা, কুসুম-সৌরভ-পূরিত মধুর সমীরণে শেলীর [illegible] প্লাবিত জ্যোছনা-রাশিতেও শেলীর ভাব-সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে লাগিল।

এবার শেলুবি ধীরে ধীরে হেলেনের কম্পিত হস্ত আপনার কম্পিত হস্তে তুলিয়া লইল। ব্যাকুল-নয়নে হেলেনের মুখপানে চাহিয়া বলিল—"আমার দুঃখ শুনিলে হেলী? এ দুঃখ কি দূর করিতে পারিবে? না—না, তাহা তুমি পারিবে না। কিন্তু আজ আমি একটা সংকল্প স্থির করিয়াছি। আজ এই সুন্দর অবসরে স্নিগ্ধ চাঁদের আলোতে স্নাত হইয়া তোমার চরণতলে এ দেহ বিসর্জ্জন করিব।"

শেলুবির স্বর কম্পিত হইল, নয়ন উজ্জ্বল হইল; সে দেহাবরণ হইতে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বহির্গত করিয়া হেলেনের মুখের কাছে ধরিল। চাঁদের আলোতে ছুরিকাখানি ঝলমল করিয়া উঠিল। হেলেনের মাথা ঘুরিয়া গেল—আকুল প্রাণে বলিল—"শেলি, শেলি, তুমি মরিবে কেন? তোমার দুঃখ দূর করিবার কি কোনও উপায় নাই? থাকে বল—আমি তাহা অবশ্য করিব। তোমার জন্য আমি এ জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।"

"উপায় আছে—কিন্তু আমাদের সুখ-স্রোতের মাঝখানে এক প্রবল বাঁধ—হেলি, সে—সে তোমার 'জনষ্টন'!"

বিচারশক্তি-রহিতা উন্মাদিনী হেলেন বলিল—"সে বাঁধ ভাঙ্গিবার কি উপায় নাই?"

শেলী—আছে, কিন্তু সে তোমার হাত—বড় কঠিন কার্য্য—পারিবে কি হেলেন্?

হেলী—কিরূপে?

শেলী একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল। একবার হেলেনের মুখের দিকে চাহিল।

বুঝিতে পারিল—পাখী ফাঁদে পড়িয়াছে—তবে আর ভয় কি! ধীরে ধীরে সেই ছুরিকাখানা হেলেনের হস্তে প্রদান করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"ইহা দ্বারা আজ রাত্রেই, পারিবে হেলী?"

হেলেন একবার শিহরিয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য হৃদয় কম্পিত হইল। কাতর ভাবে বলিল—"ইহা ভিন্ন আর কি কোন উপায় নাই?"

শেলী—না, যদি তুমি না পার হেলী, তবে ছুরিকা দাও, আমার ছুরিকা আমরই বক্ষে বিদ্ধ হউক।

হেলেন্ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব বল সঞ্চার হইল—দৃঢ় মুষ্টিতে ছুরিকা লইয়া—দৃঢ় স্বরে বলিল—"না—না শেলী তা হইবে না—আমি তোমার মৃত্যু সহ্য করিতে পারিব না। তুমি যাহা বলিলে—আমি তাহাই করিব।

শেলুবি আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, আবেগ ভরে হেলেনের কর চুম্বনে হেলেনের হৃদয় আবেশ-আকুল করিয়া দিয়া মধুরস্বরে বলিল—"হেলি, আজ এই সুখনিশির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও দুঃখ নিশির অবসান হইবে। কাল আমরা নবজীবন লাভ করিব—আমাদের সুখের জীবন প্রভাত হইবে। এখন বাসায় চল—তুমি সাবধানে কার্য্যোদ্ধার করিও, কাল ভোরে আবার তোমার সহিত মিলিত হইব।"

তখন রাত ৮টা হইয়া গিয়াছে। সরলা হেলেন দেবী রূপে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া মোহে মুগ্ধ রাক্ষসী রূপে গৃহে চলিল।

(৩)

রাত্রি ৮টার সময় হেলেন বাগান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তখনও জনষ্টন বাসায় ফিরে নাই। হেলেন ধীরপদে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া অবসন্ন দেহে শয্যায় শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল—আজ তাহার জীবনের এক-দিন—অনন্ত সুখ ও অনন্ত দুঃখ স্রোতের মাঝখানে হেলেন ভাসিতেছে। আজ সুখের লালসায় একমাত্র প্রণয় পাত্র শেলুবির প্রাণ রক্ষার জন্য তাহাকে কঠোর কার্য্য করিতে হইবে। আজ স্বহস্তে স্বামীর বক্ষে ছুরিকা বসাইতে হইবে!! ওঃ কি ভয়ানক!!! হেলেন আর ভাবিতে পারিল না। চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল—দেহের শোনিত শুকাইয়া উঠিল, হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া যেন দেহে এক নূতন শক্তি সঞ্চার করিল। শেলীর প্রত্যেক বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিল। না—না—অবশ্য এ কাজ করিতে হইবে। ওঃ শেলীর কি মধুর কথা, কি অকৃত্রিম ভালবাসা! কি সুন্দর ভাব-সৌন্দর্য্য, ভাবিতে ভাবিতে হেলেন ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমন্ত হেলেন স্বপ্নে দেখিতে পাইল—যেন একটি উচ্চ সুদৃশ্য পর্ব্বত-শৃঙ্গে শেলুবীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া হেলেন্ শুইয়া আছে। পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া একটী খরস্রোতা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হই-তেছে। সেই খরস্রোতে রক্তস্রোত মিশাইয়া হেলেনের হস্তে নিহত জনষ্টনের মৃতদেহ

ভাসিতেছে, শেলূবী যেন কত আদরে কত সোহাগে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া তাহার হৃদয়ে সুধাধারা ঢালিতেছে। সুমধুর স্বরে কত কথা বলিয়া হেলেন্‌কে সুখ স্বপ্নের হিল্লোলে নাচাইতেছে। উভয়ের হাস্য-ধ্বনিতে পর্ব্বত শৃঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। হেলেন যেন দুই হস্তে শেলূবীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"শেলী! শেলী! আজ আমি কি সুখী! এ সুখ তো আমি জীবনে কখন পাই নাই। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি,যেন তোমার চরণ প্রান্তে বসিয়াই আমার সারাটী জীবন কাটিয়া যায়।

কিন্তু সহসা এ কি!—শেলূবী ভীষণ রাক্ষসের মত লাফাইয়া উঠিল—পদাঘাতে হেলেন্‌কে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিকটহাস্যে বলিল—আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, পাপিয়সী দূর হও। যে সামান্য জঘন্য সুখের লালসায় স্বামীকে হত্যা করিতে পারে, তাহাকে আমি জীবনের সহচরী করিতে পারি না। হেলেনের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। একি হইল! এযে তাহার স্বপ্নের ও অগোচর! হেলেন আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিল বলিল—"শেলী, শেলী, আজ তোমার একি ভাব—আজ তুমি কি কথা বলিতেছ? আমি যে তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্যই এ ভয়ানক কার্য্য করিয়াছি। তোমারই কুহকে মুগ্ধ হইয়া—তোমার জন্যই এ কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, আমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছি। আজ আমাকে পায়ে ঠেলিলে আমি কোথায় যাইব? না—না শেলূবী তোমার পায়ে পড়ি আমাকে অকূলে ভাসাইওনা।"

বলিতে বলিতে হেলেন শেলূবীর পদপ্রান্তে পতিত হইল। কিন্তু শেলূবীর এ কি রূপান্তর—সে যেন আর সে শেলূবী নয়, দৃঢ় মুষ্টিতে হেলেনের কেশরাশি ধরিয়া ক্রোধান্ধ নয়নে পদাঘাত করিতে করিতে সেই খরস্রোতার স্রোতোপরি হেলেনকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"দুশ্চারিণী—আপনার পাপের ফল ভোগ কর। জানিস্‌না আমরা অলি-স্বরূপ, প্রতি ফুলকেই এইরূপে মুগ্ধ করি—প্রতি ফুলের মধুই এইরূপে পান করিয়া পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া থাকি।" বিকট হাস্যে—পর্ব্বত-শৃঙ্গ ধ্বনিত করিয়া নদীর জল কাঁপাইয়া—শেলূবীর দেহ যেন বাতাসে মিশিয়া গেল। শেলূবী কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া হেলেনের হৃদয় অনুতাপানলে জ্বলিয়া উঠিল—উঃ! আমি কি করিয়াছি—সুধা ফেলিয়া গরল ভক্ষণ করিয়াছিলাম—স্বহস্তে পুষ্পহার ছিন্ন করিয়া, কালসর্প গলায় পরিয়াছিলাম। আমি কেন মুগ্ধ হইয়াছিলাম—কেন আমার জীবনে এ মহাভ্রম হইয়াছিল! কোন্ মোহে আমি মজিয়া ছিলাম? শেলূবীর রূপ?—শেলূবী কি জনষ্টনের চেয়ে সুন্দর?—উন্মাদিনীর মস্তক পার্শ্বস্থিত জনষ্টনের মৃতদেহের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া—হেলেন বলিতে লাগিল—না না, তাহা নহে, জনষ্টনের কাছে কি শেলূবী দাঁড়াইতে পারে? জনষ্টনের গম্ভীর প্রশান্ত-মূর্ত্তি—স্নেহশীল-আয়ত-লোচন—কি করুণা-মাখা! জনষ্টনের হৃদয় কত উচ্চ—কত মহিমাময়! জনষ্টনের ভালবাসা কত স্থির, কত গভীর! অতলস্পর্শী। প্রেমান্ধ চঞ্চল-হৃদয়া হতভাগিনী আমি, তাই সেই প্রেম খুঁজিয়া পাই নাই। তাই আমি শেলীর চপ-

লতা মাখা কুটীল-কটাক্ষে মজিয়াছিলাম ! তাই আমি রাক্ষসের প্ররোচনায় দেবতাকে হত্যা করিয়াছি। বিশ্বাসঘাতকের কুহকে—বিশ্বাস-ঘাতিণী হইয়াছি—জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিয়াছি, না—না আর নয়, আর সহ্য করিতে পারি না, জনষ্টন ! জনষ্টন ! আজ তুমি কোথায়, একবার এস— হতভাগিনী হেলীর দশা দেখিয়া যাও। তুমি ত দয়াময়—আমাকে এই অকুল-সাগর—অনন্ত-যাতনা হইতে উদ্ধার করিয়া যাও। আমি তোমার চরণে শত অপরাধে অপরাধিণী—কিন্তু তুমি তো করুণাময়,আমাকে ক্ষমা করিবে না কি ? হেলেন আকুল-প্রাণে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল ; সেই ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে হেলেনের নিদ্রা ভঙ্গ হইল বটে—কিন্তু স্বপ্নের মোহ কাটিল না—তাহার মনে হইলে—কোথা হইতে এক দেবতা আসিয়া যেন তাহাকে সেই ভীষণ স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার অবসন্ন দেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে, স্বর্গীয় সৌরভে তাহার হৃদয় ভরিয়া যাইতেছে—মধুর শীতল সমীরণে—তাহার দেহ-ক্লান্তি দূর হইয়াছে।

ধীরে ধীরে হেলেন নয়ন উন্মিলন করিল। এ কি—সে যে তাহার নিজের কক্ষেই শুইয়া আছে, আর তাহার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া স্নেহ-মাখা নয়ন দুটী হেলেনের মুখের উপর রাখিয়া বসিয়া ও কে ? এই কি দেবতা ! এ যে জনষ্টন। হেলেন আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার সকল শক্তি যেন বিলুপ্ত হইল।

মধুর কণ্ঠে জনষ্টন্ ডাকিল—"হেলেন্।"

হেলেন জনষ্টনের মুখপানে চাহিল।

সস্নেহে জনষ্টন বলিল—"তুমি কি কোন স্বপ্ন দেখিতেছিলে হেলী ? এত ঘামিতেছ কেন ? চোখ মুখই বা অমন কেন ? আমাকে কি বলিবে হেলী ?"

হেলেন কি বলিবে ? অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল—স্বপ্নের ঘটনায় তাহার মোহান্ধকার দূর হইয়াছিল। হেলেন বুঝিতে পারিয়াছে—এ স্বপ্ন—স্বপ্ন নহে ; এ সত্য—এ তাহারই ভবিষ্যৎ ছবির চিত্রপট। অব্যক্ত যাতনা হেলেন আর সহ্য করিতে পারিল না। দুই হস্তে জনষ্টনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রু-জলে বদন-কমল প্লাবিত করিয়া কাতর-কণ্ঠে হেলেন বলিল—"স্বামীন্ ! আমার হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবতা ! আমি হতভাগিনী, আমাকে ক্ষমা করুন।"

জনষ্টন স্নেহভরে হেলেনের অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"হেলেন্, মনে যদি কোন অনুতাপ হইয়া থাকে, তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও—ক্ষমা চাহিবার হইলে তাহারই কাছে চাও। আমি তোমাকে কি ক্ষমা করিব হেলী —তুমিই আমাকে ক্ষমা কর। শুন হেলী, আজ সন্ধ্যার সময় যে ঘটনা ঘটিয়াছে সকলই আমি জানি, আজ আমাদের মিটিং হইল না, —তুমি বাগানে যাইবে জানিতাম, তাই আমিও বাগানের দিকেই গিয়াছিলাম। দূর হইতে তোমাদের কথা ও ভাব দেখিয়া শুনিয়া আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না ; মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তোমরা আমাকে দেখ নাই কিন্তু আমি তোমাদের কার্য্যকলাপ সকল দর্শন করিয়াছি। তোমাদের চলিয়া আসার

পর, আমিও খানিক পরে ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি—তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছ, তাই আর তোমাকে আমি ডাকি নাই। আজ সমস্ত রাত্রি তোমার শিয়রে বসিয়া তোমার সুমতি ফিরিয়া পাইবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছি। হেলি, আজ আমি ধন্য, ভগবানের কর্ণে আমার সেই করুণ আবেদন পৌঁছিয়াছে।" বলিতে বলিতে জনষ্টনের বদন উজ্জ্বল হইল। প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রদ্বয়ে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

ওঃ, এত দয়া—এত ক্ষমা! কি উচ্চ হৃদয়—কি মহান্! হেলেন কি এই ক্ষুদ্র প্রাণ লইয়া দেবতার অঙ্কবাসিনী হইয়া থাকিবে? না—না, তাহা হইবে না! হেলেন উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে কম্পিত-কণ্ঠে বলিল—"তুমি আমায় ক্ষমা করিলে? না—না, আমি ক্ষমার উপযুক্ত নই। আমাকে দণ্ড দাও—দণ্ড দাও!"

জনষ্টন হেলেনের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল—"হেলী, দুনিয়ার মালিক ভগবান তিনিই আমাদের বিচার কর্ত্তা; তোমার আমার দণ্ড দিবার অধিকার কি? আমরা প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তি আমাদের যে পথে টানিয়া লইয়া যায়, আমরা সেই পথেই যাই। কেহ বা কুপথে যায় কেহ বা সুপথে যায়—তোমার প্রবৃত্তি তোমাকে কুপথে টানিয়া ছিল—কিন্তু তোমার মনে আজ যে ঘৃণা ও ক্ষোভ জন্মিয়াছে—তাহাতেই তোমার দণ্ড হইয়াছে। অনুতাপই ভগবান প্রদত্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" একি মধুর বুলি! হেলেনের কান ভরিয়া গেল, হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল—বদন প্রফুল্ল হইল, কি এক স্বর্গীয় পুণ্যালোক তাহার সমস্ত দেহ বেষ্টন করিল, হেলেন একটী কথাও বলিতে পারিল না—কেবল দুই হস্তে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ছল ছল নেত্রে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

চুপি চুপি উষার স্নিগ্ধ আলোক গবাক্ষ দিয় কক্ষে প্রবেশ করতঃ দম্পতিদ্বয়ের শান্তোজ্জ্বল বদন আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল, পাখীর ডাকে উভয়ে চমকিত হইয়া দেখিল—রাত্র ভোর হইয়া গিয়াছে।

হেলেন বলিল—"দেখ—দেখ—আমার জীবন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে রজনীও প্রভাত হইয়া গিয়াছে।" সহসা এ কি!—"হেলি—হেলি"—এই বলিতে বলিতে স্বাভাবিক দ্রুত-পদে শেলুবী কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! শেলুবী কি দেখিল! রাত্র ভোর হইতে না হইতে ছুটিয়া আসিয়া—কি দৃশ্য দেখিল!! শেলুবী এমন অসময়ে এমন ভাবে ঘরে ঢুকিয়াছে দেখিয়া জনষ্টন কি মনে করি-তেছে? এ যে ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। শেলুবী থত-মত খাইয়া গেল—সহসা তাহার মনে হইল—"হেলী কি জনষ্টনকে সব বলিয়া দিয়াছে?—হায়! হায়! তবে কি হইবে? লজ্জায় ভয়ে অপ্রতিভ শেলুবী অবনত মুখে জড়পদার্থের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। জনষ্টন ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া শেলুবীর হাত জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে বলিল—"শেলুবী, কাল সন্ধার ঘটনা বিস্মিত হও—হৃদয়ের সে মোহান্ধকার দূর করিয়া ফেল—অধর্ম্মের পথে চলিলে এজীবনে

কখনও সুখশান্তি অনুভব করিতে পারিবে না। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পন করিয়া কর্ত্তব্য-পথ পরিষ্কার কর—জীবনকে উজ্জ্বল কর। শেলী আমাকে দেখিয়া ভীত হইতেছ কেন? আজ হইতে তুমি আমার ভাই—বল আর কখনও পাপের স্রোতে গা ঢালিবে না।

একি! স্বর্গ না মর্ত্ত! এত দয়া, এত ক্ষমা, এত সহৃদয়তা, এত শক্তি কি মানুষের আছে? কি এক বৈদ্যুতিক আকর্ষণে শেলুবীর সমস্ত হৃদয় জনষ্টনের হৃদয়ের প্রতি ধাবিত হইল. শেলুবীর হৃদয়ের সকল পাপ-তাপ যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে পলাইয়া গেল—সে যেন মরমে মরিয়া গেল—নীরব-বেদনায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। ব্যথিত অনুতপ্ত শেলুবী জনষ্টনের পা দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া দর দর ধারায় ভক্তির পবিত্র অশ্রুতে বক্ষ ভাসাইয়া উচ্ছসিত-কণ্ঠে বলিল—"জনষ্টন, জনষ্টন—তুমি মানুষ নও দেবতা। কি মোহে আচ্ছন্ন ছিলাম! আজ তুমি আমার অন্ধনয়ন ফুটাইয়া দিয়াছ—কি এক ভ্রমান্ধকারে বিচরণ করিতেছিলাম, তুমি আজ আমার হাত ধরিয়া আলোকে টানিয়া আনিয়াছ—আজ হইতে তুমি আমার দেবতা তুমিই আমার ভগবান।"

জনষ্টন সস্নেহে—শেলুবীকে উঠাইয়া বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন—স্বর্গীয় আলোকে তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল।

ধীরপদে হেলেন অগ্রসর হইয়া শেলুবীর হাত দুটী ধরিয়া বলিল—"শেলুবী—তোমারই জয় হইল—তোমার কথাই বজায় রহিল, তুমি বলিয়াছিলে আজ আমাদের জীবন প্রভাত হইবে,—তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিলেত?

শেলী। না হেলী, শুধু জীবন প্রভাত নয়, আজ আমি নব-জীবন পাইয়াছি।

জনষ্টন হাসিয়া বলিল—"আমার এক অনুরোধ তোমাদের নূতন রকম জীবন প্রভাতের শান্ত-স্নিগ্ধ পবিত্র আলোকে—আর কখনও মোহের কালিমা মিশাইও না।

* * *

স্নেহের তুল্য শাসন ও কার্য্যানুসারে ক্ষমার তুল্য দণ্ড বুঝি আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীনির্ম্মলহাসিনী গুপ্তা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতি

(একতালা)

আনন্দ-বর্দ্ধন, শ্রীশচী-নন্দন, ভক্ত বিনোদন
হরি।
অপার মহিমা, বেদে নাহি সীমা, চরণেতে
তোমা, ধরি॥
জেনেছি হে তুমি ভব কর্ণধার,
কলি জীব গণে করিবে উদ্ধার,
শ্যামরূপ ত্যজি হেম কলেবর—
ধ'রেছে, ছলনা করি'॥
ত্যজে চূড়া বাঁশী ধ'রেছে করঙ্গ,
গোপী-গণ ত্যজে,' কর সাধুসঙ্গ,
নামটী মধুর, ধরেছ গৌরাঙ্গ,
কাহে ঝরে আঁখি তোরি॥

কভু রাধা নামে ভূমেতে লুটতি,
কভু হরিনামে আনন্দ মূরতি,
কভু প্রেমদানে, চাঁদিণী মূরতি,
উঠাও ভকতি লহরী॥
কিঙ্কর কহিছে আওতো গোরা,
তুয়া নাম-পানে মধু মন ভোরা,
একাঙ্গ হ'য়েছ কিশোরী কিশোরা,
ত্রিতাপ পাশরা আমরি॥

শ্রীসত্য কিঙ্কর কাব্যকণ্ঠ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সচিত্র পণ-প্রথা।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। নগেন্দ্রবাবু বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত না হইলেও অপরিচিত নহেন। "বিশ্বদূত" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিয়া তিনি বাঙ্গালার পাঠকগণের নিকট বিশেষ্‌ভাবে পরিচিত। আজ "পণ-প্রথা" লিখিয়া তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সন্দেহ নাই। যে পণ-প্রথার ভীষণ প্রকোপে আজ বঙ্গবাসী ব্যতিব্যস্ত, যাহার ভীষণ অত্যাচারে বঙ্গসমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে; যাহার প্রবল প্রতাপে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার চক্ষের জলে ধরণী সিক্তিত হইতেছে; তাহারই বিষময় ফলের অলন্ত-চিত্র লইয়া নগেন্দ্রনাথ এই "পণ-প্রথার" রচনা করিয়াছেন। লেখা সামগ্রিক এবং তাহাতে অতিরঞ্জিত কিছুমাত্র নাই। যে পণ-প্রথার দারুণ উৎপীড়ন প্রত্যহ নেত্রগোচর করি, ইহাতে সেই সকল বিষয় সরল ও সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যে দুই খানি ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই দুঃখে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। আজ কাল এ পুস্তকের বিশেষ আদর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই পুস্তক ৯৩নং কাল কুণ্ডুর লেন, হাওড়া "বিশ্বদূত" আপিসে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

নির্মীলন।—একখানি কবিতা পুস্তক। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত। চট্টগ্রাম ইম্পিরিয়াল প্রেসে এস, বি, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে লেখা বেশ হইয়াছে, "পত্নী-বিয়োগে স্বামীর মর্ম্মোচ্ছাস" পড়িতে আগ্রহ হয়; এই উচ্ছাসময়ী কবিতা পুস্তকখানি পাঠে অনেকেই সন্তুষ্ট হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা।—শ্রীযুক্ত সরোজাক্ষ চক্রবর্ত্তী বিরচিত, মূল্য ৵৹ আনা। জেলা বীরভূম, পোষ্ট সিউড়ী, গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। বাজারে প্রচলিত যত প্রকার সত্যনারায়ণের ব্রতকথা প্রকাশিত হইয়াছে, এখানি তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। গ্রন্থকার পয়ার ছন্দে বেশ সুখ পাঠ্য করিয়া পুঁথির আকারে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তগণের নিকট ইহার আদর হইলে আমরা সুখী হইব।

সেবক।—মাসিক পত্র, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্ম-সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত। আমরা এক সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। দেখিলাম, পত্রিকাখানি আজ ১৮ বৎসর চলিতেছে কিন্তু আমরা এতাবৎকাল ইহার দর্শন পাই নাই। এই

সংখ্যা পাঠে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ইহার পরিচালনা কার্য্য বেশ সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

শান্তি।—শ্রীশচীপতি চট্টোপাধ্যায় ও বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত একখানি মাসিক পত্র। প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি। পত্রিকাখানির অঙ্গসৌষ্ঠব, ছবি ও ছাপা বেশ সুন্দর, প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক এবং সুলিখিত, অনেক কৃতবিদ্য লেখক "শান্তির" জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তাই আশা হয়, ইহা ভাল হইলেও হইতে পারে। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহাদের সাফল্য কামনা করি।

গম্ভীরা।—কলিগ্রাম, মালদহ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার দ্বারা প্রকাশিত একখানি ত্রৈমাসিক পত্র। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র সডাক ১৲ মাত্র। এই পত্রিকার আমরা দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাখানির ছবি ছাপা ও কাগজ সুন্দর, সহর ও মফঃস্বলের অনেক লেখক ইহার সেবায় নিযুক্ত; দুই সংখ্যা পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে আশা করা যায়—পত্রিকাখানির দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবে। কারণ পত্রিকার উপরেই দেখিতে পাইলাম "ত্যাগবলং পরং বলম্" ইহাই যদি পরিচালকবর্গের হৃদয়ের কথা হয়, তাহা হইলে কাজ হইবে না কেন? আমরা ভগবানের নিকট ইহার উন্নতি ও দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

ব্রাহ্মণের দুর্গতি ও তাহার প্রতিকার উপায়।—শ্রীযুক্ত রাজ শশিশেখরেশ্বর রায় প্রণীত সুচিন্তিত প্রবন্ধ মূল্য যথাসম্ভব সুলভ, এক আনা মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পাঠোপযোগী এই পুস্তকখানির প্রচার আমরা কামনা করি। মহামণ্ডলের জনৈক সভ্যের লিখিত এবং 'ত্রিশূল' পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত "অপ্রিয় প্রশ্নাবলী" ও উল্লেখ যোগ্য এবং বিতরণোপযোগী।

প্রেমের ডালি।—নামধেয় একখানি ভক্তিগ্রন্থ উপহার পাইয়াছি। ইহা নারায়ণ পূজার চন্দন তুলসী ও অপরাজিতার মিশ্রণে একখানি মনোহর পুষ্পপাত্র। ইহাতে কয়েকটী ভাবময় পদ্য ও হৃদয়ময় গদ্য আছে। লেখক শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে নামক একজন ভক্ত। তাঁহার হৃদয়-নিসৃত প্রেমরস, পুস্তকের প্রতি ছত্র আর্দ্র করিয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে হৃদয় গলিয়া যায় ও নয়ন ভক্তিনীরে ভাসিতে থাকে। তাপদগ্ধ সংসারের উষ্ণশ্বাসের মধ্যে ভক্ত লেখক শক্তির নিলয় "রাঙ্গা পা দুখানি" ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি 'মনের মানুষ' খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাই তিনি প্রীতি-বিগলিত-হৃদয়ে জীবনসর্ব্বস্বকে ডাকিতেছেন ও আদর করিয়া বলিতেছেন—"এস হে নিভৃতে, হৃদয়-আবাসে রাখি, করি সফল জীবন হে।" যে হৃদয়ে এমন প্রেম-ভাব, সে হৃদয় স্বর্গের নন্দনকানন এবং সেই কাননের ফুলের ডালি, এই 'প্রেমের ডালি' যেস্থানে পৌঁছিবে, সেই স্থান প্রেম-মকরন্দে আমোদিত হইবে। সকল ভক্তের এরূপ একখানি ভক্তিগ্রন্থ নিকটে রাখা উচিত। পুস্তকখানি দেখিতে মনোরম। মূল্য ।৵০ আট আনা। ঠিকানা—শ্রীরসিকলাল দে, তৃতীয় শিক্ষক সোনামুখী, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, পোঃ সোনামুখী, (জেলা বাঁকুড়া।)

হিন্দুস্থানের বৈষ্ণব-কবি।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ঘোর আন্দোলন হয়, সেই সময় সাধক রামানুজ বেদান্ত-দর্শন হইতে বিষ্ণু আরাধনার মত প্রবর্ত্তিত করিয়া লোক-শিক্ষার্থ ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করেন,—এবং রামানন্দ, কবীর প্রভৃতি তৎপরবর্ত্তী সাধকগণ দেশে দেশে এই ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিয়া যখন ঘোর ধর্ম্ম-বিপ্লব বাঁধাইতেছিলেন—তখন হিন্দি-সাহিত্যেরও ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল। রামানন্দ ও কবীর-সম্বন্ধে গ্রীয়ার্সন বলেন ঃ—

"Râmananda the populariser of the worship of Rama flourished about the year 1400 A D and even greater than he was his famous disciple Kabir, who succeeded in founding a still existing sect, which united the salient points of Hinduism and Mahomedanism. Here we first touch upon that catholicity of sentiment of which the key-note was struck by Ramananda, which is visible in the doctrines of all his successors and which reached its truest height in the hands of Tulsidas two centuries later. The worship of the deified prince of Oudh and the loving adoration of Sita, the perfect wife and the perfect mother have developed naturally into a doctrine of electicism in its best form"

ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে রামানন্দের ভক্তিরসাত্মক গীতগুলি কিরূপ মর্ম্ম-স্পর্শী ও ভাবব্যঞ্জক। রামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে ভবানন্দ,—"অমৃতধার" নামক বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা প্রচারিত করেন এবং ক্ষৌরকার বংশীয় সেন-কবি বিবিধ ভক্তিরসাত্মক গীতাদি প্রচার করেন।

রামানন্দের প্রিয়শিষ্য মহাকবি কবীর হিন্দি সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনেক মণিরত্ন উপঢৌকন দিয়াছেন। তাঁহার অনেক পদাবলী হিন্দি-প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। কবীরের জীবনী অতি অদ্ভুত। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, জনৈক ব্রাহ্মণ-বিধবার গর্ভে কবীরের জন্ম হয়, লোকাপবাদের ভয়ে ঐ ব্রাহ্মণ-বিধবা নবজাত শিশুকে পথিপার্শ্বস্থ একটী পুষ্করিণীতে প্রস্ফুটিত পদ্মপর্ণের উপর রাখিয়া যায়; ঘটনাক্রমে নীমা নাম্নী জনৈক মুসলমান তন্তুবায়পত্নী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল, প্রস্ফুটিত শতদলোপরি নবজাত শিশুর লাবণ্য দেখিয়া যবনীর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয় ও পরে তাহারই যত্নে কবীর পালিত হন। কেহ কেহ বলেন কবীর ১১৪৯

খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ তিন শত বর্ষ জীবিত ছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণের মুখে এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়।

উইলসন্ সাহেব তদীয় "Religious sects of the Hindus" নামক প্রসিদ্ধগ্রন্থে "খাসগ্রন্থ শীর্ষক" কবীরের ২১ খানি গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন। স্থানাভাবে পুস্তকগুলির বিবরণ বিবৃত করিতে অশক্ত হইলাম। তবে ইহা বলাই বাহুল্য যে অপূর্ব্ব সাধন-বলে যিনি তিন শত বর্ষ জীবিত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে, তাঁহা-দ্বারা সাহিত্যের প্রভূত মঙ্গল সাধন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কবীরের পর ভগোদাসের "বিজক" ও শ্রুতগোপালের "শুকনিদান" প্রকাশিত হয়, এদিকে কবীরের পুত্র কমলকবি পিতার বচনের প্রতিবাদ করিয়া পদ-রচনা করিতেন। উপযুক্ত পিতার এই অনুপযুক্ত পুত্রের অবৈধ আচরণের জন্য হিন্দিতে "বুরাবংশ কবীর কে কী উপজা পুত কমাল" বলিয়া একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।

এইবার কবীর ও রামানন্দের শিষ্যগণের নিকট বিদায় লইয়া হিন্দুস্থানের পূর্ব্বপ্রান্তে যে সকল বৈষ্ণব-কবিগণ সমস্বরে বিষ্ণুস্তোত্র গান করিতেছিলেন,—ভক্তিরসে শ্রোতৃবর্গের মন প্রাণ বিমোহন করিতেছিলেন,—বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অদ্যাবধি যে ভাবের ভোরে বিহ্বল হইয়া আছেন—সেই ভক্তগণের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাকবি বিদ্যাপতি-ঠাকুর ইঁহাদিগের অন্যতম। এই বিদ্যাপতিকে লইয়াই মহাগোলযোগে পড়িতে হইয়াছে; একদিকে হিন্দিকবিগণ তাঁহার এক হস্ত ধরিয়াছেন, অপর দিকে বঙ্গবাসিগণ তাঁহার অপর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। উভয় দলের জাতীয় সাহিত্যে বিদ্যাপতিকে ধরিয়া রাখিবার দৃশ্য বড়ই মনোহর, বাঙ্গালা ও হিন্দি সাহিত্যের ইহাই সঙ্গমস্থল; এই দুই জাতীয় সাহিত্যে ইহাই পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ-ক্ষেত্র, ও বাঙ্গালা ভাষার ইহাই সাগর-সঙ্গম।

'পুরুষ-পরীক্ষা' 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের জন্য হিন্দি-সাহিত্যে বিদ্যাপতির প্রাধান্য নহে—তাহার অনন্ত প্রভাব সেই মন-প্রাণ-বিমোহনকারী 'মৈথিল-পদাবলীর' জন্য। স্বর্গের সুধা ভুবনে নাই বটে, অপ্সরাগণের মধুর কণ্ঠ-ধ্বনি মর-জগতের জীব কখনও শুনিতে পায় না বটে; কিন্তু বিদ্যাপতির-বাঁশরী-নিঃসৃত মধুর রব বুঝি ইহাদেরও অভাব মোচন করিয়াছে। তাঁহার পদাবলী—"লাখ-লাখ যুগ শ্রবণে শুনলুঁ তথাপি না জুড়ন গেল," তাহার আর নূতন্ পরিচয় অনাবশ্যক। তবে বঙ্গদেশে তাঁহার যেরূপ সমাদর,হিন্দি-সাহিত্যেও তাঁহার ততোধিক প্রভাব দেখিতে পাই। আত্মার সহিত ঈশ্বর-সম্বন্ধ, রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-রূপকে—এই হিন্দি কবি ভিন্ন হিন্দুস্থানে আর কোন কবি ফুটাইতে কৃতকার্য্য হন নাই। বাস্তবিক বঙ্গের চণ্ডীদাস ও তৎসমসাময়িক মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি বাঙ্গালা ও হিন্দি-ভাষায় গীতি-কবিতার অধ্যক্ষ-স্বরূপ।

হিন্দুস্থানে ধর্ম্মপ্রচারকালে বিদ্যাপতির পদাবলী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব কর্ত্তৃক গীত

হইত। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, সম্রাট্ আকবর বিদ্যাপতির আশ্রয়দাতা মহারাজ শিবসিংহকে বন্দী করেন। বিদ্যাপতি আশ্রয়দাতার উদ্ধার-মানসে আকবরের সম্মুখে জনৈকা নগ্ন-বালিকার অবগাহন-প্রথা বর্ণনা করিয়া এরূপ একটী ললিত কবিতা আবৃত্তি করেন যে, সম্রাট্ তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, রাজা শিবসিংহকে তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত করেন।

বিদ্যাপতির সমসাময়িক আরও দুই জন মৈথিল-কবি রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে হিন্দি-সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের নাম 'উমাপতি' ও 'জৈদেব'; এই 'জৈদেব' ও বঙ্গীয়-কবি 'জয়দেব' স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

বিদ্যাপতির সহচরবৃন্দ ও অন্যান্য বৈষ্ণব-কবিগণের বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতীব দীর্ঘ হইয়া যায়, সুতরাং আমরা কৃষ্ণগত-প্রাণা বিদুষী রাজবালা মীরা-বাইর নাম উল্লেখ করিলাম মাত্র।

"মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা"—এই মর্ম্মের মূলমন্ত্রে তাঁহার দোঁহাবলী রচিত হইয়াছে; ইহা কেবল হিন্দুস্থানে নহে, বঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মীরা জয়দেবের গীতগোবিন্দেরও একখানি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

নানকপন্থী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রন্থ-প্রণেতা, 'নানক' এই বৈষ্ণব-কবি-সম্প্রদায়ের শেষ কবি। নানকের শিষ্য ও অনুচরবর্গ নিতান্ত অল্প নহে। ইহাঁরা সকলেই আপন সম্প্রদায়ের অনুযায়ী ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। ফলতঃ সকলেই অনুকরণপ্রিয় ছিলেন। এই সকল কবিদের মধ্যে মৌলিকতা অতি অল্পমাত্রায় বিরাজ করিত। তাই নানক ও তদীয় শিষ্যবর্গের নাম উল্লেখ করিয়া আমরা বৈষ্ণব কবি-সম্প্রদায়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন :—

নিতাই পদ কমল, কোটী চন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইএর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জনম হল তার,
কি করিবে বিদ্যাকুলে তার।
মজিয়া সংসার সুখে, নিতাই না বলিল মুখে,
সে পাপী অধম সবার॥
অহংকারে মত্ত হইয়া, নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যকে সত্য করি মানে।
এ ভব সংসার মাঝে, নিতাই চাঁদ যেনা ভজে,
তার জন্ম হইল অকারণে॥
নিতাইয়ে দয়া হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখি রাঙ্গা চরণের পাশ॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলায়, ব্রজমধ্যে যিনি শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ হইয়া শ্রীবলরাম নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং যিনি শ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার অগ্রজ হইয়া

রূপান্তরে শ্রীশচীমাতার গর্ভ-সমুদ্র হইতে শ্রীবিশ্বরূপ নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, পিতা হাড়াই-পণ্ডিত এবং মাতা পদ্মাবতীর নন্দন সেই নিত্যানন্দ চন্দ্রকে আমি ভজনা করি। কবি 'কর্ণপুর-গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়' স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যিনি বলরাম, তিনিই নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

যিনি স্বয়ং প্রথম—ভক্তরূপে, দ্বিতীয়—ভক্ত-স্বরূপে, তৃতীয়—ভক্তাবতাররূপে, চতুর্থ—ভক্তার্থ-স্বরূপে, পঞ্চ—ভক্তশক্তিরূপে; এই প্রকারে পঞ্চত্ব-স্বরূপ হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর পদে এই পদের সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন যে, (১) ভক্তরূপ শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রই অভিহিত হইয়াছেন, যেহেতু এই গৌরচন্দ্রই নন্দ নন্দন। আর (২) ভক্তস্বরূপ শব্দে শ্রীনিত্যানন্দ অভিহিত হইয়াছেন, যিনি ব্রজে বলরাম নামে অভিহিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আর (৩) ভক্তাবতার শব্দে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য অভিহিত হইয়াছেন, কারণ তিনি অপ্রকট ধামে শ্রীসদাশিব। আর (৪) ভক্তার্থ শব্দে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তগণ অভিহিত হইয়াছেন, যেহেতু ইঁহারাই নিত্য শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তরূপ। আর (৫) ভক্ত-শক্তি শব্দে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শ্রীগদাধর পণ্ডিত অভিহিত হইয়াছেন, যেহেতু এই গদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধার দ্বিতীয়-মূর্ত্তি।

সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠস্থ শ্রীকৃষ্ণ ব্যূহগণ মধ্যে যিনি মহা সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত এবং প্রপঞ্চলীলাতে যিনি কারণ সমুদ্রশায়ী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু ও গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মার অন্তর্যামি অবতারগণের মূলভূত দ্বিতীয় পুরুষ প্রদ্যুম্ন ও ক্ষীরাব্ধিশায়ী ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী তৃতীয় পুরুষ অনিরুদ্ধ এবং শেষ অর্থাৎ অনন্ত-দেব। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাঁহার অংশ, ও কেহ কেহ যাঁহার কলা অর্থাৎ অংশাংশ, সেই নিত্যানন্দ-সূচক বলরাম, আমার আশ্রয় হউন, এবং শ্রীবলরাম যে শচীগর্ভ হইতে বিশ্বরূপ নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং পদ্মাবতী গর্ভ হইতে নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাও 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা' হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

অংশ ও অংশীর অভিন্নতা নিবন্ধন আদ্য-ব্যূহ বাসুদেবই শচীনন্দন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন আর দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণই প্রকাশভেদে বলরাম ও বিশ্বরূপ ও নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'গৌরচন্দ্রোদয়' নাটকে ধর্ম্মের প্রতি কলি বলিয়াছেন,—"এই গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপই বলদেব।" এই বিশ্বরূপ দারপরিগ্রহ না করিয়া মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পূর্ব্বেই সন্ন্যাস করিয়া শ্রীক্ষেত্রে (পুরীতে) জগন্নাথদেবে নিজতেজ প্রবেশ করাইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন; আর এই জগৎ মধ্যে নিত্যানন্দ নামে যে সন্ন্যাসী, তিনিই সঙ্কর্ষণ-তেজ অর্থাৎ বলদেবই নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব শ্রীবলরাম যে নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বেদ-প্রমাণ-সূচক।

প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বৎসর হইল যখন এই কলিযুগে নিত্যানন্দ বিহার করেন, তখন তিনি প্রেমদাতা উপাধিতে ভূষিত। চলিত গ্রাম্য গীতেও আছে যে :—

"সুরধ্বনি তীরে হরি বলে কে ?
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নৈলে, কে পারে এমন, নাম
বিলাতে।
এ জগতের মাঝে।"

জনসাধারণের মধ্যে নিতাই নিম্নলিখিত ধরণের গান লইয়া প্রচার করিতেন যে ঃ—

১। "সদা হরি হরি হরি বলে ডাক্‌রে রসনা।
যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে,
যাবে যম-যন্ত্রণা।
২। আপন আপন কারে রে বল,
এসেছি যে ভবের হাটে মিছে দিন গেল ঃ
ও ভাই মোহমায়ায় মুগ্ধ হয়ে,
মিছে খেলা আর খেলো না।
৩। শমন এসে বাঁধবেরে যখন,
কোথায় রবে ঘর দরজা,
কোথায় রবে ধন,
তখন বন্ধুজনে বিদায় দিবে,
সঙ্গের সাথি কেউ হবে না।"

নিত্যানন্দের আহ্বানে অনেকের হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গেল, এমন কি অনেকেই গাইতে লাগিলেন যে ঃ—

১। শ্রীমধুসূদন, বিপদ-ভঞ্জন, কৃপা কর নাথ,
এ ভব দুস্তরে।
আর নাহি হে উপায়, ওহে দয়াময়,
দয়া করে প্রভু, রাখহে কাতরে।
২। কি বলিব মন দুঃখেরি কাহিনী,
সবইতো জান ওহে অন্তর্যামী
চিন্তানলে জলি দিবস-রজনী,
না পাইলাম সুখ এ ভব-সংসারে।
৩। সংসারের সুখ অর্থ উপার্জ্জন,
অনেক তাহাতো করিয়াছ দান,
দিবানিশি তুমি, আপ্ত-পরিজন,
বৃথা কাটে কাল, হের এ দাসেরে।
৪। বন্ধু বান্ধব দিলে তবু যে প্রবাসী,
বার বার আসি যাই আর আসি,
গৃহস্থ করিলে, করহে উদাসী,
তোমা বিনা দুঃখ জানাব কাহারে।
৫। সুপ্রসন্ন হও ওহে গুণনিধি,
অভাগার কষ্টেরি নাহিক অবধি,
দয়াময় তুমি দয়া কর যদি,
নিরবধি তাই ডাকিহে তোমারে॥

আর একস্থলে নিতাই উপদেশ দিতে লাগিলেন, যথাঃ—(গীত)

১। জীবরে এমন মানব-জনম পেয়ে তোমার
ভ্রম গেল না।
তোমার নহে যাহা, তুমি তাহা,
সদা কর কল্পনা।
(আমার বলে সদা কর কল্পনা)
২। আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার,
আমার দেহ ধন জন, আমার এ সংসার ;
যদি আমার হৈত, সঙ্গে যেতে,
সঙ্গে তো কিছু যায় না ;
(যখন আমি যাই, তখন, সঙ্গেতো কিছু যায় না)
৩। সুখ ব'লে যা কর বাসনা,
সেই সুখের মাঝে, রহিয়াছে, দুঃখ যন্ত্রণা ;
তবু সুখের আশে, সংসার-পাশে,
বদ্ধ আপনা আপনি ;
(একি বিষম ভ্রম, বদ্ধ আপনি আপনা)
৪। অসার সংসারে শান্তি মাত্র নাই,

দেখে শুনে তবু কর্ম্ম সূত্রেতে জড়াই ;
আমার ইচ্ছা সুখ, পাই যে দুঃখ,
মরি কি বিড়ম্বনা।
(কে এমন ঘটায়, মরি কি বিড়ম্বনা)

৫। নিতাই বলে আপন ইচ্ছায়,
সুখ হৈলে তবে দুঃখ, কে কোথা শেখায় ;
দেখ, ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে,
কর তাহার ভাবনা ;
(সুখ দুঃখ দুরে যাবে, কর তাহার ভাবনা)
(এমন মানব-জনম পেয়ে, কর তাঁহার ভাবনা)॥"

সকলেই, আপনার সাধারণ, সকলেই মন খুলিয়া নিতাইএর সহিত সুর ধরিলেন এবং গাইতে লাগিলেন যথা ঃ—

১। আমার দয়াল গৌর নিতাই,
পরম দযাল অদ্বৈত গোঁসাই।

২। প্রেমের প্রতিমা, কি দিব উপমা,
কোন যুগে হয় নাই ;
(ওযে সেধে কেঁদে ভক্তিদান,কোন যুগে হয় নাই)

৩। ওরে জীবের দশা দেখে, বারি ঝরে চক্ষে,
আচণ্ডাল যারে তারে বলে ডেকে,
এই ধর নেরে ভক্তি সুধা, (জীবরে)
যাবে ভবের ক্ষুধা,
হরি নামের মহিমা গাই।
(তোরা আয়রে সবাই, ও ভাই কলির জীব,
তোরা আয়রে সবাই, হরিনামের মহিমা গাই)

৪। ও ভাই নামে রুচি, জীবে দয়া কর সদা,
দুরে যাবে মনের ভ্রম আত্মদ্বিধা,
পাবে প্রেম ভক্তি সুধা, এ কথার অন্যথা,
কখন হবে না হয় নাই।

৫। তৃণ হতে লঘু আপনারে জান,
ছাড়রে বিষয়ের দম্ভ অভিমান,
তোমার ভব রোগ যাবে, (জীবরে)
জ্ঞান ভক্তি পাবে,
তোদের নিতাই বলে তাই।
অক্রোধ নিতাই বলে তাই।
পরমানন্দ নিতাই বলে তাই।
অক্রোধ পরমানন্দ, নিত্যানন্দ রায়
বলে তাই।"
নিতাই হরি প্রেমে মত্ত হৈয়ে, বলে তাই॥"

চতুর্দ্দিকে রব উঠিল ঃ—(বন্দনা গীত)
"ধর, লও সে কিশোরির প্রেম, নিতাই
ডাকে আয়।
এ প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায় ;
প্রেমে দুকুল ভেসে ঢেউ লেগেছে,
গোরাচাঁদের গায়।

নিতাইএর এক মাত্র কাজ জীবকে অভয় দেওয়া, তাইরে সেই পাপীর পরিত্রাতা, তাপীর শান্তিদাতা, যমের যম সেই তিনি, আমার দাদা দয়াল গৌরহরি এসেছেন, আর তোদের কোন ভয় নাই, যমে পর্য্যন্ত ছুঁতে পারবে না, তিনি যে যমের যম, এদিকে জীবের লাগিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া হরিনাম বিলাইতেছেন। নিতাইর কেবলই বুলি ঃ—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সেই আমার প্রাণ॥"

কেবল এই বুলি,আর আচণ্ডালকে গৌরনাম ও গৌরপ্রেম বিতরণ। ইহাতেও যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ না করিল, তাদের নিকট কত অণুনয় বিনয়, দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া নিবেদন

করেন যে, ভাই আমায় ঋণমুক্ত কর, গৌর নাম গ্রহণ করিয়া আমাকে কিনিয়া লও। যথাঃ—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়।
নাম যে না লয়, তারে বলে দণ্ডে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর হরি॥"

যদি ইহাতেও কেহ নাম না লইল, তবে নিতাই সেই নরাধমের সম্মুখে বৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণার ন্যায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমে তাহার হৃদয়ে ভক্তি-সঞ্চার করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন তাহার মন নির্ম্মল হইল, প্রেমের উদয় হইল, প্রাণ কাঁদিল আর নাম না লইয়া থাকিতে পারিল না, আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি না দিয়া থাকিতে পারিল না। তখন নিতাইয়ের উদ্দাম নৃত্য, জোড়ে জোড়ে, ধাপে ধাপে লম্ফ ও নৃত্য এবং চিৎকার যে দাদা এসেছেন, এবার পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু কেহই বাদ পড়িবে না, সকলেই উদ্ধার হবে। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে অধিবাসি-বৃন্দকে গৌর-নামে ও গৌর-প্রেমে ভজাইতে লাগিলেন। জগৎ-গুরু নিতাই এই প্রকারে আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিতাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ পাইতে হইলে নিতাই চাঁদ তাহার ভাণ্ডারী। নিতাই জড়বস্তুর ন্যায় প্রেম বিলাইবার ক্ষমতা রাখেন। দৃঢ়তা সহকারে নিতাইচাঁদকে ধরিলে, তিনি ছাড়াইতে পারিবেন না; অতএব নিতাই অনুগত হও। গৌর নিতাইয়ের দয়া হবে, রাধা গোবিন্দের দয়া হবে। নিতাই প্রেম-রাজ্যের গুরু, তিনি ছাড়া, কলির জীবের অন্য সহজ উপায় নাই।

"ওরে এক ধরিলে দুই ধরা যায়, এক ছাড়া দুই নয়রে।
নিত্যানন্দ বিনে কে চৈতন্য দিতে পারে এ মায়া ঘোরে!
আবার দুইকে মিলায়ে দেয় অদ্বৈত দয়া করে।
চৈতন্য পাবিরে অদ্বৈত চিন্তা করে, ওরে নিত্যানন্দে ধরে।
ওরে এক ধরিলে তিন যে মিলে, এক ছাড়া তিন নয়রে॥"

নিতাইএর কেবল একই বুলি, বলেন :—

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গ চাঁদ, সেই আমার প্রাণ।
গৌরাঙ্গ ভজিয়ে তোমরা, আমায় কিনে লওরে;
যে চাঁদ গৌরাঙ্গ ভজে, তার বিপদ যায়রে।
দয়াল গৌরাঙ্গ বিনা, আর গতি নাইরে।
নাম লৈলে প্রেম হয়, বহে অশ্রুধারে॥"

অক্রোধ পরমানন্দ, নিত্যানন্দ রায় প্রেমে জগত ভাসাতে লাগ্‌লেন, আচণ্ডালে কেবল (হরিনাম অন্তরে) দিতে লাগলেন। যা কোন-যুগে হয় নাই, হবার নয়। লোকের মনে একই ভাব এবং শ্রীভগবানের তরে প্রার্থনা সুরু হলো, প্রার্থনার রোল উঠ্‌লো, যথা :—

১। "আমায় কাঙ্গাল বলে দয়া কর হে ভবকাণ্ডারী।
তুমি অধমতারণ, নিলাম শরণ, দেও হে চরণতরি।
২। আমার প্রাণের ব্যথা, মনের সকল কথা।

তুমি হৃদয় মাঝে থেকে জান, হৃদয়-বিহারী।
৩। আমি এ সংসারে, পড়ে অন্ধকারে,
প্রভু দেখিতে না পাই তোমারে কি করি, কি করি।
৪। আমি দীন হীন, তুমি সকল জান,
আমি আর কিছু ধন চাই না. তোমার প্রেমের ভিখারী, কেবল প্রেমের ভিখারী!
৫। যাবে সকল দুঃখ, তোমার প্রেমমুখ,
আমি দিবানিশি অনিমেষে দেখবো নয়ন ভরি॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দের ন্যায় এমন পতিতপাবন দয়াল ঠাকুর আর নাই, তাই প্রবাদ যে,—

"এমন দয়ার সিন্ধু. পতিত জনার বন্ধু,
ত্রিভুবনে আর দেখি নাই।
অবধূত বেশে ফিরি, জীবে দিল নাম "হরি",
হাঁসে কাঁদে, নাচে ফেরে ভাই॥"

কলি-জীবের সর্ব্বসন্তাপহারী পরম করুণাময় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা না হ'লে বা না পেলে ভগবান গৌরাঙ্গ ভজনের অধিকারী হওয়া অসম্ভব। নিতাইয়ের কৃপা ব্যতীত গৌরতত্ত্ব কিম্বা গৌরহরি কি বস্তু, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কাহারও সাধ্য নহে এবং এক সঙ্গে নিত্যানন্দ ব্যতিত গৌরতত্ত্ব বা নবদ্বীপ-রস বুঝাইবার বা দান করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। তাই মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

"জীবেরে সদয় হয়ে. হরিনাম লওয়াও গিয়ে,
যাও নিতাই সুরধনী তীরে॥
প্রভু কহে নিত্যানন্দ, জীব সব হল অন্ধ,
কেহ তো না লইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে, নয়নে দেখিবে যারে,
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥
কত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ড আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়,
মুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি, বালক-পুরুষ-নারী,
খণ্ডাইও সবাকার দুঃখ॥"

ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, জীবের দুঃখ নিবারক নিত্যানন্দ, অক্রোধ পরমানন্দ রায়। অতএব অন্যকে না ভজিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য-সমাপনকর্ত্তা নিত্যানন্দকে আগে ভজা চাই। নিত্যানন্দের কৃপাতে গৌরতত্ত্ব যে অনায়াসে লাভ হয় ও হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এমন কি, নিতাইচাঁদের আশ্রয় লইলে বা পাইলে, বিনা সাধনাতেও সেই আরাধনার ধন গোরাচাঁদের দয়া হয়। এবং তাঁহাকেও করতলস্থ করিতে পারা যায়, একথাও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কারণ :—

"নিত্যানন্দ প্রসাদে, সে সকল সংসার।
অদ্যাপিও হয়ে, শ্রীচৈতন্য অবতার॥"

আবার :—

"সংসারের পার হইয়া, ভক্তির-সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক, নিতাইচাঁদেরে॥"

এই কারণেই মহাপ্রভু 'গম্ভীরা' প্রবেশের পূর্ব্বে কলি-জীব উদ্ধারের জন্য বহু চিন্তার পর নিভৃতে নিতাইকে আহ্বান করতঃ বলিয়াছিলেন,—"ভাই! আমার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদি-

তেছে। কারণ,জীব সব অন্ধ হইয়াছে দেখিয়া জীবকে হরিনাম দিয়া উদ্ধার করিতেছিলাম; কিন্তু ভাই, আর আমার দ্বারা জীব উদ্ধার হইল না, কেন না, এখন আমিই কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসিয়া যাইতেছি। আমি জীবগণের নিকট ঋণী, সেই দায়ে বিকাইয়া যাইতেছি। আমার যাহা সম্বল ছিল, তাহা আর নাই—ফুরাইয়াছে। তোমা ছাড়া আমার ব্যথার ব্যথী আর কেহই নাই, তাই আমার হৃদয়ের ব্যথা তোমাকে বলিতেছি। ভাই, জীব উদ্ধার ক'রে আমায় ঋণমুক্ত কর। আমার এই অনুরোধ যে, তুমি সত্বর গৌড়ে গমন করতঃ মূর্খ জ্ঞানী.ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবা, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পাপী তাপী. রোগী শোকী, ভাল মন্দ সকলকেই প্রেম-ভক্তি দানে উদ্ধার কর। ভাই, তুমি যে প্রেম-ভক্তি রস দাতা; তুমি প্রেমভক্তি না দিলে কলির জীবকে কে প্রেম ভক্তি দিবে? তুমি যে জগৎ-গুরু! যাও, গৌড়দেশ রক্ষা কর, উদ্ধার কর, আমার বাসনা পূর্ণ কর ও আমায় ঋণমুক্ত কর। মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধর্য্য করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ গৌড়ে গমন করতঃ মুনি-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম-রূপ হল স্কন্ধে ধারণ করিলেন। নিজে সংসার-বন্ধনে বন্দী হইয়া, কলি-জীবের চিত্তের অন্ধকার, জ্ঞান ও প্রেম/-লোকের দ্বারা নাশ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণ-প্রেম দিয়া নাচাইয়া গাওয়াইয়া খাঁটি সোণা করিতে লাগিলেন; পোড়াইয়া খাদ উড়াইয়া দিয়া সোণাকে বিশুদ্ধ করে কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কঠিন ব্রত, পুজা,জপ,তপে নিযুক্ত না করাইয়া,নাচিয়া-গাইয়া বিশুদ্ধ সোণা করিতে লাগিলেন, যাহা অসম্ভব. তাহা সম্ভব করিলেন। ধন্য নিতাইপ্রভুর দয়া! তাঁহারে নিত্যানন্দের প্রীতে একবার হরি হরি বল।

অতএব, ভ্রাতৃগণ যদি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে পাইতে চাও, তাহা হইলে দয়াল নিতাইয়ের আশ্রয় গ্রহণ কর; যদি গৌরতত্ত্ব বুঝিতে চাও বা জগতকে বুঝাইতে চাও, তবে নিত্যানন্দের শরণ লও। আর যদি নিতাই ছাড়া গৌরাঙ্গ ভজতে চাও, একেবারে আকাশের চাঁদ ধরিতে যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পা ভাঙিবে, পিছলে পড়বে. অথচ ধ্যেয় বস্তুও পাইবে না। অর্থাৎ সকল আশা বিফল হইবে। কার্য্য সিদ্ধি হবে না. অথচ নিজের সর্ব্বনাশ হইবে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে যে,—

"প্রভু বলে এই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা, সে করয়ে মোরে॥
ইহার চরণ—ব্রহ্ম, শিবের বন্দিত।
অতএব ইহারে করহ সবে প্রীত॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে,—

"দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মানিলে তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥"

যে কৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত, যে কৃষ্ণানুরাগ গোপীগণের নিজস্ব সম্পত্তি, যে কৃষ্ণপ্রেম লাভার্থে শিব শ্মশানবাসী, যে কৃষ্ণপ্রেম লাভার্থে নারদমুনি সর্ব্বদাই বীণাযন্ত্রে কৃষ্ণগুণ গান করেন, সেই দেবদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম আমার দয়াল নিতাই পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া ঘরে ঘরে, যারে তারে, অযাচিতভাবে বিতরণ করিয়াছেন ও অদ্যাপিও করিতেছেন। মহাপ্রভু

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন ঃ—"প্রেম তো বৈভব নয়, অবৈভব ধন। জীবে কি সম্ভবে, সনাতন।" এমন দেবদুর্লভ জিনিস আমার দয়াল নিতাই মুক্তচিত্তে অযাচিত ভাবে যারে তারে বিতরণ করিতেন।

"প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়।"

ভাইরে। যে নিতাইয়ের সুশীতল পদ-কমল-ছায়ায় জগৎ জুড়ায়, যে নিতাই ভিন্ন আর কেহ রাধাকৃষ্ণ দিতে পারে না, যে নিতাই প্রেমের বন্যা লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ দেশ ভাসাইয়াছিলেন, যে নিতাই প্রতি ঘরে ঘরে প্রেমামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন, সেই নিতাইয়ের শ্রীচরণ দৃঢ় করিয়া ধারণ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

"লোচন বলে আমার নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল জ্বালিয়া দিব তার মাঝ মুখখানে॥"

ভাইরে। আমার নিতাইয়ের মত আর কে দয়াল আছে, জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিত-ভাবে কে গৌর-নাম বিতরণ করিয়াছিলেন, কে বলিয়াছেন—"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম। যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ সেই আমার প্রাণ।" মার খেয়েও কে প্রেম বিতরণ করেছিলেন, জগাই মাধাইকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"মেরেছিস্ কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।"

"মারিলি কলসির কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি।
মেরেছিস্ কলসির কানা তাতে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরি নাম মুখে বল ভাই॥"

কে বলেছিলেন —

কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃতি।
সব দিনু মাধাইয়েরে, শুনহ নিশ্চিতি॥"

কে বলিয়াছিলেন—

"আমারে চিনিয়া লহ, বল গৌরহরি।"

কে বলিয়া বেড়াইত—

"তোরা আয়রে পুরবাসীগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।
তোদের গোলকধামে লয়ে যেতে, এসেছেন পতিত-পাবন।
ও ভাই, ভবের মেলায়, ধুলা খেলায়, হারাসনে জীবন রতন।
তোদের পাপ তাপ সব দূরে যাবে, সফল হবে জীবন।
তোদের কাঙ্গাল হেরি, রইতে নারি, এসেছেন কাঙ্গাল-শরণ।
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছেন, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে ভক্তিভরে, পূজি তাঁর অভয় চরণ॥"

কে মুনি-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আত্মোৎসর্গ করতঃ প্রেম-বন্যায় সকল জগৎ ভাসাইয়াছিলেন? অতএব সেই পতিতপাবন, অধমতারণ, সর্ব্ব সন্তাপহারী, শ্রীগৌরহরির অভিন্ন কলেবর শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শরণাগত হও, যাহাতে ত্রিতাপ-জ্বালা হইতে জুড়াইয়া, উদ্ধার হইবে, আর তোমাকে সংসারের তাপে দগ্ধ হইতে হইবে না, তাঁহার চরণের শীতল ছায়াতে ত্রিপাপ দূর হইবে এবং তোমার চিরমঙ্গল সাধিত হইবে। বল ভাই ঃ—

ভাবের গোরা আমার শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ।

(ওরে) শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ আমার শ্রীনিত্যানন্দ
চাঁদ।
একবার বল ভাই, নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অদ্বৈত
সাধা।
ওরে হরি গুরু বৈষ্ণব, ভাগবৎ গীতা,
বোল হরিবোল, হরি হরি বোল, বোল হরি
বোল।

শ্রীআনন্দগোপাল সেন।

নির্ম্মলা।

(পৌরাণিক গল্প।)

অতি প্রাচীন কালে এদেশে কৌশিক নামক জনৈক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সতী নির্ম্মলাদেবী এই মহাব্যাধিগ্রস্ত গলিতাঙ্গ ভিখারী ব্রাহ্মণের ভিখারিণী সহধর্ম্মিণী। ব্রাহ্মণ কঠোর পীড়ার দুঃসহ যন্ত্রণায় এতই ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন যে, সংসারের অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও তাঁহার দ্বারা নির্ব্বাহ হইত না। পতিপ্রাণা সাধ্বী-সতী নির্ম্মলা কায়মনোপ্রাণে ঐকান্তিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে ব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র স্বামীর যথারীতি সেবা-সুশ্রূষা করিয়া ও লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, দুইটী প্রাণীর উদরান্নের সংস্থান করিতেন। তথাপি কখনও স্বামীর প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি, অশ্রদ্ধা কি অন্য কোনরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইত না। বরং তিনি এরূপ করিয়া পরমারাধ্য স্বামী-দেবতাকে যেটুকু সুখী করিতে পারিতেন, তাহাতেই আপনার প্রাণে আপনি পরম প্রীতিলাভ করিতেন। একমাত্র পতিপদ-সেবা ভিন্ন পার্থিব অন্য কোন সুখসেবা বস্তুতে তাঁহার প্রাণের পিপাসার শান্তি পরিলক্ষিত হইত না। পতি-পদ সেবাকেই তিনি স্বর্গীয় সুখের সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন। সতী জানিতেন, পতিই অবলার ঈশ্বর,—পতিসেবাই নারী-জীবনের প্রধানতম ব্রত। তিনি জানিতেন ও মানিতেন যে, স্বামী কুৎসিত, পতিত,মূঢ়, দরিদ্র, ব্যাধিত কি জরাগ্রস্ত যাহাই কেন হউক না—পতিব্রতা রমণীর তাঁহাকেই বিষ্ণুতুল্য-জ্ঞানে প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে পূজা করা পরম ধর্ম্ম ও নারী-জীবনের সার-কর্ম্ম।

সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে একদা সেই পীড়িত ব্রাহ্মণের মনে বড় সাধ হইল,নদীর ঘাটে যাইয়া স্নান করিবেন। তাঁহার বাস-ভবনের অদূরে পতিত-পাবনী ভাগীরথী কুলকুল রবে প্রবাহিতা। ঐ দেখ, সেই সতীপ্রতিমা ভিখারিণী ব্রাহ্মণী বিকলাঙ্গ স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া প্রফুল্লমনে কলুষনাশিনী কৈবল্যদায়িনী পূত-প্রবাহিনী গঙ্গার উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। আহা! পতিগতপ্রাণা সতীর নির্ম্মল-হৃদয় আজ স্বামী-সেবা-রূপ স্বর্গীয়-সুখের বিমল সলিল সেচনে কিরূপ সুস্নিগ্ধ ও উৎফুল্ল। যে রমণী কখনও এরূপ স্বর্গীয়-সুখের অধিকারিণী হইয়াছেন, তিনিই ধন্যা—তাঁহারই রমণী-জীবন সার্থক। রমণী হইয়া যদি রমণীর ন্যায় কাজ করিতে না পারে—স্বামী-দেবতার পূজা করিতে না জানে, তবে বৃথা তোমার নারী-জীবন ধারণ করিয়া ফল কি?

নদীর পরপারে গঙ্গার তীরে লক্ষহীরা নাম্নী

এক বারবণিতার সুসজ্জিত সৌধ অট্টালিকা উন্নত মস্তকে বিরাজমান। আজ ভাগীরথী-তটে স্নানের ঘাটে স্নানার্থী নর-নারীর এক পুণ্য-সম্মিলন। আজ ঘাটে জনতার বড় ভিড়। কেন না আজন্মপাপানুরক্তা লক্ষহীরা তাহার আজীবন-সঞ্চিত দুরপণেয় পাতক-রাশির স্খলনার্থ সূর্য্য-গ্রহণের পুণ্যদ-পবিত্র-মুহূর্ত্তে পবিত্র ভাগীরথীর পুণ্য-সলিলে স্নান এবং দরিদ্র-ব্রাহ্মণ ও কাঙ্গাল প্রভৃতিকে আপনার আজীবন-সঞ্চিত পাপার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব দান করিতেছে।

মহাব্যাধিগ্রস্ত দরিদ্র-ব্রাহ্মণ কৌশিক কুলটার দানগ্রহণ অভিলাষে পত্নীসহ সেই জনতার একপ্রান্তে উপবিষ্ট, তাঁহার উত্থান-শক্তি-রহিত। অনুতাপিতা লক্ষহীরা দান করিতে করিতে সেই সপত্নীক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণের নিকট উপনীতা হইয়া, প্রার্থনাধিক ধন-রত্ন দানে তাঁহাদের ও আপনার প্রাণে তৃপ্তি ও প্রীতির অমৃত-নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিল।

দানকালে ব্রাহ্মণ-পত্নী সতী নির্ম্মলার পুণ্য-জ্যোতিঃপূর্ণ পবিত্র মুখ-কমলের প্রতি লক্ষহীরার দৃষ্টি পড়িল। লক্ষহীরা সতীর সেই পুণ্য-পবিত্রতার-আধার জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীপ্রতিমা-দর্শন করিয়া বিস্মিতা হইল। অনন্তর তাঁহার পতি-ভক্তির পবিত্র-কাহিনী শ্রবণ করিয়া মন্ত্রমুগ্ধা ভুজঙ্গিণীর ন্যায় দেবী-জ্ঞানে তাঁহার পবিত্র-চরণে মস্তক অবনত করিয়া, সতী স্পর্শে মুহূর্ত্তে জীবনের গুরুভার লঘু হইল বলিয়া মনে করিয়া, কি এক অভূতপূর্ব্ব অনাস্বাদিত অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয়-সুখের আস্বাদনে কৃতার্থ হইল। অতঃপর লক্ষহীরা আপনার অঙ্গের মণি-মাণিক্য-খচিত বহুমূল্য রত্নাভরণ ও সুশোভন পরিধেয় বসন উন্মোচন করিয়া সযত্নে ছিন্ন-বসনা সতী নির্ম্মলার অঙ্গে পরাইয়া দিয়া কাঙ্গালিনীর বেশে আপনার আবাসে প্রত্যাগমন করিল।

এদিকে পতিব্রতা সতী-নির্ম্মলা আশাতীত দান লাভ করিয়া, দানলব্ধ বস্ত্রালঙ্কারগুলি দৃঢ় পুটুলী বন্ধনপূর্ব্বক রুগ্ন পতিকে স্কন্ধে লইয়া প্রীতি-প্রফুল্লমনে আপনার পর্ণকুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সেই দান-গ্রহণ কালাবধি ব্রাহ্মণ বড়ই বিমর্ষ। তিনি দান-গ্রহণ করিতে যাইয়া সেই পতিত-পাবনী ভাগীরথীর পবিত্র-তীরে কি যেন কোন এক মহারত্ন হারাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার প্রাণে সুখ নাই, শান্তি নাই, আহারে রুচি নাই, নিশিতে নিদ্রা নাই; সতী নির্ম্মলার প্রতিও আর তেমন প্রাণের টান নাই। দুর্জ্জয় দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি তাঁহার আন্তরিক শান্তির ঘরে পাপ-লালসার প্রাণঘাতি বিষের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কে যেন তাঁহার ব্যাধিক্লিষ্ট-জীবনের শেষ শান্তিটুকু কাড়িয়া লইয়াছে। কুলটা লক্ষহীরার অনুপম রূপ-যৌবন-মাধুরী দর্শন করিয়া অবধি ব্রাহ্মণ পাপাসঙ্গলিপ্সায় নিয়ত জর্জ্জরী-ভূত হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণে বড় সাধ, একাবার সেই পাপীয়সীর পাপভবনে যাইয়া স্বীয় পাপ-অভিলাষ পূর্ণ করেন। আকাঙ্ক্ষিত ধন না পাইলে বুঝিবা তিনি প্রাণে বাঁচিবেন না, কিন্তু তিনি জানিতেন যে, অন্ধের দর্পণ দর্শনের স্পৃহার ন্যায় তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হই-

বার নহে। সে যে মহা-ব্যাধিগ্রস্ত অর্থহীন দীন-দরিদ্র পথের-কাঙ্গাল। লক্ষ মুদ্রা দর্শনী না হইলে, কত রূপ-গুণ-সম্পন্ন যুবাপুরুষেরাও যাহার পদপ্রান্তে স্থান পান না, ব্যাধিত দীন-ভিখারী-ব্রাহ্মণের সে স্থলে আশা অলীক স্বপ্নবৎ, শুধু কল্পনায় পর্য্যবসিত না হইবে কেন?

কন্দর্পের কঠোর-তাড়নায় অবোধ ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। অগত্যা সতী সহধর্ম্মিণীর নিকট স্বীয় পাপ অভিলাষের গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন। সতী, পাপ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবার জন্য পতিকে অনেক বুঝাইলেন। যখন কিছুতেই পতির পাশবিক-প্রবৃত্তি প্রশমিত হইল না—দুর্জ্জয়-লালসার কঠোর-তাড়নায় ব্রাহ্মণ যখন অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণায় মরিয়া হইয়া উঠিলেন, তখন অগত্যা সতী পতির ঘৃণিত অভিলাষ পরিপূরণার্থে যত্নবতী হইলেন।

পতির ঐকান্তিক আগ্রহ-অনুরোধে সতী তমসা-যামিনীর ঘোর-অন্ধকারে শরীর আবরিয়া হীরার সুশোভিত সৌধভবনে উপনীতা হইলেন। নরকের অধিষ্ঠাত্রী পিশাচরাণীর সুবর্ণ-ভবনে দীনা কাঙ্গালিনীর-বেশে মূর্ত্তিমতী পুণ্যবতী দেবী-প্রতিমার আবির্ভাব হইল।

অনুতপ্তা হীরা, গঙ্গাস্নানের সেই মুহূর্ত্ত হইতে আপনার দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত পাপবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া এখন অনুতাপের তুষানলে নিয়ত দগ্ধ হইতেছে। উষার ক্ষীণালোকের ন্যায় পুণ্য-পবিত্রতার অতি ক্ষীণ স্নিগ্ধ-রশ্মি ধীরে ধীরে তাহার চির-তমসাচ্ছন্ন পাপ-হৃদয়ে স্বর্গীয় পুণ্যজ্যোতির মধুর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। জাহ্নবীর শীতল-সলিল স্পর্শে চিতার অঙ্গার ধীরে ধীরে হৃদয়-নিহিত গুপ্ত তাপরাশি উদ্গীরণ করিয়া শীতল হইতেছে। মুহূর্ত্তপূর্ব্বের প্রজ্জ্বলিত ভীষণ শ্মশান এখন চির-শান্তিপ্রদ তাপসাশ্রমে পরিণত হইতেছে।

এ হেন শুভমুহূর্ত্তে সতী নির্ম্মলা, মূর্ত্তিমতী দেবী-প্রতিমার ন্যায় হীরার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। চির-পবিত্র স্বর্গীয় সুরধুনী, ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর নিকট কৃপার ভিখারিণী হইয়া উপনীত হইলেন। নিশীথকালে এরূপ অতর্কিতভাবে অকস্মাৎ সতী দর্শন-লাভে বিস্মিতা হইয়া হীরা প্রীতি-ভক্তির সহিত তাঁহাকে সুবর্ণ-খচিত বিচিত্র-আসনে বসাইলেন। হীরা আন্তরিক আবেগভরে আগ্রহ-সহকারে সতীকে এরূপ অসময়ে তাহার পাপভবনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিলে, ভিখারিণী ব্রাহ্মণী হীরার নিকট অভয় চাহিয়া বিনয়-মধুর-বচনে পতির পাপ-অভিলাষ-বার্ত্তা প্রকাশ করিলেন। নির্ম্মলা অতি করুণস্বরে বলিলেন,—"ভগ্নি! স্বামীই আমার সর্ব্বস্বধন এবং একমাত্র আরাধ্য-রতন—পূজা-ভক্তির মূর্ত্তিমান বিগ্রহ—শ্রীনারায়ণ। কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করাই আমার পরমধর্ম্ম এবং নারী-জীবনের সারকর্ম্ম; তাই, সম্বল-শূন্য দুঃখিনী ভিখারিণী আমি পতির ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আজ তোমার দ্বারে তোমারই কৃপার ভিখারিণী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি।" সরলা নির্ম্মলা এই কথা বলিতে বলিতে মনের আবেগে অশ্রু-প্রবাহে ভাসিতে লাগিলেন।

সতীর অপূর্ব্ব পতি-ভক্তির মধুর-গাথা শ্রবণ

ও পতি-প্রেমের পবিত্র অশ্রু দর্শন করিয়া, পাপীয়সী হীরার পাপ-পঙ্কিল-হৃদয়ে কি জানি কি এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনাস্বাদিত পবিত্র মধুর ভাবের উদয় হইল? হীরা সাগ্রহে সতীর অবৈধ-প্রস্তাবে সম্মত হইল। অতঃপর পতি-পরায়ণা নির্ম্মলা হীরার বাক্যে আশ্বাসিতা হইয়া তাহাকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন সতী নির্ম্মলা ব্যাধিগ্রস্ত পতিকে স্কন্ধে করিয়া হীরার পাপ-ভবনে উপনীতা হইলেন। পাপিণী হীরা দেব-দম্পতি-জ্ঞানে প্রীতি-ভক্তির কুসুমাঞ্জলি-দানে পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে রত্নময়-আসনে বসাইলেন। হীরার অপ্সরীবিনিন্দিত রূপ-যৌবন-মাধুরী দর্শন এবং তাহার বীণা-ঝঙ্কারবৎ মধুর-বচন শ্রবণ করিয়া, কুষ্ঠ ব্রাহ্মণ পিপাসাতুর চাতকের ন্যায় তাহার মুখপানে অনিমিক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তীব্র-লালসার আবেগে তাঁহার অন্তর নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। আকাঙ্ক্ষিত উপাদেয় খাদ্যপূর্ণ পাত্রের নিকট উপবিষ্ট রুদ্ধমুখ পেটুক ব্যক্তির ন্যায় প্রবল আসঙ্গলিপ্সার কঠোর তাড়নায় মূঢ় ব্রাহ্মণ প্রাণের জ্বালায় নিয়ত ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। সহসা প্রবল পিপাসায় তাঁহার কণ্ঠ শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিল। স্থান ও পাপ ভুলিয়া পিপাসাতুর ব্রাহ্মণ হীরার নিকট জল-পানের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। হীরা ত্রস্তে ব্রাহ্মণের তৃষ্ণানিবারনার্থ জল আনিবার জন্য কক্ষান্তরে ছুটিয়া গেল। অনতিবিলম্বে হীরা সুবর্ণ ও মৃন্ময়পাত্রপূর্ণ সুশীতল, সুবাসিত জল লইয়া তৃষিত ব্রাহ্মণের সম্মুখে রবিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ বিপ্র দুই পাত্রে জল আনিবার কারণ জিজ্ঞাসিলে চতুরা হীরা উত্তর করিল,—

"স্বর্ণ-পাত্রে কূপ-জল আমি অভাগিনী।
মৃৎ-পাত্রে গঙ্গাজল তোমার গৃহিণী।"

বারাঙ্গনার অপূর্ব্ব বুদ্ধি-কৌশলে কাম-মুগ্ধ মূঢ় ব্রাহ্মণের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইল। তখন ব্রাহ্মণ পতিব্রতা পত্নীর নিকট স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য বিনয়-বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং হীরার নিকটও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাহাকে পরজন্মে সতী-লক্ষ্মী পতিব্রতা হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া, হৃদয়ের গুরুভার কিঞ্চিৎ লঘু করিলেন। অনুতাপের তুষানলে পুড়িয়া পুড়িয়া তাঁহার পাপ-হৃদয় পবিত্র হইল—তিনি শান্তিলাভ করিলেন। ঘটনা-চক্রে পড়িয়া ব্রাহ্মণের মোহ ঘুচিল। তিনি লজ্জাবনত-বদনে কেবলই ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহার সহধর্ম্মিনী স্বর্গের দেবী; কিন্তু লক্ষহীরা কে? বেশ্যা-রূপিণী হীরা,—মানবী, দানবী, দেবী কি পিশাচী?

পতির বিনয়-বচন ও ক্ষমা প্রার্থনায় সতী নির্ম্মলা যারপর নাই লজ্জিতা হইয়া পতির পদ-মূলে ভূতলে লুণ্ঠিতা হইয়া সাদরে ভক্তিভরনত অন্তরে তাঁহার পদধূলি লইয়া মাথায় প্রদান করতঃ বলিলেন,—"ছি প্রভু! এমন করিয়া আর এ দাসীকে লজ্জা দিবেন না।" অনন্তর তিনি হীরাকে বলিলেন,—"ভগ্নি! আজ তোমারই কৃপায় আমার স্বামীর এ সুমতি, এ বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, সে জন্য এ দীনা ভিখারিণী প্রাণ ভরিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছে। এই পুণ্য ফলে তোমার আত্মার সদ্গতি এবং জন্মা-

ভবে সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় পতিব্রতা সাধ্বী-সতী হইয়া সুদীর্ঘকাল পতি-পদ-সেবা-সুখ-ভোগ অন্তে অক্ষয় স্বর্গবাসের অধিকারিণী হইবে; আমি মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি এ জন্মে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া অন্তিমে পুণ্য-তীর্থে সুখে মরিতে পারিবে। হীরারে! আমি যদি জীবনে একদিনও পতিকে অবহেলা না করিয়া থাকি, আমি যদি কায়মনোবাক্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও পবিত্র সতী-দর্পের অবমাননা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই সফল হইবে।

হীরাকে মুক্তকণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, পতিব্রতা নির্ম্মলা স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া আপনাদের কুটীর-ভবনে গমন করিলেন। আর এদিকে চির-বিলাসিনী অনুতপ্তা হীরা আজীবন-সঞ্চিত পাতকরাশির পোড়াস্মৃতি বুকে লইয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু-প্রবাহে ভাসিতে লাগিল। পাষাণ-কঠোর বিহ্বলা কুলটার প্রাণ, পতিব্রতার পুণ্য-বিলাস-স্পর্শে কি জানি কি এক অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় অমৃতের, চির-মধুর নিত্য-পবিত্র পদার্থের অনুভূতি-লাভে মণিহারা ফণিনীর ন্যায় শোকে-দুঃখে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রত্নহারা ভুজঙ্গিনী ভূতলে লুটাইয়া পাষাণে মাথা খুঁড়িতে লাগিল! কাঁদ হীরা, একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদ; অনুতাপের তুষানলে তোমার আজীবন অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।

সে দিন কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথি; তাহাতে ঘোর মেঘাচ্ছন্ন-রজনী। সে ঘোর তমসাচ্ছন্ন গভীর নিশায়, রমণী পতিকে স্কন্ধে বহিয়া লইয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে কুটীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজাদেশে শূলদণ্ড-প্রাপ্ত মাণ্ডব্য নামক জনৈক ঋষি পথিমধ্যে শূল-দণ্ডোপরি উপবিষ্ট ছিলেন।* সতী নির্ম্মলা অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া সহসা দণ্ডপ্রাপ্ত তপস্বীর শূলাঘাতে ক্লিষ্ট পবিত্র দেহে বাধা প্রাপ্ত হইলেন। সতীর অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে ঋষির মস্তকে স্ত্রী-স্কন্ধারূঢ়া কৌশিকের পদস্পর্শ হইল। সহসা সেই পদ-স্পর্শে যোগমগ্ন তপস্বীর ধ্যানভঙ্গ হইল। কোপান-স্বভাব সন্ন্যাসী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন,—"অদ্য যামিনী প্রভাতে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী।"

স্বামীর প্রতি মুনীর এ নিষ্ঠুর অভিসম্পাত শ্রবণে নির্ম্মলা যারপর নাই ভীতি-বিহ্বলা হইয়া, পতিকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত ঋষীর নিকট বিনয়-বচনে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সতীর প্রার্থনায় যোগীর প্রাণে বিন্দু-মাত্রও দয়ার সঞ্চার হইল না। অশ্রু-প্রবাহে সাধ্বীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল; কিন্তু পাষাণ-হৃদয় ঋষির প্রাণে এতটুকু করুণারও উদয়

* ভগবান মাণ্ডব্য-মুনি মহাযোগে নিমগ্ন, সে অবস্থায় তস্কর-জ্ঞানে রাজাদেশে তাঁহার সেই সমাধি-অবস্থায়ই শূল-দণ্ড হইয়াছিল। মুনি শৈশবে ক্রীড়াকৌতুকে একটা পতঙ্গকে শূলে (তৃণ-শূলে) বিদ্ধ করিয়াছিলেন; মুনির যোগাবস্থায় অজ্ঞাত শূলদণ্ড সেই শৈশব-কৃত অজ্ঞানাবস্থার অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র পাতকেরই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট অমোঘ বিধান। পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদান জন্য বিধাতার দরবার চির-উন্মুক্ত। জীবের কর্ম্মফল প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য-বিধাতৃ বিধান।

হইল না। সতী আপনার সেই বিষম অবস্থার বিষয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঋষির করুণা-ভিক্ষা করিয়াও যখন কিছুতেই তাঁহার দুর্জ্জয়-ক্রোধ শান্তি করিয়া ঋষিদত্ত ভীষণ অভিশাপ মোচনে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি বলিলেন,—"আমি যদি কায়মনোবাক্যে সাধ্বী-সতী হই, তাহা হইলে এ কাল নিশা কথনই শেষ হইবে না, আমার সতী-ধর্ম্মের অক্ষয় পুণ্য-প্রভাবে আমার স্বামীর জীবনরক্ষার্থ এ নিশা অনন্ত-কালব্যাপী মহানিশায় পরিণত হউক।"

সতীবাক্য অখণ্ডনীয়। সতীবাক্যে অনন্ত-কাল ব্যাপি ঘোর অন্ধকার-যামিনী বর্ত্তমান থাকিলে সৃষ্টি নাশ অনিবার্য্য। এ ঘটনা শ্রবণে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রমাদ গণিলেন। ইহার প্রতি-বিধানার্থ ব্রহ্মাদি দেবগণ মর্ত্তে সতী সদনে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সতীর চিররুগ্ন পতিকে পুনর্জ্জীবিত ও রোগমুক্ত দিব্যকান্তি করিবার অঙ্গীকারে সতীর নিকট হইতে রজনী প্রভাত হইবার অনুমতি চাহিয়া লইলেন। সতীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। সতী-আজ্ঞায় তিমিরা-যামিনীর অবসান হুইল। মুনি-শাপে সতীর পতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর করালগ্রাসে ঢলিয়া পড়িলেন। কিন্তু দেবকৃপা-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই মৃতদেহে পুনরায় জীবন-সঞ্চার হইল। কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত গলিত-দেহ কৌশিক দিব্য-কান্তি নবীন-নধর যুবা-পুরুষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

যথাকালে দম্পতি কুটীরে প্রত্যাগমন করি-লেন। ঘটনাচক্রের গভীর নিষ্পেষণে ব্রাহ্মণের পাপস্পৃহা দূর হইয়া চিত্তশুদ্ধি ও ভগবদ্ভক্তির উদয় হইল। এই ঘটনার পর হইতে তিনি সর্ব্বদাই শ্রীভগবৎগুণানুকীর্ত্তনে লিপ্ত থাকি-তেন। দেবানুগ্রহে এখন ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব-ব্যাধির চিহ্নমাত্রও আর নাই।

এদিকে অনুতাপিতা লক্ষহীরা স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত-মানসে সতীর অপূর্ব্ব পাতিব্রত্যের পুরস্কার-স্বরূপ তাঁহাকে রাজবৈভব তুল্য স্বীয় সম্পদরাশির দানপত্র লিখিয়া দিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে কোথায় অন্তর্হিতা হইল, আর কেহ তাহার দর্শন পাইল না।

লক্ষহীরা-প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য লাভে ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হইল। সতী কায়োমনপ্রাণে ঐকান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে সতত পতিসেবা-রূপ স্বর্গীয়-সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘকাল স্বামি-সেবা-সুখভোগ অন্তে পতিসহ স্বর্গবাসিনী হইলেন। তাঁহার পতিপূজা সার্থক হইল।

পতি-ভক্তির এমনি গুণ; এমনি অপূর্ব্ব পারিতোষিক। পতিব্রতা সাধ্বী-সতী প্রথমে যতই ক্লেশ পাউন না কেন, পরিণামে তাঁহার সুখ অবশ্যম্ভাবী। পতিব্রতার জন্য ভগবৎ-কৃপারূপ অমৃত-নির্ঝরিণী সদা প্রবাহিতা; সতীর জন্য স্বর্গের সুবর্ণ-দ্বার চির-উন্মুক্ত। এ দৃশ্য ভারতের প্রতি গৃহে সতত বিদ্যমান ছিল। ভারত ইহারই জন্য গর্ব্বোন্নত, সকল দেশের পূজনীয় ও বরণীয় হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু হায়! ভারত এখন আর দেশ বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারে না। হা ভগবান! আর কি সে দিন ফিরিয়া আসিবে না?

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

জাতি-বিচার ।

সাম্য ।

অন্ন-বিচার ।

সাম্যবাদীর দ্বিতীয় আপত্তি অন্নবিচার। ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন খাইবে না, শূদ্রের সহিত আহার ব্যবহার করিবে না, এই সব ব্যবস্থা যে সমাজের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকারী, এ সকল কু-রীতি সমাজ হইতে এক কথায় উঠিয়া যাওয়া যে একান্ত প্রয়োজনীয়, অনেকেই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। যদি দোষের হয় তবে আমরাও ইহা উঠাইয়া দিবার প্রার্থনা করি, যদি সামাজিক উদ্দেশ্যের কোন ক্ষতি সাধন করে, তবে ইহা রহিত করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু তুলিয়া দিবার আগে দেখিতে হইবে ইহার দোষ কি কি। কোন দোষ না থাকিলে প্রতিপক্ষের ইহাতে কথা কহিবার অধিকার নাই।

যাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করেন, দোষের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যুক্তিযুক্ত কোন কারণই তাঁহারা দেখাইতে পারেন না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইহাতে সকল লোকের মধ্যে সহানুভূতি জন্মাইতে দেয় না। সহানুভূতি স্ব স্ব জাতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে—এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। ইওরোপের মত স্বাধীন সমাজে এ ভয়টা কতক পরিমাণে যুক্তিসিদ্ধ সত্য, কিন্তু হিন্দু-সমাজের সে আশঙ্কা করিবার কোন কারণই নাই। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণাধীন সমাজ। সকলেই ব্রাহ্মণের অধীন এবং ব্রাহ্মণের দ্বারা পরিচালিত। সকল জাতিই ব্রাহ্মণকে ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দেখে এবং এক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধ ছাড়া সকলকেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও উপর বিদ্বেষ প্রকাশ করিবার কোন কারণই নাই। তার পর সার্ব্বজনীন সহানুভূতি-জ্ঞান যাহার থাকে, জাতিবিচার তাঁহার সে জ্ঞানের প্রতিরোধ করিতে পারে না। আর যাহার না থাকে তাহার সহানুভূতির আশা করা মূর্খতা। আর যদিই কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব পরিলক্ষিত হয়, সেটা কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এইরূপ জাতিগত কোন তর্ক লইয়া হইতে পারে। সমগ্র হিন্দুর জাতীয় সহানুভূতি সংগ্রহ করিবার সময় কেহ বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বলিয়া তাহাতে যোগ দিতে অস্বীকার করে না ও করিতেও পারে না। সেরূপ করিবার কোনও কারণও দেখা যায় না। একথা "সহানুভূতি" নামক অধ্যায়ে বিশেষ করিয়া বলিব। "আমি ব্রাহ্মণ নহি, ব্রাহ্মণের সহিত আহার করিতে পারি না, তবে কেন হিন্দু মাত্রের কর্ত্তব্য এ কার্য্যে যোগদান করিব" কোন নিম্ন জাতির মুখে এ কথার আশা করাই অসম্ভব।

তারপর একটু বিশেষ করে দেখিলেই বোঝা যায় এ অন্নবিচার এক রকমে না আর এক রকমে সকল সমাজেই বর্ত্তমান আছে। ইওরোপেই কি অন্নবিচার নাই? একজন ঝাড়ুদারের সঙ্গে বেড়াইতে বা আহার করিতে একজন ইওরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি ঘৃণা-বোধ করে না? ইওরোপেই কি সকলে সকলের সঙ্গে আহার করিয়া থাকে? তবে শুধু হিন্দুর বেলায় দোষ বলিলে চলিবে কেন।

তবে হিন্দু সমাজের অন্নবিচার দুই রকমের। ইওরোপে ধনগত বিচার আর আমাদের দেশে গুণগত। ইওরোপীয় সমাজের উদ্দেশ্য—ধন, তাহারা ধন হিসাবে পার্থক্য প্রকাশ করে, আমাদের লক্ষ্য — ও ধর্ম,আমরা গুণ হিসাবে বিচার করিয়া থাকি। ভাল কোন্‌টা? ধন না গুণ? ইওরোপে আজ যে ঝাড়ুদার, কাল সে ধনী হইলে তাহার সহিত আহার করিতে আর কাহারও আপত্তি থাকে না; আমাদের আজ যে শূদ্র বা শূদ্র গুণাক্রান্ত, কাল সে চেষ্টা করিয়া ব্রাহ্মণ গুণাবলম্বী হইলেও তাহার অন্ন গ্রহণ করি না। কেন না সে নিজে ব্রাহ্মণধর্ম্মী হইলেও তাহার শরীরে তাহার শূদ্র গুণান্বিত পিতা পিতামহের গুণ-দোষ একটু না একটু বর্ত্তমান আছে। আর আজ যাহাকে ঘৃণা করি কাল তাহাকে কেমন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিব, আজ ঘৃণায় যাহার সহিত আহার করিনাই, কাল তাহার অন্ন কেমন করিয়া গ্রহণ করিব, ইওরোপই এ কথার যথার্থ উত্তর দিতে পারে। আমাদের পার্থক্য ধর্ম্মের বা গুণের উচ্চ নীচতা অনুসারে। কিন্তু শুধু তাহাই নহে। ইওরোপের মত উচ্চের সম্মান রক্ষা, বর্দ্ধিষ্টের বর্দ্ধিষ্টতা দেখানই আমাদের অন্নবিচারের উদ্দেশ্য নহে। ইওরোপীয়দিগের মত ধনোদ্দেশী সমাজের এ পার্থক্যের অন্য কোন কারণ নাই সত্য এবং এটা তাহারা নিয়ম করিয়াও করে নাই। তাহাদের পার্থক্য সমাজে আপনা হতে দাড়াইয়া যায়। কিন্তু আমাদের যাদের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম যাহাদের উদ্দেশ্য ধর্ম্মের জন্যই জন্ম, যাহাদের ধর্ম্মের জন্যই জীবনধারণ, যাহাদের সমস্তই ধর্ম্মময়, তাহাদের এ অন্নবিচারের যথেষ্ট উপকারী উদ্দেশ্য আছে এবং ইচ্ছা করিয়া সমাজ শাস্ত্র প্রণেতারা এ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। পাশব ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়া ইওরোপের মত হিন্দু জাতিবিচার করে না। চন্দ্রনাথ বাবু সুবিখ্যাত হিন্দুত্ব নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হিন্দু কড়া ক্রান্তি বাদ দিতে জানে না। অর্থাৎ যতদূর দৃষ্টি ও ক্ষমতা চলে, হিন্দু ততদূর আপন ধর্ম্মোন্নতির জন্য দৃষ্টি ও শক্তি সঞ্চালিত করিয়াছেন। একথা খুব যথার্থ। ধর হিন্দুর সম্প্রদায়গত অন্ন ও ব্যবহার-বিচার উঠাইয়া দেওয়া গেল। তাহা হইলে কি দাঁড়ায়? প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির আহারের যে কতকগুলি স্বঃ স্বঃ বিভাগীয় কার্য্য সম্পাদনে সাহায্যকারী খাদ্যাখাদ্যের বিধি নিষেধ আছে, সেগুলি রাখা দুষ্কর হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ একত্রে আহার, উপবেশনাদি হইলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বড় বাড়িয়া যায়। বড়তে ছোটতে ঘনিষ্টতা হইলে ছোটর গুণ কতকটা বাড়িতে পারে সত্য কিন্তু বড়র গুণ কমিয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা। আমাদের উদ্দেশ্য বড় ছোট এক করা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য বড়কে আমাদের ব্রাহ্মণকে আদর্শ মনুষ্য করা, অনন্তের দিকে যেন তেন প্রকারেন অগ্রসর হইতে দেওয়া। কেন না, তাহা হইলে, আমাদের সমাজও উর্দ্ধে উঠিবে। নেতা যদি উঠিতে পারে তবে তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিবৃন্দও অনায়াসে তাহার অনুধাবন করিতে পারিবে। এই জন্যই ব্রাহ্মণ নিম্নশ্রেণীর সহিত যতদূর অসংশ্লিষ্টভাবে থাকিতে পারে, থাকিতে দেওয়া একান্ত

কর্ত্তব্য। এবং এই সব কারণেই জাতীয় বিভাগ ও পার্থক্য বজায় রাখা বিজ্ঞানামুমোদিত, বিশেষ তাহাতে যখন কোন গুরুতর দোষ জন্মায় না।

মনুর অন্নবিচার একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে ব্রাহ্মণকে অসৎ গুণাবলম্বী মাত্রেরই অন্ন পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্নবিচার ও এইরূপ অন্যান্য ব্যবস্থা, শুধু গুণগত পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্যই অর্থাৎ বড়কে ছোটর সঙ্গে মিশিতে না দিবার জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। জাতি হিসাবে গুণের পার্থক্য থাকে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গুণগত উচ্চ নীচতা পরিলক্ষিত হয়—এইজন্যই ওগুলা জাতিগত করা হইয়াছে। জাতিটা যেন certificateএর মত ব্যবহৃত হইয়াছে। নতুবা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য গুণগত বিচার, জাতিগত নহে। নিম্নলিখিত সূত্রগুলি পাঠে ইহা বিশেষরূপ উপলব্ধি হইবে।

মত্ত ক্রুদ্ধাতুরাণাঞ্চ নভুঞ্জীত কদাচন।
কেশকীটাব পন্নঞ্চ পদাস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ॥

মত্ত, ক্রোধপরবশ ও ব্যাধিযুক্ত—ইহাদের অন্ন কখনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিবেন না। কেশকীট ইত্যাদি সংযুক্ত অন্ন বা ইচ্ছাধীন পদদ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন কখনও আহার করিবে না।

স্তেন গায়নয়োশ্চান্নং তক্ষোবার্দ্ধুষিকস্য চ।
দীক্ষিতস্য কদর্য্যস্য বদ্ধস্য নিগড়স্য চ॥

চৌর,গায়ন-বৃত্ত্যুপজীবী তক্ষণ-বৃত্ত্যুপজীবী ও বৃদ্ধি উপজীবি অগ্নিসোমীয় যাগ না করিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত এবং কৃপণ ও নিগড়বদ্ধ, ইহাদিগের অন্ন কখনও গ্রহণ করিবে না।

অভিশস্তস্য ষণ্ডস্য পুংশ্চল্যা দাম্ভিকস্য চ।
শুক্তং পর্য্যুষিতঞ্চৈব শূদ্রস্যোচ্ছিষ্টমেব চ॥
চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্ট ভোজিনঃ।
উগ্রান্নং সূতিকান্নঞ্চ পর্য্যাচান্ত মনির্দশং॥

মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যাভিচারিণী, বীড়ালব্রতাদি-ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ছলকারী, ইহাদিগের অন্ন কখনও খাইবে না। শুক্ত, পর্য্যুষিত দ্রব্য এবং শূদ্রের অন্ন ভোজন করিবে না ও গুরুর উচ্ছিষ্ট ব্যতিরেকে কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইবে না।

চিকিৎসোপজিবী, ব্যাধ, বক্রভাব, নিষিদ্ধ উচ্ছিষ্ট ভোজনকারী ও নিষ্ঠুর কর্ম্মা ইহাদিগের অন্ন খাইবে না। ইত্যাদি—

পিশুনানৃতি নোশ্চান্নং ক্রতুবিক্রয়িনস্তথা।
শৈলূষতুন্নবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্ন মেব চ॥

যে ব্যক্তি একের নিকট অপরের দোষ বলে তাহাকে পিশুন বলা যায়, যে আদ্যোপান্ত মিথ্যা বলিয়া কূট সাক্ষ্য প্রদান করে, সে স্বকৃত যজ্ঞফল ধন দ্বারা বিক্রয় করে, যে নটবৃত্তি, যে বস্ত্রাদিসীবন দ্বারা জীবীকা করে, যে উপকারকের অপকার করে, ইহাদের অন্ন কখনও খাইবে না॥

মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অনির্দশঞ্চ প্রেতান্ন মতুষ্টি করমেব চ॥

যে জ্ঞাতসারে পত্নীর উপপতি সহ্য করিতে পারে, যে স্ত্রীর বুদ্ধিতে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করে ইহাদিগের অন্ন মরনা শৌচির অন্ন ও যে অন্ন খাইতে তুষ্টি না হয়, এমন অন্ন খাইবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি॥

এইরূপ ব্যবস্থা দেখিলে নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হয় যে গুণ বিচারে অন্ন বিচার করাই

শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। পাছে অসৎ গুণীর সংসর্গে আসায় এবং তাহার সংস্পৃষ্ট খাদ্য ভোজনে চিত্ত বিকার জন্মে ; আহারে তৃপ্তি নষ্ট হইলে সে আহার শরীর পোষণের ব্যাঘাত ঘটায় সেই সব জন্য আহারে এত ধরাধরি। এমন কি সেই জন্য স্বপাক অন্নই ব্রাহ্মণের বিশেষরূপে ব্যবস্থিত। সর্ব্বদা সত্ত্বগুণোদ্দীপক কার্য্যরত ব্রাহ্মণের পক্ষে এটা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা আর বোধ হয় বলিতে হইবে না। খাদ্যের সহিত মনের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিশেষ হিন্দুর আহারে শুধু রসনার তৃপ্তিদায়িনী এবং শরীর পোষিণী হইলে হয় না, মানসিক সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধক হওয়া চাই। হিন্দুর আহার একটা পুণ্যক্রিয়া একটা কর্ত্তব্য সম্পাদন একটা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন। হিন্দু আহারকে এইরূপ ভাবে। তোমার হয়ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। স্থান নির্ম্মল পাত্র, শুভ্রবসনধারী পরিবেষণকারীর দর্শনই তৃপ্তিদায়ক হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃত সত্ত্বগুণান্বেষী হিন্দুর তাহা হয় না। অসচ্চরিত্র অসদগুণবংশীয় লোকের ছায়াপাতেই হিন্দুর শুভ্র, সুনির্ম্মল হৃদয় পরিম্লান হয়, হৃদয়ের পবিত্রতা ক্ষণেকের জন্যও অপসারিত হয়। তাহার স্পৃষ্ট অন্ন হিন্দু কেমন করিয়া খাইবে ? হিন্দু আহার করিবার অগ্রে ঈশ্বরকে সে আহার নিবেদন করিয়া তবে সেই ভগবানের প্রসাদ ভক্ষণে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, হৃদয়ে অতুল আনন্দ উপভোগ করে। বল দেখি, যে আহার ঈশ্বরে নিবেদন করিবে, তাহাতে নিজের যদি এতটুকু মাত্রও বিতৃষ্ণা জন্মায়, তবে কেমন করিয়া সে আহার তাহার আরাধ্য গুরুকে নিবেদন করিবে ?

কিন্তু একথায় হয়ত অনেকে আমায় অর্ব্বাচিন্ বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। করুন তাহাতে ক্ষতি নাই। কেন না আমি বেশ জানি সৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সন্তান ও সাত্ত্বিক গুণ মণ্ডিত মহাজন ব্যতিত এ কথা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, এবং মলিন বসন মলিন দেহব্যাতিত, মলিন চরিত্র, মলিন বীজোদ্ভূত দেহ যে হিন্দুর সচ্ছ, স্ফটিক তুল্য অম্লান হৃদয় দর্পণ ম্লানিভূত করে,—এ কথা তিনি ভাবিয়াই পাইবেন না।

এরূপ গুণানুসারে পার্থক্য আরও উপকার করে,—ইহাতে অসচ্চরিত্র লোকের অনেকটা শাসন হয়। সে অনেকটা লজ্জিত ও অপমানিত হয় ; আপনার উপর তার অনেকটা ধিৎকার হয় এবং চরিত্র সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারে। অতএব এ প্রকার অন্ন বিচার যে দেশের ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। ইহা যে শাস্ত্রকারদিগের তীক্ষ্ণ দুরদর্শীতার অন্যতম পরিচয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শুধু তাই কি ? কোন্ দিনে কি খাইবে, কোন্ মাসে কি খাওয়া নিষিদ্ধ, কোন্ তিথিতে কি খাইলে অপকার করে, এ সব গ্রহ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দ্রব্যগুণ ও মনুষ্য-দেহের অবস্থা-পরিবর্ত্তন-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত যাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাদের নির্ম্মল জ্ঞানালোক এতদুর অধিবিস্তৃত, এতদুর অবধি আলোকিত করিয়াছে, তাঁহাদের এ প্রকার আহারের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা কি আমাদের

মত লোকের বাতুলতা নহে ?

যাই হউক এখন দুইটি কথা উঠিতে পারে। যখন গুণ বিচারেই আহার-বিচার, তখন যদি কোন শূদ্র সম্যক ব্রাহ্মণ গুণাবলম্বী হয়, তাহার অন্ন ব্রাহ্মণের গ্রহনীয় কি না। আর এক কথা, আজ কাল আহার-বিচার শুধু জাতি হিসাবেই করা হয় ; কই ক্রোধী, বা খল বা স্ত্রী-পরতন্ত্র, কৃপণ, ইত্যাদি রূপ গুণ্-বিচার করিয়াত অন্ন বিচার করা হয় না ? ব্রাহ্মণ অসদ্‌গুণী হইলেও তাহার অন্ন ত সকলেই গ্রহণ করে ?

ইহার প্রথম কথার উত্তর এই যে, বাস্তবিক যদি কোন অধম-জাতি আচার ব্যবহারে ও চিত্তবলে ব্রাহ্মণ-তুল্য হয়, তবে তাহার অন্ন নিশ্চয়ই গ্রহণীয়। শাস্ত্রেও ইহার ব্যবস্থা আছে। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

শূদ্রাস্ত যে দানপরা ভবন্তি
ব্রতান্বিতা বিপ্রপরায়নাস্ত।
অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং।
ভবেদ্দিজে দৃষ্টিমিদং পুরাত নৈঃ॥

অর্থাৎ শূদ্র—দাতা,ব্রতান্বিত,ও বিপ্রপরায়ণ হইলে তাহাদের অন্ন সুভোগ্য কিন্তু তবে আমরা খাই না কেন ? যদিও তেমন দান পরায়ণ, ব্রতান্বিত, ব্রাহ্মণ-ভক্ত শূদ্র আজকাল বিরল, তথাপি দুই চারিজন তেমন শূদ্র পাইলেও আমরা তাহাদের অন্ন গ্রহণ করি না কেন ? না এখন তাহাও পারি না। মনে করুন, আপনি সদাচারসম্পন্ন। নিষ্ঠাবান, জিতেন্দ্রিয় শূদ্র, আপনি কার্য্যে যথার্থই ব্রাহ্মণতুল্য ; কিন্তু আপনার দেহ ও আত্মার বীজ ত শুদ্ধ নহে আপনি শূদ্রের সন্তান, আপনার শরীরে অন্তরে কোন না কোন বংশগত দোষ বা গুণ যে নাই সে কথা কে বলিবে ? অসংখ্য যোজন দূরবর্ত্তী চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহোপগ্রহের ক্রীয়া যখন প্রত্যেক দ্রব্যের উপর সম্পাদিত হয় তাহাদের ঈষৎ স্থান, কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন দূরস্থ ধরণীস্থিত মনুষ্যের শরীরের ও দ্রব্যাদির গুণ পরিবর্ত্তিত হয়, তখন আপনার স্পৃষ্ট অন্নে, আপনার শরীরে ও সেই অসদ্‌গুণ যে ক্রীয়াশীল হয় না কে বলিতে পারে ? নিত্য নূতন আবিষ্ক্রীয়াশীল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ত সে বিষয়ে কোন প্রতিবাদক উত্তর দিতে পারে না। তবে আমি আপনার অন্ন কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারি ? পূর্ব্বে সত্য ত্রেতা,দ্বাপরাদি যুগে বরং পারা যাইত,কেন না তখনকার আশ্রমী লোক শুদ্ধবীর্য্যবান ও সর্ব্বদা সদাচার সম্পন্ন থাকিত, এত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রদোষ তাহাদের ব্রহ্মতেজ নষ্ট করিতে পারিত না কিন্তু এখন ? এখন যে আলগা মাটি, বিন্দুমাত্র জলসম্পাতেই দ্রবীভূত হয়। এখন আচার-নিষ্ঠ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন সূর্য্যে জ্যোতির্ষি, সত্যে জ্যোতিষির পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ইত্যাদি বাক্যগুলি অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব এখন এত সাহস করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সেই জন্য কলির বিধিদাতা পরাসর সংহিতায় ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু এই পরাশর সংহিতার অর্থ লইয়া অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করেন ; সেই জন্য এ বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। পরাশর প্রথমে বলিলেন।

তন্ডুলং গোরসং স্নেহং শূদ্র বেশ্মণ আগত ।
পক্কং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যং তন্মনুর ব্রবীৎ॥

অর্থাৎ শূদ্র দত্ত তণ্ডুল, দুগ্ধ, তৈলাদি স্নেহ, ব্রাহ্মণ-গৃহে আনিয়া পাক করিলে পবিত্র হয়,—অতএব তাহা খাইতে পারেন। ইহা হইতে শূদ্র-গৃহে পক্কান্ন খাওয়াই যে দোষাবহ তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

তার পর বলিলেন—

আপৎকালে তু বিপ্রেন ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুদ্ধিাত দ্রুপদং বা শতং জপেৎ॥

অর্থাৎ—"আপৎকালে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র-গৃহে ভোজন করেন, তবে মনস্তাপ বা দ্রুপদ মন্ত্রের শতবার জপ দ্বারা শুদ্ধ হয়েন।" আপৎকালে শূদ্র-গৃহে ভোজন করিলে যখন তাহার জন্য অনুতাপ ও জপ করিতে হয়, তখন শূদ্রগৃহে ভোজন—পরাশরের মতে দোষণীয় এবং এখানে যে শূদ্রগৃহে ভোজনেরই নিষেধ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু তার পরই গোলমাল। পরাশর তার পরেই বলিলেন।—

দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

অর্থাৎ—দাস, নাপিত, গোপাল, কুল মিত্র, অর্দ্ধসীরি এবং শরণাগত ইহারা শূদ্র মধ্যে ভোজ্যান্ন এই "ভোজ্যান্ন" অর্থে "পক্কান্ন" ধরিয়া অনেকেই ইঁহাদের অন্ন ভোজনের শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু পরাশরের ঐ স্থলের পূর্ব্বাপর শ্লোকের অর্থ দেখিলে ইহার অর্থ ঐরূপ বোধ হয় না।

স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবা বিবাহ নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে "আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং, পক্কমুচ্ছিষ্ট মুচ্যতে" ইত্যাদিরূপে অনেক শাস্ত্রীয় মত দর্শাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে "ভোজ্যান্ন" তণ্ডুলাদিরই অর্থবোধক; পক্কান্নের অর্থবোধক নহে। তিনি বলেন, শূদ্রের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরি ও শরণাগত, ইহারা ভোজ্যান্ন; ইহাদের দত্ত তণ্ডুলাদি ইহাদের গৃহে পাক করিয়া ভোজন করা যাইতে পারে। উক্ত শ্লোকের এই অর্থ। বাস্তবিক উহার অর্থ যে পক্কান্ন নহে এ কথা যুক্তি সঙ্গত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থ পাঠে ইহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। কেন না পরাশরই বলিয়াছেন "শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেও স্বীকারের অপেক্ষা রাখে; যাবৎ ব্রাহ্মণ না গ্রহণ করেন তাবৎ শূদ্রান্নই থাকে।" শূদ্রদত্ত অপক্ক তণ্ডুলাদিও ভোজন কালে শূদ্রগৃহস্থিত হইলে শূদ্রান্ন হয়।" তবেই বুঝিতে হইবে, যখন শূদ্রদত্ত তণ্ডুলাদির জন্যও এত বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা, তখন যে সেই শূদ্রের মধ্যে জনকয়েকের পক্কান্ন অবধি ভোজ্য বলিয়াছেন, ইহা অসম্ভব। "শূদ্রদত্ত তণ্ডুলাদি গৃহে আনিয়া ব্রাহ্মণ খাইতে পারেন। যদি আপৎকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে ভোজন করেন, তবে মনস্তাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তবে দাস, কুলমিত্র, গোপাল ইত্যাদি কয়টি শূদ্রের গৃহে তণ্ডুলাদি পাক করিয়া খাইতে পারেন।" ইহাই পরাশরের অভিমত। তাহা ছাড়া আদিত্য পুরাণেও,—

অর্দ্ধোরসেত ধেয়াত্ত পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাস গোপাল কুল মিত্রার্দ্ধ সীরিনাং
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থ সেবাতিদূরতঃ

ইত্যাদি স্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছে।

যাহা হউক, এই সকল পরাশর আদির মত হইতে এইটি স্পষ্ট বুঝা গেল, যে পূর্ব্বে শূদ্রান্ন (পক্ক বা অপক্ক এ কথা এখানে বিচার্য্য নহে) গ্রহণ করিলেও দুই চারিস্থলে করা যাইত, কিন্তু এখন তাহা নিষিদ্ধ। তবেই আমরা যাহা বলিতেছিলাম যে পূর্ব্বে বরং বাছিয়া বুঝিয়া শূদ্রান্ন গ্রহণ করিলে করিতে পারিতাম বটে ; কিন্তু এখন আমরা এত অবনত এত দুর্ব্বল, যে এখন তাহা আর করিবার উপায় নাই। এখন ঈষদ্দূষিত অন্নগ্রহণও আমাদের নির্ব্বাপিতোন্মুখ সত্বশক্তি আরও নির্ব্বাপিত করিবে।

আর এক কথা। এখনকার কাল এমনই দাঁড়াইয়াছে এবং সমাজ ধর্ম্মমুখী হইতে এত অর্থমুখী হইয়াছে যে আজ যদি আমরা যথার্থ আচারবান এবং যতদূর জ্ঞাত হওয়া যায় ততদূর ব্রাহ্মণ পরায়ণ কোন শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করি, কাল অন্য একজন অর্থবান্ ভণ্ডতপস্বী শূদ্র, তাহার অন্ন কেন গ্রহণ করা হইবে না বলিয়া জেরা ধরিবে এবং অর্থলোভে মুগ্ধ করিয়া কত ব্রাহ্মণকেও খাওয়াইতে সক্ষম হইবে।

আর কে যথার্থ বিপ্রপরায়ণ, নিষ্ঠাবান শূদ্র তাহাও বিচার করা বড় সহজ কথা নহে। এইরূপে তখন আর গুণাগুণ বিচারের বড় একটা সুবিধা ও অবসর থাকিবে না। কেন না, তেমন বিচারক, স্পষ্ট ন্যায়ানুগামী ও বহুদর্শী ব্রাহ্মণও এখন অতি বিরল। সাধারণ ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রায় সমধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সেই যথার্থ সদাচারী শূদ্রের শাস্ত্রীয় অধিকার সত্বেও (যদি বিনা তর্কে ইহা স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি না থাকে) ব্রাহ্মণকে অন্ন ভোজন করানতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য মানসিক ক্ষোভটুকু, সমগ্র সমাজের দিকে চাহিয়া সহ্য করা উচিত। এই জন্যই পূর্ব্বে উহা প্রচলিত থাকিলেও এখন উহা নিষিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত নহে। নতুবা তদ্বৎ শূদ্রের অন্ন যে কদাচারী ব্রাহ্মণের অন্ন অপেক্ষা সহস্রবার স্পৃহনীয়, একথা শাস্ত্রজ্ঞানী মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। কেন না সদাচারী শূদ্রে দোষটুকু অনুমিত, কদাচারী ব্রাহ্মণে প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ দোষীর দণ্ড বিধান না করিয়া অনুমিত দোষীর দণ্ড দেওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ। আমার মতে আমাদের সমাজে এরূপ কদাচারী ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ রহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা না করাতে শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম আমরা বিস্মৃত হইতেছি এবং সমাজেরও যথেষ্ট অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। মত্ত, কৃপণ, স্ত্রীবুদ্ধি পরিচালিত, লম্পট অসচ্চরিত্র প্রভৃতির অন্নত্যাগ যে শুভফল-প্রসূ হইবে, তাহাতে তিল মাত্র সন্দেহ নাই। তবে এ শাসন পরিচালিত করিতে ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। হায় ব্রাহ্মণ! তুমি আজ শূদ্রাপেক্ষাও হীন—তোমার সে ক্ষমতা কই ? তোমার যদি সেই পূর্ব্বের জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা ও সাত্বিক বল থাকিত, তুমি যদি অর্থলোভী বিলাস প্রিয় না হইতে, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের কি এ অধঃপতন হয় ! তুমি যদি আপনাকে আপনার রত্নময় সিংহাসনে স্থাপিত রাখিতে পারিতে, তুমি যদি খরদীপ্ত জ্ঞান গৌরব রত্নখচিত

নিঃস্বার্থপরতায় হৈম মুকুট দূরে নিক্ষেপ করিয়া সামান্য বিষয় লালসা লোভে দুর্গন্ধ পুরিত স্বার্থ সাগরে নিমগ্ন না হইতে, তাহা হইলে কি কেহ আজ এ প্রশ্ন উত্থাপন করিত! তাহা হইলে কি আজ তোমার কথার উপর কথা কহিতে কেহ সাহস করিত! তাহা হইলে কি আজ নীচাদপি নীচজনও তোমার সমান বলিয়া আস্ফালন করিতে পারে! তোমার যে অনন্ত জ্ঞানগর্ভ আদেশ উপদেশ শ্রবণে একদিন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা স্তব্ধ হইয়াছিল, তোমার যে জ্ঞানের গরিমায় স্বর্গের দেবতা অবধি নতশীর হইয়াছিল,—আজ তোমার সেই আদেশ উপদেশ মূর্খাদপি মূর্খের মুখেও কি সমালোচিত হইত! তুমি আপনি আপনার পায়ে কুঠার মারিয়াছ। আপনি হৃদয়ের বল হারাইয়া সামান্য পার্থিব-সুখান্বেষী হইয়া স্বর্গ হইতে নিম্নে—সুদূর নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িয়াছ। নিঃস্বার্থ জাতীয় প্রেম আত্মচরিতার্থতার দ্বারা সাধারণ মনুষ্যের মত বলি দিয়াছ! তাই আজ তোমার এ দুর্দশা। এ দারুণ অনপনেয় কলঙ্ক—এ শোচনীয় অধঃপতন! তোমার সে কঠোর ইন্দ্রিয় জয় আজ কবির কল্পনা মাত্র।

বাস্তবিক আমাদের এ সমাজের অধঃপতনের কারণ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব পালনে অসমর্থতা ছাড়া কিছুই নহে। ব্রাহ্মণ ঠিক সদাচারী জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্বার্থ, বিষয় বৈরাগী থাকিতে পারিলে সমাজ ঠিক চলিত। ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয় পদে, বৈশ্য—বৈশ্য কর্ম্মে, শূদ্র দ্বিজাতি সেবায় থাকিতে নিশ্চই সক্ষম হইত। মাথা বিগড়াইয়াছে, তাই হিন্দু-সমাজ-শরীর এত উচ্ছৃঙ্খল। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট এত চির প্রসিদ্ধ প্রবাদ।

যাহা হউক এখন স্পষ্ট দেখা গেল যে আমাদের এ অন্নবিচার সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এ অন্নবিচার এক হিসাবে না আর এক হিসাবে, সকল সমাজেই প্রচলিত আছে। অন্য সমাজে শুধু পাশব-ঘৃণাবৃত্তির উদ্দীপনায় ইহা ধনগত উচ্চ নীচতা অনুসারে প্রচলিত। আমাদের এ অন্নবিচারের মধ্যে মহৎ উপকারী উদ্দেশ্য বর্ত্তমান ও সমাজ-উন্নতি-সাধনের জন্য গভীর জ্ঞানের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা আর যথার্থ সাধ্য-সাধনে ইহা কোন বিঘ্ন ঘটায় না। স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে সকল জাতীর লোকেরই সমান মান্য, ধন হিসাবে পার্থক্য হিন্দু সমাজে নাই। আর সাম্যের উদ্দেশ্য সার্ব্বজনীন সহানুভূতির বিকাশ। আমাদের অন্নবিচারের কোন অংশেই তাহার সহিত সংশ্রব নাই; যদিই ইহাতে একটু উচ্চ নীচভাব আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তত্রাচ এটী সার্ব্বজনীন সহানুভূতি উদ্দেশী সাম্যের তুলনায় সামান্য বিষয়। সে সাম্যে এ সাম্যে স্বর্গ মর্ত্ত প্রভেদ। সাম্যবাদীরা সাম্যের যথার্থ অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া তিলকে তাল করিয়া speech ঝাড়েন। শূন্য জাহাজ গতিশীল হইলে, গভীর শব্দে নিজের শূন্যতারই পরিচয় দেয়।

শ্রীনৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীত।

বেহাগ—ঠুংরি।

দেখিতে তোমারে বড় ভালবাসি,
দেখা দিতে কেন চাহ না?
দেখিলে তোমারে সুখ-নীরে ভাসি
না দেখে যে প্রাণ বাঁচে না।
মধুর অধরে মধুর হাসি—
নিরখিতে বড় ভাল যে বাসি।
সে সুখে মোরে বঞ্চিত কোরে
কি ফল তোমার বল না।

শ্রীধ্রুবলাল দত্ত বর্ম্মা।

"আকিঞ্চন" পাঠে।

কে বহালে ঘরে, এত দিন পরে
এ পবিত্র নন্দন-কুসুম-বাস!
কার 'আকিঞ্চন' স্নিগ্ধ চরণ
আসিল বহিয়া অমরা-ভাস।
স্বদেশী সঙ্গীত ভুলে গিয়ে অই
বিদেশে বিস্মৃত বাস করে রই
(এযেন) মনে পড়ে পড়ে, মুখে না নিঃস্বরে—
ধরি ধরি ধরা যায় না;
লিখি বটে গান, পড়ি বটে বই,
আঁকি যারে হায় সে নহেত ওই!
(যেন) ফোটে ফোটে ফোটে, ওঠে না'ক ফুটে
ঝাপসা রুচির আয়না!
এ হেন সময়ে, কে গাহে কোথায়,—
চির পরিচিত বিস্মৃত ভাষায়,
আনন্দ জোয়ারে যেন বেগে ধায়
দিক্ চক্র বাণে পরশি!—
ফুটে উঠে সুর পঞ্চমে নিখাদ,
(যেন) দেবর্ষির বীণা বাঁধা দিব্য-ছাঁদে
কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে কাঁদে,—
অমৃতের ধারা বরষি!
এযে এ ভক্তের হৃদি, সিক্ত প্রেমানন্দে গীতি,
পিছনে পড়িয়া ভাব-মাধুর্য্য ঝঙ্কার-ভাষা
যেন বরাঙ্গিনী তম্বঙ্গীর, সকলি সে সুরুচির;
(তবু) সবারে ফেলিয়া ফুটে আঁখি দুটি ভাসা।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

নিবেদন।

কোথায় রয়েছ দেব জগৎ ঈশ্বর,
তোমারে হেরিতে মম ব্যাকুল অন্তর।
তোমারে ডাকিতে নাথ আমিত জানিনা,
অশান্ত হৃদয়ে তাই শান্তি পেলেম না।
কোথায় রয়েছ পিতঃ না পাই সন্ধান,
তোমারে নিকটে পেতে আকুলিত প্রাণ।
কি বলে ডাকিব তোমা বল দয়াময়,
হৃদপদ্মে দাসী যাহে সদা দেখা পায়।
কে তুমি? আমার দেব আপনার জন,
তোমা হ'তে এই ভবে কে বা প্রিয়তম।
তুমি ত সকলি মম আত্মীয় স্বজন,
তোমা হতে বল আর কে আছে আপন।
স্নেহেতে তুমিই দেব স্নেহময় পিতা,
যতনে জননী তুমি স্নেহময়ী মাতা।
আদরে জনক তুমি শ্বশুর আমার,
বলিতে পারি না তুমি কত আপনার।
সোহাগেতে তুমি নাথ হও প্রাণপতি,
স্নেহেতে স্নেহের পুত্র প্রাণাধিক অতি।

ব্যথার ব্যথী তুমি দেব ভগিনী আমার,
তুমিই আমার এই প্রাণের আধার।
সাকার তুমিই প্রভু তুমি নিরাকার,
ত্রাণকর্ত্তা করি তোমা কোটী নমস্কার।
তুমিত চিন্ময় চির সুন্দর আমার,
বিরাজ করিছ হৃদে নাশি অন্ধকার।
তুমিত সুন্দর ফুল হৃদয়ে আমার,
কিবা ফুল দিয়া পূজা করিব তোমার।
তুমিত জীবন-বারি পবিত্র সলিল,
তুমিত শীতল-বায়ু মলয়-অনিল।
তোমা ছাড়া এ জগতে নাহি কোন স্থান,
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
যে পদে ভুবন বাঁধা রয়েছে তোমার,
সে পদে আশ্রয় পেতে চাই বারবার।
নিজ অদৃষ্টের দোষে নিজে ভুগি হায়,
দাসীরে চরণে রেখো ঠেলিও না পায়।
তুমিই পরমব্রহ্ম দেবতা আমার,
বিপদ-তারণ তুমি বন্ধু সবাকার।
তুমি মোর অন্তরেতে আছহ সদাই,
জ্ঞানহীনা আমি নারী দেখিতে না পাই।
হৃদয়-আসন পেতে রয়েছি বসিয়া,
দয়াময় দাও দেখা বারেক আসিয়া।
শিখিপুচ্ছ বামে হেলা মুরলীমোহন,
দেবের দেবতা তুমি পতিতপাবন।
সতত বিরাজ হরি মম হৃদাসনে,
সদা যেন থাকে মন তব শ্রীচরণে।

শ্রীমতী সুহাসিনী দাসী।

গোচারণ ও গোরক্ষা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাহারা বলে, বঙ্গদেশের জল-বায়ু ভাল নয়, জন্মভূমি প্রতিকূল, তাহাদের কথার কোন মূল্য নাই, অবশ্য বায়ু-প্রকৃতির জীবগণই দুর্ব্বল; কিন্তু কৃষক, গোয়ালা, ধীবর প্রভৃতি বঙ্গ-সন্তানগণের কর্ম্ম-প্রিয়তা, অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও লৌহ-বিক্রম লক্ষ্য করিলে দেশ-মাতৃকার দোষ দেওয়া চলে না। বিংশ-শতাব্দীর অলসতা ও বিলাসিতাই আমাদের দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ। অভাব আমরা ইচ্ছা করিয়াই সৃষ্টি করি—আমরা ইচ্ছা করিয়াই মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনি। সংযম নাই—সদভ্যাস নাই—কেবল ব্যভিচার, অনাচারেই আমরা আয়ুকে হ্রাস করিয়া থাকি। আত্মদ্রোহিতা ও পরচর্চ্চা লইয়াই আমরা এতাদৃশ পতনোন্মুখ! আর যাহাদের অনুকরণ করিতে যাই, তাহারাই কি জগতের আদর্শ? পাশ্চাত্য-সভ্যতায় আমাদিগের ক্ষতি ব্যতীত উন্নতি হয় নাই। পাশ্চাত্য-সভ্যতার কুহকে পড়িয়া আমরা সদাচার এবং সরলতা হারাইয়াছি—হিংসা, বিদ্বেষ এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় আমাদিগের সমাজ বন্ধন ও একান্নবর্ত্তী-পরিবার শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে ইঙ্গিত করিয়া আফ্রিকার বর্ব্বর-নরপতি—খামা (Khama) বলিতেছেন You English take great care of your goods but you throw away your child অর্থাৎ ইংরাজ জাতি, তোমরা অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে সুদক্ষ এবং চতুর হইলেও তোমাদের শিশুসন্তানদিগকে তোমরা ফেলিয়া দাও। সমগ্র ইংলণ্ডে পরিত্যক্ত শিশুর

তালিকা শুনিলে পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে দুর্জ্জনের ন্যায় দূরে পরিহার করিতে হয়! ব্যাভিচারের এবং বেশ্যা-বৃত্তির তালিকা শুনিলে প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। অসহায়া রমণীর কাতর-আর্ত্তনাদ পাশ্চাত্য-জগতে বড় কম নহে, পেটের দায়ে কত দরিদ্রা রমণী তথায় বেশ্যা-বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা কি আমাদের দেশ ভাবিয়া দেখে? সতীত্বের আদর্শ এখনও ভারতের ঘরে ঘরে বর্ত্তমান—এই বিশাল ভারতবর্ষে দরিদ্রের কুটির হইতে এখনও সন্তোষ ও সহিষ্ণুতা দূরীভূত হয় নাই।

তাই বলি আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি করিতে হইলে, আমাদের এই উৎকট জীবন সংগ্রামের দিনে সর্ব্বাগ্রে যাহাতে জীবনধারণ করিতে পারি, তাহার উপায় আশু উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। ধান-চালের পরিবর্ত্তে পাটের-চাষ দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। খাদ্য-সামগ্রী দেশ হইতে অপরিমিত মাত্রায় বিদেশে রপ্তানি হইয়া তদ্বিনিময়ে আমাদের দেশে অসার পণ্যদ্রব্য আসিতেছে। তাহা আমরা আমাদের বহু-কষ্ট-সঞ্চিত অর্থে ক্রয় করিয়া বিলাসিতার বিশেষ পরিচয় দিতেছি, অথচ কি খাইয়া যে বাঁচিব, তাহার দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি লাগিয়াই আছে। তাহার প্রতিকারের পন্থা উন্মুক্ত করা আমাদের ক্ষমতার অতীত! আমরা "হা চাকুরী", "জো চাকুরি" লইয়াই চিৎকারে পটু। আমাদের কি আর মঙ্গল আছে! ঘরে আমাদের খাদ্য নাই, পাটের চাষে অর্থাগম করিয়া বিলাসিতায় আমরা ক্রমশঃই ডুবিতেছি। এই সব অত্যাবশ্যকীয় দেশের 'ইকনমিক্ প্রশ্ন'গুলির উত্তর সমাধান কোন চিন্তাশীল দেশবাসী করেন না। মরণশীল নিস্তেজ বাঙ্গালিজাতির অভ্যুত্থানের কি আর বেশী শতাব্দী বিলম্ব আছে?

পেটের অন্নের সংস্থান চিন্তা করিতে হইলে দেশের মধ্যে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন ও কৃষক-কুলের মধ্যে কৃষি-পদ্ধতিগুলি প্রাঞ্জল-ভাষায় বিস্তারের জন্য কৃষি-বিভাগ হইতে বা জমীদার-সমিতি হইতে বা দেশের ধনী জমীদারদের সাহায্যে আশু চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। গোরক্ষার জন্য, গো-বংশের উন্নতি-সাধন জন্য, বিদেশী দেশোপযোগী বৃষের আমদানি করার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। এ বিষয়ে বঙ্গীয়-গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। দেশের লোকের তাহাতে যোগদান করা কর্ত্তব্য।

কৃষি-বিভাগ হইতেও দেশের কৃষকদের সুবিধার জন্য বহুল সংখ্যায় তেজস্কর বৃষ রাখার জন্য চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে ডাইরেক্টার মাননীয় মিঃ জে, আর, ব্ল্যাকউড্ মহোদয় আমার মত জানিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের নির্জ্জীব ও রুগ্ন গোকুলের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, বিদেশী শোণিত অস্মদ্দেশীয় গোশরীরে আনয়ন করিতে হইবে। মনুষ্য-জগতে যে নৈসর্গিক নিয়ম আছে, তাহা পশু-জগতেও প্রযোজ্য। এ বিষয়ে আমি মৎপ্রণীত "গোপাল-বান্ধব" পুস্তকে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব ব্যবহারিক অর্থ-বিজ্ঞানের পুস্তক-গুলি দেশের লোক নাটক-নভেল ও চুটকি-

গল্পের পত্রিকা-সমূহ (যাহা দেশকে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্যে প্লাবিত করিয়াছে, তাহা) পরিহার করিয়া কদাচ পাঠ করেন না। তাই আমাদের দেশের এত দুর্দ্দশা। পাশ্চাত্য-দেশের অধিবাসীগণের অনুকরণে আমরা বিশেষ পটু, কিন্তু তাঁহাদের গুণগ্রাহী না হইয়া আমরা তাঁহাদের দোষগ্রাহীই বেশী। তাই আমাদের সমাজ-বন্ধন শিথিল, তাই আমাদের এই অধোগতি ! ! !

জীবন-সংগ্রামে বাঁচিতে হইলে, আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ হইতে হইবে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়, যাহা দেশে ইংরাজি-বিদ্যানুশীলনের ফলে চতুর্দ্দিকে প্রকটিত হইতেছে,তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে.গোজাতির উন্নতির দিকে আমাদের সম্যকরূপে মনঃসন্নিবেশ করিতে হইবে, দ্রোণ-দুঘা সুরভির বংশের উৎপাদন আমাদের দেশে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। তবেই আমরা বাঁচিতে পারিব। তাহা হইলেই আমাদের সমাজ-সংস্কার, সাহিত্যানুশীলন, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান, ইতিহাস-বিজ্ঞান ও কলা-বিদ্যার চর্চ্চা সার্থক,নচেৎ আমরা যে গভীরে—সেই তামসী গভীরে চিরতরে ডুবিব ! ! ! গোরক্ষার জন্য গোচারণ ও গোবীমার দরকার তাহার বিষয় নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

গোচারণের অভাবেই যে আমাদের দেশের গোকুলের সমধিক অবনতি হইতেছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তেজস্কর বৃষাভাব, চিকিৎসাভাব, চারণাভাব, পানীয় জলাভাব, খাদ্যাভাব, অবাধে গোহনন প্রভৃতি কারণে যে আমাদের গোদুগ্ধের ও কৃষির অভাব হইতেছে, তাহা আমরা সবিশেষ জানিয়াও তাহার জন্য যত্নবান হই না। প্রাচীন চারণ-ভূমিগুলি অর্থ-লোলুপ জমীদারগণ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মনে করেন—খুবই লাভবান হইতেছি, কিন্তু ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। গোরক্ষার জন্য আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় গোবীমা কোম্পানী বিলাতি-অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে মদীয় বিস্তারিত প্রবন্ধ পূর্ব্বের বসুমতী,হিতবাদী, আলোচনা ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। এখন চারণ সম্বন্ধে সবিস্তার বিধি আলোচনা করা কর্ত্তব্য। গোচারণের অস্তিত্ব প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে আছে। মনু, পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ গোচারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান আমলেও রাজাগণ দেশের চারণ-ভূমিগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, যেহেতু গোরক্ষণের উপর দেশের যাবতীয় কৃষি নির্ভর করিতেছে। আকবর বাদসাহের সময় গোরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, তাহা "গোপাল-বান্ধব" পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আইন-আকবরি গ্রন্থে চারণ-রক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কেবল আমাদের ইংরাজ-বাদসাহের শাসন-কালেই এই রক্ষণ-বিধির বিশেষ শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, এবং এই প্রধান কারণে আমাদের দেশের চারণ-গুলির ক্রমিক অন্তর্দ্ধান পরিলক্ষিত হইতেছে। আমাদের দেশের জমীদারগণের স্বত্বের প্রধান ভিত্তি দশশালা বন্দোবস্তের চুক্তি-পত্র এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশের ইস্তাহার-পত্রই সকল স্বত্বের মূল। দেশের রাজা [illegible] সকল করিয়া

সম্পন্ন। দেশের রাজা-প্রজাও গোবৃন্দের রক্ষক। দশশালা বন্দোবস্তের বলে রাজা প্রাচীন চারণ ভূমিগুলি জমিদারগণের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন। নূতন চারণ দান করিতে হইলে, রাজার আদেশপত্রের প্রয়োজন। বর্ত্তমান আইনের বলে রাজ-কর্ম্মচারীগণ তাহা সৃষ্টি করিতে পারেন। অথবা দশশালার চুক্তির বলেও তাহা রক্ষা করিতে পারেন। যদি এরূপ বিবেচিত হয় যে, রাজার ইঙ্গিতে অর্থাৎ বর্ত্তমান বিধির বলে কোন ক্ষমতা নাই, তাহা হইলে রাজার নূতন আইন প্রবর্ত্তিত করিয়া চারণ-রক্ষণ করার বিধি দেশে নবভাবে প্রবর্ত্তিত করিতে বিশেষরূপে চেষ্টিত হওয়া উচিত। অস্মরণীয় কাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ব্যবহার, রাজার দান, পুস্কিপ্‌শান ইত্যাদির দ্বারা চারণ-হক্ সংগৃহীত ও অর্জ্জিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিশদভাবে বেঙ্গলী, আলোচনা, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে। আমাদের বিশাল দেশে, আগে বহু কোটী কোটী বিঘা জমী পতিত পড়িয়া থাকিত বলিয়া দেশের গবাদি পশুবৃন্দের অবাধে চরিবার কোনরূপই ব্যাঘাত ঘটিত না কিন্তু আজকাল লোক-সংখ্যা বেশী হওয়ায় অনেক জমী উঠ্‌তি হইতেছে। রাজা প্রজার স্বত্ব-সংরক্ষণ জন্য রাজদরবারে অনেকরূপ মামলা-মোকদ্দমা হইতেছে। দেশে সার্ভে প্রবর্ত্তিত হইয়া এই স্বত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে বলিয়া গবাদির চারণের অভাব হইতেছে। ইংলণ্ড-দেশে চারণের পৃথক বিধি আছে, চারণ প্রস্তুতের স্বতন্ত্র নিয়ম আছে, তজ্জন্য নানাবিধ পুস্তকও আছে। দেশের মধ্যে কি কি প্রকারের ঘাস জন্মে, কিরূপে তাহাদের বীজ তোলা বা রক্ষিত হয়, কোন কোন ঘাস পুষ্টিকর, তাহার গণীকরণ আছে কিন্তু আমাদের মুখসর্ব্বস্ব দেশে তাহার কিছু নাই। পোড়া দেশের বিলাসী লোকের এই সব দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। চারণের আইন আমাদের দেশে কতিপয় নজীরের উপর অবস্থিত আছে। ভূম্যাভাবে প্রজা ও অর্থ-লোলুপ জমীদারবর্গের মধ্যে স্বত্ব-সংরক্ষণ জন্য আজকাল দুই একটি মকদ্দমা আইন-আদালতে দৃষ্ট হইতেছে। কক্স ও রায় জজদ্বয় সেদিন ১৮ ক, উ, নো, নজীর বহির ৭৩৫ পৃষ্ঠার নজীর-বলে এই হকটুকু স্পষ্টরূপে আমাদের দেশেও প্রবর্ত্তিত করিয়া কৃষক-বৃন্দের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। ৩১ কলিঃ ৫০৩ পৃষ্ঠায় প্রিভিকউন্সিলের নজীরটী এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্থল। তাহা ছাড়া ৯ কলিঃ ৬১৮ নজীরটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোরক্ষা সম্বন্ধে স্যার মুখোপাধ্যায় ও বীচ্‌ক্রফ্‌ট্ জজদ্বয় সেদিন নিম্নলিখিত মোকদ্দমাটির সুবিচার করিয়া গোরক্ষণের ও দুগ্ধ-সরবরাহের পথ উন্মুক্ত করিয়া ভারতবাসীর বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গো-রক্ষা সম্বন্ধে আজকাল কাগজপত্রে খুবই আন্দোলন চলিতেছে। রাজ-দরবারে ও জজ স্যার মুখোপাধ্যায় ও মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের আদালতে সে সম্বন্ধে এক অভিনব মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। মামলার ঘটনাটি এইরূপ,—নদীয়াবাসী এক ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এই চুক্তিতে একটি গোবৎস বিক্রয় করে যে, মুসলমান বৎসটিকে অপর কাহাকেও বিক্রয় করিতে

পারিবে না। যদি একান্তই বেচিবার আবশ্যক হয়, তবে বিক্রেতাকেই পুনরায় বেচিতে হইবে। বৎসটিকে বদল করিতে পারিবে না, যদি ক্রেতা তাহা করে, তবে ৫০৲ খেসারৎ ও ১০৲ প্রায়শ্চিত্ত খরচা দিতে হইবে।

ক্রেতা তোমিজ মণ্ডল বৎসটির মুণ্ডচ্ছেদ করায় বিক্রেতা সুরেন্দ্র বসু দিগর ৬০৲ খেসারতের দাবী দিয়া চুয়াডাঙ্গার আদালতে মোকদ্দমা রুজু করে। বাদীর চুক্তি সাধারণ নীতির (Public Policy) বিরুদ্ধ বলিয়া চুয়াডাঙ্গার মুন্সেফ বাহাদুর বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। বাদী হাইকোর্টে মোশান করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩৪০ নং সিভিল রুল প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত উভয় বিচারপতি উক্ত রুলের বিচার করিয়া বলেন যে, বাদীর চুক্তি-আইন ও নীতিবিরুদ্ধ নহে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা বাদীর স্বপক্ষে মোকদ্দমার ডিক্রী দিয়াছেন।

এই সংবাদ দেশের গো-খাদকদের পক্ষে হানিকর হইলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কতকটা মঙ্গলজনক। দুগ্ধব্যবসায়ী ও গোয়ালারা এইরূপ চুক্তিতে গো-বৎস বিক্রয় করিলে দেশের তেজস্কর গাভী, বকনা এবং বৃষকুল সমূলে ধ্বংসের হাত হইতে কতকটা রক্ষা পাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয়। এই ন্যায়সঙ্গত বিচারের জন্য মহামান্য জজ মহোদয়গণ দেশের সমগ্র কৃষককুলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য-সভ্য-দেশে চারণ, কমন্‌স্‌, গ্রাম্য-গাছতলায় চড়িভাতি করা, মেষ, ছাগল, ঘোড়াদি গৃহপালিত পশুর অপরের জমিতে চরাণ বা ছাড়ার পৃথক রীতি ও বিধি আছে। ইহার সম্বন্ধে মল্লিখিত একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই বসুমতীতে প্রকাশিত হইবে।

আমাদের দেশে গো-চিকিৎসার বড়ই অভাব। গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে কেহ যদি দেশী প্রচলিত ঔষধ ও বিধি সংগ্রহ করিয়া আমাকে দিতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব এবং তজ্জন্য প্রকৃতই দেশের মঙ্গল করা হইবে। আমি "গোপাল-বান্ধব" দ্বিতীয় ভাগে তাহা সন্নিবেশিত করিতে বাসনা করি, ঐ পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। গো, মেষাদি গৃহপালিত পশু-রোগের যাবতীয় চিকিৎসা এই পুস্তকে সরল-ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারায় দেশের মহীয়সী হিতসাধিত হইবে। এরূপ পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ইহার জন্য নাম রেজিষ্টারী করা প্রয়োজন. মূল্য সামান্যই হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জনন নীতিগুলি মনুষ্য ও পশু-জগতে সমভাবে প্রযোজ্য। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি, বেদ, পুরাণের কথায় আমরা বড় আস্থাপ্রদান করি না। তাই আমাদের নবশিক্ষা-মন্দির পাশ্চাত্য-দেশ বিলাত হইতে ফিরিয়া এসব কথা বলিলে বিশ্বাস হয়। কেল্‌ট্‌-জাতির শক্তি হ্রাস হইলে, নিয়ামার-শোণিত বৃটন-শোণিতে মিলিত হইয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিল। তাহারা ইতিহাস-পৃষ্ঠে বহু শতাব্দী যাবৎ খেলা খেলিয়া নিস্তেজ হইয়া আসিলে, নরম্যান্‌-শোণিতের আমদানি করিয়া এক প্রভূত ক্ষমতাশালী জাতির সৃষ্টি হইল। এই জার্ম্মাণ-জাতি নিস্তেজ হইয়া আসিলে,

জার্ম্মাণ-রক্ত ইংরাজ-ধমনীতে প্রসারিত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান তেজস্বী, মনস্বী, সভ্য জগৎ গুরুকারী বর্ত্তমান সাহসী ও রাজশক্তিসম্পন্ন ইংরাজ-জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছে। সেইরূপ বর্ত্তমান-কালে বিলাতি কয়টি বংশের গো-পরিবার জগদ্বিখ্যাত।

শর্টহর্ণ, কেরী, ডেক্‌সিটার, ডিভন-আর্-শিয়ার, হাইল্যাণ্ড, ফাইলো-জার্সি, সফর্ক, গেলোয়ে প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গো-পরিবারগণ এক দিনের অধ্যবসায়ের ফল নহে। এই সম্পর্কে, বেট্‌, কলিংউড্, বুথ্ ডিশ্‌লী, ইয়ঙ্গ প্রভৃতি মনস্বী-গণের শতাব্দী কালব্যাপী চেষ্টা ও অধ্যবসায় বিলাতের নামকে শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে. আমাদের দেশের গুজরাট্,সিন্ধ, কৃষ্ণা, কাভেরী, দেশী, সাহিওয়াল প্রভৃতির গোকুল উপেক্ষার জিনিস নহে। তবে তাহাদের দিন দিন অবনতি হইতেছে,তাহা নিবারিত করিবার চেষ্টা আমাদের দেশের লোকের আদৌ নাই। আমাদের শিক্ষা নাই তাই হয় না। আমরা গোরক্ষার মূলমন্ত্র, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও নীতিগুলি হারাইয়াছি। পরাশর ও ভেড়-ঋষির পুস্তকের প্রচার আমাদের দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছে। আমাদের বহুকালের সঞ্চিত ধন আমরা হারাইয়া "বিষহীন ঢোঁড়া" হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তাই আমরা পাশ্চাত্য মেকী-মুকুরে দূরের পদার্থ দেখিয়া আসল বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইয়া মেকিত্ব উপলব্ধি করতঃ পরে নৈরাশ্য-সাগরে হাবুডুবু খাই। পরাশর ও ভেড়ের পুস্তক কাহারও নিকট থাকিলে আমাকে পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইবে।

এখন আন্তর্গণিও ও বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমি বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের পক্ষপাতী,কারণ তেজস্কর শোণিত দেশী গোশিরায় প্রবাহিত করাইয়া দুর্ব্বল ভারতীয় গোকুলের উন্নতি-সাধন করা দরকার। এ বিষয়ে আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং অত্রস্থলেও পুনশ্চ বলিতেছি যে, মনুষ্য-জগতের নিয়ম পশু-জগতেও সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ, নৈসর্গিক নিয়ম (Law of nature) অপরিবর্ত্তনশীল ও নিত্য। সেই কারণে আজ-কাল আমরা ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে, বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিবাহ দেখিতে পাই। এই সকল আধুনিক সংযোগলব্ধ সন্ততি-গুলি বলিষ্ঠ, তেজস্কর এবং সারবান্ হইয়া থাকে। সেইরূপ হান্সি, মণ্টোগো মেরী প্রভৃতি সুরভীকুল বেশী দুগ্ধদায়িকা গুণযুক্ত হইলেও বহুকালের বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের ফল। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ভগ-বানের উৎপাদিত ব্রজের গোকুল এক স্বতন্ত্র পরিবার। নন্দ তাহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই গোকুলের চরম উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাদিগকে "মথুরাপুরী" এই আখ্যা দিয়া যান। এই গোজাতি অদ্যাবধি ভারতবর্ষে "মথুরাপুরী" গাভী বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

পুষা কলেজের অধ্যাপকবর্গ এবং ভেটারি-নারি বিভাগের কর্ত্তা মেজর স্মিথ্ ও কৃষি-বিভাগের কর্ত্তা মাননীয় মিঃ ম্যাক্‌উড্ প্রমুখ মহোদয়গণ বৈজ্ঞানিক-সংযোগের বিরোধী, তাঁহারা স্বগণে নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। আমার

বিবেচনা হয় যে, ইহা দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে অধিক সময় আবশ্যক এবং ভারতের গোকুল যেরূপ অবনতিগ্রস্থ হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের শিরায় পাশ্চত্য-শোণিত প্রবেশ করাইতে না পারিলে উন্নতির আশা নাই। উপরোক্ত মহোদয়গণ বলেন যে,ঐ জাতীয় গবাদি এদেশের জল-বায়ুতে অবনতি প্রাপ্ত হইবে। তাহা সত্য হইলেও যত্ন চেষ্টা, ব্যায়াম ও খাদ্যের দ্বারা সে অসুবিধা অতিক্রম করা অসাধ্য নহে। বৈজ্ঞানিক উৎপাদন (Cross breeding) যদি পৃথিবীর সকল দেশে আশানুরূপ ফল দেয়, তবে ভারতে দিবে না কেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল।

অবসান।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সভাগৃহ।

(রাম, লক্ষণ, ভরত, বিদূষক ও সুমন্ত্র।)

রাম। (স্বগতঃ) কেন কাঁদে কঠিন পরাণ এবে ?
তখনত এই প্রাণ, এই হৃদি ছিল,
কাঁদে নাই কি লাগি তখন ? .
এই ব্যথা এই ব্যাকুলতা,
এই শত বৃশ্চিক দংশন,
কেন প্রাণে হয়নি তখন ?
তা'হলে কি হ'ত হেন সর্ব্বনাশ ?
অনুদিন জীবনের পঞ্জরে পঞ্জরে,
জলিছে যে দাবানল,
অশ্রুজল ঢালি অহর্নিশি
নিবাতে পারিনি যাহা,
তাহা কি জলিত হৃদিমাঝে ?
সে অনলে জ্বালাইতে মোরে,
শত্রু যেন হয়েছিল সবে।
যেই মাত্র দুর্ম্মুখের মুখে
শুনিনু দারুণ বাণী
কলঙ্কিণী জনক-নন্দিনী
সংসার অমনি,এক বাক্যে দিল যোগ তাহে।
মরমের অস্ফুট রোদন,
সুহৃদের নিষেধ বচন
হৃদি মাঝে নাহি পেলে স্থান।
তুচ্ছ লোক অপবাদ ভয়ে,
উদ্বেল হৃদয়ে, কাঁপিল পাষাণ প্রাণ।
লোক তুষিবারে, প্রজারঞ্জনের তরে,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
বিসর্জ্জন করিনু তাহারে ;
পূর্ণ গর্ভবতী দেবী মূর্ত্তিমতী,
পতি পাশে, জানালে সোহাগ ভরে
যাবে বন দরশন হেতু ;
জানিত কি সরলা হরিণী
পতি তার নিষ্ঠুর নিষাদ ?
বিসর্জ্জিবে জনমের মত,
গহন কানন মাঝে ;
রাজ্য সুখ চরণে দলিয়া,
সন্ন্যাসিনী সাজি পতি সনে
বনচারী পতির সঙ্গেতে
যে সতী পশিল ঘোর বনে,
সে চরিত্রে কলঙ্ক সন্দেহ ?

ধিক্ মোরে শত ধিক্ !
আহা ! সেই পরীক্ষার দিন,—
এখন আসিছে আঁখি পথে,
ম্লানমুখ অশ্রুময় আঁখি
দেহ কান্তি অস্থি চর্ম্মসার,
সে মূরতি—কলঙ্কিনী পাবে কোথা ?
তবু আমি পাষাণ হৃদয়ে
মূর্ত্তিমতি সে দেবী প্রতিমা,
পরীক্ষার তরে,
আহুতি দিলাম হুতাশনে
হাঁসি মুখে জ্বলন্ত অনলে,
প্রবেশিল সুহাসিনী ;
সতীর পরশে অনল শীতল হ'ল ;
পুষ্পসার বরষিল দেব—
সতীত্ব গৌরব
পরশিল স্বরগের সীমা ;—
সেই দিন যা কিছু সন্দেহ
পুড়ে হয়েছিল ছাই—
কেন ঠাঁই দিনু তবে লোক অপবাদে
এ দগ্ধ হৃদয় মাঝে ?
রাজা আমি,
কিবা ভয় ছিল অপবাদে
কিবা কাজ ছিল মোর প্রজার রঞ্জনে
রাজ্যে মোর কিবা ছিল সুখ ?
সিংহাসন চরণে দলিয়া
সঙ্গে লয়ে জনক-নন্দিনী,
কেন নাহি পশিনু কানন মাঝে ?
প্রাণ রাখি সীতা কেন দিনু বিসর্জ্জন ?
সীতা বিনিময়ে প্রাণ দিলে জুড়াইত জ্বালা,
যা বিহনে নন্দন শ্মশান হয়
সুখ রাশি সাথে যার যায়,
সে গেল পরাণ কেন থাকে ?
হ'ল সীতা কাননবাসিনী,
জ্বালিলাম শ্মশান অনল পুর-মাঝে,
সেই স্নেহ, সেই প্রেম, সেই সমবেদন,
একে একে পুড়ে হ'ল ছাই।
রহিলাম একাকী অভাগা,
দগ্ধ হতে স্মৃতির অনলে
সে দুঃখেরও হয়েছিল অবসান
যুগ্ম শিশু কোলে,
রাজলক্ষ্মী এসেছিল সিংহাসন পাশে,
হায় ! কোথা সে ম্লান মুখ
চুম্বি শত সোহাগ পরশে
অশ্রু ধৌত হৃদয় আসনে—
বসাইব জনমের মত—সে দেবীপ্রতিমাখানি,
তা না হ'য়ে পাপ মুখ হ'তে
পাপ পরীক্ষার কথা
বাহির হইল পুনর্ব্বার—
কত আর সবে বল কোমল পরাণে ;
গেল সতী স্বরগের পথে,
শুষ্ক মরু, ভগ্ন হৃদি মোর
হা সীতা ! হা জনম-দুঃখিনী,
তোমা হারা হ'য়ে,
এখনও রয়েছি আমি, এ শ্মশান ভূমে ;
ভাসাইয়া প্রাণের সে প্রাণ—
কুঠার হানিয়া নিজ পায়,
ব্যাধ আমি, পত্নীঘাতী আমি,
রয়েছি জীবিত ভবে,
রয়েছি জীবিত আজি,
দ্বিধা হও জননী বসুধে

একবার সেই ভাবে
যে ভাবে লয়েছ কোলে তুলে,
স্নেহময়ী তনয়ারে তব,
সেই ভাবে কর গ্রাস অভাগারে।
শতধা বিদীর্ণ হয়ে গগন মণ্ডল,
পড় আসি অভাগা মস্তকে—
লুপ্ত হ'ক অস্তিত্ব রামের—
মুছে যা'ক রাম নাম,
আর না সহিতে পারি জ্বালা।

সুমন্ত্র। দেব! সীতা দেবী জনমের মত
আঁধারিয়া গেছেন ভুবন—
রোদনে কি ফিরিবেন আর?
এবে অশ্রু বরিষণ
দুর্ব্বলতা প্রকাশ কেবল।
রাম-হৃদি শোকের তাড়নে
হয় যদি এ হেন ব্যাকুল
তা হ'লে নিশ্চয়
রাম চরিত্রে, লাগিবে কলঙ্ক রেখা।

রাম। হা সুমন্ত্র! কলঙ্ক লাগিতে
এখন আছে কি বাকি?
জগজন ঘৃণার নয়নে,
চাহে না কি রাম পানে?
এখন কি ঘৃণার সহিত
উচ্চারে না রাম নাম?
দিছি বিসর্জ্জন
জনমের মত সব
রোদনে আমার সুখ এবে
কাঁদি তাই অবিরাম।

ভরত।—আর্য্য।
নির্দ্দয়তা নিষ্ঠুরতা হয়ে থাকে যদি,
প্রজার রঞ্জন তরে,
এবে তার বৃথা অনুতাপ।
দূরে যা'ক দুরাগত স্মৃতি—
কর্ত্তব্য পালিয়া
রামচন্দ্র শোকেতে বিহ্বল—
কহে যদি প্রজাগণ,
বিষম বাজিবে প্রাণে
জানে সবে কোশল ভূপতি
প্রজা রঞ্জনের অনুগত।

রাম।—হায় ভ্রাতঃ।
চাহি না'ক রাজ-সিংহাসন
কাজ নাই প্রজার-রঞ্জনে
প্রাণের প্রতিমা বিসর্জ্জন,
যে রাজ্যের পরিণাম
সে রাজ্য যা'ক রসাতলে।

সুমন্ত্র।—অসহ্য বিরহ বটে দেব!
তবু প্রাণ ধৈর্য্যের বন্ধনে
যতনে বাঁধিতে হবে;
রাজ্য এবে অরাজক প্রায়
সর্ব্বস্থানে শত অমঙ্গল
সমুদিছে দিন দিন,
বহু ক্লেশে কাতর প্রকৃতিপুঞ্জ—
রামরাজ্যে সম্ভবে কি ইহা?

রাম।—নহি রাজা, নাহি প্রজাপাল
রাজদণ্ড স্পন্দহীন মোর
রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হয়েছেন এবে।
কহ প্রজাগণে, রাম-রাজ্য নাহি আর
রাম নাম ঘৃণার সহিত
উচ্চারণ করুক সকলে।

বিদূষক।—(স্বগতঃ) সংসার আঁধার হেরি

ব্রাহ্মণী লুকালে ;
বিরহে ব্যাকুল হয়ে
কাঁদি সংগোপনে।
(প্রকাশ্যে) মহারাজ ! ক্ষমা করিবেন মোরে
একটী ভারি কথা আছে
বিদিত—সংসারে ;
লোকে বলে ;—
স্ত্রী বিনে ঘর-কন্না অন্ধের হাতে আরসি ;
নেড়ার মাথায় উকুন দেখা,
হাঁড়ির মাছে বড়সি।
অচল সংসার যদি, না থাকে গৃহিণী,
কেমনে চলিবে রাজ্য বিনা রাজরাণী।
তাই কহি, মহারাজ, করুন বিবাহ ;
দুই হাতে লুচি-মোণ্ডা লুটি অহরহঃ।
রাম।—হায়, ভ্রান্ত অবোধ ব্রাহ্মণ—
কেমনে বুঝিবে তুমি এ হৃদয়-ব্যথা ?
দেবীর আসনে, মানবী বসিবে আসি,
সীতার বিনিময়ে অন্য রমণীর সাধ ?
জগতে সুষমা নাহি আর
নাহি পবিত্রতা ধরা-মাঝে
বুঝি সব প্রিয়তমা সাথে
করিয়াছে অন্তর্ধান।
লক্ষ্মণ।—শূন্য হৃদি শূন্য মোর প্রাণ,
চির-শূন্য এ অযোধ্যা ধাম,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা-রাশি যত—
নিমজ্জিত অতল সাগরে
কি প্রবোধে বাঁধিব হৃদয় আর ?
মর্ম্মের গঠন
কিবা আর আছে এ জীবনে।
ছার প্রাণে ছিল না ত অন্ত সুখ-সাধ ;
সাধ হ'ত জনকনন্দিনী—
বসিবেন রাজ-সিংহাসনে
চির দাস—দাস ভাবে দাঁড়ায়ে সম্মুখে
সেবিব চরণ-যুগ,
বনে যাঁর স্নেহে, ভুলেছিনু জননীর স্নেহ—
রণে যাঁর স্নেহ স্মরি
হ'ত দেহে দ্বিগুণিত বল,
হায় ভাগ্যদোষে, জনমের মত
হারানু সে জননীরে।
ভরত।—কেন ভাই বাড়াও যন্ত্রণা,
একে আর্য্য শোকেতে আকুল,
তাহে যদি তুমি নহ স্থির,
অধীর হবেন রঘুনাথ।
লক্ষ্মণ। ইচ্ছাতে কি কাঁদি দেব !
পূর্ব্বস্মৃতি দিতেছে যাতনা—
সেই নির্ব্বাসন চিত্র শোণিত অক্ষরে ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে লেখা।
আনি রত্ন সিন্ধুগর্ভ হ'তে
পুনঃ নিক্ষেপিনু সিন্ধু-মাঝে ?
নিজ করে কান্তার মাঝারে,
বিসর্জ্জিনু স্নেহময়ী জননীরে মোর।
সেই জাহ্নবীর তীরে, নিবিড়-কান্তারে,
আঁখি নীর লুকায়ে যতনে,
একাকিনী রাখিয়া মায়েরে
ফিরাইনু যবে রথ,
কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে কহিলা জননী,
"লক্ষ্মণ কোথায় যাও"
আহা কি নিষ্ঠুর কথা !
বাহিরিল পাপ মুখ হ'তে,
উচ্চরোলে নিনাদিল প্রতিধ্বনী

কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধ হইল আমার।
হায়! কেন অশনি-সম্পাতে
এ মস্তক হ'ল না বিদার!
এ নয়ন কেন অন্ধ হ'ল না তখন!
লক্ষ্মণ রহিল কেন ভবে?

বিদূষক। (স্বগতঃ) বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্।
কেঁচো তুল্‌তে সাপ॥
কপালে কিছু নাই।
বিপরীত হ'ল তাই॥
তুষের আগুন জ্বলে।
তা কেমন করে ফলে॥
কোথা ষোড়শ উপচার।
না হল হাহাকার॥

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। মহারাজ! সন্ন্যাসী জনেক;
যাচে আসি রাজ-দরশন
আজ্ঞা যদি, আসে রাজ-সভা-মাঝে।

রাম। (স্বগতঃ) সন্ন্যাসী এসেছে দ্বারদেশে?
কিন্তু প্রাণ কেন হতেছে ব্যাকুল?
বাম আঁখি স্পন্দন কি লাগি?
একি বামঅঙ্গ স্পন্দে কেন ঘন!
সাক্ষাতের আশে
সন্ন্যাসী এসেছে দ্বারদেশে,
যাবে ফিরি জানায়ে প্রার্থনা তার;
ভয়ের সঞ্চার; কি লাগি অন্তরে মোর!
হৃদয়ের অন্তরালে বসি,
কে যেন নিষেধ করে মোরে।
নিয়তি কি সঙ্কেত করিয়া
ক্রুর ভবিতব্য কথা দিতেছে জানায়ে?
অকুশল—অকুশল ঘটিবে কি পুনঃ?
রঘুকুলে কলঙ্কী রামের
কিবা অকুশল আছে আর।
(প্রকাশ্যে) যাও,প্রতিহারী—
সসম্মানে সন্ন্যাসীরে ল'য়ে এস হেথা।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) দিগন্তের দূরপথে
নিদাঘ সন্ধ্যায়—
জলদ গর্জন যথা বহে ধীরে ধীরে;
ঝটিকার সন্দেহ সংবাদ
তেমতি এ সন্ন্যাসীর নাম
কম্পিত করিল প্রাণ ঘোর।
সন্নিকট হ'ল কি গো অশ্রুর প্লাবন?
আসে কি সন্ন্যাসী, সঙ্গে লয়ে
অশ্রুরাশি,
পুরবাসী কাঁদাবার তরে?
নহে হৃদি কি লাগি চঞ্চল,
সেই বীভষিকা ছায়া, সেই অন্ধকার
চারিদিকে আবরিছে যেন।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।—
কৌশল্যা গর্ভ সম্ভূতং জগন্মঙ্গলকারণম্।
কাকুৎস্থং দশবক্ত্রারিং রাজেন্দ্রং পুরুষোত্তম
মৈথিলীনয়নাম্ভোজ সম্পূজিত কলেবরম্।
লক্ষ্মণানুচরং শান্তং নীলকীলালজেক্ষণম্॥ ২
আজানুলম্বিসুভুজং স্বর্ণকেয়ূর ভূষিতম্।
রত্নাম্বুবিদ্ধসিংহস্থং রঘুসন্ততি দীপকম্॥ ৩
ইন্দ্রায়ুধপ্রভং চাপং বেত্রন্তং বিপুলোরসম্।
বানরেন্দ্রসখং পূর্ণব্রহ্মরূপং সনাতনম্॥ ৪
শিলা যয্যা হ্যহল্যায়াঃ শাপমোচন কারণম্
মারুতেন বলবতা সংকীর্ত্তিতগুণং প্রভুম্॥ ৫

পরশুধাগ্রনামস্ত যুধি হীন পরাক্রমম্।
পিতুর্ব্বাক্যকবং দাশরথিং পূজিতচেষ্টিতম্॥ ৬
সদা সহাস্যবদনং দয়ালুং দীন বৎসলম্।
গোপ্তারং কোশলাধশং জগদানন্দ বর্দ্ধনম্॥ ৭
অনন্তগুণ সংযুক্তং সংসারার্ণব তারকম্।
পাপিহাপেক্ষামাত্তস্তং ভজামি বিগতের্গতিম॥ ৮॥ *

আশীর্ব্বাদ করি রঘুনাথ।
জয় হ'ক সত্যের তোমার,
লোকান্তর বাসী সন্ন্যাসী অতিথি আমি
দেবকার্য্য জীবনের ব্রত,
আসিয়াছি গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনে
আজ্ঞা হলে করিব প্রকাশ।

রাম। কৃতার্থ হইনু দেব।
তব আগমনে
পবিত্র হইল পুরি;
কি উদ্দেশ্য, কিবা অভিলাষ
অসঙ্কোচে করুন প্রকাশ।

সন্ন্যাসী। অতি নিরজনে
প্রকাশিব উদ্দেশ্য আমার,
তুমি আমি বিনা,
জন প্রাণী নাহি র'বে তথা,
সত্য প্রিয় তুমি রঘুনাথ,
অভিপ্রায় প্রকাশের আগে,
সত্যে বদ্ধ হও তুমি এক।

রাম। কৃপা করি করুন আদেশ,
সত্য ভঙ্গ নাহি করে রাম।

সন্ন্যাসী। সেই বিশ্বাসে ত'
আশ্বাসে বেঁধেছি প্রাণ।
যশে তব পূর্ণ বসুন্ধরা

অলৌকিক শুনি তব সত্যের পালন,
শুন তবে শুন মহারাজ
সংগোপনে বসি দুই জনে,
মনোভাব প্রকাশিব যবে,
প্রাণী মাত্র না থাকিবে তথা,
এ আদেশ করিবা প্রচার,
তবু যদি আসে কোন জন
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর যদি,
কর অঙ্গিকার পরিহার করি
মায়ামোহে
জনমের মত তারে করিবে বর্জ্জন।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) কি ভীষণ সত্য অঙ্গিকার
এ আবার কি নবীন প্রহেলিকা?
সন্ন্যাসী আকার হেরি বার বার,
প্রাণ মোর সন্দেহ আগার,
নহে কি মানব এই জন?
এই জ্যোতিঃ এ ভীষণ কঠোর-মূরতি,
মানবে কি সম্ভবে কখন?
মূর্ত্তি চাহি অনিমিষ রহিতে না পারি।
আঁখি যেন যায় ঝলসিয়া
মনে হয় যমদূত বুঝি,
ছদ্ম বেশে এসেছে ছলিতে।

রাম। হে সন্ন্যাসী, দেবতা প্রসাদে,
আজীবন সত্য-অনুগামী দাস,
প্রাণ দিয়া সত্য ধর্ম্ম করিব পালন
অঙ্গিকার করিলাম আমি।
"যবে নিভৃতে রহিব মোরা,
সে কক্ষেতে পশে যদি কোন জন,
হয় যদি প্রান প্রিয়তম,
তবু তারে করিব বর্জ্জন।

* বৃহৎ সম্পাদিত চিত্র কাব্যাদ্ হইতে গৃহিত।

এবে উপস্থিত বিশ্রাম সময়,
হইয়া সদয়,
এ আলয়ে আতিথ্য লভুন আজি ;
শুনিব উদ্দেশ্য কল্য প্রভাত সময়ে।
(লক্ষ্মণেরপ্রতি) শুন ভ্রাতঃ
গুরুতর সত্য অঙ্গিকারে
আবদ্ধ হইনু আমি,
অন্য প্রহরীরে বিশ্বাস করিতে নারি
তুমি কাল অতি সাবধানে
রক্ষিবে গৃহের দ্বার,
আসে যদি দেব কোন জন,
পশিতে না দিবে তারে গৃহে।
না জানি সত্যের ছলে ঘটে কি বিপদ।
(বন্দীগণের প্রবেশ ও সমস্বরে গীত)
রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতি সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং
ধার্ম্মিকং॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং
শান্তিমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং
রাবণারিং॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ঃ পতয়ে নমঃ॥ *
(সকলের প্রস্থান। পটক্ষেপন।

শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী।

হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, জগতের অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যশালী, মা অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ পবিত্র-মূর্ত্তি-বিরাজিতা ৺কাশীধামের প্রসিদ্ধ যোগী, ভগবানের অবতার, মৌনব্রতাবলম্বী মহাপুরুষ, শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ্য স্বামীর কথা অনেকেই জানেন, এমন কি, যাঁহারা কিছুকাল পূর্ব্বেও ৺কাশীধামে গিয়াছেন—তাঁহারা অনেকেই উক্ত মহাপুরুষকে দেখিয়া থাকিবেন। সে কি পবিত্র-মূর্ত্তি, কি ভক্তি-রসাত্মক ছবি ; যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারিয়াছেন। সে মূর্ত্তি দেখিলে, এমন পাষণ্ড নাই যে, হৃদয়ে ভগবৎ-ভক্তির উদয় না হয় ; স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে, তাঁহার পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে ইচ্ছা না হয়। যিনিই তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই ভক্তি-ভাবে পদধূলি গ্রহণ করিয়া জীবন চরিতার্থ করিয়াছেন। সেরূপ সংযমশালী মহাপুরুষ কোথাও কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি শুনিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তিনি কত কালের, কত যুগের লোক ছিলেন, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেন-না,—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাঁহার নিকটেই উক্ত মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিই বলেন,—"আমি আমার বয়স পর্য্যন্ত ঐ রকম একই চেহারায়, একই আকারে দেখিতেছি।" তবেই, তিনি কত যুগের লোক ছিলেন, তাহা ঠিক করা কঠিন। যখন তাঁহার বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা কি প্রৌঢ়াবস্থাও কেহ দেখে নাই, সকলেই বৃদ্ধাবস্থা দেখিয়াছে, তখন তিনি যে বহু কালের, বহু যুগের প্রাচীন ঋষি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

৺কাশীধামের মণিকর্ণিকার ঘাটের পার্শ্বে

---

* কবি কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণ হইতে গৃহিত।

ছোট একটী মন্দির আছে। উহাই মহাপুরুষের যোগস্থান ছিল। তিনি মৌনব্রতাবলম্বী চির-সমাধিপ্রাপ্ত যোগী ছিলেন। কখন কাহার সহিত কথা বলিতেন না। কিম্বা কোন প্রকার আকার ইঙ্গিত করিতেও কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই। তিনি চিরসমাধি-প্রাপ্ত হইয়া যোগসাধনে নিরত ছিলেন। তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনও কিছু আহার করিতেন না; ভক্তিভাবে যিনি যাহা খাওয়াইয়া দিতেন, তাহাই তিনি গলাধঃকরণ করিতেন। সে প্রকারে খাওয়ানও কষ্টে সৃষ্টে হইত, কারণ উক্ত মহাপুরুষ নিজে হস্ত দ্বারা কিছু স্পর্শ করিতেন না। তাঁহাকে যিনি যাহাই খাবার দিতেন, তাহা তরল বস্তু ভিন্ন কঠিন বস্তু দিতেন না। তাহাও একজনে উক্ত মহাপুরুষের মুখ হা করিয়া ধরিলে, একজনে গলায় ঢালিয়া দিত, তবেই তাহা উদরে যাইত, নচেৎ খাওয়াইবার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। দারুণ শীতে, দারুণ গ্রীষ্মে, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে, কখনও জলে, কখনও স্থলে, কখনও রৌদ্রে, কখনও ছায়ায়, কখনও ধূলায়, কখনও কাদায়, কখনও বা শুষ্ক ভূমিতে—বসিয়া, শুইয়া, দাঁড়াইয়া অথবা গড়াগড়ি দিয়া তিনি কাল কাটাইতেন।

যোগ-সাধনে সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া কোন সময়ে জপ-তপ করিতেন, কি—না করিতেন, কিম্বা জপ-তপ করার আবশ্যক ছিল কি -না, তাহাও কেহ জানিতে পারে নাই। কোন কোন ভগবৎ-প্রেমিক মহাজন দারুণ-গ্রীষ্মে মহা-পুরুষকে তালবৃন্ত দ্বারা ২।৩ ঘণ্টা যাবৎ ব্যজন করিয়া দিতেন, আবার কেহ কেহ দারুণ-শীতে তার্শ শাল, আলোয়ান কি কম্বল কিনিয়া দুই ভাঁজ তিন ভাঁজ করিয়া ভাঁজিয়া শীত নিবারণের জন্য গলার সহিত বাঁধিয়া দিতেন; তাহাও যতক্ষণ কাপড়ের সেই গাঁট থাকিত, ততক্ষণ গায়ে থাকিত, এবং খুলিয়া গেলে, যখন যে স্থানে যে ভাবে খুলিয়া যাইত, সেই স্থানেই তাহা পড়িয়া থাকিত। তাহা তিনি আর স্পর্শ করিতেন না। এ সম্বন্ধে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার কথা অনেকের মুখেই সত্য বলিয়া শুনা যায়। ঘটনাটী এই:—৺কাশীধামের কোন প্রসিদ্ধ মহাজন একদা শীতকালে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে যাইয়া, তথায় ঘাটের উপর উলঙ্গ-অবস্থায় উক্ত মহাপুরুষকে দেখিতে পান। তাহাতে উক্ত ব্যক্তির মনে ভগবৎ-ভক্তি উদিত হওয়ায় তিনি তখনই অতি মূল্যবান একখানি শাল নিজের দোকান হইতে আনাইয়া মহাপুরুষের গলায় শীত নিবারণের জন্য বাঁধিয়া দেন। পূর্ব্ববঙ্গ বিক্রমপুর নিবাসী * * * নামক এক ব্যক্তি ৺কাশীধামে তীর্থ করিতে গিয়া, তিনি ঠিক ঐ সময়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে যাওয়ায় তাঁহার নয়ন-পথে ঐ দৃশ্য পতিত হয়। কি জানি কেন, তখন তাঁহার মনে অত্যন্ত ভক্তিভাবের উদয় হয়, এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এক জহুরীর দোকানে গিয়া একটী বহু-মূল্য অঙ্গুরী খরিদ করিয়া আনিয়া মহাপুরুষের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দেন। অল্পক্ষণ পরেই মহা-পুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়া নামিলেন এবং সকলেই দেখিল, হস্তস্থিত অঙ্গুরিটী খসাইয়া অদূরে মণিকর্ণিকার জলে নিক্ষেপ করিলেন! এই দৃশ্য দেখিয়া উক্ত অঙ্গুরীদাতা ভদ্রলোক বড়ই রাগান্বিত হন এবং সমবেত জনসাধারণের নিকট মহাপুরুষকে নানা প্রকার নিন্দাবাদ করিতে থাকেন। ইত্যবসরে মহাপুরুষ জল হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উক্ত অঙ্গুরীদাতা ভদ্রলোকটীর সম্মুখে নিজের মুষ্টিবদ্ধ হস্ত খুলিয়া মাটীতে রাখিলেন; তখন সকলেই দেখিতে পাইল যে, প্রায় ২০।২৫টী বহুমূল্য অঙ্গুরী রহিয়াছে। তাহা আবার অন্য কোন অঙ্গুরী নহে; যে অঙ্গুরী ঐ ভদ্রলোকটী মহা-পুরুষকে দিয়াছিলেন, ঐ সকল অঙ্গুরীগুলিও ঠিক তদনুরূপ মূল্যবান এবং দেখিতে ঠিক একই রকম। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং ভক্তি-গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে সমবেত জনমণ্ডলী সকলেই ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া,

মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। মহাপুরুষও তখন অঙ্গুরীগুলি সেইস্থানে রাখিয়া অন্যদিকে গমন করিলেন। অঙ্গুরীদাতা ভদ্রলোকটী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে উক্ত মহাপুরুষের চরণ ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন।

ক্ষমাগুণ না থাকিলে মহাপুরুষ হওয়া যায় না—একথা সকলেই স্বীকার করেন এবং সকলেই জানেন যে,—"ক্ষমা মহত্বের লক্ষণ।" ঐ ব্যক্তির কাতর-প্রার্থনায় মহাপুরুষ উঁহাকে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু তাহা স্পষ্টভাবে তখন বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। কারণ, মহাপুরুষ মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন। তবে এখন ইহা জানা যায় যে,ঐ ব্যক্তির হৃদয় ভূমিতে মহাপুরুষ এমন একটী অজানিত ঐশ্বরিক-শক্তির বীজ রোপন করিয়া দিয়াছিলেন যে, যাহার বলে আজ তিনি একজন সাধক বলিয়া পরিচিত। ইদানীং যাঁহারা ৺কাশীধামে যাতায়াত করেন, হয়তঃ তাঁহাদিগের অনেকেই ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া থাকিবেন। তিনি এখন ৺কাশীধামে মণিকর্ণিকার ঘাটে, শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ্য স্বামীর যোগাসনে বসিয়া ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে যোগ-সাধনে নিযুক্ত আছেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, ভগবানের অবতার, অদ্বিতীয় যোগবল-সম্পন্ন মহাপুরুষ উপরোক্ত যোগী শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ্য স্বামী আর ইহলোকে নাই; কয়েক বৎসর হইল, তিনি নশ্বর মানব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানে লীন হইয়া গিয়াছেন। কাহারও কাহারও মুখে শুনা যায়, তিনি দেহত্যাগিবার শেষে "এটা কোন্ যুগ?" বলিয়া সম্মুখস্থ জন-মণ্ডলীর প্রতি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তখন কেহ কেহ 'এটা কলিযুগ", এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই উক্ত মহাপুরুষের দেহত্যাগ হয়। তখন সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত-চিত্তে উক্ত মহাপুরুষের দেহ নৃত্য-গীত-সহকারে সমাধিস্থ করেন। মহাপুরুষের পবিত্র আত্মা অমরধামে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সাধন-সময়ের অক্ষয়কীর্ত্তি চিরদিনের মত মানব-হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে।

সমাধিতে কি সুখ আছে, তাহা কাহারও নিকট জানিবার উপায় নাই অথবা কেহ তাহা বলিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না—কারণ, সমাধি-প্রাপ্ত না হইলে সে সুখ অনুভব করা যায় না। যিনি সে সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি কখন সংসারে ফিরিয়া আসেন নাই। তবে এইমাত্র জানা যায় যে, যোগে যাঁহারা সমাধি-প্রাপ্ত হয়েন, তাহাদিগের আত্মায় ও পরমেশ্বরে কোনও তফাৎ নাই, অথবা তাঁহাকেই ভগবানের অবতার বলা যাইতে পারে। চিত্ত-সংযম হইলে, তবে যোগে অধিকার জন্মে; সেই চিত্ত-সংযম একমাত্র মানব ভিন্ন অন্য কেহই করিতে সক্ষম হয় না। মানবের মধ্যেও একমাত্র ভারতবাসী-ব্রাহ্মণ ভিন্ন উক্ত কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে কেহই পারে নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভারতবাসী ব্রাহ্মণগণ কত সম্মানীত ও উচ্চপদস্থ ছিলেন। এই কারণেই ভারতবাসী ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সমস্ত জাতীর সমস্ত লোকে সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় ভক্তি করিত। এমন কি, এক সময়ে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের পদরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিন এখন কোথায়! বড়ই দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণগণ নিজের আচার বিচার লক্ষণ ভুলিয়া গিয়া এখন কিম্ভূতকিমাকার জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণের লক্ষণ ছিল,—

"তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ পবিত্রঞ্চ কুশধারণং।
সদা মুখে বেদপাঠং ব্রাহ্মণস্য পঞ্চলক্ষণম্॥

আর এখন সেই সকল লক্ষণ পরিবর্জ্জিত হইয়া, নিম্নোক্ত লক্ষণ সকলে পরিণত হইয়াছে।

"চাকরী উমেদারীশ্চৈব মিথ্যাবাক্য প্রবঞ্চনাম্।
সদা মুখে অর্থচিন্তা ব্রাহ্মণস্য পঞ্চলক্ষণম্॥"

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

আলোচনা, অষ্টাদশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ভাদ্র, [illegible]।

শিব ও সতী।

শিব ও সতী আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। কি সাকার কি নিরাকার—এই উভয় বাদেই শিব আমাদের আদর্শ, আরাধ্য ; সতীও আদর্শ ও আরাধ্যা। শিব-মঙ্গলময়। সতী—সতী। ব্রহ্ম নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, অজ্ঞ, আনন্দময় ও উদাসীন। শিব ও তাহাই।

"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং" কৈবল্য।

উমা—ব্রহ্মবিদ্যা। উমাপতি—নীলকণ্ঠ—ব্রহ্ম। আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃত ভাষ্যে ইহাই বুঝাইয়াছেন। "সত্যং শিবং" এই মঙ্গলময় স্বার্থক বিশেষণটি ব্রহ্মেই প্রযোজ্য। সদানন্দ রূপঃ শিবোহহং" আমিই সদানন্দরূপী শিব। এই শিবত্ত ব্রহ্ম। "তত্ত্বমসি" তুমি সেই ব্রহ্ম। ইহাতে যে আদর্শ তথ্য ; "সদানন্দরূপ শিবোহহং" ইহাতেও সেই আদর্শ তথ্য। শিব—অজ্ঞ ও উদাসীন। সর্ব্বত্যাগী, স্বতউদ্ভূত দেবাদিদেবই উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম।

সতী—ব্রহ্মবিদ্যা। সতী—যাহা আছে, যাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, যাহা নিত্য বর্ত্তমানা, তাহাই সতী। এই সতী—ব্রহ্ম-বিদ্যা। উমা শব্দটির অর্থও উহাই। যাঁহা আছে, যাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা কি ? ব্রহ্ম একমাত্র কারণ, একমাত্র সৎ। বিশ্ব—কার্য্য, অসৎ। তবে সতী কি ? সতী—শক্তি। "কারণই কার্য্যরূপে উপলব্ধি হইযা থাকে, তাহা হইলে কারণকে সতী বলিতে বাধা কি ?"

বাধা আছে। কারণ ও কার্য্য এই উভয়ের মধ্যস্থলে যে শক্তি অবস্থিত, তাহাই সতী। দার্শনিক সিদ্ধান্তে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কারণের আত্মভূতা শক্তি, শক্তির আত্মভূত কার্য্য। অগ্নি কারণ, দাহ তাহার কার্য্য, কিন্তু কোন ঔষধি গুণে ঐ অগ্নি দাহকার্য্যের জনক হয় না। অগ্নি রহিয়াছে, তাহা গাত্রে স্পর্শও করিয়াছে, তবে দাহ কার্য্য হইল না কেন ? এস্থলে ঐ ঔষধি গুণে দাহিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই দাহকার্য্য হইল না। তবেই অগ্নি দাহকার্য্যের কারণ হইলেও তাহার দাহিকা শক্তিই সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপে দাঁড়াইল। অগ্নি—কারণ, দাহিকা-শক্তি, দাহ—কার্য্য। আত্মভূতা দাহিকা; দাহিকার আত্মভূত কার্য্য।

কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ-শক্তি, দাহ-কার্য্যের

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।—আমরা পাঁচ ছয় মাস গ্রাহকগণের নিকট নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া আসিতেছি ; আলোচনাকে আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিতেছি। এত অল্প মূল্যে এত বড় একখানি মাসিক দিতে হইলে গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টির সমধিক আবশ্যক কারণ গ্রাহকগণই পত্রিকার জীবন। এইবার হইতে আমরা সকলের নিকট ভিঃ পিঃ করিব তাঁহারা যেন তাহা ফেরৎ দিয়া ক্ষতিগ্রস্থ না করেন। আমাদের ক্ষতি, গ্রাহকগণের নিজস্ব ক্ষতি মনে করিয়া ধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া দেখিবেন। ইতি—কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাক্ষাৎ কারণ অগ্নির দাহিকা শক্তি, তবে দাহিকা শক্তি অগ্নির, এই কারণ দাহ কার্য্যের কারণ সাক্ষ্যাত্রুপে অগ্নিকে নির্দ্দেশ করা যায়। এই প্রকার বিশ্বকার্য্যের কারণ-- শক্তি। শক্তির কারণই ব্রহ্ম আর আশ্রয়ই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বা শিব। বেদান্ত বলেন—ব্রহ্ম মায়া সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন, মায়াই সাক্ষাৎ বিশ্বপ্রসবিত্রী।

শক্তিই কার্য্যরূপে উপলব্ধি হয়, এই কারণ শক্তি সতী। এই শক্তি প্রত্যেক বস্তুতেই বিদ্যমানা, কিন্তু এই সকল বস্তুতে বিদ্যমানা শক্তির যে মূলশক্তি—তাহাই সতী। প্রত্যেক পরিচ্ছিন্না বস্তুশক্তিই সমষ্টি ভাবে দেখিলে এক। একই সতী শক্তিকে ব্যষ্টি ভাবে দেখিলে অনেক। অনেক বৃক্ষাদিকে সমষ্টিভাবে বন, একই বনকে ব্যষ্টিভাবে বৃক্ষাদিরূপে দেখিলেও কি প্রকৃত পার্থক্য আছে? কেবল সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবের খেলা মাত্র। সতী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু-শক্তি সম্বন্ধে ঐ একই কথা। একই অগ্নি যেমন কোথাও উদরাগ্নি, কোথাও বাড়বাগ্নি, কোথাও দাবাগ্নি.কোথাও বা বিদ্যুতাগ্নি,বস্তুতঃ অগ্নি একই। তদ্রূপ একই শক্তির সহস্ররূপে বিকাশ দেখিয়া "শক্তি অনেক—ইহা মানা সঙ্গত নহে।

কারণের আশ্রভূতা শক্তি। তবেই কারণ ও শক্তির সম্বন্ধে বাক্য ও তাহার অর্থের মতই নিত্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট।

শক্তি বিশিষ্ট শক্তিমান,—শক্তিমৎ কারণই কার্য্যের পিতা-মাতা। শক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মই বিশ্বকার্য্যের কারণ। বেদান্তে মায়াবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম পরমেশ্বরকেই তজ্জন্য স্রষ্টা রূপে দাঁড় করান হইয়াছে। মায়াতীত ব্রহ্ম, শক্তিরহিত কারণ, সতী বিরহিত শিবই প্রকৃত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। শক্তি, মায়া বা সতী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী জননী। শক্তিবিশিষ্ট, মায়াযুক্ত, সতীপতি শিবই প্রসবয়িতা জনক।

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ"

সাকার বাদ।

আমাদের পরমেশ্বরের ত্রিবিধ মূর্ত্তি। বিশ্ব-ত্রিগুণ,—পরমেশ্বরেরও ত্রিমূর্ত্তি। সত্ত্বগুণময় ব্রহ্মা প্রথম,রজোগুণময় বিষ্ণু দ্বিতীয়, তমোগুণময় শিব তৃতীয়। পুরাণে শিবই সংহার কর্ত্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট। সংহার কর্ত্তৃত্ব তমোগুণের ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য ঐ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ অমিশ্র। বিশ্ব যে ত্রিগুণ, তাহা মিশ্র ত্রিগুণ।

আমাদের শিব সংহার কর্ত্তা বলিয়া যে বরদাতা, মুক্তিদাতা নহেন, তাহা নহে। শিবকে আমরা দুইভাবে দেখিতে পাই। একভাবে ভীষণ, সংহার শূলধারী, সতী-বিরহিত। অন্যভাবে শান্ত-প্রসন্ন ডমরুশোভিত কর, সতীসহ তত্ত্বালোচনপর।

শিব ও সতী—উভয়েই যখন আমাদের প্রতিপাদ্য, তখন তাঁহাকে সতীপতি ভাবেই দেখিব।

আমাদের আরাধ্যদেব দেবাদিদেব শিব কৈলাসেশ্বর। ধনাধিপতি যক্ষরাজ কুবের তাঁহার ভাণ্ডারী। অন্নপূর্ণা সতী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী। নন্দী-ভৃঙ্গী প্রভৃতি মহাবীর মহাভক্ত তাঁহার সেবক। হিমশুভ্র কৈলাস, সুখপূর্ণ, আনন্দকর, শান্তিময়। সে কৈলাসের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। প্রকৃতি দেবী সেই কৈলাসের

সেবিকা দাসী। শিব ও সতীর দাম্পত্যশয্যা পুষ্পময়ী করা, কুঞ্জগৃহ নানাপুষ্প সম্ভারে সুশোভিত করা, তাঁহার কার্য্য। এই স্বর্গ অপেক্ষা স্পৃহণীয় কৈলাস যাঁহার বাস ভূমি, অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যশালিনী সতী যাঁহার প্রণয়িণী, সমস্ত শক্তিধরগণের মধ্যে যিনি প্রধান শক্তি সম্পন্ন—সেই সতীপতি কৈলাসেশ্বর শিব কিরূপ তাহা মানবীয় কল্পনা ধারণা করিতে অক্ষম। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোন ব্যক্তি, বিশ্বসাহিত্যে কোন কবিই শিব ও সতীর স্বরূপ বর্ণনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রেমের বারিধি, জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি রূপ, বৈরাগ্যের একমাত্র মূর্ত্তি, সুখশান্তির আধার মহাদেব বস্তুতই প্রহেলিকাময়, পার্শ্বে হাস্যমুখী গৌরী—প্রণয়ের সজীবমূর্ত্তি, সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রূপলাবণ্যশালিনী যুবতী প্রণয়নী পত্নী গৌরী উৎসঙ্গোপরি উপবিষ্টা আর সেই গৌরীপতির ভাব নির্ব্বিকার। মহামায়াস্পর্শালস, তবু মায়াতীত, প্রকৃতি সেবক, তবু স্বরূপ প্রতিষ্ট। গৌরী উজ্জ্বলবেশা শিব ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত; গৌরী চন্দনচর্চ্চিতদেহ, শিব ভস্মাচ্ছাদিতাঙ্গ, গৌরী হাস্যচ্ছটারঞ্জিত বদনা, শিব শান্ত প্রসন্ন বদন। কি অপূর্ব্ব সম বিষমের মিলন! কি অলৌকিক প্রণয় বৈরাগ্যের একীকরণ! কিবা রক্তশ্বেতের মিশ্রণ! কখন মনে হয়, যোগ্য যোগ্যমিলনে সার্থক হইয়াছে। কখন মনে হয়, যোগ্য অযোগ্য মিলনে সৃষ্টি বৈচিত্রের সমাবেশ হইয়াছে।

সতী সহ শিব তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত, তথাপি তাঁহার মন পরমাত্মায় লীন রহিয়াছে। জগতের মঙ্গলকর চিন্তায় ব্যাপৃত তথাপি তাঁহার আত্মা জগৎ হইতে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত আছে।

ভাণ্ডারে পৃথিবীর যাবতীয় বিলাস, সুখ সৌন্দর্য্য সঞ্চিত আছে, কিন্তু সে সকলে শিব বিতৃষ্ণ। রাজকীয় উপকরণ থাকিতে ইনি ভিক্ষুক, শ্মশানচারী। অমৃত পানে দেবতারা অমর হইলেন, ইনি জগতের রক্ষার্থ সমুদ্রোদ্গীর্ণ গরলরাশি ভোজন করিয়া নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিলেন। কখন অন্নের জন্য অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষুক, কখন পাণ্ডব সৈন্য রক্ষার্থ শিবির রক্ষক, ত্যাগী, সর্ব্বত্যাগী, বিরাগী, সন্ন্যাসী প্রণয়ীর পূর্ণ আদর্শ কেহ যদি থাকেন, তবে সে আমাদেরই শিব। আর্য্যের উপাস্য, অনার্য্যের আরাধ্য, দেবের দেবতা, দানবের প্রভু, একাধারে কোন দেবতা আছেন? ব্রাহ্মণ, শূদ্র, রমণী বালক—সকলেই যাঁহার সেবার অধিকারী, বিল্বদল ও সামান্য গঙ্গাজলে যিনি তুষ্ট—এমন সমদর্শী সর্ব্বজীবত্রাতা দেবতা শিবের মত কে আছে?

প্রথম বিবাহের সাজে যোগীপুরুষটিকে দক্ষ-সভায় দেখিলাম; পার্ব্বতীর সহিত দাম্পত্যক্রীড়ায় সুখরত দেখিলাম; দেখিলাম শান্ত, প্রকৃতির সেবক। তারপর সতী দেহ ত্যাগ হইল, প্রসন্ন শিব রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন, মাথার কপিল ক্রোধকম্পিত কেশ হইতে বীরভদ্র জন্মিল; দক্ষযজ্ঞ সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল, দেখিলাম তমোগুণাশ্রিত সংহার মূর্ত্তি, ধ্বংসের দেবতা; শেষ দেখিলাম, হিমালয়ের নির্জ্জন অরণ্যানী মধ্যে যোগাসনে সমাধিমগ্ন; চক্ষু নাসাগ্রস্থাপিত, ইন্দ্রিয়,মনপ্রাণ পরমাত্মায় লীন;

নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপবৎ, নিস্তরঙ্গ শান্তসাগরবৎ সুখোপবিষ্ট, তখন বৈরাগ্যের সেবক। ত্যাগের সন্ন্যাসমূর্ত্তির পরিপূর্ণতা এইবার দেখা গেল। নিষ্ক্রিয়স্বভাব, গুণাতীত ভাবের প্রধানতম আদর্শ দৃষ্ট হইল। যখন মহাদেব শিব, সতী-সমেত, তখন ত্যাগের স্বমূর্ত্তি। যখন কামনা-শূন্য নিষ্ক্রিয় ভাব, তাহাই গুণাতীত ভাবের অন্যতম আদর্শ।

কাম্য-কর্ম্ম ত্যাগের নাম ত্যাগ। কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করাই ত্যাগ। আর একেবারে কাম্য,নিষ্কাম কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস তজ্জন্যই ত্যাগের দ্বিবিধ মূর্ত্তি ; এক সন্ন্যাস মূর্ত্তি, অপর ত্যাগ মূর্ত্তি বা স্ব-মূর্ত্তি। নিষ্ক্রিয়তা ও এক, একবারে কর্ম্মশূন্যতা ; অপর, নির্লেপ হইয়া জগদ্ধিতায় আত্ম কর্ম্মকরণ। গুণাতীত ভাব ও এক, স্বরূপতঃ সত্ত্বরজস্তমোভাবশূন্যতা। দ্বিতীয়, স্বেচ্ছামত সত্ত্বরজস্তমোভাবের নিষ্কাম-সেবা। দেবাদিদেব শিবে এই দ্বিবিধ ত্যাগ, দ্বিবিধ নিষ্ক্রিয়তা, দ্বিবিধ গুণাতীত ভাবের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, সকল জাতি, সকল ধর্ম্মাবলম্বী মহাদেবকে আদর্শ মনে করিতে পারেন।

এই শিবই উদাসীন পুরুষ ; এই সতীই প্রকৃতি। এই শিবই সার্ব্বভৌমিক আত্মা বা চৈতন্য, এই সতীই সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি। এই শিবই মায়াতীত ব্রহ্ম বা মায়াশ্রিত পরমেশ্বর ; সতী মায়া, মহামায়া, জগদীশ্বরী, দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

ভিখারিনী।

(মুসলমান সতী-সংবাদ।)

আজ আমরা আর একজন মুসলমান সতীর অপূর্ব্ব পাতিব্রাত্য ধর্ম্মের বিমল-কাহিনী লইয়া উপস্থিত হইতেছি। রমণী সুন্দরী, যুবতী এবং বিদুষী না হইলেও জ্ঞানবতী। এক দরিদ্র মুসলমান যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। যুবক রূপে সুপুরুষ বা গুণে সাধু সজ্জন না হইলেও নিতান্ত হৃদয়বিহীন নরপশু নহে। সাধ্বী পত্নী, পতির দৈনিক উপার্জ্জনের সামান্য আয়ে অতি ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই আপনার প্রাণে আপনি প্রীত। পতি সমস্ত দিন দিন-মজুরের কাজে কঠোর কায়িক পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে পরিশ্রান্ত দেহে স্বগৃহে প্রতিগমন করতঃ পতিব্রতা পত্নীর সেবা-শুশ্রূষায় সারাদিনের কঠোর শ্রম ভুলিয়া স্বর্গীয় সুখশান্তি উপভোগ করিয়া আসিতেছে। এই রূপ পরম সুখে দরিদ্রের শান্তি-কুটিরে তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতার চক্রে দম্পতির অদৃষ্টে এ সুখ অধিক দিন সহিল না। নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে অচিরে তাঁহাদের সুখের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। একদিন রোজ-মজুরের কাজ করিতে যাইয়া যুবক উভয় চক্ষে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বগৃহে ফিরিল। হায়! সদ্যচ্ছেদিত বৃক্ষ শাখার দারুণ আঘাতে দীর্ঘকাল অরুন্তুদ যন্ত্রণা ভোগের পর

যুবকের দৃষ্টিশক্তি অন্তর্হিত হইল। যুবক দৃষ্টি-শক্তি হীন হইয়া মণিহারা ফণীর ন্যায় মাটীতে লোটাইয়া রোদন করিতে লাগিল। সাধ্বী পত্নী কতদিন অনশন অনিদ্রায় কাটাইয়া প্রাণপণ পরিশ্রমে পতির সেবা-সুশ্রূষা করিতেছিলেন; এত করিয়াও তিনি স্বামীর চক্ষুরত্ন রক্ষা করিতে পারিলেন না। গভীর দুঃখ-কষ্টে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দুঃখিনীর সকল শ্রম পণ্ড হইল।

দম্পতী এখন উপায়হীন পথের কাঙ্গাল। ভিক্ষা না করিলে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের আর উপায় নাই। অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা যুবতী অন্ধ যুবক স্বামীর হাত ধরিয়া ভিক্ষার্থে বহির্গত হইলেন। এইরূপে ভিক্ষান্নে অতি ক্লেশে—সুখে দুঃখে তাঁহাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

কিন্তু বিধাতার চক্র বড়ই বাঁকা। দম্পতীর এ ক্ষুদ্র সুখটুকুও বুঝি তাঁহার চক্ষে সহিল না। অথবা এমন করিয়াই বুঝি বা তিনি মানুষের অগ্নিপরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিতান্ত নিখাদ খাটি সোনা না হইলে কেহ এ ভীষণ অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না। হিন্দুর আদর্শসতী সীতা একদিন এই ভয়াবহ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিজগৎ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আর আদর্শ সতী সাবিত্রী দেবীও একদিন এই ভীষণ পরীক্ষায় সফলতার মোক্ষ-ফল স্বরূপ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর যমের ক্রোড় হইতে তাঁহার প্রাণারাধ্য স্বামীরত্ন সত্যবানকে কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রমণীর অলৌকিক তেজঃ দর্শনে বিশ্ববাসী মুগ্ধ হইয়াছিল।

এখন হইতে যুবতীর অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। তাঁহার অন্ধ স্বামী ঘৃণিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইল। ভীষণ পীড়ার চিহ্নসকল তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বিষম দুর্গন্ধে রোগীর ক্ষুদ্র গৃহখানি সদা পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। মক্ষিকা সকল নিয়ত সে দুর্গন্ধ-পূর্ণ ঘৃণিত দেহ বেষ্টন করিয়া "ভন্ ভন্" রবে উড়িয়া পড়িয়া তাহাকে অশেষ বিধানে জ্বালাতন করিতে লাগিল। ক্রিমি কীটসমূহ সে দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকিল না। অসহ্য যাতনায় যুবক দিবা রাত্রি ক্রন্দন চীৎকার করিয়া সময়পাত করিতে লাগিল।

স্বামীর এ দারুণ দুর্দ্দশার সময় সাধ্বী পত্নী প্রাণপণে তাহার সেবা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। দ্বিগুণ পরিশ্রমে সারাদিন ভিক্ষা করিয়া তিনি পতির ঔষধ পথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যুবতী প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করতঃ স্বামীর জন্য ঔষধ পথ্য সব প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনন্তর পতির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে উষ্ণ জলে তাঁহার ক্ষতাদি ধৌত করিয়া তাহাতে চিকিৎসকের উপদেশানুযায়ী ঔষধাদি লেপন করিতেন। এবং সেবনের ঔষধ প্রদানান্তর তাহাকে আহার করাইয়া—মক্ষিকার উৎপাৎ হইতে রক্ষার জন্য কুটিরব্যাপী এক সুবৃহৎ মশারির মধ্যে পতির শয়ন ও উপবেশনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া স্বয়ং ভিক্ষার্থে বহির্গত হইতেন। সতী সারাদিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়া পুনরায় পতিকে ঔষধ পথ্যাদি প্রদান করিয়া স্বয়ং আহার করি-

তেন। এইরূপে ভীষণ দুঃখ দারিদ্র্যে তাঁহার সময় পাত হইতে লাগিল।

রমণী সুন্দরী ও যুবতী; সুতরাং এরূপ ভাবে একাকিনী ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিরাপদ হইল না। এক প্রতিবেশী যুবকের পাপ চক্ষুর লালসাময় দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইল। পাপাত্মা, সতীকে নরকের কুপথে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য নিয়ত অশেষ বিধানে প্রয়াস পাইতে লাগিল। কিন্তু পতিব্রতা সতী কিছুতেই তাহার পাপ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। পথে, ঘাটে, মাঠে প্রতিনিয়ত পাপিষ্ঠের অত্যাচারে নিঃসহায় সতী যারপরনাই উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সতী লজ্জা ঘৃণা ও দুঃখে জীবন্মৃতা হইয়া উঠিলেন।

এদিকে দীন ভিখারীর মহাশত্রু বিষম বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। এখন নৌকা ও সাথী অভাবে রমণীর মুষ্টি ভিক্ষাও বন্ধ হইল। কাঙ্গালের সংসার আর চলে না—ঔষধ পথ্য অভাবে পতির আর জীবনরক্ষা হয় না। রমণী আজ তিন দিন উপবাসী। তাঁহার রুগ্ন স্বামীর মুখে তুলিয়া দিবার মত এক মুষ্টি অন্নও আজ তাঁহার গৃহে নাই। রমণী প্রমাদ গণিলেন। অন্নাভাবে বুঝি আর তাহার পতির প্রাণ রক্ষা পায় না। অনন্তর তিনি বর্ষার অনন্ত জলরাশি সাঁতরিয়া—দুই দশজন গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইলেন, তদ্দ্বারা সেদিনের মত রুগ্ন পতির জীবন রক্ষা করিলেন।

সুযোগ পাইয়া সেই দুষ্ট মুসলমান যুবক সতীর পতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—"দেখ তুমি তোমার স্ত্রীকে আমার সহিত "নিকা" করিতে সম্মত করিয়া "তালাক" দিলে আমি তোমায় এককালীন কিছু নগদ টাকা এবং মাসে মাসে তোমার জীবন ধারণোপযোগী কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি"। ইহাতে তোমাদের উভয়েরই জীবন রক্ষার উপায় হইবে। বৃথা কেন এ দুর্দ্দিনে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে অন্নাভাবে অনাহারে মরিবে? অনন্ত অভাব প্রপীড়িত রুগ্ন পতি যুবকের এ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইল। এবং স্ত্রীকে ডাকিয়া কথাটা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল।

স্বামীর মুখে এই নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়া সাধ্বী স্ত্রী মর্ম্মাহত হইলেন। অনন্তর তিনি অরুন্তুদ দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কহিলেন,—"তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী; পত্নীর প্রতি পতির পূর্ণ অধিকার আছে। মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রে "তালাকের" ব্যবস্থাও আছে; সুতরাং তুমি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমার তালাক দিতে পার। কিন্তু আমার অপরাধ কি? তুমি কোন্ দোষে আমাকে "তালাক" দিতে চাহিতেছ? কি অপরাধে আমাকে সেবা-সুখে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছ? তুমি অন্ধ, তুমি মহাব্যাধিগ্রস্ত, অচল, অক্ষম; স্বামী পীড়িত, অন্ধ বা অচল-অক্ষম হইলেই স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায় না। স্ত্রীলোকের কি অন্ধ স্বামী—রুগ্ন অক্ষম পতি থাকিতে নাই? স্ত্রী কি কেবল পতির সুখেরই অংশী—ভোগ বিলাসেরই সঙ্গিনী? রোগে,শোকে, দুর্দ্দিনে কি পত্নী পতির কেহই নহে? তুমি স্বামী,আমার প্রতি তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি আমাকে তালাক দিতে বা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পার, কিন্তু

তুমি আমাকে তোমার সেবা-সুখে—নারী ধর্ম্মে বঞ্চিতা করিয়া "তালাক" দিলেও আমি আর "নিকা" করিব না; আমি জলে বা উদ্বন্ধনে যেমন করিয়া পারি তোমার পরিত্যক্তা এই রমণী দেহ বিসর্জ্জন করিয়া আত্মধর্ম্ম রক্ষা করিব। কিন্তু এ দুঃসময়ে কে তোমার সেবা করিবে?—কে তোমার দুঃখে দুঃখী হইয়া ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল তোমার মুখে তুলিয়া দিবে? মরণেও এ চিন্তা—এ দুঃখ আমার সঙ্গে যাইবে; আমি কিছুতেই তোমার দুঃখ-দুর্গতির কথা বিস্মৃত হইয়া "নিকা" করা ত দূরের কথা—মরিয়াও সুখী হইতে পারিব না।"

সতীর কথায় পতির জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল। তখন রুগ্ন পতি পতিব্রতা পত্নীর পবিত্র হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"না, না, আমি কখনই তোমায় তালাক দিতে পারিব না; তোমাকে ছাড়িলে আমার এক মুহূর্ত্তকাল জীবন ধারণও অসম্ভব। আজ হইতে বুঝিলাম, তুমিই আমার পতি; আর আমিই তোমার স্ত্রী। তুমি না ছাড়িলে আমার সাধ্য কি যে তোমায় পরিত্যাগ করি?" এই বলিয়া রুগ্ন স্বামী পতিব্রতা স্ত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। প্রেমাশ্রুতে পতিপ্রেম পাগলিনী সতীর বুক ভাসিয়া গেল। সেই দাম্পত্য-প্রেমের পবিত্র অশ্রু স্পর্শে দরিদ্রের পর্ণকুটীর স্বর্গীয় শান্তি নিকেতনে পরিণত হইল।

দম্পতির এ স্বর্গীয় প্রেম দর্শনে রূপ-মুগ্ধ সেই পাপিষ্ঠ মুসলমান যুবক যার পর নাই বিস্মিত হইল। "প্রেমে পাষাণ যায় গ'লে।" তাহার জীবনে এই প্রথম প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। যুবক, যুবতীকে মধুর মাতৃসম্বোধনে তুষ্ট করিয়া তাঁহার হস্তে পাঁচটি টাকা প্রদান করিয়া সতীর পদধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক স্বগৃহে প্রতিগমন করিল। আজ অবধি যুবক তাঁহার ধর্ম্ম-পুত্র হইল।

অতঃপর যুবক প্রদত্ত সেই সামান্য অর্থে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ক্রয় করিয়া সতী তাঁহার পতি সহ লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সে দারুণ বর্ষা পাত করিল। দীর্ঘকাল অন্তে এক দয়ালু চিকিৎসকের যত্নে মঙ্গলময় শ্রীভগবানের অপার কৃপায় সতীর পতি সেই ভীষণ যন্ত্রণা-দায়ক ঘৃণিত মহাব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিন্তু তাহার অন্ধত্ব আর এ জীবনে ঘুচিল না। পতিব্রতা সাধ্বী সতী আজীবন সেই অন্ধ পতির হাত ধরিয়া ভিক্ষা করিয়া কাটাইয়াছেন। এক দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার পবিত্র মুখে দুঃখের ক্ষীণ রেখাটিও ফুটিয়া বাহির হইতে দেখা যায় নাই। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত রমণী যেন চির সুখের অধিষ্ঠাতৃ-দেবীরূপে—লোক-শিক্ষার্থে ভিখারিণীর ন্যায় দীনবেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছেন।

রমণী দীনভিখারী অন্ধের পত্নী—স্বয়ং চির-ভিখারিণী, তথাপি দুঃখিনী নহেন; চির-সুখের অধিকারিণী। তাঁহার মনে দুঃখ নাই, বিধাতার প্রতি রোষ বা অভক্তির লেশ নাই, পতির প্রতি এতটুকু বিরক্তি আভাষ নাই! কি উচ্চ অঙ্গের পতিপ্রেম।—কি চির-মধুর পবিত্র-হৃদয়! ধন্য সতী! ধন্য তাঁহার অনাবিল অদ্ভুত পতিপ্রেম!!

এই সতী-চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে অনৈকা মুসলমান মহিলা-কবির একটি ক্ষুদ্র কবিতা মনে পড়িল। তিনি সতী-মহিমা-প্রসঙ্গে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন.—

"সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী কে হেন ধরায় ?
কার স্নেহ-দৃষ্টি করে অমৃত বর্ষণ ?
সঙ্কটে সঙ্গিণী সখী মন্ত্রী মন্ত্রণায়,
দাসীর অধিক যত্ন কে করে এমন ?
অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠ রোগী তবু ঘৃণা নাই,
হেন পতি নিয়ে সতী ভিক্ষা মেগে খায়!
কোথায় এমন প্রেম তুলনায় পাই ?
প্রেমিকা যোগিণী হেন কে আছে কোথায় ?"

বস্তুতঃ পতি-ভক্তি-পরায়ণা সতীর মত এমন প্রেমিকা-যোগিনী ধরায় আর কে আছে, জানি না। সতি! তুমিই ধন্যা—তোমারই নারী-জন্ম সার্থক !! এ বিশ্ব যুগে যুগে তোমার পবিত্র পদরেণু স্পর্শে কৃতার্থ হউক ; এ বিশ্বে নন্দনের মত পারিজাত—প্রেম-প্রীতি ও পবিত্রতার অনন্ত কামিনী-কুসুম রাশি ফুটিয়া উঠুক।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

জীবন পথ।

আঁধার জীবন-পথ কাদম্বিনী ঢাকা
জড়ায় নীরদ ঘন মাথার উপরে ;
চপলা গর্জ্জিছে উর্দ্ধে হেরি বিভীষিকা
দিশে হারা হ'য়ে মাগো কাঁপি গো অন্তরে।

ডেকে লও হাতে ধ'রে
লীলাময়ি কৃপা ক'রে।
আঁধার ঠেলিয়া তারে
ল'য়ে যাও তব দ্বারে—
শান্তির আলয়ে তোর
ঘুচে যা'ক মোহ ঘোর।

দিন চ'লে গেল মাগো এল' নিশীথিনী
ঘন অন্ধকার ল'য়ে ঢাকে চারি ধার ;
সন্দিগ্ধ বিশ্বাস মোর হেরে কুহকিনী
মায়ার ভীষণা-মূর্ত্তি প্রেত ছবি আর।

ঘেরে চারি দিকে মোর
যতেক নারকী ঘোর।
কৃপাময়ী কৃপা কর
অভাজনে ধর ধর ;
ঘন অন্ধকার হ'তে
ল'য়ে যাও তব পথে।

সুদীর্ঘ জীবন-পথ জীবনদায়িনী
আকুল পরাণ চায় অনন্তে মিশিতে ;
চায় শান্তি, তব পদে, দুর্গতিনাশিনী
সসীম ঘুচায়ে দাও অসীমে মিলিতে।

আর যে চলিতে নারি
দুর্ব্বল কেমনে পারি,
ধরো মাগো ধর হাত
হউক জীবনপাত।
যায় মাগো যায় দিন
কর গো তোমাতে লীন।

শ্রীমতী বিষাদকুমারী।

ব্রাহ্মণদিগের বংশনামের পুরাতত্ত্ব।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের পাঁড়ে, চৌবে, তেওয়ারি, দুবে প্রভৃতি নাম যে পাণ্ডা, চতুর্ব্বেদী, ত্রিবেদী, দ্বিবেদী নামেরই অপভ্রংশ, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। পাণ্ডা নামের পণ্ডা শব্দই মূল বলিয়া বোধ হয়। এই পণ্ডা শব্দ "বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি" রূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।* সুতরাং পাণ্ডা শব্দ বেদজ্ঞ-পণ্ডিত অর্থই প্রকাশ করিত বলিয়া মনে হয়। পাঁড়ে শব্দটী পঞ্চবেদীর অপভ্রংশ হইতে পারে কি না, জানি না—ঋক, সাম, অথর্ব্ব এই তিন বেদ এবং যজুর্ব্বেদের কৃষ্ণ ও শুক্ল এই দুই ভাগ হইতে বেদের পাঁচ সংখ্যাও গণনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বোক্ত বংশ নামের মূল তাৎপর্য্য যে বেদ-পারদর্শিতা, তাহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের দেশপ্রচলিত ব্রাহ্মণ-বংশ নামেরও মূল তাৎপর্য্য বেদ বা শাস্ত্রাভিজ্ঞতা। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদিগের সাধারণতঃ দুইটী প্রধান শ্রেণী-বিভাগ দেখা যায়। এক শ্রোত্রীয় শ্রেণী ও অপর কুলীন শ্রেণী। শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থানুধাবন করিলে তাহাতেও আমরা বেদের সহিতই যোগ দেখিতে পাই। "শ্রুতি" যেমন বেদ বুঝায়, ইহারই এক প্রাকৃতিক 'শ্রোত্র' শব্দও তেমনই বেদ বুঝায়। শব্দকল্পদ্রুমে ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে,—"শ্রূয়েতে ধর্ম্মাধর্ম্মাবনেন ইতি শ্রোত্রো বেদঃ॥" সুতরাং শ্রোত্রিয় শব্দের অর্থ যে বেদবেত্তা হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। ইহার ব্যুৎপত্তি শব্দকল্পদ্রুমে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে,—"শ্রোত্রং বেত্তি অধীতে বা শ্রোত্রিয়ঃ।" অমরকোষে ইহার অর্থ—"বেদাধ্যেতৃ ব্রাহ্মণঃ" এইরূপ করা হইয়াছে।

* দেওঘরে অবস্থান কালে ৺বৈদ্যনাথ দেবের পাণ্ডার মুখে এইরূপ ব্যাখ্যাই শুনিতে পাইয়াছি।

শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ যে কেবল বেদাভিজ্ঞ হইতেন—তাহা নহে কিন্তু তিনি তিন বেদে পারদর্শী হইতেন যথা—"বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি॥" ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ ধৃত পাদ্মে উত্তর খণ্ডে ১১৬শ অধ্যায়। শ্রোত্রিয় যেমন বেদ-পারদর্শী হইতেন, তেমনই আবার ক্রিয়াবান্‌ও হইতেন যথা—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্যচ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়োনামধর্ম্মবিৎ॥"
(ইতি শব্দকল্পদ্রুম ধৃত দান কমলাকরঃ।)

বৈদিক কার্য্য নিষ্পাদনের জন্য শ্রোত্রিয়ের কিরূপ উপযোগীতা ছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত চাণক্য শ্লোকটী হইতেই প্রতীয়মান হইবে যথা:—

"হতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং হতোযজ্ঞস্তদক্ষিণঃ॥"

শ্রোত্রিয়বিহীন শ্রাদ্ধ ও 'দক্ষিণা'বিহীন যজ্ঞ নিষ্ফল।" সমাজে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কিরূপ মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল, চাণক্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে যথা:—

বণিকঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং নকারয়েৎ॥"

ধনবান ব্যক্তি, শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও চিকিৎসক এই পাঁচটী যেখানে নাই, সেখানে বাস করিবে না।

শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আমরা ভট্টাচার্য্য ও চক্রবর্ত্তী এই দুইটী উপাধিই প্রাচীন ও প্রধান দেখিতে পাই। 'ভট্টাচার্য্য' উপাধিটীর দুইটী অংশ—একটী ভট্ট ও অপরটী আচার্য্য। এই উভয় অংশই পাণ্ডিত্যবাচক। সোমদেব ভট্ট ও বাণভট্ট নামে আমরা যে ভট্ট শব্দের যোগ পাই, তাহাতেই ইহার পাণ্ডিত্য অর্থ ও প্রাচীনত্ব বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। রঘুনন্দনের 'কাণভট্ট' নামেও ভট্ট শব্দ ঐ অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। "ভট্টস্যকট্টাং শকটঃ প্রবিষ্টঃ" এই প্রচলিত গল্প বাক্যেও আমরা ভট্ট শব্দের 'পণ্ডিত' 'অধ্যাপক' এই অর্থই প্রাপ্ত হই। "ভট্টাচার্য্য" যে এক সময়ে ভুতাত ভট্ট ও উদয়নাচার্য্য কৃত শাস্ত্রবেত্তাকেই বিশেষভাবে বুঝাইত,তাহা শব্দকল্পদ্রুমের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা হইতে প্রমাণিত হয় যথা—"ভুতাতভট্টমতং মীমাংসাশাস্ত্রং উদয়নাচার্য্য মতং ন্যায়শাস্ত্রং এতদুভয় শাস্ত্রবেত্তা॥"

ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিলাম—এক্ষণে 'চক্রবর্ত্তীর' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চক্রবর্ত্তীর অর্থ যিনি 'চক্রে বর্ত্তমান থাকেন।' চক্রের অর্থ মণ্ডল—বিস্তৃত পরিধি-বিশিষ্ট-স্থান। রাজচক্রবর্ত্তী শব্দে আমরা চক্রবর্ত্তী শব্দের যোগ দেখিতে পাই। তাহাতে 'রাজমণ্ডলীর অধিপতি রূপে যিনি বর্ত্তমান' এই অর্থই বুঝায়। চক্রের অর্থ শব্দকল্পদ্রুমে 'গ্রামজালও' পাওয়া যায়। সুতরাং চক্রবর্ত্তীর অর্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর উপর অথবা গ্রাম সমূহের উপর বর্ত্তমান, এইরূপই হয়। বিদ্যাবুদ্ধি, প্রতিপত্তি ও প্রভাব এই সকল দ্বারাই সকলের উপর বর্ত্তমান থাকিয়া শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন বা আধিপত্য বিস্তার সম্ভবপর হয়। সুতরাং চক্রবর্ত্তী শব্দের দ্বারা 'ভট্টাচার্য্য' শব্দ অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিপত্তি অধিক বুঝায় বলিয়াই আমাদের নিকট বোধ হয়।

চক্রবর্ত্তী শব্দের বিদ্যাপক্ষে একটী কৌতুকাবহ মূল পাওয়া যায়। প্রকৃতিবাদ অভিধানে 'চক্র' শব্দের সিন্ধুনদের অপর তীরবর্ত্তী জাতিবিশেষ ও সামগ-ব্রাহ্মণ এই উভয়ার্থই স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা হইতে সিন্ধুনদ-তীরের সামগ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা প্রধানরূপে বর্ত্তমান ছিলেন, চক্রবর্ত্তী শব্দের প্রতিপাদ্য প্রথম তাহারাই ছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং বেদপারগামিত্বের শ্রেষ্ঠত্বই যে 'চক্রবর্ত্তী' উপাধির প্রকৃত পরিমাপক তাহাই বুঝা যাইতেছে।

'রাজচক্রবর্ত্তী' শব্দে 'চক্রবর্ত্তী' শব্দ যেমন গৌণার্থে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থও প্রকাশ করিয়া থাকে—তদ্রূপ ব্রাহ্মণের "চক্রবর্ত্তী" উপাধি সাধারণ ভাবে শ্রেষ্ঠার্থেরও বাচক হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্মণের যে 'মিশ্র' উপাধি দেখা যায়, তাহাও সাধারণ ভাবে শ্রেষ্ঠার্থেরই বোধক।

পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের অপর একটী উপাধিও এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সেই উপাধিটী 'ওঝা'। 'ওঝা' শব্দটী প্রকৃত সংস্কৃত শব্দ নহে কিন্তু সংস্কৃত শব্দেরই অপভ্রংশ; ইহার মূল সংস্কৃত শব্দ "উপাধ্যায়।" সংস্কৃত দ ও ধ বর্ণের অপভ্রংশে যে যথাক্রমে জ ও ঝ হয়, ভাষায় ইহার স্পষ্ট দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়, যথা।—অদ্য—আজ, মধ্য—মাঝ। এই প্রকারে উপাধ্যায় শব্দের ধ স্থানে ঝ হইলে উপাঝ্যায় শব্দের 'উপাধ্যায়' এইরূপ রূপান্তর হইয়া তাহার রূপান্তরে সহজেই 'ওঝা' হইতে পারে।

বারেন্দ্র শ্রেণীর আচার্য্য উপাধিটীও যে বিদ্যাবত্তারই দ্যোতক তাহা 'আচার্য্য' শব্দের শিক্ষাগুরু অর্থ হইতেই স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হয়। বারেন্দ্রশ্রেণীর 'বাগচী' উপাধিটীরও মূলে বাক্ * বা সরস্বতীর সহিত সম্পর্ক ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বাগ্‌চী শব্দটী আদিতে বাক্‌শ্রী শব্দেরই অপভ্রংশ ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার অর্থ ছিল, বাক্ বা বিদ্যাই শ্রী অর্থাৎ সম্পদ্ যাহার।

কৌলীন্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিশূরের পৌত্র ধরাশূর প্রথম বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে কুলাচল নামে আখ্যাত করেন। ইহার পরে বল্লালসেন কর্তৃক রূপান্তরিত হইয়া "কুলীন" নামে পরিণত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বল্লালসেন "সচ্ছোত্রিয়" নামে একটী মধ্যম শ্রেণীও সৃষ্টি করেন। যে শ্রোত্রিয়গণ ইতঃপূর্ব্বে মিথিলায় উচ্চতম শ্রেণীরূপে পরিগণিত হইত, সেই শ্রোত্রিয়গণই এক্ষণে নিম্নশ্রেণীতে পরিণত হইল। এখানে আমরা বাবু গিরীন্দ্র নাথ দত্তের গবেষণাপূর্ণ "The Brahmans and Kayasthas of Bengal" (বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ) নামক গ্রন্থ হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"It will be observed that in the classification of the Maithil-Brahmans the highest in rank were termed Srotriya (শ্রোত্রিয়) whereas in the classification of the Bengal Brahmans in the time of the so called Dharasur the highest rank was named Kulachala (কুলাচল) which is alleged to have been changed into Culin by Ballal and the term (সচ্ছোত্রিয়) good Srotriyas was given to the intermediate rank just above the despised Satsati. p. 133

বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের প্রভাব দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মের প্রাধান্য খর্ব্ব হইয়াই তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতেই বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বী শ্রোত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠত্ব লুপ্ত হইয়া, তান্ত্রিক-ধর্ম্মাবলম্বী কুলীনদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বল্লালসেন যে সকল লক্ষণের উপর কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে আমরা বিদ্যার বিশেষভাবেই উল্লেখ প্রাপ্ত হই যথা ঃ—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥"

কুলীনদিগের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় এই

* "ব্রাহ্মীতু ভারতী ভাষা গীর্ব্বাগ্‌বাণী সরস্বতী।" ইত্যমরঃ।

চারিটী বংশ। ইহাদের প্রত্যেকেরই শেষাংশে যে উপাধ্যায় শব্দ সংযুক্ত আছে, তাহা হইতেই ইহাদের পাণ্ডিত্যের সহিত যোগ বুঝিতে পারা যায়। কারণ উপাধ্যায় শব্দ পণ্ডিত অধ্যাপক অর্থ প্রকাশ করে ; যথা, অমরকোষে—

"উপাধ্যায়োঽধ্যাপকঃ।"

সুতরাং প্রধানতঃ পণ্ডিতের দ্বারাই যে কুলীন-বংশ-সকলের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার পরিষ্কার প্রমাণই এখানে পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত বংশনাম সকলের আদ্যংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, এইগুলি তত্তৎবংশের আদিস্থানেরই নাম। এইরূপে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আদিস্থানের নাম 'বন্দ্য' হয়, মুখোপাধ্যায় বংশের আদিস্থানের নাম 'মুখ' হয়, চট্টোপাধ্যায় বংশের আদিস্থানের নাম 'চট্ট' হয় এবং গঙ্গোপাধ্যায় বংশের আদিস্থানের নাম 'গঙ্গ বা গঙ্গা' হয়। এ সম্বন্ধে—"The Brahmans and Kayasthas of Bengal" (বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ) নামক গ্রন্থে বাবু গিরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন,—"The modern patronymic Bandyopadhyaya, Chottopadhyaya, Mukhopadhyaya (anglicised Banarjee, Chatterjee, Mukerjee), Ghosal Ganguly are derived from the Villages Bandya or Barrar, Chatta or Chatuli, Ghosal &c. p. 32.

গিরীন্দ্রবাবুর মতে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ঘোষাল, গাঙ্গুলি এই কয়টী নাম বন্দ্য বা বনরার, চট্ট বা চাটুলি, মুখটি, ঘোষাল প্রভৃতি গ্রামের নাম হইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ আমরা কুলীনদিগের যে বন্দ্যঘটী গাঁই বা গ্রাম প্রভৃতির উল্লেখ প্রাপ্ত হই এবং চট্টগ্রাম বা চট্টল নামে স্থানবাচক চট্ট শব্দের যে নিদর্শন দেখিতে পাই, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত মতটীর সত্য থাকা সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় নামের মুখ ও বন্দ্য এই দুইটী আদ্যভাগের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। মুখ শব্দ প্রধান অর্থে ব্যাখা করা যায় এবং বন্দ্য শব্দ বন্দনীয় অর্থাৎ পূজনীয়, সম্মানীয় অর্থে ব্যাখ্যা করা যায়। এইরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা 'মুখোপাধ্যায়' 'প্রধান উপাদীয়' বা পাণ্ডিত্যে প্রধান এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবে এবং 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পাণ্ডিত্যে বিশেষ সম্মানার্হ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিবে। কবিবর ভারতচন্দ্র তদীয় "অন্নদা-মঙ্গল"-কাব্যে অন্নদার নিজব্যর্থক পরিচয়ে মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় নামের মুখ ও বন্দ্য অংশদ্বয় সম্বন্ধে এইরূপ অর্থেরই স্পষ্ট আভাস প্রদান করিয়াছেন ; যথা—

"গোত্রের প্রধান পিতামুখবংশজাত।
পরমকুলীনস্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥"

উপরি-উক্ত স্থানের নাম সকল হইতে প্রাগুক্ত কুলীনবংশ সকলের যে সংক্ষিপ্ত বাড়ুজ্যা, বাড়রি, চাটুজ্যা, চাটাতি, মুখটী, মুখুজ্যা, গাঙ্গুজ্যা প্রভৃতি নাম হইয়াছে—তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রোত্রিয় ও কুলীন-ব্রাহ্মণ ব্যতীত বঙ্গদেশের পতিত ব্রাহ্মণদিগের বংশনামের মধ্যেও

আমরা বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের সহিতই সংস্রব দেখিতে পাই। সাহাজাতির ব্রাহ্মণদিগের "পণ্ডিত" নাম এবং গণক ব্রাহ্মণদিগের "আচার্য্য" নাম এ সম্বন্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্যই প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকারে আমাদিগের বংশনাম সকলের আলোচনা হইতে আমাদের আদিপুরুষগণ কিরূপ গুণোৎকর্ষের দ্বারা স্ব স্ব বংশনাম চির-সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, জানিতে পারিয়া আমরা যেমন হর্ষে গর্ব্বিত ও স্ফীত হইব, তেমনই তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে স্ব স্ব বংশের চির-প্রতিষ্ঠিত গৌরব-লাভের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিতও হইব।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্,এ, বিদ্যানিধি।

রাজা নীলাম্বর।

উপক্রমণিকা।

অদ্য দোল-পূর্ণিমা। শশাঙ্ক মনের আনন্দে আকাশে বসিয়া হাসিতেছে। নক্ষত্রমণ্ডলী চন্দ্রকে ঘিরিয়া টিপি টিপি হাসিতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য—চারিদিকে যেন আনন্দের ফোঁয়ারা ছুটিয়াছে, সকলেই আজ আমোদে রত। অদ্য শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, তাই ভগবানের আনন্দে সর্ব্বজীব আনন্দিত। বনের মধ্যে একটী পুষ্করিণী চাঁদের কিরণ জাল বেষ্টিত হইয়া কি সুন্দর খেলাই খেলিতেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি একটু একটু উচ্চে উঠিয়া আবার নামিয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীর উপরেই দেবালয়—দেবালয়ের জীর্ণাবস্থা। সেই দেবালয়ে শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি বিরাজিত। বামে কিশোরী দাঁড়াইয়া আছেন। শ্যামসুন্দর বংশীহস্তে যেন গোপীকুলকে ডাকিতেছেন। সম্মুখে একজন মহাপুরুষ উপবিষ্ট। কত যে তাঁহার বয়ঃক্রম,তাহা বুঝিবার উপায় নাই। জটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিকটে একটী কমণ্ডলু—তাহাতে গঙ্গাজল। শ্বেতশ্মশ্রু বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। মহাপুরুষের বর্ণ অতি সুন্দর, যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। গায়ে নামাবলী, পরিধানে গৈরিক বসন। মহাপুরুষের সম্মুখে একটী তেজঃসম্পন্ন বালক বসিয়া আছে। সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হইতে তাহার মস্তকে গঙ্গাজল ঢালিয়া দিয়া বলিলেন—"বৎস! এইবার দীক্ষা গ্রহণ কর।" বালক সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল, কোন কথা বলিল না। বালকটির বয়ঃক্রম ২২ বৎসরের বেশী হইবে না। দেখিলেই সুলক্ষণযুক্ত বোধ হয়। তাহার নয়ন হইতে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। সন্ন্যাসী বলিলেন—"বৎস! অদ্যকার এই ঘটনা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, গোপন রাখিবে। আর সর্ব্বদা যেন ধর্ম্মে তোমার মতি-গতি থাকে। তোমার ভয়ানক বিপদ দেখা যায়, সে বিপদ হইতে এক ভগবান ব্যতীত আর কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না। তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তি থাকিলে তোমার আর কোন ভয় নাই। সেই মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিবে,এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে ভুলিও না।" বালক ভক্তিভরে বলিল—"গুরুদেব! আমি অজ্ঞান, ভক্তি কি জানি না? আপনি অদ্য যে বীজ বপন করলেন, তাহার ফল যদি ফলে, তবেই বুঝবো কৃপাময়ের কৃপা আমার প্রতি বর্ষিত হল। আপনি যার গুরু, তার আবার

বিপদের ভয় কি ? প্রভু ! আমি ধন চাইনা,জন চাইনা,রাজ্য চাইনা,শুধু আপনার সেবা কর্‌বো, এই আমার বাসনা। অতএব আজ্ঞা করুন আমি আপনার সঙ্গে যাই, আশ্রমে বাস ক'রে আপনার পদসেবা করি।" মহাপুরুষ হাসিয়া বলিলেন,—"এখনও তোমার যে সময় হয় নাই। যখন সময় হবে, তখন আমি এসে নিয়ে যাবো। এখন সংসারের পরীক্ষার মধ্যে বাস কর, এই পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হ'তে পার, তবে আমার শান্তি নিকেতনে স্থান পাবে ও অন্তিমে ভগবচ্চরণে লয় হবে। এখন আমি যাই। তুমিও ঘরে যাও। সাবধান! একথা যেন প্রকাশ না হয়।" বালক বলিল—"গুরুদেব ! কখনও প্রকাশ হবে না। যখন সংসারে ফেলে দিলেন, তখন পরীক্ষায় যেন উত্তীর্ণ হ'তে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।" সন্ন্যাসী বালকের মাথায় হাত বুলাইলেন, বালক ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। তারপর সন্ন্যাসী বলিলেন—"বৎস ! যাও, যদি কখনও বিপদ উপস্থিত হয় তবে আমাকে স্মরণ করো।" বালক বিদায় হইল, সন্ন্যাসী উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"ভগবান ! বালককে রক্ষা করো।" তাহার পর হঠাৎ বনের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভগ্ন-মন্দিরে।

১৫০৭ খৃষ্টাব্দ—পৌষমাসের শেষভাগ—ভয়ানক শীত পড়িয়াছে। রংপুর জেলার কামারপুর হইতে ঘোড়াঘাট যে রাস্তা গিয়াছে, সেই সু-প্রশস্ত ও মনোরম রাস্তা দিয়া সায়ংকালে দুইজন অশ্বরোহী পাশাপাশি হইয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছেন। স্বল্পক্ষণ পরেই সূর্য্য অস্তাচলগামী হইলেন, তখন অন্ধকারে রাস্তায় চলা কঠিন হইবে বুঝিতে পারিয়া, দুই জন দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইলেন. ঐ দুই জন অশ্বারোহীর মধ্যে একজনের বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশ বৎসর হইবে। দেখিতে সুপুরুষ। সৈনিকের বেশ, কোমরে একখানি অসি ঝুলিতেছে। মস্তকের শিরস্ত্রাণের মধ্যে একখণ্ড মূল্যবান হীরক ঝক্‌ ঝক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। শরীর খানি বেশ সুগঠিত, বলিষ্ঠ। অপর অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম দ্বাবিংশ বৎসর হইবে, কুঞ্চিত কেশ শিরস্ত্রাণের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বলিষ্ঠ ও সুগঠিত বপু। ইহার পরিধানে যোদ্ধবেশ, তবে প্রথম অশ্বারোহী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। একখানি ক্ষুদ্র অসি পার্শ্বদেশে দুলিতেছে, হস্তে একটী বৃহৎ বর্শা। দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ, তপ্তকাঞ্চন-তুল্য বর্ণ—পোষাক ভেদ করিয়া উঠিতেছে। প্রথম অশ্বারোহীর শ্মশ্রু আছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্মশ্রু নাই,অল্প অল্প গোপের রেখা দেখা দিয়াছে। প্রথম অশ্বারোহীর নয়ন দু'টি দীপ্তিব্যঞ্জক বোধ হইতেছে, কি যেন কেমন একটী রশ্মি বাহির হইয়া আসিতেছে।

কতকদূর অগ্রসর হইলেই সন্ধ্যার অন্ধকার রাস্তায় পতিত হইল। তখন প্রথম অশ্বারোহী বলিলেন—"আমরা কি সময় মত পৌঁছিতে পার্‌বো ? এখনও অনেক দূর যেতে হবে।" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন—"যেরূপ দ্রুত-

বেগে আমরা যাচ্ছি, নিশ্চয়ই পৌঁছিতে পারবো।” প্রথম অশ্বারোহী বলিলেন—“তোমার ত ভয় হচ্ছে না?” দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন—“আপনার কৃপায় ভয় কি জানি না।” কতকক্ষণ উভয়ে আর কথা বলিলেন না, অতি বেগে অশ্ব চালাইলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল, শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু অশ্বারোহীদের শীত বোধ হইল না, তাঁহারা বরং আরাম বোধ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন—“অশ্ব আর চলিতে পারে না। এখন উপায়? এখানে কি বিশ্রামের স্থান আছে?” দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন—“বিশ্রামের স্থান দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ঐ যে একটী আলো দেখা যাচ্ছে, চলুন ঐ স্থানে যাই।” তখন উভয়ে ধীরে ধীরে আলোকটীর দিকে চলিলেন। যতই যাইতেছেন, আলো যেন ততই সরিয়া যাইতেছে, অবশেষে যখন অশ্ব আর চলিতে পারিল না, তখন উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। অশ্ব দু'টিকে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে লাগিল। সৈনিকদ্বয় পদব্রজে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন—“নিজে ইচ্ছা করিয়া এই কষ্ট আনিয়াছেন।” প্রথম অশ্বারোহী উত্তর করিলেন—“সৈনিকের আবার কষ্ট কি?”

অনেক দূর অগ্রসর হইয়া উহাঁরা দেখিলেন, একটি ভগ্ন মন্দিরে আলো জ্বলিতেছে। মন্দিরটি মাঠের মধ্যে অবস্থিত, দুই একটী বৃক্ষ মন্দিরের চতুপার্শ্বে দণ্ডায়মান। একটী ভগ্নদ্বার অর্দ্ধ উন্মুক্ত, সেই দ্বার দিয়া আলো বাহির হইতেছে। উভয়ে ধীরে ধীরে মন্দিরে উঠিলেন, দ্বারের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ভিতরে কেহই নাই। যখন আলো জ্বলিতেছে, তখন নিশ্চয়ই কেহ মন্দিরে আছে, এই ধারণা করিয়া উভয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় জনমানব নাই, এবং কোন দেবমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত নাই। উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন—“কেহ মন্দিরে থাকুক বা না থাকুক, আমরা এখানে বিশ্রাম করিব, তখন উভয়ে মন্দিরের প্রাচীর ঠেস্ দিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিদ্রার আবেশ হইল এবং বসিয়া বসিয়াই নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল, মন্দিরের আলোটী তৈলাভাবে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, তখনও উভয়েই নিদ্রায় অভিভূত। মৃদুমধুর বায়ু বহিতেছিল। তাহাতে শীতবোধ হওয়ায়, তাঁহারা উঠিয়া আবার গাত্রবস্ত্র জড়াইয়া উভয়ে নিদ্রিত হইলেন, কিন্তু শীতের প্রকোপ কমিল না। যতই অধিক রাত্রি হইতে লাগিল, ততই অধিক শীত বোধ হওয়ায় তাঁহাদের নিদ্রার বেগ ক্রমেই কমিতে লাগিল। সহসা নিদ্রাভঙ্গে উভয়ে বিস্ময়ের সহিত এক মনে শুনিতে লাগিলেন—কে যেন মৃদুমধুর-স্বরে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে স্তোত্র পাঠ করিতেছে।

“আদায় বেদাঃ সকল সমুদ্রা নিহত্য শঙ্খং
রিপুং মত্যুদগ্রং।

দত্তাঃ সুরী যেন পিতামহায় বিষ্ণুং তমাদিং
শুভ্র মৎস্যরূপং ॥" ইত্যাদি।

বিষ্ণুর স্তব শুনিতে শুনিতে এক আশ্চর্য্য ভাব উভয়ের হৃদয়ে উপস্থিত হইল, যেন কোন স্বর্গীয়া দেবী স্তব পাঠ করিতেছেন। উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোথা হইতে এমন সুস্বর বাহির হইতেছে। অনেক অনুসন্ধানেও কিছুই দেখিতে পাইলেন না, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। ইহার পর আর কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন না।

ভোর হইলে উভয়ে উঠিয়া পুনরায় মন্দির ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না; তৎপরে তাঁহারা অশ্বরোহণে গন্তব্যপথে রওনা হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘোড়াঘাট দুর্গ।

বেলা এক প্রহরের সময় অশ্বরোহীদ্বয় ঘোড়াঘাট দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সে সময় মার্ত্তণ্ডদেব এমন প্রবল তেজ প্রকাশ করিতেছিলেন, যে শীতকালেও উভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইলেন। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তুর্য্যধ্বনি করিলেন. একজন সামন্ত প্রহরী বলিল—"কে ?" প্রথম অশ্বারোহী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কথা বলিতে বারণ করিয়া বলিলেন,—"আমরা দু'জন পথভ্রান্ত, অনেক দূর হ'তে এসেছি,আজ তোমাদের দুর্গ-রক্ষকের অতিথি, তুমি একবার তাঁহাকে সংবাদ দেও!" প্রহরী উভয়কে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিল, অভিবাদন করিয়া বলিল,—"আপনারা অপেক্ষা করুন,আমি সংবাদ দিচ্ছি।" প্রহরী চলিয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছেন? আজকাল শত্রু-মিত্র চেনা ভার, আপনারা পরিচয় না দিলে এ দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।" প্রথম ব্যক্তি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তোমাদের প্রভু বুঝি এই ভাবে অতিথি সৎকার করেন? ভাল আমরা ফিরে যাচ্ছি, তোমার প্রভুকে বলো।" প্রহরী বলিল—"আপনারা পরিচয় না দিলে আমার প্রভু দুর্গে প্রবেশ করিতে দিতে পারেন না। এ সময়ে চারিদিকে শত্রু, কখন কি হয়, বলা যায় না।" প্রথম ব্যক্তি আবার হাসিয়া বলিলেন—"তোমার প্রভুর ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হ'লেম, আমরা পরিচয় কি দিব? আমরা সৈনিক-পুরুষ, চাকরীর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাদের নিবাস বঙ্গদেশের সীমানায়। আমার নাম হরনাম সিংহ, আমার এই বন্ধু দুর্গানাথ রায়।" এই কথা শুনিয়া আবার প্রহরী চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া বলিল—"আপনারা আসুন।" উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন, অশ্ব দু'টিকে দুই জন ভৃত্য আসিয়া অশ্বশালায় লইয়া গেল।

দুর্গরক্ষক শীতলা কান্ত রায় বারেন্দ্র-শ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তিনি সামান্য কার্য্য হইতে এই দুর্গরক্ষকের পদে উন্নীত হইয়াছেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতি বিশ্বাসী লোক; রংপুরের অধীশ্বর রাজা নীলাম্বরের পিতার সময়ের কর্ম্মচারী। রাজা নীলাম্বরকে তাঁহার পিতার সময়ে অতি শিশু দেখিয়াছিলেন, রাজা নীলাম্বর যখন সিংহাসনে

উপবেশন করেন, সে সময় হইতে তিনি রাজধানী যাইতে পারেন নাই। বৃদ্ধের সংসারে—স্ত্রী নাই, একমাত্র কন্যাকে রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। কন্যা সরসীবালা জন্মাবধি মাতৃস্নেহ পায় নাই, শিশুকাল হইতেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিতা। এখনি সরসীবালার বয়ঃক্রম দ্বাদশ অতিক্রম করিয়াছে। শীতলাকান্ত রায় কন্যাকে অতিশয় স্নেহ করেন, কন্যাও পিতার যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবতী। অনেকে তাঁহাকে বৃদ্ধবয়সে বিবাহের জন্য উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি সে সব কথা গ্রাহ্য করেন নাই।

দুর্গরক্ষক শীতলাকান্ত রায় একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ভৃত্য আগন্তুকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য গাত্রোত্থান করিতেছিলেন, কিন্তু প্রথম অশ্বারোহী বলিলেন—"আপনি বসুন,আমাদের জন্য কোনরূপ ব্যস্ত হ'তে হবে না।" দুর্গরক্ষক বলিলেন—"আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন, আমায় রাজার আদেশ প্রতিপালন করতেই হবে, তাই আপনাদিগকে দ্বারে এত কষ্ট পেতে হল। এই দুর্গ যদি আমার নিজের হ'ত, তা হ'লে অতিথিকে আশ্রয় দিতে আমি ইতস্ততঃ করতেম না। আমি চাকর, রাজার হুকুম তামিল না ক'রে উপায় কি?" "আগন্তুক বলিলেন—"সেজন্য আপনাকে কুণ্ঠিত হ'তে হবেনা। আপনি কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছেন, আমি সে জন্য সুখী হ'লেম। দুর্গরক্ষক বলিলেন—"আপনাদের পরিচয় ত একরূপ পেয়েছি, আপনারা কি চাকরীর অন্বেষণে বহির্গত হয়েছেন? আমার মতে—আমাদের রাজা নীলাম্বরের নিকট আপনাদের যাওয়া কর্ত্তব্য। এমন ধার্ম্মিক, পরোপকারী, বীরপুরুষ, আর ভাবতে পাবেন না। "প্রথম ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন--"আপনি আপনার রাজার অতিরিক্ত প্রশংসা কচ্ছেন, আমি শুনেছি, তিনি নিতান্ত স্ত্রৈণ, কাপুরুষ ও কপট।" দুর্গাধ্যক্ষ এই কথায় বড় অসন্তুষ্ট হইলেন, তিনি উত্তর করিলেন—"আপনি অতিথি বলে রক্ষা পেলেন, নতুবা রাজনিন্দার জন্য আপনার দণ্ড হ'ত। যা হ'ক, সে আলোচনায় দরকার নাই। আপনাদের যে স্থানে অভিরুচি যেতে পারেন।" আগন্তুক বলিলেন--"আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমি যাহা শুনেছি, তাই বল্‌ছি। যা হ'ক, এখন আমাদের আহারের উদ্যোগ করুন, গত কল্য আমাদের আহার হয় নাই।" বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়াই তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে বলিয়া নিজে তাঁহাদের আহারের উদ্যোগের জন্য গেলেন। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন—"বৃদ্ধকে কেমন দেখ্‌লেন?" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন—"কর্ত্তব্যপরায়ণ বটে, কিন্তু আজ আপনার জন্য বোধ হয় অনাহারে থাকতে হ'ত।" প্রথমব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন—"সে উপায় আমি করতেম, তোমার কোন ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্গাধ্যক্ষের কার্য্যে আমি বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি।" দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন—"সে ভাবনা বেশী নাই, তবে ভয় যে আপনি আবার চিত্ত না হারান।" প্রথম অতিথি "হো হো" করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরসীবালা।

অতিথিদ্বয় ভোজনে বসিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ স্বয়ং নিকটে বসিয়া তাঁহাদের আহারের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বৃদ্ধ অতিথিদিগকে আহার করাইয়া পরে নিজে ভোজন করিবেন। অতিথিদ্বয় দুইখানি সুন্দর আসনে দু'জনে বসিয়াছেন, নানারূপ মৎস্যের ব্যঞ্জন শোভা পাইতেছে, বৃদ্ধের কন্যা সরসীবালা পরিবেশন করিতেছে। বৃদ্ধ বলিতেছেন—"একে আর একটুকু ঝোল দেও, ওঁকে আর একটুকু মুড়িঘণ্ট দেও।" উভয়েই সলজ্জভাবে আহার করিতেছিলেন, তন্মধ্যে দুর্গানাথ রায় অল্পবয়স্ক বিধায় আরও লজ্জা বোধ করিতেছিলেন, তিনি আর মস্তক তুলিতে পারিতেছিলেন না, যেন কতই আহারে ব্যস্ত। একবার চাহিয়া দেখিলেন, সরসীবালা ব্যঞ্জনের থালা হস্তে লইয়া আসিতেছে, তিনি সরসীবালাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। এমন সুন্দরী তিনি আর কখনও দেখেন নাই? গোলাপ ফুলের ন্যায় রং,ওষ্ঠ দু'খানি যেন আলতামাখান। কুঞ্চিত মেঘবর্ণ কেশরাশি পৃষ্ঠদেশকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। হস্ত দু'খানি কি সুগোল, যেন মৃণালকে পরাজিত করিয়াছে, সেই সুন্দর হস্তযুগলে স্বর্ণের দু'গাছি বালা। কর্ণে দু'টি দুল দুলিতেছে, বোধ হইতেছে, ভ্রমর-যুগল পুষ্পভ্রমে ঐস্থানে বসিয়াছে। পরিধানে একখানি নীলবর্ণ ঢাকাই শাড়ী, তাহাতে সুন্দরীর রূপের সৌন্দর্য্য যেন বৃদ্ধি করিয়াছে। আরও চক্ষু দুটি স্থির,পদ্মের কোরকসদৃশ দেখাইতেছে। পদযুগলে রৌপ্য মল,সঙ্কেদ:ঝুণুঝুণু বাজিতেছে। গলদেশটি কি সুন্দর, তাহাতে আবার একগাছি স্বর্ণহার দুলিতেছে। শীতলাকান্ত রায়ের একমাত্র স্নেহের কন্যার অলঙ্কারের অভাব কি? তাহার উপর প্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য্য এই বালিকার উপর ঢালিয়া দিয়াছে। দুর্গানাথ রায় এ সৌন্দর্য্য দেখিলেন, তিনি এ রূপের সহিত তুলনা করিবার জন্য কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন পৃথিবীতে আর এমন সৌন্দর্য্য কোথাও নাই। তিনি দৃষ্টি করিতে সঙ্কুচিত হইলেও, এক একবার চোরের ন্যায় সে রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। বালিকাও আগন্তুকদ্বয়কে দেখিল, কিন্তু দুর্গানাথ রায়কে অল্পবয়স্ক দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইতেই বালিকার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। সেও দেখিল যে, যুবক পরম সুন্দর ও নম্র। ব্যঞ্জন আহার শেষ হইলে বৃদ্ধ দধি, দুগ্ধ ও সন্দেশ আনিতে বলিলেন, বালিকা সে সব আনিল। ক্রমে আহার সমাপ্ত হইল। বালিকা আর আসিল না। শীতলাকান্ত রায় উভয়কে আচমনান্তে একটি বিশ্রামকক্ষে লইয়া গেলেন। তথায় তাম্বুল আনাইয়া দিয়া স্বয়ং আহারার্থে চলিয়া গেলেন।

হরনাম সিংহ ও দুর্গানাথ রায় উভয়ে দুই শয্যায় শয়ন করিলেন, দু'জনের দুই চিন্তা। দুর্গানাথ রায় যতই অন্য চিন্তা আনিতে চাহেন, ততই সরসীবালার চিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। হরনাম সিংহ কি ভাবিতেছেন, এই দুর্গাধ্যক্ষের কথা, আর ভাবিতেছেন, তাঁহার প্রাণপ্রতিমার বিষয়। কতক্ষণ পরে হরনাম

বলিলেন,—"দুর্গানাথ! দুর্গাধ্যক্ষের কন্যাকে কেমন দেখ্‌লে?" দুর্গানাথ এতদিন সরল ভাবে সব উত্তর দিতেন, আজ যেন সেরূপ উত্তর করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি বলিলেন—"মেয়েটি দেখ্‌তে মন্দ নয়।" হরনাম সিংহ দুর্গানাথ রায়ের দিকে তাকাইলেন, তাঁহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন দেখিয়া লইলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"আমাকে আর গোপন ক'রে কি হবে?" দুর্গানাথ রায় উত্তর করিলেন—"গোপন কি? আমি ত বিশেষত্ব দেখলেম্ না।" হরনাম সিংহ আবার ঈষৎ হাসিলেন, তিনি উঠিয়া আসিয়া দুর্গানাথ রায়ের কর্ণের নিকট অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"উপযুক্ত হও, পুরস্কার-স্বরূপ এই রত্ন পাবে।" তিনি এই কথা বলিয়াই শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

অপরাহ্নে শীতলাকান্ত রায় আসিলেন, তিনি ইহাদের সহিত নানারূপ বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। হরনাম সিংহ বলিলেন,—আপনি কতকাল রাজধানী গমন করেন নাই? বৃদ্ধ বলিলেন—"অনেক কাল, আমি এই বর্ত্তমান রাজার পিতার সময়ে গিয়াছিলেম,তখন রাজা সীতারাম বালক ছিলেন। পূর্ব্বে এ দুর্গ ছিল না, আমি অন্যত্র নিযুক্ত ছিলাম, বর্ত্তমান রাজা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও আমাকে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ক'রে এখানে পাঠান। আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য ফেলে আর রাজধানী যেতে পাচ্ছি না। এ দুর্গটী রাজ্যের সীমায় অবস্থিত, সর্ব্বদা এখানে থাকৃতে হয়। আজকাল মুসলমানদের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, নিঃশঙ্কচিত্তে থাকিবার উপায় নাই।" হরনাম সিংহ বলিলেন—"আপনার ন্যায় বিশ্বাসী উপযুক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কর্ম্মঠ কর্ম্মচারী থাকিতে আর এ দুর্গের ভয় কি? কত সৈন্য এ দুর্গে আছে?" এবার দুর্গাধ্যক্ষের মুখ গম্ভীর হইল.তিনি সরলভাবে বলিলেন—"তাহা বিদেশী লোককে বলিবার প্রথা নাই, সেজন্য আপনারা ক্ষুণ্ণ হইবেন না। আপনাদের ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, যদি বলেন, তবে আমি আপনাদের জন্য রাজা বাহাদুরকে অনুরোধ করি। আপনাদের ন্যায় সুযোগ্য লোক পেলে তিনি আদরে গ্রহণ কর্‌বেন।" দুর্গানাথ রায় বলিলেন—"আমাদিগকে সুযোগ্য কি ক'রে বুঝলেন?" বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"এই কার্য্য করতে করতেই বৃদ্ধ হয়েছি, লোক দেখলেই চিন্‌তে পারি। আমার প্রস্তাবে কি বলেন?" হরনাম সিংহ বলিলেন—"আমরা ত দু'জনে মুসলমানদের অধীনে কার্য্য লইব মনে করে বাহির হয়েছিলেম। এখন আপনাদের অনুগ্রহে যদি এ কার্য্য পাই, তবে মন্দ হয় না।" দুর্গাধ্যক্ষ ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তিনি দেখিলেন—হরনাম সিংহ যেন বিদ্রূপের স্বরে কথা বলিতেছেন, অতএব এ বিষয় আর উল্লেখ করিলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, উভয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। নানারূপ ফল, সন্দেশ ও এক বাটী দুগ্ধ তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত হইল। এবার কিন্তু সরসীবালা আসিল না। দুর্গানাথ আশা করিয়া ঘন ঘন পথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু

তাঁহার নেত্রযুগল আর তৃপ্তি লাভ করিল না। অতএব একটী ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি জলযোগে মনোনিবেশ করিলেন। রাত্রে আর উভয়ে আহার করিলেন না। উভয়ে বৃদ্ধের নিকট বিদায় হইয়া থাকিলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। বলিলেন যে, তাঁহাদের বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্য আছে, অতএব তাঁহাদের প্রত্যুষে যাইতে হইবে। বৃদ্ধ আর এক দিন থাকার জন্য বলিলেন, কিন্তু তাহা আর হইল না।

অতি প্রত্যুষে উভয়ে উঠিয়া অশ্বারোহণে রওনা হইলেন, ঠিক সেই সময়ে বৃদ্ধ দুর্গাধ্যক্ষ আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দ্বারের নিকট সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ে অশ্ব হইতেই তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বৃদ্ধ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যাইবার সময় বৃদ্ধ বলিলেন—"তোমরা আমার পুত্রের ন্যায়, যদি কখনও চাকরী করিতে চাও, আমাকে লিখো, আমি রাজার নিকট অনুরোধ করবো।" হরনাম সিংহ বলিলেন—"আপনার অনুরোধ কি রাজা শুন্‌বেন?" বৃদ্ধ বলিলেন—"কেন শুন্‌বেন না? আমি তাঁহার পিতার সময়ের বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন না? বিশেষতঃ আমার রাজা পরোপকারী ও উৎকৃষ্ট স্বভাবসম্পন্ন; দেব-দ্বিজে যথেষ্ঠ ভক্তি আছে" হরনাম সিংহ বলিলেন—"আপনার কথায় আমি সন্তুষ্ট হলেম। আমরা এখন কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি। যদি আপনার পরামর্শানুসারে আমরা আপনার প্রশংসনীয় রাজার চাকরী করতে চাই, তবে সময় মত সংবাদ পাঠাবো, আপনি আমাদের জন্য চেষ্টা করবেন।" আর কোন কথা হইল না, উভয়ে অশ্ব ছুটাইলেন। দুর্গানাথ রায় একবার পশ্চাৎ দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন এক খানি সুন্দর মুখ বাতায়নে দেখা যাইতেছে। চারি চক্ষুর মিলন হইল, অমনি বাতায়ন হইতে মুখখানি অপসৃত হইয়া গেল। দুর্গানাথ রায় একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হরনাম সিংহের অনুসরণ করিলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু বি-এ।

কোন্ পথে?

সুদূর প্রান্তর মাঝে অয়ি হেমাঙ্গিনী,
করিতেছি করুণ ক্রন্দন,
তোমা' ধনে লভিব বলিয়া। কিন্তু,
চারিদিকে কত পথ,
খুঁজিয়া না পাই, কোন্ পথে গেলে,
তোমা' সথে হইবে মিলন।
পথহারা পান্থ আমি,
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ;
পড়িয়াছি মরুভূমি মাঝে,—দেখি নাই,
কেমন সে পান্থ-পাদপ।
শুনিয়াছি লোক মুখে শুধু, তাই—
চিনিতে না পারি;
কে দেখায়ে দেবে মোরে সেই
শান্তি-সুধা-ধারা।
দুই চো'ক থাকিতে আমার, রত্ন আমি
খুঁজিয়া না পাই;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হই হতাশে বিহ্বল।

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহার নয়,
হৃদয়-বাসনা কৈ পূর্ণ নাহি হয়;
আজি হ'বে কালি হ'বে ব'লে,
ছিড়ে যায় কর্ম্মের বন্ধন।
কাল আসি করে যবে
কেশ আকর্ষণ, মনে পড়ে
পরজন্ম কথা। অতৃপ্ত বাসনা
লয়ে যাই পরলোকে;—
মুক্তি কোথা? বাসনার বশে হই
পুনঃ এই সংসারে পতন।
কেঁদে কেঁদে মরি তাই
আপনার দোষে।
মিছামিছি অদৃষ্টের দোষ দিয়ে পরে,
সুখী হই সংসারী হইয়া।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

জাতি-বিচার।

সাম্য—বিবাহ।

বিবাহ-বিচারই জাতি-বিচারের মূল মন্ত্র। বিবাহ-বিচারের জন্যই হিন্দুর জাতি-বিচার। অতএব এ অধ্যায়টী আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

বিবাহ সকল সমাজেই প্রচলিত আছে, হিন্দু সমাজেও আছে। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য সকল সমাজের লোকের সমান নহে। স্ত্রী-পুরুষের আসঙ্গ-লিপ্সা চরিতার্থের সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন উদ্দেশ্যেই বিবাহ রূপ সামাজিক বন্ধন প্রথম উদ্ভূত হয়। তারপর যে সমাজ যত উন্নত হইয়াছে, সামাজিক ব্যক্তিবৃন্দের লক্ষ্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার দিক হইতে জ্ঞান ও বুদ্ধির দিকে যত অগ্রসর হইয়াছে, ইন্দ্রিয়দমন ও জ্ঞানের উৎকর্ষতা যে সমাজের লোকের মধ্যে যত প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বিবাহের উদ্দেশ্যও তত পরিবর্ত্তিত, সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। রমণী উপভোগ্য সামগ্রী হইতে উপভোগের অংশভাগিনী হইয়াছে, ক্রীড়-পুত্তলী হইতে ক্রিড়াসঙ্গিনী হইয়াছে, ভোগ্যরূপে সুখদায়িনী অপেক্ষা ভোগাংশিনী রূপে অধিক সুখসম্বর্দ্ধিনী হইয়াছে, আসঙ্গ-লিপ্সা প্রেমে পরিণত হইয়াছে, আকাঙ্ক্ষা কর্ত্তব্যে দাঁড়াইয়াছে, বাসনার হলাহল স্রোত বিবেচনার বজ্রবন্ধনে পড়িয়াছে, বাহ্য জগৎ অন্তর্জগতে লীন হইয়াছে, মহাপাপ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ধর্ম্ম বন্ধনে নিযুক্ত হইয়াছে। দুইয়ে মিশিয়া এক হইতে শিখিয়াছে—আর মনুষ্যের চিন্তা কি?

কিন্তু সকল সমাজ বিবাহের এ গভীরতা এখনও বুঝিতে পারে নাই। এই বিবাহের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও সাফল্য তুলনা করিলেই কোন্ সমাজ কত উন্নত হইয়াছে, বেশ জানা যাইবে। উদ্দেশ্যের গভীরতা জ্ঞানের পরিচায়ক। সেই জন্য আমরা আগে বিবাহের বিভিন্ন সমাজগত উদ্দেশ্য ও পরে তৎসাধনোপযোগী পদ্ধতিগুলির আলোচনা করিব। তার পর দেখিব—আমাদের বিবাহ-পদ্ধতি সাম্যবাদের কোন অংশে অন্তরায় কি না।

ইউরোপীয়েরা বিবাহকে কেবল পার্থিব সুখশান্তি সাধনের উপায় ভাবেন। তাহাদের বিবাহে অন্য কোন উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় না।

এই পার্থিব সুখশান্তি সাধন, দম্পতি মধ্যে গাঢ় প্রণয় সঞ্চারে উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে ক্রমে মিলন হইলেও হইতে পারে,—এই জন্য পতি-পত্নীর এরূপ সম্মিলন তাহাদের গৌণ উদ্দেশ্য। ইউরোপীয় পুরুষ বিবাহ করে, আপনি সুখী হইবে বলিয়া—স্ত্রীলোকও বিবাহ করে সেই একই কারণে।

হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য ইহা হইতে অনেক উচ্চ। হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য—যাহা তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, যাহা তাহাদের সমাজের উদ্দেশ্য, যাহা এ বিচিত্র-চিত্র-দলমালাময়ী অনন্ত প্রকৃতির উদ্দেশ্য—উন্নতি,—ধর্ম,—নির্গুণ-পুরুষ-সম্মিলন—মোক্ষ। হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ। হিন্দু—স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনী বলে।

এই ধর্ম্ম সাধনের জন্য ও দম্পতির মধ্যে প্রাণে প্রাণে, মনে মনে একীকরণ চাই; হৃদয়ে হৃদয়ে পরস্পরের সুখ সাপেক্ষতা চাই, প্রণয় চাই, সাংসারিক শান্তিও চাই; তাই হিন্দুর বিবাহের অন্ত উদ্দেশ্য—প্রেম। ইউরোপীয় বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য যে পার্থিব সুখসাধন; হিন্দুর সেটা প্রধান লক্ষ্য না হইলেও সঙ্গে সঙ্গে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যায়। অতএব হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য ইউরোপীয় অপেক্ষা যে অনেক মহৎ, অনেক উচ্চ, উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে যে স্বর্গ নরক ব্যবধান সে কথা এক প্রকার সর্ব্ববাদী সম্মত। এখন আমরা দেখিব বাস্তবিকই হিন্দু-বিবাহের ওই উদ্দেশ্য কি না এবং কোন্ সমাজ আপন উদ্দেশ্য সাধনে অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছে। মনু বলেন:—

স সন্ধার্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়া মিচ্ছতে।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোহধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ।

মনু—৩য়—৭৯॥

যিনি পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহলোকে সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়-গণকে আয়ত্ব করিতে পারেন না, তাঁহারা এ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়জয় ব্যতিত গৃহাস্থাশ্রম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না; মনু স্পষ্ট এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। তবেই ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য যে হিন্দু গৃহাস্থা-শ্রমী হয় না, এ কথা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

হিন্দুর গৃহস্থাশ্রম একটি কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদন। আর এই কর্ত্তব্য পালনের প্রধান সহায় স্ত্রী—তাই হিন্দুর বিবাহ। স্ত্রী ভিন্ন এ কর্ত্তব্য সম্পাদন হইতে পারে না। যদিও কেহ প্রাণপণে অন্যান্য গার্হস্থ্য কর্ম্ম সকল একা সম্পন্ন করিতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকার্য্য স্ত্রীর সহায়তা ভিন্ন হইবার উপায় নাই। সৃষ্টি বা বংশ রক্ষা না হইলে হিন্দু মহাপাতকী রূপে পরিগণিত হয়। তাহার ঊর্দ্ধ পুরুষেরা অবধি নিরয়গামী হয়। হিন্দু—সন্তানকে আত্মজ বলে। আপনারই এক অংশ পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে ও এইরূপে পুত্র হইতে পৌত্র, পৌত্র হইতে প্রপৌত্রে সেই এক অংশ যত অল্পই হউক না কেন, ক্রমশঃ বংশা-নুক্রমে পৃথিবীতে মনুষ্যাকারে বর্ত্তমান থাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র-শুদ্ধ-বিবাহ ও বীজ-শুদ্ধির বলে বিশুদ্ধতা লাভ করিতে থাকে। এই সবই হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য। বিবাহ না করিলে

লোপ পায়। এত ভাবিয়া তবে হিন্দু বিবাহ করে। হিন্দুর বিবাহ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা নহে।

দেখিলে—হিন্দুর দূরদর্শীতা একবার অমু-সৃষ্টি রক্ষা হয় না। মনুষ্য কুল পৃথিবী হইতে ধাবন করিলে,হিন্দুর মহান্ জ্ঞানের মহাসাফল্য প্রত্যক্ষ করিলে! ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

কর্ম্মণ্য কর্ম্মষ পশ্যেদকর্ম্মনি চ কর্ম্মষ।
সবুদ্ধিমান মনুষ্যেষু সংযুক্ত কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ॥

"যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন,তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগীই ও তিনিই সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা" হিন্দুর অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মদর্শনের ক্ষমতা একবার হৃদয়ঙ্গম করিলে! কোথায় সর্ব্বজঘন্য পাশব ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা, আর কোথায় জগতের মহাহিতকারী সৃষ্টিরক্ষা রূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাধর্ম্ম! দেখিলে কি পুলকে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায় না? বিবাহত সকলেই করে, আবহমান কাল সকলেই করিয়া আসিতেছে, আর পুত্রও ত সকলের হয়। কিন্তু কোথায় কোন্ দেশে, কোন্ দেবতা, ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা সর্ব্বপাপের আধার হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া, তাহারই মধ্যে আবার এরূপ মহাধর্ম্মের বীজ প্রত্যক্ষ করিয়া পুত্রোৎপাদন করে? এরূপ মহাধর্ম্মোদ্দেশে মহাপাপের নিয়োগ করিতে পারে কে? পুত্রোৎপাদন না করিলে নিজের অনিষ্ট এবং জগতেরও অনিষ্ট। পুত্রোৎপাদন জগতের মূল রক্ষা হেতু; আবার অসৎ পুত্র হইলে জগতের দ্বিগুণ অনিষ্ট। সৎপুত্র লাভের জন্য কত তিথি নক্ষত্র বিচার, কত বাঁধা বাঁধি প্রয়োজন; এত কথা ভাবিয়া কে বিবাহ ও স্ত্রী সহবাস করে? হিন্দু স্ত্রী-সম্ভোগ করে,ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া। কয়টা কথা বলিব? কোন্ কথার বিচার করিব? হিন্দুর নিশ্বাস ফেলার কথাটি অবধি বলিতে গেলে এক এক খানি বিজ্ঞান আবৃত্তি করিতে হয়! হায়, দেশের অবস্থা! আজ আমার মত নিরক্ষর লোকও কোমর বাঁধিয়া তার বিচার করিতে বসে। দৈব!!! । হায়! দুর্দ্দশার কথা আর কত বলিব। বলিতে বাক্যউচ্চারণ হয় না। লিখিতে কলম চলে না। চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাই না। দৈব! কেবল তোমার উপর সমস্ত বিচারের ভার দিয়াই কেমন আমরা মনুষ্যত্ব প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছি—একবার দেখ। হায়! ঋষিগণ তোমরা কোথায়? তোমাদের বংশধরদের অবস্থা দেখিয়াও তোমরা কেন নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি কিছু করিবে না? তারা কি একেবারে তোমাদের নাম লোপ করিবে? তোমাদের চিরন্তন প্রত্যাশা এক গণ্ডুস জল—তা হতেও কি তোমরা বঞ্চিত হইবে?

দূর হউক, আর এ সকল কথা বলিয়া মর্ম্মাহত হইতে পারি না। অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইতে হয়। থাক এই পর্য্যন্ত। এখন আসল কথা হতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম যে হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা নহে।

ধর্ম্ম—সৃষ্টি বর্দ্ধন করা—সৎপুত্রের উৎপাদন জন্য আপনার বীজ পরিশুদ্ধি করা ও জগৎকে প্রতিভাম্বিত মনুষ্য ভূষিত করাই হিন্দু-বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন দেখিতে হইবে কি উপায়ে এরূপ সৎপুত্র লাভ করা যাইতে পারে!

পিতার বীর্য্য মাতার-শোনিতে মিশ্রিত হইয়া সন্তান জন্মে, এই জন্য পিতা-মাতার গুণ দোষ সন্তানে বিকাশ পায়—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বীজগুণ যে মনুষ্যের প্রধান উপাদান, পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সৎপুত্র পাইতে হইলে সৎ পিতা ও সৎমাতার মিলনই প্রধান উপায়। এইজন্যই সত্ত্বগুণান্বিত পুরুষের সহিত সত্ত্বগুণান্বিতা স্ত্রীর, রজোগুণান্বিতের সহিত রজোগুণান্বিতার, তমোগুণান্বিতার সহিত তমোগুণান্বিতার বিবাহই সমাজের হিতকর। এই জন্যই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় কন্যা, বৈশ্যের বৈশ্যকন্যা এবং শূদ্রের শূদ্র কন্যার সহিত বিবাহ একান্ত আবশ্যক। যদি ব্রাহ্মণকন্যার সহিত ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সন্তান পিতৃ ও মাতৃ গুণের মিশ্রণে এক প্রকার মিশ্রগুণান্বিত হইবে,সে সন্তান পূর্ণ ব্রাহ্মণ বা পূর্ণ ক্ষত্রিয় হইতে পারে না। তবেই বিবাহের উদ্দেশ্য যে নিজগুণ নির্ম্মলীকরণ ও পরিবর্দ্ধন, সে উদ্দেশ্য আর সাধন হয় না। হিন্দুর বিবাহের উদ্দেশ্য ত জগতে স্বজাতীয় গুণান্বিত মনুষ্যের সৃজন ও সেই মনুষ্যে সেই গুণের পরিবর্দ্ধন। সন্তান না হইলে হিন্দু সে বিবাহকে বিবাহই বলে না। এমন কি এই অতিরিক্ত সন্তান প্রিয়তার জন্য, এই সৃষ্টি সংবর্দ্ধনরূপ একটি মহাধর্ম্মের দিকে দৃষ্টির অতিরিক্ততার জন্য, হিন্দু সমাজে বহুবিবাহরূপ কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কোন বিষয়েই সামঞ্জস্যের গণ্ডি বহির্ভূত হওয়া ভাল নহে। যাই হউক, সৎপুত্র উৎপাদনই হিন্দু বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যে এরূপ জাতি-বিচার ছাড়া বিবাহ হইতেই পারে না, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে।

ফলে লোক ও বংশ-সংখ্যা যত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, জাতি বিচার হইতে আবার কুলবিচারে বিবাহ তত নামিয়া পড়িয়াছে। এক জাতীয় অনেক লোক, অনেক বংশ। সকল বংশের ইতিহাস, বংশানুগত ক্রিয়া কর্ম্ম, দোষ গুণ জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব, সুতরাং তাহার; মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ করিয়া লইতে হইয়াছে। যে যে বংশের আচার-ব্যবহার-গত পার্থক্য নাই বা খুব কম, যাহাদের জাতীয় গুণ সমান,—কাহাদের সম্পূর্ণ, কাহাদের বা কিছু কম, কাহাদের বা খুব কম—তাহাদের সম শ্রেণীর মধ্যেই বিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কেননা যদি কোন পূর্ণ গুণান্বিত ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতির বিবাহ অপেক্ষাকৃত নিম্ন গুণান্বিত ব্রাহ্মণ বা অন্য জাতির সহিত হইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলেও পূর্ণ ব্রাহ্মণ গুণী বা অন্য জাতীয় গুণান্বিত সন্তান হইবে না। অনেকটা মিশ্রবর্ণী তুল্য হইয়া যাইবে। বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথাও এই জন্য। তিনি দেখিলেন, দেশে সৎ ব্রাহ্মণের অভাব হইতেছে, ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ মিশ্র গুণী রকমের হইয়া পড়িতেছে; হয়ত কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহিত বসবাস করে, আচারে শূদ্র তুল্য, শূদ্র যাজক; তাহার সহিত যদি পূর্ণ ব্রাহ্মণ গুণাবলম্বীর কন্যার বিবাহ হইতে দেয়া হয়, তাহা হইলে সৎ সন্তানের আশা করা যায় না। অতএব বাছিয়া বাছিয়া ব্রাহ্মণের মধ্যে যথার্থ সৎ গুণান্বিত ব্রাহ্মণ ঠিক করিয়া তাহা-

দের মধ্যে পরস্পরের কন্যা পুত্রের বিবাহ দিবার ধার্য্য করিলেন এবং তাহাদিগকেই কুলীন আখ্যা প্রদান করিলেন।

হিন্দুর লক্ষ্য যে বীজশুদ্ধির দিকে, ইহা এই সব হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আর এই রূপে বিবাহ-বিচারও যে গুণ পরিবর্দ্ধনের যথেষ্ট উপায়, তাহাও বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

এইবার একটী কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। হিন্দু এই গুণ পরিবর্দ্ধন রূপ ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া, বিবাহের অন্য সকল উদ্দেশ্যের বিষয়ে অন্ধ হইয়াছিলেন কি না। বিবাহ যে মনুষ্যের পার্থিব সুখশান্তির একমাত্র উপায়, এ অনন্ত আশা-নৈরাশ্যের ঘূর্ণাবর্ত্তে ক্লিষ্ট মনুষ্য চিত্তের বিরামের একমাত্র শান্তি-নিকেতন, সুখ দুঃখের তরঙ্গ-তাড়নে ভগ্ন-মানব-হৃদয়ের এক মাত্র স্নিগ্ধ লেপ, জগতের এ যেঁষাঘেঁষী রেষা-রেষীর ভিতর ছায়া পাইবার একমাত্র কুঞ্জ-কুটীর—সে কথা তাঁহারা তখন ভাবিয়াছিলেন কি না। বিবাহ যে প্রেম পরিশোধনের এক মাত্র যন্ত্র, বিবাহ যে পুরুষের একমাত্র পুরণ-কারী, বিবাহ যে অর্দ্ধাঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য—এ কথা ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন হিন্দুর হৃদয়ে পাষাণশিরে স্নিগ্ধ স্রোতস্বতীর ন্যায় উদ্ভূত হইয়া ছিল কি না। যদি না হইয়া থাকে, তবে হিন্দু একদেশদর্শী। কিন্তু হিন্দুজাতির বিমল জ্ঞান-ভাতি পড়ে নাই, এমন বিষয় অদ্যাবধি জগতে আবিষ্কৃত হয় নাই। হিন্দু পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচন বিষয়ে গুণ পরিবর্দ্ধনের দিকে যতটা সূক্ষ্মদর্শী, বিবাহ কালেও তদ্রূপ প্রেমিক। হিন্দুর বিবাহের মন্ত্র প্রেমের চরম আদর্শ। ব্যক্তিগত প্রেম ও হিন্দুর অপেক্ষা বাড়াইয়া আজ অবধি কেহ আঁকিতে পারে নাই। বিবাহের সময় হিন্দুর বর, কন্যাকে বলিয়া থাকে :—

"যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥

তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক। শুধু হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়াই হিন্দু প্রেমিক আবার ক্ষান্ত নহে। ইহাতে কি দেহীর আশা মিটে? দেহীর মিলনেচ্ছা কি কেবল মনে মনে মিশিয়াই ক্ষান্ত হয়?

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈ মাংসৈমাংসানি ত্বচাত্বচম্।"

"আমার প্রাণে তোমার প্রাণে এক হউক, আমার অস্থিতে তোমার অস্থিতে, আমার মাংসে তোমার মাংসে, আমার চর্ম্মে তোমার চর্ম্মে এক হইয়া যাউক।"

বিবাহত সকল লোকেই করিয়া থাকে; কিন্তু এমন করিয়া মিলন আশা প্রকাশ করিতে পারে কয়জন? আশাকে এমন করিয়া চিরিয়া চিরিয়া দেখাইতে পারে, আশার তরণীকে এত চরের উপর বহিয়া লইয়া যাইতে পারে, আশার সুর এত উচ্চে তুলিতে পারে—কয়জন? এমন করিয়া মনে মনে, আত্মায় আত্মায়, প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, চর্ম্মে চর্ম্মে মিলনাশা কোন দেশের কোন কবি-কল্পিত নায়ক নায়িকাও যাচ্ঞা করিতে পারে নাই।

তবেই স্পষ্ট দেখা গেল, ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সুখ শান্তি সাধনের দিকেও হিন্দুর লক্ষ্য ছিল; নতুবা বিবাহে—হিন্দুর বিবাহে আমরা প্রেমের এ জলন্ত চিত্র দেখিতে পাই-

জাম না। কিন্তু বলিয়া রাখি এই প্রেমই হিন্দুর ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান সহায়। ইহা না হইলে গৃহস্থাশ্রম চলিতেই পারে না। যাহা হউক, এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, হিন্দুর দাম্পত্য-প্রেমের দিকে লক্ষ্য ছিল, না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু তাহাদের বিবাহ-পদ্ধতির দ্বারা, অর্থাৎ পাত্র বা পাত্রীর নিজ নিজ মনোমত পাত্রী বা পাত্র খুঁজিয়া লইতে না দিয়া, অপর গুরুতর লোকে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করায়, ঐ দাম্পত্য-প্রেম-লাভে হিন্দু কতটা সুফলকাম হইয়াছে বলা যায় না।

ইহার উত্তর হিন্দু ও ইউরোপীয় সমাজের অবস্থা সমালোচনা ও তুলনা করিলেই যথার্থতঃ পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাউক কোন্ সমাজের দম্পতির মধ্যে প্রণয় অধিক প্রস্ফুটিত, দাম্পত্য সুখে কোন্ সমাজের লোক অধিক সুখী।

স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, ইউরোপীয় পুরুষ পুঙ্গবেরা যথার্থ সাংসারিক সুখের আশাতেই যা কয়জন বিবাহ করে, বলিতে পারি না। অধিকাংশ ইউরোপীয় বিবাহ, অনুসন্ধান করিলে, হয় অর্থলোভ, না হয় সুপারিশ আশা, না হয় গুপ্তপ্রেম প্রকাশাশঙ্কা ব্যাপারই অল্প বিস্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। তার উপর স্ত্রী জাতীর মন রাখিতে রাখিতে তাহাদিগকে যেরূপ স্বাধীনতা দিয়া ফেলিয়াছে, ক্রমে ক্রমে অত নিয়ে চলিয়া গিয়াছে,যে এখন ভয়ে বিবাহ বড় একটা কেহ করিতেই চায় না। সত্যসত্যই ইদানীং অনেক বিজ্ঞ ইউরোপীয় বিবাহের নামে সঙ্কুচিত হয়। আর অনেক বিবাহিত সাহেবকেও আমি স্বকর্ণে ওই স্বাধীনতার বিষময় ফলের জন্য আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। ভারতবর্ষে অনেক উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী বিবাহ না করিয়াই জীবন শেষ করিয়াছেন,ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্ত্রী-স্বাধীনতার বিষময় ফলই তাঁহাদের বিবাহ না করিবার প্রধান কারণ। সাম্য নাম্নী মহারাক্ষসী এদিক দিয়াও ইউরোপীয় সমাজের অস্থি চর্ব্বণ করিতেছে। তুমি বিবাহিত পুরুষ, তুমি আপন পত্নীর সুখের জন্য অহর্নিশ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে, কিন্তু তোমার স্ত্রীকে ভ্রমেও কখনও একটী উচ্চ কথা কহিতে পাইবে না,—তা হলে তখনই ডাইভোর্স এর পরওয়ানা জারি হইবে। "উচ্চ কথা চুলোয় যাউক, স্ত্রীর মনস্তুষ্টির একটু কসুর হইলেই আর রক্ষা নাই।" সেদিন হিতবাদীতে পড়িলাম "কোন ভদ্রলোক চুরুট সেবন করিতেন বলিয়া তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁহাকে ডাইভোর্স করিয়াছেন। এরূপ ঘটনা যে ইউরোপে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে এবং অনেক ঘটনার বিষয় সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই যে অবগত আছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এইত ইউরোপীয় দাম্পত্যপ্রেমের পরিণাম। তুমি কোন পীড়া বশতঃ শয্যাগত, তোমার প্রণয়িনী তোমার কষ্ট দেখিতে অপারক হইয়া অন্য পুরুষের সহিত নৈশ-বিহারে বা কোন ভাজে চলিয়া গেলেন। ইহা স্বামী-প্রেমের জলন্ত পরিচয় নয় কি। কিছু বলিবার উপায় নাই, কিছু করিবার উপায় নাই! এইত ব্যাপার! ইহার ভিতর আবার প্রেম কোথায়? অনেকে বলিয়া

থাকেন যে স্বাধীনতাটুকু স্ত্রীলোককে উপভোগ করিতে দেওয়া তাঁহাদের সভ্যতা ও স্ত্রীভক্তির পরিচয়, আর না দেওয়াটা বর্ব্বরতা। হইতে পারে সভ্যতা কিন্তু উহার ফল যে বিষময় সে কথা তাহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দুরমণীর মত বাধ্য পতিব্রতা স্ত্রী যে তাহাদের বাঞ্ছনীয় নয়, একথা তাঁহারা বলিতে পারেন না। তবে যদি কেহ বলেন যে, আমাদিগের চেষ্টা স্ত্রীস্বাধীনতা দান, অবলাদিগকে সবলা করাই আমাদের সভ্য সমাজের উদ্দেশ্য ও তাহা করিতে গিয়া যদি একটু লোকসান হইয়া থাকে, তাহাও সহনীয়। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বাস্তবিক তাঁহাদের রমণীদিগকে স্বাধীনতা তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া দেন নাই। ভ্রমে পড়িয়া দিয়া ফেলিয়াছেন। স্ত্রী স্বাধীনতার উৎপত্তি স্থান স্ত্রী-দুঃখ বিমোচন ইচ্ছা নহে; স্ত্রী-মনোরঞ্জনে অধিক মনোনিবেশই উহার মূল কারণ। পাত্র-নির্ব্বাচনে ইউরোপীয় কুমার কুমারীর স্বাধীনতা থাকায়, এক এক সুন্দরীর জন্য শত শত যুবক লালায়িত হয় ও competitionএ জয়লাভ করিবার জন্য সকলেই তাহার মন যোগাইতে ও মনোমত হইতে প্রাণপনে চেষ্টা করে। সুন্দরীর মেজাজও সুতরাং গরম হইতে থাকে ও দর চড়িয়া যায়। পাত্রদিগের মধ্যে যে অধিক বাধ্য, যে অধিক বিনীত, দাসতুল্য ভাব দেখাইতে সমর্থ হয়, সুন্দরী তাহার সহিত Courtship করেন, সে Courtship দাসত্বের Trial ছাড়া আর কিছুই নহে। হইলেও পারে না। কেন না তখনও শত শত যুবক শত শত প্রকারে তাহার পি[illegible]াসিয়া থাকেন। এমন কি এক একজন রমণী এই দশ জন পুরুষের সহিত এক সময়ে জ্ঞাতে অজ্ঞাতে Courtship করে। সে অবস্থায় Courtshipএ দাসত্বের পরিচয় না দিতে পারিলেই যে ছুটিতে হইবে, আশ্চর্য্য কি? রূপের মোহে প্রাণ ওষ্ঠাগত! সে মোহাবস্থায় এমন কে আছে যে, সে দাসত্বে ঘৃণা করিতে পারে! Courtshipএর অবস্থায় কেহ নিজের একটু স্বাধীনতা দেখাইতে সাহসী হয় না, পাছে মন টলিয়া যায়! তার আর পাঁচ জন আছে, স্ত্রীলোক রূপ-অপেক্ষা বাধ্যেরই অধিক প্রিয়! আমার সে ছাড়া বুঝি আর নাই! আবার Courtshipএ অমনোনীত হওয়াও লজ্জার কথা। সুতরাং এই পাঁচ রকম গোলমালে তখন আর অন্য চেষ্টা থাকে না, কেবল বিবাহ করিতে পারিলেই হইল। যে যত পারে সুন্দরীকে স্বাধীনতা দেয়, তাহার মতের বিরুদ্ধে আর তিলার্দ্ধ দাঁড়াইতে সাহসী হয় না। আর বাস্তবিক বরং বিবাহ অবস্থায় হয়, কিন্তু সে অবস্থায় সাধারণ মুগ্ধ যুবক কখনও সে সুন্দরীর মতের এতটুকু বিপক্ষাচরণ করিতে পারে না। তার পর বিবাহ হইলে সুন্দরী সেই পূর্ব্ব স্বাধীনতা ভোগে চেষ্টান্বিতা থাকে ও কৃতকার্য্যও হয়। আইনের দ্বার খোলা, সুন্দরী ইচ্ছা করিলে তার আবার পতির অভাব কি? বেশী বিরুদ্ধাচরণ করিলেই Divorce আর অন্য পতি গ্রহণ—এ ব্যবস্থা হাতের ভিতর।

এই প্রকারেই ইউরোপীয় সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতার চেষ্টা ইউরোপীয় রমণীর চিত্তে এতদূর বলবতী যে, ওরূপ স্বাধীনতা সত্ত্বেও বিবাহে

একটু নামমাত্র অধীনতা হয় বলিয়া, তাহারা আজকাল বিবাহেও নারাজ। অনেক ইউরোপীয় রমণীও চিরকুমারী থাকিতে আজ কৃত সঙ্কল্পা। জানি না ওরূপ বিলাস-বৈভবের মাঝে যাহারা বৈধব্যব্রত পালনেও অসক্তা, তাহারা কেমন করিয়া সত্য সত্য কুমারী থাকিতে সমর্থা হইবে।

যাহা হউক, নির্ব্বাচন-প্রণালীর দোষেই যে ইউরোপীয় সমাজে এ স্ত্রী-স্বাধীনতার ঢেউ উঠিয়াছে, এ কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। ঐ প্রণালীর দোষে কত রমণী সতীত্ব হারাইয়া জারজ-পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সহরে সহরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কত সহস্র ভ্রূণ অকালে হত্যা হয়। কত উচ্চবংশীয়া ললনা দীনা, অসহায়া অবস্থায় অন্নের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। সহস্র সহস্র পামরও সদাসর্ব্বদা সরলা বালিকাদিগের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য অহরহঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। বন্য-পশু-সমাজে যেমন বিচার নাই, নির্ব্বাচন নাই, মন-মোহনে বা পাশব-বলে বিবাহ, ইউরোপীয় সমাজেরও বিবাহ ঠিক তদ্রূপ। মন ভুলাইতে পারিলেই হইল! এটা যদি সভ্যতা হয়, তবে আমরা যেন চিরকালই অসভ্য থাকি।

এ অবস্থায় কি প্রেম দাঁড়াইতে পারে? যেখানে পাশব-বৃত্তির এত উদ্দীপনা, সেখানে প্রেম জন্মাইবে কি প্রকারে? আর ওসব পাশব আচার ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেও একটী কথা ভাবিতে হইবে। যদি স্ত্রীলোক ওরূপ স্বাধীনতাই উপভোগ করে, তবেই বা প্রেম কেমন করিয়া জন্মাইবে?! প্রেম অধীনতা—স্বাধীনতা নহে। যে যাহাকে যত ভালবাসে, সে তত তার প্রত্যেক কার্য্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। আমি যদি তোমায় ভালবাসি, আমি নিশ্বাসটি ফেলিতে হইলেও তোমার গায়ে না লাগে এমন করিয়া ফেলিব। তবে না প্রেম! কিন্তু সাধারণ ইউরোপীয়েরা স্ত্রী-পুরুষে যেরূপ ব্যবহারগত পার্থক্য দেখাইয়া থাকে, স্ত্রী-পুরুষে ওরূপ তফাৎ তফাৎ থাকা যায়, আমাদের মেয়েরা তাহা বুঝিতেই পারে না।

প্রেম ত আমাদের দেশে। প্রেমের ছবি ত আমাদের কাব্যে। মহাদেব সর্ব্বত্যাগী; কিন্তু সেই মহাদেবই আবার প্রেমের দারুণ মোহে মুগ্ধ হইয়া মৃত সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া পাগলের মত ঘুরিতেছে! এই না প্রেমের ছবি। রাম যজ্ঞ করিতেছেন, স্বর্ণ-সীতা বামে লইয়া! এই না প্রেম! সাবিত্রী মৃত স্বামীকে প্রেমের বলে জীবিত করিল—সেই না প্রেম! আর প্রেমের জলন্ত ছবি দেখিবে? ভারতের শ্মশানে শ্মশানে জিজ্ঞাসা কর,—দেখিবে অমূল্য, অতুল্য, অনমুভাব্য, অবক্তব্য, রোমাঞ্চকর প্রেমের পুণ্যছবি! মৃত-স্বামী-বক্ষে জীবিতা রমণী—অনল-কুণ্ডে! অগ্নির সর্ব্বভুকত্বেও হিন্দু-রমণীর পতিপ্রেম ধ্বংস করিতে অক্ষম। ছার দেহ! ছার প্রাণ! আত্মায় আত্মায় মিলন! মৃত স্বামীর চিতা সজ্জিত হইল, সজীব স্ত্রী আসিয়া স্মিতাননে, স্বামীভরা প্রাণে—আগুণের লহ লহ জিহ্বা তাচ্ছিল্যে ভ্রূক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চিতায় শয়ন করিল। ক্রোধে অগ্নি জ্বলিল। চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, আগুণ একে একে সব খাইল,—প্রেমের অক্ষয়ছবি অনন্তকালের

মত সেই ক্ষুদ্র শ্মশান-ফলকে লিখিত রহিল। হাঃ হাঃ! সেই যে "অস্থিস্থিরস্থিনি, মাংসে মাংসানি, ত্বচ ত্বচম্" সে কি মিথ্যা! আর প্রেমের কি দেখতে চাও!

হইতে পারে সতীদাহ খারাপ, হইতে পারে অনেক রমণীকে বল প্রয়োগ করিয়া দগ্ধ করা হইত,—কিন্তু সব ত নহে, শত করা একজনও ত স্বইচ্ছায় পুড়িয়াছে। তাহার যথেষ্ট প্রমাণও আছে ও অনেক বড় বড় ইউরোপীয় ভদ্রলোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে।* একবার ভাব দেখি, কি ব্যাপার! একজন ইউরোপীয় রমণীকে একবার শুনাও দেখি, কি বলে। "I love you" মুখ দিয়া একবার উচ্চারণ হইবে কি? এখনও ত এত আইন জারির পরও এত অধঃপতনের দিনেও মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দুই একটা এরূপ জীবন্ত চিতারোহণের কথা পড়া যায়। তবু প্রেমের কথা তুলিতে লজ্জা হয় না?

এই প্রেম, এই মিলন—এই বিবাহ! Churchএ গেলেই আর courtship করিয়া পছন্দসই অংশীদার বাছিয়া লইলে বিবাহ হয় না। হিন্দু যদি ইউরোপীয়ের মত স্ব স্ব পছন্দ সহ বিবাহ করিত,-তবে জগতে এ পুণ্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইত না। পরীক্ষোত্তীর্ণা সতী বুঝি বিরল হইত।

জাতি-বিচার, কুল-বিচার করিয়া বিবাহের এই অমৃতময় ফল। সমগুণী বাছিয়া লইতে না পারিলে কি এমন মিলন, এমন প্রেম প্রস্ফুটিত হয়? এমন কল্পনার অসম্ভব ফল এরূপ-বিবাহ বিচার না থাকিলে কি সম্ভব হয়? এ বীজ-বিচার, এ বিজ্ঞান বড় ভয়ানক, এ গুণ বিচার বড় শক্ত। যাহাদের নাই তাহাদের-পক্ষে ইহা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

এইত উভয় বিধ সমাজের আচার-ব্যবহার-গত পার্থক্য ও তাহার ফল। এখন কাহাদের বিবাহ পদ্ধতি ভাল বলিবে? বাস্তবিক বিবাহের পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে সকলকে স্বাধীনতা দেওয়া অপেক্ষা সমাজের অনিষ্টকারী বোধ হয় আর কিছুই নাই। বিশেষ গুণ-পরিবর্দ্ধন ও যথার্থ সম্মিলন বিবাহে জাতিবিচার না থাকিলে হইতেই পারে না। সাধ্য কি যুবক স্থির চিত্তে নিযুক্তা রমণীর গুণ-বিচার করে? রূপের মোহে এখনও এত দুর্ব্বল হয় নাই।

ইওরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি বিবাহকে এত কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে যে বিবাহ পাপকার্য্য বলিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছে। Tolstoy সাহেব তাঁহার "Six question" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "Marriage is a sin not duty." তিনি আরও বলিয়াছেন যে ধার্ম্মিক মাত্রেরই উচিৎ বিবাহ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া। অনেক কষ্ট না পাইয়া তিনি এ কথা লেখেন নাই। কোন স্বনামখ্যাতা ইংরেজ রমণী লিখিয়াছেন "Divorceএর প্রথা থাকায় স্ত্রীলোক "অবিশ্বাসিনী হইবার যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়াছে। অবিশ্বাসিনী স্ত্রীলোকদিগের জন্য ঘোড়ার মত চাবুকের বন্দবস্ত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আপনি স্ত্রীলোক হইয়া

* বঙ্গের ভূত পূর্ব্ব ছোটলাট Sir Frederic Halliday এবং Chief Secretary Buckland সাহেব স্বচক্ষে এরূপ সতী দাহ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সতী স্বইচ্ছায় আগুনে পড়িয়াছে, নড়ে নাই, শব্দ করে নাই, ধূ ধূ করিয়া আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়াছে।

অদেশীয় রমণীকুলের গুপ্ত চরিত্রের যথেষ্ট পরিচয় না পাইয়া যে এ কথা লিখিয়াছেন, এমত বোধ হয় না। তবেই ইউরোপীয় বিবাহ-পদ্ধতি যে একান্ত নিন্দনীয়, সে কথা এখন তাঁহারাও বুঝিয়াছেন। আমাদের দেশের দুই দশজন কিন্তু Courtshipএর লোভে বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুর বিবাহ কুসংস্কার পূর্ণ—এ কথা তাঁহারা অম্লান বদনে বলিয়া থাকেন। এবং উঁচু গলা করিয়া সভা সমিতেতে বক্তৃতা ঝাড়িতেও ত্রুটি করেন না।—

যাহা হউক দেখা গেল যে, হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতি অতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, ইহার তুল্য সুন্দর প্রথা আর কোন দেশেই নাই। ব্যক্তিগত ও সমাজগত গুণ পরিবর্দ্ধনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

হিন্দুর এ বিবাহ-বিচারে যথার্থ সাম্যের কোন হানি হয় না। তবে যে সব সামান্য খুটি নাটীতে ইউরোপীয় সাম্যবাদীরা সাম্যের দোহাই দেন, তাহাতে একটু প্রতিবন্ধকতা সাধিত হয় সত্য, কিন্তু ইওরোপেও সেটা হয়। সেখানে সুন্দরী ও অর্থবানের কন্যাই লোকে খুঁজিয়া থাকে, সেখানেও এক প্রকারের নির্ব্বাচন আছে ও সেটাও তাহাদের সাম্যবাদের অন্তরায়। আমাদের গুণ ও বীজ-বিচার, তাহাদের রূপ ও অর্থ বিচার। তবেই সুধু আমাদের বেলায় সাম্য সাম্য বলাটা যে মুর্খতা, এ কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

শ্রীনৃত্য গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাণীহঁসপুর।

ভুবনেশ্বর হইতে নীলাচল অভিমুখে বনের মধ্য দিয়া দুই ক্রোশ অতিক্রম করিলে যে পর্ব্বত পুঞ্জের পাদমূলে উপস্থিত হওয়া যায় উহাই "খণ্ডগিরি"। এই গিরি দুই ভাগে বিভক্ত। উদয়গিরি ও অস্তগিরি। পর্ব্বত বক্ষে খোদিত গৃহ অলিন্দ ও স্তম্ভগুলি দেখিলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়। এখানে পর্ব্বত খুদিয়া যে দ্বিতল বাটী হইয়াছে, তাহারই নাম রাণীহঁসপুর। এই বাটী প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে অশোকের রাজত্ব কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার "প্ল্যান" আজকালের মত হইলেও থামগুলি আজকালকার মত নহে। "এই বাটীর চিত্রাবলী দেখিলে পূর্ব্বকালের পরিচ্ছদ ও বেশ ভূষার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষের মালকোঁচা ও তাহার উপর কটীদেশে আর এক খানি বস্ত্র খণ্ড বাঁধা আছে, তাহার অগ্রভাগ কোঁচার মত ঝুলিতেছে, গায়ে কাপড় নাই, মস্তকে দীর্ঘকেশ বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ। মুখে শ্মশ্রু বা গুম্ফ নাই, গলায় হার হস্তে বলয়, কর্ণে কুণ্ডল। স্ত্রীজাতি চিরকালই অলঙ্কার প্রিয়। পাষাণ চিত্রেও সুন্দরীদের হার, চিক, কর্ণ ভূষা বলয় ও মল আছে। স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান প্রণালী ঠিক পুরুষের মত না হইয়া তাহার সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। মাল কোঁচার উপরে একখানি দু-মুখা বা এক মুখা কোঁচা ঝুলান। মস্তকে নানা বিধ বেণী, অন্য গুলি মূর্ত্তির মধ্যে কেবল একটি দ্বার রক্ষকের জানুদেশ পর্য্যন্ত বস্ত্রের দ্বারা আবৃত। রাণী

হংসপুর নির্ম্মানের সময়ে ভারতবর্ষে কি প্রকার ভাষার প্রচলন ছিল,তাহা পর্ব্বত খোদিত লিপি-গুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। অশোক লিপি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, (১) পাঞ্জাবী পালি, (২) উজ্জয়িনী পালি, (৩) মাগধি পালি, লিপির আকার দেখিয়াও স্থাপত্যের সময় নির্ণয় করা সহজ হয়। এই সকল ভাষার বিষয় আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব, তবে পাঠকগণের মধ্যে রাণীহংসপুরের বিস্তৃত ইতিহাস কাহারও জানা থাকিলে, আমাদের লিখিয়া পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

শ্রীজীবন দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহানুভূতি।

কি দিয়ে সহানুভূতি সৃষ্টি বিধাতার ?
শুধু কি সুখের কথা পরিচয় তার ?
সহানুভূতি ! তুমি কি অদৃষ্ট-বারতা
আছ কি কল্পনা-চিত্রে তুমি শুধু বাঁধা ?
সুখ, দুঃখ, কর্ম্মক্ষেত্র নহে কি তোমার ?
কি ভাসিয়া যাও, বুঝিবারে নাহি চাও,
এই সৎ এ অসৎ ! গতি অনিবার
তাতেই তোমার শুধু আনন্দ অপার ?
ক্ষীণশূন্য কল্পনায় যারা প্রমোদিত,
তুমি সহানুভূতি সেথায় জড়িত ?
এ জগৎ অকারণ নহে লক্ষহীন,
নহে ত সলিল সম গতির অধীন,
অযুক্ত কারণে গাঁথা সৃষ্টি চমৎকার
প্রতি অণু আকর্ষিত গুণের আধার।
তবে কি সহানুভূতি গুণ বিবর্জ্জিত
নহে তাহে মানবের জ্ঞান হিতাহিত ?
ভ্রান্ত নর-হৃদয়ের অসীম পিপাসা
নিবারিতে হয় প্রাপ্ত প্রসারিত আশা।
কৌরবের দুরাশায়, পাঞ্চালী লাঞ্ছনা—
তুমি কি সহানুভূতি তাদের খেলনা ?
শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবে তবে কেন সম্মিলিত,
কৌরবে সহানুভূতি কেন বিমোচিত ?
সত্যের বিকাশশূন্য কলুষিত জ্ঞান ;
পারাবার হিমালয়ে, অনিলে অনল বহে,
নিস্বার্থের ভালবাসা, যে নয়নে দ্বেষ-হিংসা
সেই জ্ঞানে মিলাইয়া অনুভূতি দান
সেই কি সহানুভূতি তোমার বিধান ?
যে আপন হারাইয়া, সেবিবে পরাণ দিয়া
যাহার অনন্ত চেষ্টা পরহিত তরে
যে করে কাতর মনে, ভগবান শ্রীচরণে
প্রার্থনা অনন্ত সুখ মঙ্গল বিধান,
তাহার সহানুভূতি নাহিক অন্তরে।
তুমি কি সহানুভূতি শুধুই কথার।
যার শুধু বলিবার, আহা আহা অনিবার
যার চক্ষে অশ্রু ধার, কর্ম্মহীন নির্বিচার
সেই কি তোমার চিত্র ? ধন্য ব্যবহার !
জানি গো সহানুভূতি সে চিত্র তোমার নয়।
যে সহানুভূতি জ্ঞানে হয় জীবনের জয়।
যাহারা বহিতে পারে, কভু তৃণ সম ভার,
যদি নিতে পারে ক্ষীণ শিরে যাতনা কাহার
যদি পারে দেখাতে, এস তুমি এই পথে,
কণ্টক বাছিয়া দিবে, যাতে পায়ে না বিন্ধিবে
সে সহানুভূতির চিত্র অতি জ্যোতির্ম্ময়।
মরমে বিকাশ তার নহে শুধু বাক্য ব্যয়।
এই যে নির্জ্জন নিশি, সমুদ্র চিন্তায়
হাঁতারি যে ভাবে মনে কি যে উপকার।

আহার তুলিতে মুখে, ব্যাথা যদি পায় বুকে
ঐ বুঝি না খেলে কেহ এ ছার আহার।
ছিন্ন বাস তেয়াগিতে,পায় যে বেদনা চিতে,
অন্যের নাহিক কেন বসন আমার।
সে নয় সহানুভূতি ? বিকৃত বিচার।
অসহায় দেখি যেবা সহায় হইতে চায়
ক্ষণিকের তরে যেবা আপনা ভুলিয়া যায়।
ইহাতে সহানুভূতি না হয় প্রচার।
এই যদি মনে ক'রে, বন্ধু জন ছাড়ে তারে
হউক সহানুভূতি যার হয় তার।
কেহ যদি কাঁদিয়াছে কাহার সহিত
নিস্ফল কামনা দেখি হৃদে সম্মিলিত।
বলুক যে পারে, বৃথা সে আকুল,
কার তরে কাঁদে তার বুঝিবার ভুল।
বর্দ্ধিত সহানুভূতি তারে সবে কহে যদি.
চাহেনা সেকার চোখে, তাহার এ নিন্দা দেখে
এক ফোঁটা জল।
অন্যের সহানুভূতি, তাহার নীরব স্মৃতি
যে করে যেমন সে পায় তার ফল।
বঞ্চিত সহানুভূতি যারা তার তরে,
মিনতি তাদের কাছে, তাহার অস্তিত্ব মুছে,
মরিলে তাদের যেন অশ্রু নাহি ঝরে।
যদি কভু ভুলে স্মৃতি, তাদের সহানুভূতি
তার পানে চায়,
সে স্মৃতির উৎপাটন, প্রভু করিও সাধন
তাহার আশায়।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ রায় বাহাদুর।

কেন ভালবাসা।

কেন ! কেন ভাল বাসা !
নিশি দিন যারে করিছ খেয়ান,
যে তাঁড়া নিমিশে হারাও গেয়ান,
সে যে গো দেয় তোমারে
প্রায় ঠেলে বহু দুরে
তবু তার তরে তিয়াশা
কেন মিছে ভাল বাসা।

কেন ! কেন ভাল বাসা !
চখে চখে ভাসে মুরতিটী যার
যার সহবাসে কোটি স্বর্গ ছার
আমার রোদনে
সে হাসে গোপনে
করেগো কতই তামাসা
কেন মিছে ভাল বাসা !

কেন ! কেন ভাল বাসা !
বুকে বুক চেপে ভাব তুমি মনে,
আরও কিছু বুঝি রল ব্যবধানে,
হৃদয়ে হৃদয়ে
মিশিবে উভয়ে
সে যে কেবল দুরাশা
কেন মিছে ভাল বাসা !

কেন ! কেন ভাল বাসা !
তুমি যদি ভাব কুসুম সুবাস
সে ভাবিবে ইহা দুর্গন্ধ কুবাস।
তব ধারণার
বিপরীত তার
মরতে প্রেমের এ দশা
কেন মিছে ভাল বাসা।

কেন ! কেন ভাল বাসা !
মনে ভাব তুমি স্বরগ ছিনিয়া।
তুষিবে তাহারে অমিয় আনিয়
যে ভাবে পারিলে,
কাল হলাহলে,
মিটাতে তাহার পিয়াসা
কেন মিছে ভাল বাসা।

কেন ! কেন ভাল বাসা !
ভাব ভ্রান্ত, তারে শারদ জোছনা !
মেঘের বিজলী তারেত জাননা।
স্নেহ বিলাইয়া,
তুষিবে না হিয়া,
ছুটাবে অশনি সহসা
কেন মিছে ভাল বাসা।

শ্রীবিপিন চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব তত্ত্ব।

আবাহন।

আয় মা ভুবনেশ্বরী ভারত-ভুবনে।
প্রকৃতি সন্তানগণ, আশা-পথ নিরীক্ষণ,
করিছে সতত তব দরশন আশে।
জেগেছে ভারতবাসী মোহ নিদ্রা হ'তে,
ওই দেখ ভক্তিভরে, জবাপুষ্প লয়ে করে
দাঁড়ায়ে রয়েছে তব পূজার আশায়,
দরশন দিয়ে কোলে লহগো তবায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

বর্ষাকাল অতীত হইয়াছে, শরৎকাল সমাগত। বর্ষায় ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারময় আকাশ মেঘ বিনির্মুক্ত হইয়া অতি রমণীয় পবিত্রাদপি-পবিত্রভাবে সুসজ্জিভূত হইয়াছে। গভীরাবর্ত্তময়ী ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল কল-নাদিনী স্রোতস্বতীর আর সে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোররবা বীচিমালা আর দুর্দ্দমনীয়বেগে দুকূল ভাঙ্গিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে ছুটিতেছে না। শরৎ সমাগমে সকলেই যেন প্রশান্ত কোমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, প্রকৃতি সতী আবার নব জীবন লাভ করিয়া, অহাঙ্গ আস্তে বিরাজ করিতেছে। শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, সুধাকর-সমন্বিত সুনির্ম্মল নীলাকাশ, কমলকুলপরিশোভিত কুসুম-কান্তার, প্রাণ-মন-বিমোহনকারী ভুবনমোহন সাজে সজ্জিত হইয়া, মানব মনে বিমল আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে। এমন শোভা, এমন অকৃত্রিম আনন্দ, এই সুখের শরৎকাল ব্যতীত আর কোন কালে থাকা সম্ভব? যদি উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল তটিনীর শান্তমূর্ত্তি দেখিতে চাও, যদি ধান্য ক্ষেত্রের হরিদ্রামূর্ত্তি দেখিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে এই শরৎকালে দেখ। যদি সুবিমল সুধাকরের অতুলনীয় স্নিগ্ধজ্যোতি উপভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে একবার এই শরচ্চন্দ্রের প্রতি তাকাইয়া দেখ, প্রাণে অপার আনন্দ উপজিত হইবে। প্রকৃতির এমন শোভা আর কোন কালে নয়ন গোচর হয় না; এখন সকলই শান্ত, সকলই উজ্জ্বল, সকলই মনোহর। বর্ষাকালের সেই শ্রীনহীনা মলিনা প্রকৃতি দেবী আজ রাজরাণী হইয়াছেন, সেই বিষাদতারা-

ক্রোধ্যে অশ্রুমুখী দেবী আজ হাসি রাশ মাখিয়া, পুণ্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; সুবিমল লাবণ্য-সলিলে অঙ্গ ঢল ঢল করিতেছে। মা'র এ মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি দেখিলে কার হৃদয় না ভক্তি-প্রেমে আপ্লুত হয়, কোন হৃদয়বান ব্যক্তি শরতের এ সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন?

শরতে প্রকৃতির অনুপম অনন্ত শোভারাশি, বিশ্বরচয়িতার এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মানব-লেখনীর এমন সাধ্য নাই, ভাষায় এমন বর্ণ নাই, যাহাতে তাহা সম্যকরূপে বর্ণনা করা যায়। ইহা কেবল দেখিবার জিনিষ নয়ন আছে কেবল দেখি, —আকাশের কোলে চাঁদের খেলা, প্রকৃতির কোলে মেঘজড়িত উত্তাপবিহীন ক্ষণস্থায়ী রৌদ্রের লীলা, দেখি আর বিশ্বেশ্বরের অতুলনীয় মহিমার বিষয় ভাবি।

আনন্দময়ী মা আসিতেছেন, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মুখে কেবল মা মা শব্দ, আনন্দের উচ্চরোল। আনন্দের শরতে, শারদিয়ার আবির্ভাবে আর কোথাও নিরানন্দ নাই। বিশ্বব্যাপী আনন্দ যেন আজ বঙ্গের ঘরে ঘরে পূর্ণ মূর্ত্তিতে বিরাজিত। এখন যে দিকে চাও, যে দিকে যাও, সকল স্থানেই সুখের ফোয়ারা উঠিতেছে, গীত-বাদ্য-আনন্দ ধ্বনি পরিপ্লুত হইয়া সকলেই উৎসবামোদে মাতিতেছে, এই কয়দিনের জন্য নিরানন্দ যেন বঙ্গদেশ ছাড়িয়া কোথায় পলাইয়াছে।

এখন ঘাটে ফুল, মাঠে ফুল, গৃহে ফুল, বাগানে ফুল, লতায় পাতায় ফুল, জলে স্থলে ফুল, ভগবানের অনন্ত কৌশল পরিপূর্ণ বিশ্বরাজ্য ফুলময়, বিশ্বেশ্বরীর পূজার জন্য আনন্দময় ভাবে জড়ীভূত হইয়া, কি এক অব্যক্ত ভাব পরিস্ফুরণ করিতেছে।

আজ আশ্বিন মাস বঙ্গের দুর্গোৎসব, সপ্তমীর শুভবাসর সমুপস্থিত। শারদীয়া পূজার মহতী ঘটা। আজ ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গবাসী সম্বৎসরের জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়াছে, চিরদুঃখী বঙ্গবাসীর হৃদয়ে আজকাল দুঃখের লেশমাত্রও নাই। অন্ধ যেন চক্ষুষ্মান হইয়াছে, হৃত সর্ব্বস্ব ব্যক্তি হারানিধি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছে, মাতৃভক্ত বঙ্গবাসী আজ মাতৃ দর্শন লালসায় উৎফুল্লচিত্ত হইয়া সদানন্দ মনে সদানন্দময়ীর অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বঙ্গভূমিকে মনের মত সাজাইতেছে। সকলেই ভক্তি-ভরাচিত্তে আশাপথ চাহিয়া আছে—আজ ভক্তবৎসলা মা আসিতেছেন। বহুদিনের পর আবার জগদম্বার অকৃতি সন্তানগণকে মনে পড়িয়াছে, সকল দুঃখের লাঘব হইয়াছে। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত বঙ্গবাসী সম্বৎসরের অধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া আজ যেন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে। আজ বাঙ্গালী আনন্দময়ী বিশ্বজননীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িবে, সম্বৎসর পরে আজ মাতৃভক্ত বাঙ্গালী মায়ের দর্শন পাইবে। জগজ্জননী অভয়ার স্নেহময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভক্তিভরে মা মা বলিয়া ডাকিবে, তনু দেহ মন-প্রাণ মায়ের সুশীতল চরণে অর্পণ করিয়া জুড়াইবে বলিয়া, আজ বাঙ্গালীর আনন্দ, এত উৎসব।

চিরদুর্ব্বল বঙ্গবাসীর দুর্ব্বল হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে! শক্তিহারা বঙ্গবাসী আজ অনাদ্যা আদ্যাশক্তির দর্শন পাইয়াছে, হৃদয়ে,

প্রভূত সাহসের সঞ্চার হইয়াছে, বিজাতীয় ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া সকলে এক প্রাণ হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী মহামায়ার পূজায় রত হইয়াছে, মহাশক্তি সাধনে আজ সকলে জীবন উৎসর্গ করিতেছে।

একদিন রঘুবীর রামচন্দ্র লঙ্কাধামে রাবণ বিজয়ের জন্য ব্রহ্মার আদেশে এই মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, দনুজ দলন করিবার জন্য দনুজদলনী মায়ের অকালে উদ্বোধন করিয়াছিলেন, অষ্টোত্তরশত নীল পদ্মের অভাবে আপনার কমল আঁখি উৎপাটন করিয়া, প্রসন্নময়ীকে প্রসন্ন করিবার মানসে অগ্রসর হইয়াছিলেন, আদ্যাশক্তির কৃপাবলে অসীমশক্তিমত্ত হইয়া বিপুল রক্ষোকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন; ধর্ম্ম-প্রাণ বাঙ্গালী কি সেই স্মৃতি, সেই পরম পবিত্র স্মৃতি, কখন ভুলিতে পারে? তাই শাস্ত্রজ্ঞ বাঙ্গালী চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, সেই রীতিনীতি অনুসারে মাতৃ পদে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, ব্যাকুল হৃদয়ে তৃষিত ভাবে বাঙ্গালী শাস্ত্রোক্ত জননীর রূপ কল্পনা করিয়া, হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সেই ত্রিজগৎধারিণী, ভবভয়হরা, অচিন্ত্যরূপার আনন্দময়ী মূর্ত্তি রচনা করে। ইহাতে কি বাঙ্গালী পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণিত হইল? ভক্ত বৎসলা ভবারাধ্যা মূর্ত্তি গড়িয়া যদি বাঙ্গালী নিন্দনীয় হয়, হউক তাহাতে বাঙ্গালীর বাড়িবে বই কমিবে না।

প্রতিমা রচনা।

দেশভেদে, সাধক ভেদে ও পুরুষ-পরম্পরা ভেদে দেবীর অনেক রূপ মূর্ত্তি গঠিত হইয়া থাকে। কোথাও দশ হাত, কোথাও আট হাত, কোথাও চারি হাত, কোথাও বা দুই হাত। কখন নীল কখন কাল, কখন হরিদ্রা বর্ণ প্রভৃতি নানামূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। ইহার বর্ণনা করা সামান্য মানব বুদ্ধির অতীত কারণ "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা" অনন্তশক্তি স্বরূপিণী, বিশ্ববিমোহিনী জগদ্ধাত্রীর অনন্তমূর্ত্তি বর্ণনা করা যায় না। তবে আজ মায়ের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবদোক্ত তাঁহার সিংহ বাহিনী, মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি যাহা প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত, আজ সেই বিষয় যৎসামান্য কিছু বলিব। দেবীর দাক্ষিণপদ সমান ভাবে সিংহোপরি স্থাপিত—সিংহ বলিতে ঈশ্বরের চৈতন্য সংযুক্ত তেজ। বামপদ উর্দ্ধ করিয়া, অঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি রাখিয়াছেন, অধোভাগে ছিন্নশির মহিষ পতিত, মহিষ অর্থে মোহ, আর মহিষ হইতে প্রকাশিত অসুরমূর্ত্তি রিপু অর্থাৎ অবিদ্যায় যুক্ত ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় তেজ।

মা আমার কাঞ্চনের ন্যায় হরিদ্বর্ণা, নব যৌবন সম্পন্না, নানালঙ্কার বিভূষিতা, মনোহর দণ্ড সমন্বিতা, পীনোন্নত পয়োধরা, ত্রিভঙ্গময়ী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মৃণালের ন্যায় দশ হস্ত সমবেষ্টিতা, দশ হস্ত বিস্তারে সর্ব্বব্যাপকতা প্রকাশ পাইতেছে, দশদিক রক্ষা করাই এই দশ হস্ত ধারণের উদ্দেশ্য, দশ হস্তে দশ প্রহরণ সমাযুক্তা, দক্ষিণের পাঁচ হস্তে—ত্রিশূল খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি। বাম হস্তে খেটক, ধনুক, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা বা পরশু শোভিত রহিয়াছে, ইহা দ্বারা জগদীশ্বরীর জগৎ শাসন, পালন, বর্দ্ধন ও হরণ ক্ষমতা প্রকাশ হইতেছে।

দেবীর কোটী পূর্ণ চন্দ্রসম বদন মণ্ডলে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় তেজাধার স্বরূপ ত্রিলোচন শোভিত। বামভাগে দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয় ও দক্ষিণে সিদ্ধিদাতা গণপতি। দক্ষিণে ধনদাত্রী নিত্যাপ্রকৃতি লক্ষ্মী ও বাগ্বাদিনী নিত্যা প্রকৃতি সরস্বতী দেবী বামে অবস্থিতা। গণপতির দক্ষিণ ভাগে নবপত্রিকা দুর্গাদেবী অর্থাৎ কলাবৌ, ইহা কলাগাছ, ডালিম শাখা, ধানগাছ, মানগাছ, কচুগাছ, অশোকশাখা, বিল্বশাখা, জয়ন্তীশাখা. এই কয়টী পদার্থে রচিত হইয়া অপরাজিতা সূত্রে আবদ্ধ ও বস্ত্রাবৃত হয় বলিয়া ইহার নাম নবপত্রিকা হইয়াছে।

দুর্গোৎসবে ইহার শাস্ত্রোক্ত পূজাবিহিত আছে। দেবীর চারিধারে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডনায়িকা প্রভৃতি অষ্ট সখী ও তেত্রিশ-কোটী অমরবৃন্দ কায়মনে পূজায় নিযুক্ত। বাঙ্গালী পৌত্তলিক এই ভাবে দেবীর প্রতিমা গড়ে, শাস্ত্রের-বিধানানুসারে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে এবং তখন সেই মূর্ত্তি তাহারা ভবারাধ্যা চৈতন্যময়ীর মূর্ত্তি বলিয়াই পূজা করে, তখন তাহাদের মনে অন্য ভাব আর থাকে না—ইহাই আদ্যামূর্ত্তি—ইহাই রজোগুণময়ী মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গার প্রতিমা। মরি মরি! হিন্দুর এই পবিত্রভাবে পূজার কি আর তুলনা আছে!

পূজা-পদ্ধতি।

আশ্বিন মাসের পূজা অকালের পূজা; তাই বোধন অর্থাৎ নিদ্রাভিভূতা দেবীকে চৈতন্য করিতে হয়। ষষ্ঠীর দিবস বিল্ববৃক্ষ মূলে আমন্ত্রণাদি অধিবাস করিতে হয়। রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র সময়াভাবে ষষ্ঠীর দিনেই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অধুনা কুলাচার অনুসারে কাহার নবম্যাদি কল্প, কাহারও বা ষষ্ঠীর দিন হইতে কল্পারম্ভ হইয়া থাকে।

আর্য্য শাস্ত্রে ত্রিবিধ পূজার পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক। সাত্বিকপূজায় সাধকগুরুর উপদেশানুসারে আপনাকে ঈশ্বরানুরূপ অর্থাৎ "হংসরূপ" বিবেচনা করিয়া স্বয়ং পূজায় বসিবেন। পূজা অবস্থানুসারে ষোড়শোপচারে অথবা পঞ্চো-পচারে হইয়া থাকে, কোথাও কোথাও পটে পূজারও নিয়ম আছে, কোথাও বা ঘটে, কিন্তু এ সমস্তেতেই এক ফল লাভ হয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমে ঘটরূপ হৃদয়ে সপ্ত তীর্থ বারি অর্থাৎ সপ্ত প্রকৃতিস্থিত মনকে সংযুক্ত করিবে, তাহাতে শাখা পল্লবাদি ইন্দ্রিয় সমূহ রক্ষা করিবে। তদুপরি অন্নধার—মায়া, তদোপরি অম্বুগর্ভ নারিকেল ফল অর্থাৎ জগৎ গর্ভাধারী ঈশ্বর, আর উপরে চিত্রিত মূর্ত্তি আত্মা, এইরূপ সঙ্কল্প করিবে এবং বাসনাদি সমস্ত বিকারকে ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ বলি প্রদান করিয়া জ্ঞান স্বরূপ হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া ঈশ্বরময় হইবে, ইহাই সাত্বিক পূজা। সমাধি নামা বৈশ্য এই পদ্ধতিতে পূজা করিয়া অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। মা আমার চৈতন্যময়ী, জগতের সকল বস্তুতেই মায়ের চৈতন্যসত্বা ওতঃপ্রোত ভাবে বিরাজিত, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ সাধক সকল বস্তুতেই সেই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ধন্য হয়। এই জন্য সাধক বলিয়াছেন,—"তিনি ঘটে পটে বিরাজ করেন। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।"

ব্রহ্মময়ী চিদানন্দরূপিণী মা আমার সর্ব্ব ঘটে বিরাজিত, আমাদের চক্ষু নাই—অন্ধ, তাই আমরা দেখিতে পাই'না। যাহার চক্ষু আছে সে মা-ময় ভুবনই দর্শন করে—মা ছাড়া তার আর কি আছে? বৈশ্য শ্রেষ্ঠ সাধক এইরূপেই মাকে দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। আর সুরথ রাজা রাজসিক পূজায় হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এইরূপে সপ্তমী ও অষ্টমী পূজা করিবে। অষ্টমীর শেষভাগে এবং নবমীর প্রারম্ভে অর্থাৎ সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা করিবে, ইহার দিবা রাত্র ভেদ নাই। বিধিপূর্ব্বক এই দুর্গা পূজারূপ মহাযজ্ঞ সমাধা করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আধুনিক পূজা অধিকাংশই তামসিক ভাবে হইয়া থাকে—ইহা প্রকৃত পূজা নহে।

প্রার্থনা।

মা সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণি! মানবের নিজস্ব সম্পত্তি কিছুই নাই, তুমিই সকলের মূলাধার তাই সাধক বলিয়াছিলেন—"তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি" বাস্তবিক আমি কিছুই করি না, আমার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। তুমি যা করাও তাই করি, যা বলাও তাই বলি, তুমি সর্ব্ব কর্ত্রী, তোমার চরণে সংখ্যাতীত প্রণাম। মা! করুণাময়ি, অন্নপূর্ণে অভয়ে! মা তুমি ভারতে আসিয়াছ, সম্বৎসরের পর আবার এই অভাগা সন্তানদের মনে পড়িয়াছে কি?

মা! সন্তান বৎসলে! বিষাদ ক্লিষ্ট, দারিদ্র-দুঃখ-প্রপীড়িত সন্তানদের আর্ত্তনাদ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কি? মা! এক একটা বৎসর যাইতেছে, আর আমাদের পক্ষে যেন প্রলয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে, সে কষ্ট, সে দুঃখ, সে মর্ম্মপীড়া; মা! তুমি অন্তর্যামিনী, তোমার কাছে কিছুই অবিদিত নাই, তুমি সকলই জান। মা! গত গত বৎসর যখন তুমি এসেছিলে, এই জীর্ণ শীর্ণ দেহ সেই কয়দিন তোর যত্নে কিঞ্চিৎ শ্রীধারণ করিয়াছিল, তুইও চলে গেলি আবার যেমন দেহ তেমনি; মা! আবার যে দর্শন পাইব, সে আশা ছিল না। দেখ মা! তোর অভাবে তোর স্নেহের ছাওয়ালদের কি দুর্গতি হইয়াছে। এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভারতে থাকিয়া ক্ষুধায় সময় অন্ন পাই না, পিপাসার সময় জল পাই না, পরিবার তরে কাপড় পাই নাই। জননী, যে দেশকে তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ করিয়া সাজাইয়া ছিলে, আদরের সন্তানগণকে রাখিবার জন্য যাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া ছিলেন। সেই অমরবাঞ্ছিত দেশ ও সেই স্নেহের সন্তানগণের দুরবস্থা একবার স্বচক্ষে দর্শন কর।

আজ মা! উদরে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, চক্ষে আর দৃষ্টিশক্তি নাই; সকলি যেন আঁধার। তথাপি মা! আমরা তোমার আগমনে সকলি ভুলিয়াছি, তোমার সেই ভবারাধ্য অভয় চরণ দর্শন করিয়া সকল যাতনা ভুলিয়া আবার তোমার পূজা করিব, নয়ন-নীরে আবার তোমায় অভিষেক করাইব, ভক্তি-বিমল-পুষ্পে আবার তোমার পূজা দিব। তোমার চরণামৃত পান করিয়া দগ্ধ মনপ্রাণ সুশীতল করিব, ভবের সকল ভাবনা এড়াইব—এস মা জগজ্জননি! এস ভাই! পবিত্র-চিত্ত সাধু

বঙ্গবাসী! এস আমরা ভক্তিভরে হৃদয়ের কপাট খুলিয়া মাতৃপদে আত্ম সমর্পণ করি। যে পদ বিধি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র ধ্যানে পায় না পরমযোগী মহাদেব যে পদ পাবার জন্য সতত শ্মশানে মশানে ভ্রমণ করিয়াও ধরিতে পারেন না, আজ মায়ের কৃপায় ভবের সম্পদ সেই অভয় পদ লাভ করিয়াছি; এমন সৌভাগ্য আর হইবে না। এস ভাই! হিংসা, দ্বেষ, শক্রতা বিসর্জ্জন দিয়া আজ মনের সাধে জবা-বিল্বদলে মায়ের পূজা করি। আর ভাই সাধক-মণ্ডলী! আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া এস সমস্বরে গললগ্নীকৃতবাসে বলি—"ধন্যোঽহং কৃত কৃতোঽহং সফলং জীবনং মম।"

ভাই! এমন দিন হবে না, নশ্বর মানব দেহেরত স্থিরতা নাই। মায়ের এমন জগন্মোহন বাৎসল্য প্রতিমা আর দেখিতে পাইব কি না সন্দেহ। এই সময় এস ভক্তির সহিত একবার প্রাণ ভরিয়া মা মা রবে ডাকি, করুণাময়ী মা আমাদের ভক্তি সম্বোধনে বিগলিত হইবেন, আমাদের সুখের পথ মুক্ত করিবেন, তবে আর কোনও ভাবনা থাকিবে না।

এস শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি ভক্তগণ আজ দেহ মন-প্রাণ-আত্মা এবং আমাদের যা কিছু আছে, মায়ের মোক্ষ মুলাধার পদতলে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই, মায়ের চরণে শরণ লই এবং বলি ঃ—

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরেদেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

পরিশেষে মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভক্তিভরে যুগ্ম-করে তার-স্বরে সাষ্টাঙ্গ ভূলুণ্ঠিত হইয়া এস দেবীর পদে প্রণিপাত করি—

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সম্পাদক।

সেকালের বিবাহ রীতি।

ময়মনসিংহ জেলায় "বুড়োগ্রামের" সু-কবি নারায়ণদেব অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি। নারায়ণদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তাঁহার রচিত পদ্মা-পুরাণ যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই প্রাচীন পুরাণে আমরা সেকালের বিবাহ-রীতি—কন্যা-নির্ব্বাচন, বরযাত্রা, বরভূষণ, সোহাগমাগা, জলভরা, বরবরণ, বিবাহ, স্ত্রী-আচার, বরভোজন ইত্যাদি প্রাচীন চিত্র যাহা দেখিতে পাই, তাহা এইরূপ ঃ—

কন্যানির্ব্বাচন ঃ—সেকালে ঘটক মহাশয়দের মুখে কন্যার নাম, পিতৃনাম ইত্যাদি জানিয়া বিবাহ স্থির করা হইত। স্ত্রীলোক-জাতিভেদে—"হস্তিনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী ইত্যাদি বহু রকমের। কাহার মেয়ে কোন্ জাতীয়, কি নাম ইত্যাদি সংবাদ, ঘটক মহাশয়দিগের জানা থাকিত। ঘটক মহাশয়গণ ঘটকালী করিয়া বরপক্ষ—কন্যাপক্ষ—উভয় পক্ষ হইতেই যথেষ্ট ধন পুরস্কার পাইতেন। ঘটকের সংখ্যাধিক্য হইলে কাজ সেরূপ হইত না। ঘটকের মুখে

কোন্ জাতীয় এবং কাহার কন্যা, কি নাম ইত্যাদি পরিজ্ঞাত হইয়া যাহার সঙ্গে যে মেয়ের উদ্বাহ সম্বন্ধ হইতে পারে, এইরূপ সুবিবেচনা করিয়া, পরে বরের পিতা—ভাবী বৈবাহিকের বাড়ীতে গিয়া মেয়ে দেখিত। বিবাহে কোষ্ঠী বিবেচনা করিবার রীতি ছিল। মেয়ের নামের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত, কেন না, বরের মাতৃ, মাসী, ভগ্নি ইত্যাদির নামীয় ও কোনও দেবতার নামীয় কন্যা-বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। বর্ত্তমান যুগে এই প্রথা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক রীতি-অনুসারে পূর্ব্বে বরকে যাইয়া মেয়ে পছন্দ করিতে হইত না। সেকালে পিতা যাহা নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহাই নির্দ্ধারিত হইত কিন্তু দুঃখের বিষয় এক্ষণে অনেক স্থানেই বরকে গিয়া মেয়ে পছন্দ করিতে দেখা যায়। পিতার পছন্দে এখন আর চক্ষুঘ্রাণধারী ছেলেদের মন ওঠে না। হায়! পাশ্চাত্য-শিক্ষার কি বিষময় ফল!

বরযাত্রা :—সেকালের বরযাত্রা প্রায় আধুনিক বরযাত্রার ন্যায়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, পঞ্চপল্লব ও জলদ্বারা একটী ঘট পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে পাঁচটী সিন্দুরের কৌটা দিয়া একটী জীবন্ত পুঁটী (শফরী) মৎস্যের উপরে ঐ "মঙ্গলঘট" বরের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাহার পর ধান্য দূর্ব্বা বরের মস্তকে দেওয়া হইলে বরকে সূর্য্য-প্রণাম করিতে হইত। পুঁটী (শফরী) মৎস্যের মস্তকে সিঁদুরের কৌটা ও বরকে "খার বিচুনের" বাতাস দেওয়ার রীতি ছিল। রক্তবাস পরিধান করিয়া মাতৃ-চরণে প্রণাম করিলে পর উপরোক্ত আচার-ব্যবহার করা হইত। আমরা দেখিতে পাই, একালের ন্যায় সেকালে বরকে, শকট শিবিকা আরোহণ করিয়া যাইতে হইত না।

"চতুর্দ্দোলে চাঁদ হস্তীপৃষ্ঠে লক্ষীন্দর
ব্রহ্মা সম্ভাষণে যেন যায় পুরন্দর।"

অবস্থানুসারে বরকে হস্তী-ঘোটকে আরোহণ করিয়া যাওয়াই সেকালের পদ্ধতি ছিল। বরের সঙ্গে "বরযাত্রীক" কতকগুলি লোক যাওয়াও প্রাচীন রীতি।

বরভূষণ :—সেকালের বরভূষণ বড়ই সুন্দর। বর-মস্তক বিচিত্র মুকুটে সুশোভিত হইত; হস্তদ্বয়ে সুগন্ধি (বকুল, গোলাপ ইত্যাদি) পুষ্পের মালা থাকিত, কপোল চন্দন-ফোঁটায় পরিশোভিত হইত। তখন বোধ হয় "Asaws"এর ব্যবহার ছিল না। তাহার পরিবর্ত্তে চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। রক্তবাস পরিধান, গলদেশে কুসুম-মালা, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল ও সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম, চন্দন লেপিত হইত। বর্ত্তমানে বিলাসিতার স্রোতে সমাজ টলটলায়মান! তাই চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরীর পরিবর্ত্তে "Bakul, Khas Khas, Chamali, Rose" ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। হায়রে বিলাসিতা!

সোহাগমাগা :—বিবাহোৎসবে সোহাগ মাগাতে সেকালে ও বর্ত্তমান যুগে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে যৎসামান্য পার্থক্য যাহা এখন প্রচলিত হইয়াছে, ধর্ম্মপ্রাণ আলোচনার গ্রাহকগণের নিকট অবিদিত নাই।

জল ভরা :—কন্যা, বর, উভয়ের

বাড়ীতেই জল ভরার রীতি। পাঁচ জন এয়ো মিলিত হইয়া গীত হুলুধ্বনি ও ইহাঁদের সঙ্গীয় বাদ্যকার বাদ্যে বিবাহ-বাড়ী মুখরিত করিয়া, "পঞ্চঘট" পুকুর হইতে কিংবা নদী হইতে জলে পূর্ণ করিয়া আনিয়া বরকে (মেয়ের বাড়ীতে—মেয়েকে) স্নান করাইলে পর বর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইত। সেকালের জল-ভরা প্রায় বর্ত্তমান যুগের মতই।

বর বরণ ঃ—বর শ্বশুর বাড়ীতে আসিলেই বহির্ব্বাটীতে শ্বশুরকে জামাতা-বরণ করিতে হইত। একালের ন্যায় বিবাহ স্থানে বর বরণ করিবার রীতি ছিল না। পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধপুষ্প দ্বারা জামাতাকে অর্চ্চনা করিয়া রক্ত-বস্ত্র, মুকুট ও স্বর্ণাঙ্গুরীয় দ্বারা বরকে বরণ করিলে পর বাড়ীর ভিতর লইয়া যাওয়া হইত। বরকে ভিতর বাড়ী লইয়া যাইবার সময় পঞ্চ-প্রদীপ দেখানও প্রাচীন নিয়ম। বর্ত্তমানে ইহার বিপরীত।

বিবাহ ঃ—সেকালের বিবাহে ও একালের বিবাহে অনেকটা প্রভেদ লক্ষিত হয়। কদলীবৃক্ষের নীম্নেই বিবাহের প্রথা ছিল। চারিটী কদলী বৃক্ষের নীচেই বিবাহ প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু এক্ষণে স্থানভেদে আটচালার নীচেও বিবাহ হইতে দেখা যায়! এতদ্ব্যতিরেকে—সেকালে মুখচন্দ্রিকার পর বর, মেয়ের অনুগত থাকার জন্য মেয়ের মাতা অনেক প্রকার ঔষধ করিতেন। ঔষধ করা একটা বিশেষ প্রথা ছিল, কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ ঔষধ করিতে দেখা যায় না। তখনও গীতবাদ্যের প্রথা ছিল সত্য,কিন্তু একালের ন্যায় এত বাজী-বারুদ পোড়াতে ও খেমটানাচে এত টাকা ব্যয় করিতে হইত না। ক'নেকে খুব সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া কনেবর উঠানো, পুষ্প ছিটানো, বিবাহের পর অগ্নিস্থাপন, যজ্ঞ, হোম ইত্যাদি মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা হইত।

স্ত্রী-আচার ঃ—বিবাহের পর বরকে ঘরে লইয়াই "দুধকলা" খাওয়ানো হইলে পর এয়োগণ মিলিত হইয়া গীত গাহিতে গাহিতে কনেবরে পাশা খেলা হইত। পাশা খেলার রীতি বর্ত্তমান যুগেও কোথাও কোথাও আছে; কিন্তু "দুধকলা" খাওয়ার প্রথা এখন আর দেখা যায় না।

বর-ভোজন ঃ—বিবাহের পরদিবস শ্বশুর বাড়ীতে বর ভোজন একটা প্রথা ছিল। ইহা না হইলেই বিবাহোৎসবের একটা অঙ্গ হানি হইল বলিয়া মনে করা হইত। বর ভোজনে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধা হইত; পঞ্চাশ রকম না হইলেই নয়। পিষ্টক পায়েস ইত্যাদি আরও কত কি প্রস্তুত হইত।

রন্ধন ঃ—বর ভোজনে "পরিহাস" করা প্রচলিত ছিল বলিয়াই বর ভোজনের রন্ধন শ্যালক স্ত্রী, দিদিশাশুড়ী কিম্বা পত্নীর ছোট বোন্‌কেই করিতে হইত। আমরা শাহে রাজার বাড়ীতে বর ভোজনে দেখিতে পাই—

"শাহে রাজা পুত্র বধু তারকা সুন্দরী
রন্ধন কর যে ধনি বহু যত্ন করি।
এক মুখে জ্বাল দেয় পঞ্চ মুখে জ্বলে
নূতন হাঁড়িতে রান্ধে ঘৃত আর তৈলে।
রান্ধিল কচুর শাক, ব্যঞ্জন বিস্তর
পনসের বীজ তাহে ঘৃতের উপর।

পলতার পাতা আনি তারকা সুন্দরী,
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে ঘৃতেতে সম্ভারী
একে একে রান্ধিলেক পঞ্চাশ ব্যঞ্জন
চলিলেন লক্ষীন্দর করিতে ভোজন ॥”

ব্যঞ্জন আমিষ ও নিরামিষ দুই রকম রাঁধা হইত। কচুশাকে বুট দেওয়ার নিয়ম ছিল। কলাই, মসুর, মুগ দাইল, অরহর দাইল “আদ্রক যোগে” বুট দাইল, ছিমুর কলায়ের দাইল, “ডাব্জাও লাউ” যোগে ঠাকুরী দাইল ঘৃতে সম্ভসি দেওয়া হইত। পলতার পত্র ও পনসের বীচি ঘৃতে ভাজা হইত। রোহিত, কাৎলা, চিতল, বোয়াল, ভেট্কী, কই মদগুর মৎস্য প্রভৃতি তৈলে রাঁধা হইত। বোয়ালের ঝোলে (রসায়) কাল জিরা, ও মদগুর মৎস্যের ঝোলে (রসায়) আদ্রক দেওয়ার রীতি ছিল। ইহার পর—

“পদ প্রক্ষালিয়া কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ
ভোজন করিতে বসে চাঁদের নন্দন।
আতপ তণ্ডুল ভাত আধা পোড়া করি,
লক্ষীন্দর থালে দিল তারকা সুন্দরী।
আদা বলি আনি দিল হরিদ্রার মুড়া,
চিনি বলি আনি দিল লবনের গুড়া।
মরিচ ব্যঞ্জন আনি দিল তার শেষে,
হস্ত দিয়া লক্ষীন্দর রাখে এক পাশে।
পুনরপি আনি দিল তেতুল অম্বল,
তাহা দেখি লক্ষীন্দর হাসে খল খল।
অবশেষে আনি দিল পরমান্ন পিঠা,
মিশাইয়া দিল তাতে খাস্ত গোঠা গোঠা ॥”

এইরূপে আহার করিবার কালে পরিহাস করা। দিব্য অন্ন আনি দিল, থালার উপর

ভোজন করয়ে তবে বর লক্ষীন্দর।
ঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ করিয়া সঞ্জাত,
লক্ষীন্দর থালে দিল পঞ্চামৃত ভাত।”

পিষ্টক :—বহুপ্রকারের পিষ্টক প্রস্তুত করিবার রীতি ছিল। ময়দা ও মুগ কলায়ে একপ্রকার পিষ্টক প্রস্তুত হইত। তদ্ভিন্ন আলুর পিষ্টক, নারিকেল দ্বারা “তক্তি পিষ্টক”, পুলি পিষ্টক, বর্‌ফি পিষ্টক ইত্যাদি বহুরকমের প্রস্তুত হইত। কাঁচকলার শাঁসে এক প্রকার পিষ্টক হইত। ইহা ছাড়াও হিজি বিজি কত প্রকারের প্রস্তুত হইত। দধি দুগ্ধ পায়েস প্রভৃতিরও ব্যবহার ছিল।

এই প্রাচীন বিবাহ চিত্রে আমরা দেখিতে পাই, মেয়েকে বিবাহ দিয়া কন্যার পিতাকে এ কালের ন্যায় নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হইত না। বাস্তুভিটায় ঘুঘু চরিত না। বরের পিতাও মেয়ের পিতার নিকট হাজার দুহাজার নগদ টাকা, তিনশত টাকার গহনা, ২০০ শত টাকার তৈজস্ পত্র এবং ছেলেকে এফ,এ পাশ করাইবার খরচ চাহিতেন না। অন্ততঃ তৈজস পত্র মাপ-করিলেও বরের ভ্রাতাকে এণ্ট্রান্স পাশের খরচ দিতে হইবে বলিয়াও এখনকার মত দশ-শালার বন্দোবস্ত করিতেন না, তখন কেবল মেয়ের পিতা মুখে পাঁচ হরিতকী বলিলেও—

“এক ভাণ্ডারের স্বর্ণ, রজত বিস্তর
দাস দাসীগণ আর ভূমি বহুতর।
সুগন্ধি কস্তুরী দিল, চন্দন চামর,
হীরা মণি মাণিক্যাদি প্রবাল পাথর।
সুবর্ণের খাট দিল সেতের মশারী,

রজত ডাবর দিল কাঞ্চনের বনারী।
সুবর্ণে আবরি দিল সহস্রেক ঘোড়া,
একশত হস্তি আর মুদ্রা লক্ষতোড়া।"
ইত্যাদি দেওয়া হইত।

অবস্থানুসারে বহু ধন সামগ্রী তৈজস পত্র ইত্যাদি বরকে যাচাই করিয়া দেওয়া হইত; ইহাই ছিল প্রাচীন রীতি॥

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

হে মঙ্গলময় বিভো! তোমার লাগিয়া।
এক বিন্দু অশ্রু যদি তোমার চরণে,
ফেলাইতে পারি কভু দেখিব সে দিনে,
ভুলিয়ে কেমন করি থাক অন্তরালে,
ছুটিয়া আসিয়া মোরে লও কিনা কোলে।
আছি সে দিনের তরে প্রতীক্ষা করিয়া,
হে মঙ্গলময় বিভো! তোমার লাগিয়া।

শ্রীতারানাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভক্তের প্রার্থনা।

সুনীল অম্বর পানে কখন চাহিয়া,
সজল নয়নে থাকি একাকী বসিয়া।
কভু কল্লোলিনী কূলে গা'ই কত গান,
কুলু কুলু কুলু নাদে মিশাইয়া তান।
নিবিড় তিমির ঠেলি নিশায় কখন,
উধাও হইয়া ফিরি কে'করে বারণ।
আঁখি জলে ভাসে বুক আকুল কাঁদিয়া,
হে মঙ্গলময় বিভো! তোমার লাগিয়া।
সারাটী জগৎ স্তব্ধ! নাহি কোলাহল,
নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে নিদ্রিত সকল।
মস্তক স্থাপিয়া করে হস্ত জানু'পরে,
আমি শুধু জেগে থাকি বিষাদ অন্তরে।
নৈরাশ্য-তরঙ্গাঘাত নীরবে সহিয়া
হে মঙ্গলময় বিভো! তোমার লাগিয়া।
খুলিয়ে হৃদয় দ্বার সতত ডাকিব,
কাঁদিয়ে হইব অন্ধ তথাপি কাঁদিব।
মায়ার মোহন ফাঁদে পড়িবনা আর,
বিরলে তোমার গীত গাব' অনিবার।
আলোক আঁধার মাঝে সমান থাকিয়া

"চিরানন্দ।"

তুমি গেয়েছিলে কোন্ সকালে
কোন্ স্বপনের গান;
কোন্ স্বপনের গান ও গো—
কোন্ আকাশের তান!
পাখীরা কোন কাননেতে,
গেয়েছিল তোমার সাথে;
ওগো এনেছিল কোন্ স্বপনের
মধুমাখা দান।
চাঁদেতে কার এমন আলো
কাল জগত হল আলো
ওগো কে করিল—এমন আলো
আমার ভাঙ্গা কুঁড়ে খান।
হৃদয়ে কার প্রেম ছুটে
কার প্রভাবে কুসুম ফুটে
কে গাহিল জগত সুরে—
এমন প্রেমের গান
আর কেন গান আকাশ মাঝে
সখা জাগো এসে হৃদয় মাঝে

প্রেম পরশে প্রেমিক গানে
জাগাও সুপ্ত প্রাণ ॥
ভেঙ্গে দাও সব কপটতা
ছুটে যাক্ সব আকুলতা
তুমি গোপন পুরে গোপন সুরে
বাজাও বাঁশীর তান্ ।
তোমার ঐ মোহন সুরে
মিলায়ে সুর পরাণ ভরে
আজি—নিদ্রা ভাঙ্গা নবীন গানে
জাগাই আকাশ খান্ ॥
ওগো নিষ্ঠুর কোন্ দেশে
গাহিছ কি ভাবে হেসে,
লোকে দেয় গালি, তুমি হাস খালি
সই কত অপমান ;
তুমি চিরানন্দ—তবু আমি ধন্য
তোমায় করেছি সকল দান ॥

শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী ।

চিত্তশুদ্ধি ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছেন, নিষ্কাম কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির সর্ব্বপ্রধান উপায় ; নিষ্কাম হইতে পারিলেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি জন্মে, যতদিন না অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, ততদিন আত্মজ্ঞান কখনও জন্মিবে না। এই আত্মজ্ঞান জন্মিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ ইহাও বুঝাইয়াছেন, সংসার ত্যাগ করিলেই, সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেই, চিত্তশুদ্ধি হয় না ; নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধির উপায়ান্তর নাই। তাই সন্ন্যাস ধর্ম্মের পূর্ব্বে গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা। গৃহ ভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র কোথাও নাই। কিন্তু ভগবান এই কর্ম্ম ফলকামনা ত্যাগ করিয়া করিতে বলিয়াছেন। "আমি করিতেছি", "আমার দ্বারা এত কাজ হইল", "আমি ভিন্ন একাজ আর কেহ করিতে পারে না", এই অহঙ্কার, এই অভিমানও পরিহার করিতে হইবে। কিন্তু সংসারী ব্যক্তির মনের, গৃহীর মনের এই অবস্থা জন্মিতে বহুকাল লাগে, এক জন্মে হইয়া উঠে না। একেবারে নিরহঙ্কার, নিরভিমান হওয়া, সকল কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া চিত্তের এই নির্ম্মল, বিশুদ্ধ অবস্থা জন্মিতে মানুষের কত জন্ম কাটিয়া যায়, বলা যায় না ; অথচ চিত্তশুদ্ধি না হইলেও, মানুষ শান্তি পাইতে পারে না, মানুষ সুখী হইতে পারে না, মানবমনে আনন্দের লেশ মাত্রও থাকে না। যাহার চিত্ত যত মলিন, যাহার মনে ঈর্ষা, হিংসা, অহঙ্কার, অভিমান, রাগ, দ্বেষ, কাম, লোভ যত প্রবল, তাহার তত জ্বালা, তত যন্ত্রণা, তত কষ্ট, ততই ভাবনা। তাহার তৃপ্তি নাই, সন্তোষ নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই ; তাহার জীবন ভারস্বরূপ। পক্ষান্তরে ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি যাহার যত কম, সে সেই পরিমাণে আত্ম প্রসাদ লাভ করে, তৃপ্তি পায়, সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, সেই পরিমাণে শান্তি উপভোগ করিতে পারে, সুখী হইতে পারে। মানুষ কি ইহা বুঝে না ? মানুষ ত প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে, রিপুগুলির প্রভাবে, কুপ্রবৃত্তি নিচয়ের তাড়নায়, তাহার শান্তি নাই, সুখ নাই, আনন্দ নাই ; মায়ায় অভিভূত হইয়া মায়াবশে মানুষকে এত

ভুগিতে হয়। কিন্তু ইহারও উপায় আছে। যে মায়া আমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছে, সেই মায়ার দ্বারাই আমরা শান্তি পাইতে, সুখী হইতে পারিব। শুদ্ধচিত্তে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, দারা সুত, আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব সকলের প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, মমতা, প্রীতি, দয়া কর, সমবেদনায় সহানুভূতিতে হৃদয় ভরিয়া ফেল, তুমি শান্তি পাইবে, সুখী হইবে, আনন্দ অনুভব করিবে। কিন্তু মনে থাকে যেন, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে, নির্ম্মল অন্তঃকরণ না হইলে তোমার পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, দারাসুত প্রভৃতি তোমাকে কোন সুখেই সুখী করিতে পারিবেন না; সব বর্ত্তমানে তোমার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিবে। যদি পিতামাতাকে অবিচলিত, অকপট সম্মান শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে পার, যদি নিঃস্বার্থভাবে ভাই ভগিনীকে ভালবাসিতে পার, ঈর্ষ্যা, হিংসা, দ্বেষ বর্জ্জিত মমতা করিতে পার; যদি পতি পত্নী পরস্পরে পরস্পরকে পবিত্র চক্ষে দেখিতে পার, দ্বিধাশূন্য হৃদয়ে ভালবাসিতে পার, সংশয় সন্দেহ-ব্যবধান পরিশূন্য চিত্তে আত্মায় আত্মা মিশাইতে পার, যদি পুত্রকে যথার্থ ভালবাসিতে পার (যাহা সংসারে অল্প লোকই পারে) অর্থাৎ পুত্রের মুখ চাহিয়া, পুত্রের মঙ্গলের জন্য পুত্রের প্রতি পিতার প্রকৃত কর্ত্তব্য সাধনের জন্য নিজের কু-অভ্যাসগুলি পরিহার করিতে, নিজের মন্দ স্বভাব সংশোধন করিতে, পুত্রের জন্য সর্ব্বপ্রকারে আত্মসংযমী হইতে পার, যদি আত্মীয় স্বজনের অনিষ্টচিন্তা না কর, নিজ স্বার্থের জন্য তাঁহাদের স্বার্থহানি না কর, তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধিতে হৃদয় ঈর্ষ্যা, হিংসা-বিদ্বেষ জর্জ্জরিত না কর, যদি কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বন্ধুত্ব বন্ধনে বদ্ধ না হইয়া, খলতা, কপটতা পরিহার করিয়া সরল প্রাণে, উন্মুক্ত হৃদয়ে বন্ধুর সহিত প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পার; যদি প্রতিবেশীর বিপদে নিজ বিপদ জ্ঞান করিতে, সম্পদে আনন্দ বোধ করিতে পার; যদি দেশের কাজে দেশকে বড় করিয়া আপনাকে ছোট করিতে পার, তবেই তোমার ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হইবে। চিত্তশুদ্ধির ইহাই প্রথম সোপান। চিত্তশুদ্ধির আরও পবিত্র, আরও উচ্চতর, আরও উৎকৃষ্টতর উপায় আছে সেগুলি শাস্ত্রবিহিত পূজা, আরাধনা, জপ, তপ, ব্রতব্রত, আচারানুষ্ঠান। নিষ্ঠাবান হইয়া আন্তরিক অনুরাগ ভক্তির সহিত ঐগুলি আচরিত হইলে চিত্তশুদ্ধি সাধনের এমন সরল, এমন সহজ, এমন অল্পকালসাধ্য সদুপায় আর নাই। তাই ভগবান গৃহে থাকিয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন, তাই অর্জ্জুনের বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে তিনি অত উপদেশ দিয়াছিলেন। আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হইবে, জীবন কর্ম্মময় করিয়া ফেলিতে হইবে; আলস্যে, অবসাদে, পরনিন্দায়, পরচর্চ্চায়, কুক্রিয়ায়, কুঅভ্যাসে রত থাকিয়া দেহ রোগের আধার, মন শোক তাপময় করিলে চলিবে না। আমরা নিজদোষে পথভ্রষ্ট, লক্ষভ্রষ্ট হই কেন? কেন অদৃষ্ট রচনা করি, কি নিমিত্ত কর্ম্মফল বাড়াইয়া বার বার জন্মের পথ পরিষ্কার করি? এস ভাই, যাহাতে আমাদের ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধ হয়, যাহাতে নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিতে শিখি, আত্মজ্ঞান লাভ

করিতে পারি, ভগবানকে বুঝিতে পারি, জগৎ সেই ভগবানময় দেখিতে পারি, তাহার উপায় করি।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

প্রেমের কবর।

(ছোট গল্প)

মানবের অদৃষ্টে লুকাইয়া লুকাইয়া অলক্ষ্য হস্তে অস্পষ্ট নূতন অক্ষরে ভবিতব্য যে কোথায় কি লিখিয়া রাখে, তাহা যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে কাহারও কোনও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। মানুষের শত সুখময় কল্পনার শোভনোদ্যান নিরাশার তপ্ত নিশ্বাসে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত না।

সুরথলাল যখন দিলদার নগরের বাদশাহের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী ছিল, তখন কি সে জানিত—তাহার জীবনে এমন দিন আসিবে? সে কি ভাবিয়াছিল—কখনও তাহার এতখানি পরিবর্ত্তন হইবে? যে ভালবাসা তাহার নিকট শুধু একটা বাজে 'সেন্টিমেন্ট' ভিন্ন কোনও মূল্যবান জিনিষ বলিয়া মনেই হইত না, প্রেমের নাম শুনিলে সে হাসিয়া ভূমিতে লুটাইত, সেই ভালবাসার জন্যই যে একদিন তাহার এ অবস্থা হইবে, সে কি ইহা কখনও কল্পনা করিয়াছিল?

সুরথলাল দর্পিত গর্ব্বিত চির-তেজোময় চির-দর্পপূর্ণ রাজপুতবংশীয় যুবা, পরম সুপুরুষ; যোদ্ধার মত অনিন্দ্য সুন্দর চেহারা! আপনার উপর তাহার বড় বিশ্বাস ছিল, তাহার হৃদয়ে কখনও রমণীর ছায়া পড়িবে না বলিয়া দৃঢ় ধারণা ছিল, কিন্তু এক নিষ্ঠুর মুহূর্ত্তে জীবনের সে দৃঢ়তা, আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস কোথায় ভাসিয়া গেল। একদিন কোন্ এক অশুভ মুহূর্ত্তে একবার শুধু এক বিদ্যুতের মত চকিত দৃষ্টিতে দিলদার নগরের নবাবজাদী সখিনার অপ্সরা-নিন্দিত ভুবন-বিজিত অনুপম রূপচ্ছবি সুরথলালের নয়নগোচর হইয়াছিল, সেই দিবস হইতে তাহার প্রাণে যেন কোথা হইতে এক-রাশ কি উন্মাদনা আসিয়া পড়িয়াছিল।

সুরথলাল রাজপুত, সখিনা শাহাজাদী মুসলমানী, কিন্তু অদৃষ্টের পথ কে রোধ করিবে? সখিনা তাহার কর্ম্মচারী সুরথলালের চরণে আপনার হৃদয়-প্রাণ বিকাইয়া নিজ সর্ব্বস্বের বিনিময়ে চির-জীবনের জন্য অশ্রুজল কিনিল! অদূর দিয়া স্রোতস্বিনী শত ধারে বহিয়া যাইত, সুরথলাল প্রতিদিন সেই পুণ্য পবিত্র জলে প্রাতঃস্নান করিতে আসিত, শাহাজাদী তাহার মহলের জানালা দিয়া তাহাকে দেখিত। সুরথলাল প্রথমে জানিত না, পরে দাসীর নিকট হইতে শুনিয়াছিল—সখিনা তাহারই অনুরাগিণী! প্রথমে সুরথ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, ভাবিল—এ কি পরিহাস নাকি!! শাহাজাদী সখিনার ভালবাসিবার মত তাহার কি আছে! তাহার পর একদিন স্নান করিয়া যাইবার সময় সেই জানালার প্রতি সুরথলালের দৃষ্টি পড়িল, জানালায় গোলাপের মত সুন্দর একখানি মুখ ঝলমল করিতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে চারি চক্ষের মিলন—দুই জনে চোখোচোখি হইল।

সুরথ মনে করিয়াছিল—তাড়াতাড়ি শীঘ্র করিয়া সে পথটুকু অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা পারিল না, সে থমকিয়া দাঁড়াইল—বুঝি সখিনার সে আকর্ণ-বিস্তৃত, সুরমারঞ্জিত, মোহভরা, প্রেমভরা, সকরুণ অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টি কেহ উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে না !!!

সখিনা সরিল না.চোখোচোখির পরমুহূর্ত্তেই উভয়ের দৃষ্টি নত হইয়া গেল। যাহাকে দেখিবার সাধ—যাহাকে না দেখিলে প্রাণ কাঁদে, তাহার দিকে চাওয়া যায় না কেন? কি বিড়ম্বনা !! যে কথা মুখে বলা যায় না, প্রাণের সেই ভাষা—সেই কথা নীরবে এক মুহূর্ত্তে নয়নে নয়নে হইয়া গেল ! সখিনার বড় বড় কালো কালো চোখ দু'টী জলে ভরিয়া গেল। ভাবিল—কেন বিধাতা তাহাকে শাহাজাদী করিয়া গড়িলেন? পেস্তাই রংএর ওড়নার অঞ্চলে চোখ মুছিয়া শাহাজাদী চাহিল, দেখিল—সুরথলাল ইত্যবসরেই চলিয়া গিয়াছে! সেই একদিনের দেখা—সেই এক মুহূর্ত্তের সাক্ষাৎ দু'জনের প্রাণে যেন জন্মজন্মান্তরের কোন্ অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনের সুদূর স্মৃতি মনে করিয়া দিল।

সুরথলাল ভুলিয়া গেল—শখিনা শাহাজাদী, সখিনা যবনী—সখিনা তাহার অস্পৃশ্যা ম্লেচ্ছ কুমারী। সেও হৃদয় হারাইল, সখিনাকে ভালবাসিল, ভূতভবিষ্যতের চিন্তা তাহার মনেই আসিল না।

তারপর অনেক দিন কাটিয়া গেল—মর্ম্মর কক্ষে মকমলের শয্যায় শুইয়া সখিনা ভাবে—তাহার এ কি হইল? চাঁদের আলোয়, পাপিয়ার গানে. ফুলের গন্ধে সখিনা কাঁদে—কেন সে বাদ্‌সাজাদী হইল!

আর সুরথলাল দিবানিশি অন্যমনস্ক, কি ভাবে কে জানে! সদাই বিমনা! প্রত্যেক কার্য্যেই তাহার ভুল হইতে লাগিল। হাসি যেন জন্মের মত তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কোন দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে।

প্রেম কি প্রমাদ, গুপ্ত কিছুই থাকে না, দিনে দিনে, অল্পে অল্পে,ধীরে ধীরে সুরথলাল ও শাহাজাদীর কথা প্রাশ হইয়া পড়িল, ক্রমে বাদসাহের কাণেও উঠিল।

বাদশাহ সুরথলালের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু সখিনা কাঁদিয়া কাটিয়া পিতার পায়ে ধরিয়া তাহার প্রাণ-ভিক্ষা করিয়া লইল। দারুণ মর্ম্ম-দুঃখে ও অপমানে সুরথলাল দিলদার নগর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—সে আজ তিন বৎসরের কথা।

* * * * *

দিন কাটে সকলেরই, তবে কাহারও হাসিয়া, কাহারও কাঁদিয়া! সময় কাহারও মুখাপেক্ষা করে না, কাহারও সুখ-দুঃখে দিনের কিছু আসে যায় না।

সুরথলালের দিনও কাটিতেছে, কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সেই জানে! সুরথ ভাবিয়াছিল—দিলদার নগর ত্যাগ করিলে, সখিনাকে ভুলিতে পারিবে, কিন্তু তাহা পারে নাই। ভালবাসিয়া কে কবে কাহাকে ভুলিয়া যাইতে পারিয়াছে যে সুরথ পারিবে? ভুলিয়া যাওয়া সহজ নহে, পাষাণ-প্রাণের পরতে পরতে

যে দাগ জন্মের মত আঁকিয়া গিয়াছে, সে দাগ মুছিয়া ফেলা দুঃসাধ্য। ভুলিয়া যাওয়া যদি সহজ হইত, তাহা হইলে জগতে এত অশ্রু, এত হাহাকার থাকিত না! কেহ কাহারও অভাবে কাঁদিত না।

তিন বৎসর পরে সুরথলাল আবার দিল্‌দার নগরে আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। শান্তির দীন ভিখারী এতদিন শান্তির আশায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরাশ হইয়াছে, বুঝিয়াছে হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা নিভিবার নহে। জগতে তাহার শান্তি নাই। জীবনের ওপারে কেবল সেই সবিতৃ-মণ্ডল-শোভিত, নক্ষত্র-বেষ্টিত চন্দ্রালোকিত পরজগতে যদি তাহার শান্তি থাকে ত আছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া সুরথ জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু দিলদার নগরে কাটাইয়া দিবার আশা করিয়া সেই পরিত্যক্ত পুরীতে আবার ফিরিয়া আসিল।

দিল্‌দার নগরের একজন হাফিজের সহিত সুরথের বড় আলাপ ছিল, সুরথলাল সেই হাফিজের বাটী আসিয়া উঠিল।

হাফিজ মহাশয় পরমাদরে তাহাকে বসাইলেন, সুরথলালকে তিনি সত্যই একটু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, বাদশাহ কর্ত্তৃক অপমানিত হওয়ায় সুরথকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—"প্রেম-ভালবাসা—প্রণয়-অনুরাগ স্বর্গীয় পদার্থ —হৃদয়ের জিনিষ—আর মন ত কাহারও শাসনের বশ নহে!

আনাহারের পর হাফিজ মহাশয়ের নিকট সুরথ দিলদার নগরের সংবাদাদি শুনিতে চাহিল।

হাফিজ মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

সুরথ শাহাজাদীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

হাফিজ মহাশয় তাঁহার আবক্ষলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রুরাজির ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে অন্য কথা পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুরথের প্রাণ কাঁপিল, ভাবিল বুঝি—শাহাজাদী মরিয়া গিয়াছে, সে বুঝি আর —সুরথের চোখে জল আসিল। সুরথ অধিকতর আকুলভাবে আবার সখিনার কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

হাফিজ মহাশয় নিশ্বাস ফেলিয়া অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন, বলিলেন—"শাহাজাদী লোকান্তরে!" বৃদ্ধের কোঠরাগত চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া গেল।

সুরথ শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

হাফিজ মহাশয়ের যত্নে ও শুশ্রূষায় সুরথ চৈতন্যলাভ করিলে হাফিজ মহাশয় পুনরায় সুরতের নিকট বলিতে লাগিল—"তাহার যাইবার পর দিবসেই শাহজাদী আত্মহত্যা করিয়াছেন। শাহজাদীর মৃত্যুর পর হইতে সমগ্র প্রাসাদে এক অদ্ভুত ভৌতিককাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। দিলদার নগরে বাদসাহের সেই প্রকাণ্ড ভবন এখন জনশূন্য, নবাব-পরিবারের কেহ তথায় নাই। আকাশস্পর্শী অট্টালিকা একটা ভীতিপূর্ণ শোক-স্মৃতির জলন্ত-চিত্রের ন্যায় উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে"; লোকজন নাই, চারিদিকের দরজা খোলা, কোথাও কোন দরজা অর্গলাবদ্ধ নাই; উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খল বাতাস কেবল শন্ শন্ রবে ভিতর বাহিরে

ছুটাছুটী করিয়া জনশূন্যতা জ্ঞাপন করিতেছে। রাত্রে সে পথ দিয়া পথিকও চলিতে পারে না। সখিনার মৃত্যুর পর হইতে প্রত্যহ রাত্রে সেই বাড়ীর ভিতর কাহার অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনা যায়—“দরজা বন্ধ করিও না,সে যেন আসিয়া ফিরিয়া না যায়।”

আবার কে যেন অশ্রুকাতর মিনতিতে সমস্ত রাত্রি কাহাকে ডাকিতে থাকে,—“এস আমার লাঞ্ছিত, অপমানিত প্রিয়তম! এস, হৃদয়-নিকুঞ্জের পিকবর! এস, হৃদয় মোহন! এস, হৃদয়েশ! এস, ওগো আমার পরাণবল্লভ প্রিয়তম! ফিরে এস!! শান্তির জন্য মরণের পরপারে আসিয়াছি, কিন্তু শান্তি কৈ? এস হে আমার শান্তিরাজ! ফিরে এস! ওগো আমার পরাণ-দয়িত, ফিরে এস! আমি মরিয়াছি, ভয় নাই, ভাবনা নাই, আর আমি শাহজাদী নই, আমি মরিয়াছি, তুমি এস! আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি! এস, আমার বেহেস্ত,! আমি যূথিকা ফুলের মালা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, এস, চিরসুন্দর! তুমি একবার এস।

সুরথলাল নীরবে হাফিজ মহাশয়ের কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিল, আর তাহার দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

তারপর সুরথলাল সেই রাত্রে সেই নিস্তব্ধ জনহীন বাদসাহ-ভবনে একাকী বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, (যে বাড়ীর পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া ভয়ে রাত্রিতে লোক চলিত না,) সেই প্রাসাদের ভিতরে জীবন পণ করিয়া প্রবেশ করিল। প্রেমের জন্য প্রণয়ী কি না করিতে পারে?

সুরথলাল নির্ভীক-চিত্তে একেবারে শাহজাদীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। যাহার জীবনে সুখ নাই, বাঁচিতে সাধ নাই, তাহার কিসের ভয়? সুরথ কক্ষে আসিয়া ভূমিতলে শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরথ শুনিতে পাইল,কে যেন অদৃশ্যে অলক্ষ্যে থাকিয়া এস্‌রাজের সহিত সুর মিলাইয়া বড় মিষ্ট, বড় করুণ-স্বরে গাহিল—

“তেরে লিয়ে মেরা দিল্
হ্যায় দেওয়ানী জান।”

সে গীতের তানে তানে কি হৃদয়স্পর্শী করুণ মূর্চ্ছনা! যেন কাহার, কোন্ জ্যোৎবাসিনীর প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া, সেই বিষাদপূর্ণ করুণ রাগিনী উত্থিত হইতেছে!

সুরথের গণ্ড বহিয়া জল পড়িতে লাগিল, সুরথ বলিল,—“সখিনা! এই ত এসেছি সখিনা! তোমারই আশায় এসেছি। তোমারই জন্য তোমারই মত মৃত্যুকে বরণ করিতে আসিয়াছি। এস সখিনা, যে দেশে তুমি আছ, এই নশ্বর পৃথিবী হইতে আমাকে সেই দেশে নিয়ে চলো।”

সহসা অন্ধকার ঘরে কোথা হইতে আলো আসিয়া ভরিয়া গেল। অদূরে-কাহার ভূষণ-সিঞ্জিত নূপুর-নিক্কণ শ্রুত হইল। সুরথ চাহিয়া দেখিল,—তাহার অনতিদূরে জরদারংয়ের পায়জামা ও বক্ষে বহুমূল্য সল্‌মা-চুমকির কাজ করা কাঁচুলি পরিহিতা, মাথায় একখানা হাল্‌কা আতরসিক্ত ফিরোজা রংয়ের মিহি ওড়না দেওয়া, সর্ব্বাঙ্গে মণি-মাণিক্য-মণ্ডিতা শাহজাদী

সখিনা, তাহার প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তম সখিনা, দাঁড়াইয়া আছে।

সুরথলাল বিস্ময়ে ও সুখাতিশয্যে কতকটা যেন হতচেতনের মত হইয়া গেল। সংজ্ঞালাভ করিয়া সুরথ আকুল নয়নে চাহিল, কিন্তু সখিনা তখন কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে!! অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে সুরথলাল বলিল—"সখিনা, কই তুই পাগলিনি! আমায় দেখা দে। এখনও প্রাণভরে একবার দেখিতে পাইনি—কোথায় লুকালি মায়াবিনি!

সুরথ আবার তেমনি সাজসজ্জাময়ী সখিনাকে দরজার নিকট দেখিতে পাইল।

সুরথলাল বলিল—"জীবনময়ী কাছে এস, চির-জীবনের অতৃপ্ত পিপাসা একবার মিটাই—এস, ভাল করে তোমায় দেখি!"

সখিনা বলিল—"কেমন করিয়া কাছে যাইব? আমি যে মৃত—জীবিতের কাছে যাইবার অধিকার হারাইয়াছি। মৃত, জীবিতকে স্পর্শ করিতে পারে না।"আমার হজরত! আমার স্বামী! তুমি যদি মরিতে পার,—তাহা হইলে আমার সহিত মিলিতে পারিবে। এস প্রিয়তম! এস মনোরম! এস জীবননাথ!! আমার নিকট এস!!!

সুরথলাল সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, উন্মত্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"সখিনা! কি করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব? কেমন করিয়া মরিব? যেথা তুমি আছ সখিনা—সেথাই আমার সুখ—ছার জীবনে প্রয়োজন নাই। বল সখিনা, কেমন করিয়া মরিব!"

সখিনার আজ কি দিন! জীবনে যে দিন আসে নাই, আজ মরণে সেই দিন আসিয়াছে। আজ সে তাহার এত দিনের আকাঙ্ক্ষিতের সহিত মিলিত হইবে! সখিনার শিশিরস্নাত বিকশিত পদ্মের মত ছলছল সুন্দর মুখখানিতে বড় মধুর একটী হাসি ফুটিল।

সখিনা বলিল—"এস চিরবাঞ্ছিত! আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস।"

সখিনা অন্দরমহলের ছোট দরজাভিমুখে চলিল। সুরথলালও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। উভয়ে ছোট দরজা দিয়া একেবারে কলনাদিনী প্রবাহিনীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সখিনা বলিল—"প্রিয়তম, এই নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়, তাহা হইলেই আমার সহিত মিলিতে পারিবে।"

সুরথলাল নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল, এক মুহূর্ত্তেই কোথায় তলাইয়া গেল—নদীবক্ষে যবনী প্রণয়িনীর জন্য সুরথলালের "প্রেমের-কবর" হইয়া গেল।

ইহার পর হইতে বাদশাহের প্রাসাদে আর কখনও রাত্রে সেইরূপ অশ্রু-আবেদন—সেইরূপ ব্যাকুল-নিবেদন, কেহ শুনিতে পায় নাই।

কুমারী প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী।

অবসান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

দুর্ব্বাসা। ধন্য তুমি অযোধ্যা নগরী
মরতের আনন্দ-মন্দির।

ধন্য ধন্য এ অযোধ্যাবাসী
ইন্দ্রিয় দমন, চিত্তের সংযম,
করি কত বিচিত্র সাধন,
তপ, জপ, জাগ, যজ্ঞ, সমাধি কঠোর
করি কত অনুষ্ঠান
যোগী, ঋষি, তপস্বি, দেবতা,
নাহি পায় দরশন যাঁর,
অনুদিন নয়ন সম্মুখে,
সেই নর-নারায়ণে
সদানন্দে নেহারে অযোধ্যাবাসী।
লভি অমরতা,
বৃথা গর্ব্ব করে দেবগণ,
পুণ্যবান্ কোন জন,
কেবা আছে এদের সমান?
অবিরাম রাম সঙ্গে করিছে বিহার।
হায় সে অলকানন্দা তীর সুশোভিনী,
অমরার বৃথা অহঙ্কার
কোন ছার এ অযোধ্যা পুরী কাছে।
আছে কিরে হেন শান্তি-নিকেতন আর?
মনে হ'ত মর্ত্তের বাতাস,
সদা বিষ—বিষময়
কিন্তু এ অযোধ্যা মাঝে স্নিগ্ধ পরিমলে
বহিছে যে বসন্ত-হিল্লোল,
অবগাহী সরযুর নীরে
স্নিগ্ধ তনু পরশনে তার।
নারায়ণ যোগ্য বটে এ মোহন পুরী।
কি যে করি বুঝিতে না পারি
ছল ধরি কেমনে পশিব পুরমাঝে?
কিন্তু বৃথা চিন্তা এবে মোর,
অন্তর্য্যামী সে ভূভারহারী
জানিছেন চিন্তা মম অন্তরে অন্তরে
করিবেন আপনি তাহার পথ
মনোরথ অবশ্য পুরিবে মোর;
কিন্তু হায় ব্রহ্মবংশে লভিয়া জনম
দুর্ব্বাসা ক্রোধের দাস সদা?
তপস্যার ফলে জন্মি ঋষিকুলে
রিপু জয় না হইল যদি,
কি লাগি মস্তকে তবে দীর্ঘ জটাভার,
ঘোর তপস্যার এই কিরে পরিণাম?
অথবা আক্ষেপ করি বৃথা
জীব মাত্রে অদৃষ্টের দাস
অতিক্রমী অদৃষ্টেরে কি সাধ্য আমার।

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। (স্বগতঃ) গতিক ভাল নয়, সন্ন্যাসীর মা'র ধরেছে। কাল দেখলাম একটী, আজ দেখছি একটী, মতলব বড় ভাল হচ্ছে না। কা'লকের সেটাত এসেই অন্য কথা বার্ত্তা নেই, মহারাজকে একটা বিষম সত্যে আবদ্ধ ক'রলে। বোধ হচ্ছে সব এক দলের লোক, ইনিও বোধ হয় রাজদর্শনে যাবেন। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করে দেখিনা;—(প্রকাশ্যে) জটাধারী ঠাকুর প্রণাম, গমন হবে কোথায়?

দুর্ব্বাসা। যাব রাজ-দরশন হেতু,
কেবা তুমি ব্রাহ্মণ কুমার?

বিদূষক। ঠাকুর! সেই ভাবনাইত ভাবছি, ঠিক করতে পারছি না—আমি কে? আমি যখন জেগে থাকি, তখন আমিও চলাফেরা করি, আমার মনও চলাফেরা করে, তখন্ আমি যে আমি, রাত্রিতে আবার সে আমি, আমি নাই। ব্রাহ্মণীর নাসিকাধ্বনি শুনিতে

শুনিতে ঘুমিয়ে পড়ে যখন স্বপন দেখ্‌তে আরম্ভ করি, তখন আমার দেহটী অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। মন কিন্তু চলা ফেরা ক'রে, কখন উড়ি, কখন পড়ি, কখনো বা সিংহের মুখে লাগাম দিয়ে তার পিঠের উপর চড়ি। কখন বা স্বশরীরে স্বর্গে যাই। যখন আমি সজীব, তখন ব্রাহ্মণী ডাকেন প্রাণনাথ, ছেলে পিলে হয় নাই, হ'লে ডাকত বাবা; মহারাজ বলেন সখা লোকে ডাকে বিদূষক। ঠিক করতে পারিনে, আমি এর কোন্‌টী। এক কথায়ও ঠিক্ পরিচয় হয় না। তবে বলুন ঠাকুর, আমি কি করে বলি—আমি কে? আপনি কি বোলতে পারেন—আমি কে?

দুর্ব্বাসা। (স্বগতঃ) কূট প্রশ্ন করেছে ব্রাহ্মণ।

(প্রকাশ্যে) হে ব্রাহ্মণ বটু

তপস্বী নেহারী-কর কিবা পরিহাস।

বিদূষক। সত্য কথা বল্‌লেই যদি পরিহাস হয়, তবে ঠাকুর প্রাতঃপ্রণাম। মশায়রা ত যোগবলে বহুরূপীর বেশ ধর্‌তে পারেন, মানুষের মনের ভিতরও ত ঢুকতে পারেন; তবে আর এ গরীব ব্রাহ্মণের খট্‌কাটী ভেঙ্গে দিতে পারেন না? আজ ছাড়ব না ঠাকুর, বলে দিতে হবে, আমি কে।

দুর্ব্বাসা। কেবা তুমি কেমনে বলিব আমি,

হবে কোন অদৃষ্ট প্রেরিত

নররূপী জীব এক।

বিদূষক। তবেইত ঠাকুর, আরও গোঁল বাধালে, বুঝি—আমার এ দেহটি আমি, না এই স্থূল উদরের ভিতর, যেখানে রাজবাড়ীর মণ্ডার খলি ধরে ধরে টাঙ্গান, তার ভিতর আমি। না এই দুয়ের মিশ্রণে আমি। ইহার কোন্‌টী আমি?

দুর্ব্বাসা। উপদেশ লইতে কি সাধ, কিম্বা

বাদ করিতে বাসনা।

বিদূষক। যেটী মনে করেন, প্রথম ধরে নিন্ যেন উপদেশই নিচ্ছি, মনে করুন,—আমি যেন একটা ময়রার দোকানে গিয়েছি, বাড়ীর ভিতর ময়রার ছেলেটা কেঁদে উঠেছে, ময়রা ছুটে বাড়ীর ভিতরে গেল, অমনি নররূপী জীব আমি, তার রসগোল্লার থালাটী সরিয়ে নিয়ে গণ্ডায় গণ্ডায় গিলিতচর্ব্বণ আরম্ভ করেছি, এমন সময় দুর্বৃত্ত ময়রা বেটা এসে, দুই চোক বুজে পৃষ্টে লগুড়াঘাত। তখন আমি কি বল্‌ব—আমাকে মারলে না, নররূপী জীবকে মারলে।

দুর্ব্বাসা। হে ব্রাহ্মণ! প্রাণ তব সম্বন্ধ জড়িত,

ভূতাত্মক দেহ যাহা দেখিছ সম্মুখে,

ইহা শুধু মায়ার স্ফুরণ।

দেহ আর দেহী দু'টী ভিন্ন অবিধান;

জড়দেহে পরমাণু উপাদান হেতু;

নাহি তাহে চৈতন্য বিকাশ।

জড় আর চৈতন্য মিলনে,

হয় বিশ্বে জীবের উদ্ভব।

বিদূষক। কথাটী শুনলাম বটে কিন্তু গোড়ায়, যা বুঝেছিলাম, এখনও তাই বুঝলাম। এখন ঐ ময়রাবেটা যে হাতের সুখ ক'রে নিলে, যদি আমাকে রাজদ্বারে দাঁড়াতে হয়, তা হ'লে বলব কি—ময়রাবেটা আমাকে মেরেছে, না ময়রার চৈতন্য আমার চৈতন্যকে মেরেছে। বলি মারটা হইল কার উপর? দেহের উপর না, চৈতন্যের উপর?

দুর্ব্বাসা। স্থূলবুদ্ধি তুমি মতিহীন,
এই ক্ষুদ্র সামান্য বিষয়,
অধিগম্য না হয় তোমার ?
দেহে ক্রীড়া অনুভূতি চৈতন্যে বিকাশ
পৃষ্ঠে তব লগুড়াঘাত
করিল যা মোদক নন্দন,
জড় দেহে ক্রিয়া মাত্র তা'
জীব-আত্মায় হল কিন্তু অনুভব তার
জ্ঞান ইচ্ছা চৈতন্য বিহনে
জড় দেহে জড় মাত্র সার।

বিদূষক। তবে কি বুঝিব—আপনি হইলেন এক চৈতন্য আর আমি হলাম এক চৈতন্য ? আপনার চৈতন্য আমার চৈতন্যকে বল্‌লে, তোর নাম থাক্‌লো হাড়গিল্লে, কিষ্কিন্ধ্যায় সেই মুখপোড়া চৈতন্য, তাকে দেখেছেন কি ? সে যদি এসে আমায় ডাকে হাড়গিল্লে. তখন আমার উত্তর দেওয়া উচিত কি না—বলুন দেখি ?

দুর্ব্বাসা। দুরাচার! পরিহাস উদ্দেশ্য তোমার,
দূর হও সম্মুখ হইতে, নহে
মুহূর্ত্তেকে দগ্ধ হবে অভিশাপে।

বিদূষক। তা হ'লে একটা কাজ করে যান, দোহাই ঠাকুর, যদি দয়া করে একটী অভিশাপ দেন, তা হ'লে চিরকাল আপনার বাহন হ'য়ে থাকি।

দুর্ব্বাসা। অভিশাপে নাহি তব ভয়!
ইচ্ছায় মাগিছ ব্রহ্মশাপ!

বিদূষক। ঠাকুর! সাধে কি আর অভিশাপ মাগছি, আজকাল এ অযোধ্যার আবহাওয়া বিগড়েছে। কেউ কারও দিকে আর চাচ্ছে না। গাই বাছুরকে আর দুধ দিচ্ছে না। মা আর ছেলে কোলে নিচ্ছে না। সেদিন বেণে-দের বউটী থাম্‌কা তার ছেলেটীকে ঠেঙাতে আরম্ভ করেছে। বণিক ভায়ার অপরাধ—সে তাই দেখতে পেয়ে, নরম সুরেই বল্লে—তোর কি বাবার ছেলে পেয়েছিস্ তাই ঠেঙাচ্ছিস্ ? অমনি ছেলে ছেড়ে দিয়ে,—"নারে পোড়ারমুখো, আমার বাবার ছেলে নয়, তোর বাবার ছেলে ?" বলে ঝাঁটা ঝাপ্‌টা করলে, বেচারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তাই বল্‌ছি—গতিক ভাল নয়, ভালয় ভালয় সরতে পারলেই ভাল। থাকৃত যদি গৃহে চৈতন্য-রূপিনী গৃহিণী-ব্রাহ্মণী, আর তার সেই সম্মার্জ্জনী, আর রোজ রোজ আমার মতন হুহুঙ্কারের সঙ্গে যদি কোমলতার স্বাদ পেতেন, তাহা হ'লে অভিশাপ মাগতে হ'ত কি না—বুঝতে পারতেন।

দুর্ব্বাসা। (স্বগতঃ) এ ব্রাহ্মণ বাতুল নিশ্চয়,
বৃথা ক্রোধ নির্জ্জিব অসারে।
চাহি পরিচয়, দিতে করে ভয়,
কৌশলে ভুলাতে চাহে।
উন্মাদ কি হেন প্রশ্ন পারে, করিবারে!
যেই হ'ক কাজ নাই বৃথা বিতণ্ডায়।
(প্রকাশ্যে) হে ব্রাহ্মণ!
যেবা হও তুমি, কাজ নাই পরিচয়ে,
কহ মোরে,
কোন্‌পথে যাব রাজপুরে ?

বিদূষক। রাজপুরে যাবেন ? রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বল্লেন নয় ?

দুর্ব্বাসা। ইচ্ছা বটে তাই।

বিদূষক। (স্বগতঃ) ফন্দি মন্দ নয়, মহারাজ যে আজ সত্যে বন্দি, সে সন্ধান দেওয়া হবে না। মহারাজ সেই সন্ন্যাসীকে নিয়ে এতক্ষণ নির্জ্জন ঘরে ঢুকেছেন। এখন যদি এই বুড়ো সন্ন্যাসী বরাবর সেখানে গিয়ে পড়ে, তাহ'লে অমনি সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জন! যোগ-যাগে একটা সন্ন্যাসী-বর্জ্জন করাতে পারলেই আর একজনও এ মুখো হবে না। সব সন্ন্যাসীগুলোই ভোজন-কণ্টক। মুনি-ঋষি ও সন্ন্যাসী এলে সেদিন ত আর মহারাজার কোন দিকে মন থাকে না; তাকে নিয়েই ব্যস্ত! আপদ যত সরে, ততই ভাল। (প্রকাশ্যে) ঠাকুর! দর্শনে যাবেন, এ পরামর্শ ভালই করেছেন। আমি পথ বলে দিচ্ছি শুনুন, এখন মহারাজ সেইখানে আছেন। বরাবর উত্তর মুখে গিয়ে দেউড়ী পার হবেন, তার পর এক মহল, তার পর এক মহল, তার পর এক মহল; সেই বাড়ীর ভিতর গিয়ে, অশোক বনের নাম শুনেছেন কি? লঙ্কা হতে দেখে এসে মহারাজ এখানে যা লাগিয়েছেন, সেই, সেই অশোক গাছের বনওয়ালা বাড়ীটীর ভিতরে ঢুকবেন, কেউ বারণ করলে শুনবেন না। কিন্তু সাবধান, সেখানে আবার চির-বসন্ত বিরাজ করে।

দুর্ব্বাসা। সুখধাম বসন্তের লীলা স্থানে—
সাবধান কি লাগি হইব?

বিদূষক। আপনারা মুনিঋষি মানুষ, আতপ খান, ধূলায় শোন, গড়ুর গড়ুর বলেন, আপনাদের অঙ্গসেবা করতে হয়। ভ্রমর কোকিলের ডাকত কাণে সয় না। সেখানে ঐগুলোর উৎপাত বড় বেশী। কি জানি, প্রাণটা যদি আই-ঢাই করে উঠে। মুনির মনও টলে—

দুর্ব্বাসা। অধঃপাতে যাও তুমি,
করিতে নাহিক তোর বদন দর্শন।
নরাকারে পশু যদি না হইতিস্ তুই
প্রতিফল দিতাম উচিত।

বিদূষক। (স্বগতঃ) ইস্ রাগের জলন্ত-মূর্ত্তি। এঁরাই আবার সব ভাল বলে রাজসভায় উচ্চাসন পান। বলিহারী বাবা শাস্ত্রকে। যত শাস্ত্রকারই ত মাথা খেয়েছে। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করলাম, এখন অনুগ্রহ করে বরাবর সেই অশোক-কাননের পাশে যে একটা বড় দালান দেখবেন, সেইটীর ভিতর গিয়ে রাজ-দর্শন ক'রবেন! আমিও পিছু পিছু গিয়ে খবর নিচ্ছি।

দুর্ব্বাসা। নাহি চাহি সাহায্য তোর,
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক তুই—
রাজসখা বলি পরিচয় দিয়াছ আমারে
তোমা হেন পাষণ্ড বর্ব্বরে,
মহারাজ বলিবেন সখা—
বিশ্বাস না হয় কভু।
রাজ-দরশনে জঞ্জাল তোমারে ভাবি
একাকী যাইব আমি। (প্রস্থান)

বিদূষক। যাক্ একটা আপদ বিদায় হ'ল। এখন একবার সরোবর-তীরে যাই। মতলবটা হাসিল করে আসি। দাসী মাগী হয়ত এতক্ষণ এসেছে। (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

গীতা-তত্ত্ব।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন যে ঃ—

শাস্ত্র মাত্রেই অনুবন্ধ চতুষ্টয়াপেক্ষ। যথা(১) অধিকারী, (২) বিষয়, (৩) সম্বন্ধ এবং (৪) প্রয়োজন। ইহারাই অনুবন্ধ নামে খ্যাত।

১। অধিকারী। অর্থাৎ পাঠের বা শ্রবণের অধিকারী কীদৃশ হওয়া উচিত? শ্রদ্ধালু, সৎ-ধর্ম্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, গীতা-শাস্ত্রের অধিকারী। স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ ভেদে, অধিকারী ত্রিবিধ। যাহারা স্বর্গলোক দর্শনের আশায় শ্রীভগবানের অর্চনা করেন, তাঁহারা পরিনিষ্ঠিত; ইহারা আশ্রমী। আর যাঁহারা সত্য, জপ ও তপাদি দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তে একমাত্র শ্রীহরির চরণ নিরত হয়েন, তাঁহারা নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ অধিকারীরা নিরাশ্রম। এই ত্রিবিধ ব্যক্তিগণই গীতাশাস্ত্র পাঠের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অধিকারী। অধিকারী নির্ণয়ই শাস্ত্রের প্রথম অনুবন্ধ।

২। বিষয়। অর্থাৎ শাস্ত্রে কি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। গীতা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মুখ নিঃসৃত; ইহা শাস্ত্রের গম্ভীর ও প্রসন্ন-বাক্য। গীতা-শাস্ত্রখানিকে সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাক্য বলিয়া জানিবে। গীতাশাস্ত্র অতীন্দ্রিয়ার্থ, অধ্যাত্মবিজ্ঞান। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বিষয়ক গীতাশাস্ত্রের উপদেশ সকল, সকলের পক্ষে অধিগম্য নহে। চিত্ত-বিশুদ্ধ ও শ্রদ্ধাযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গীতা-শাস্ত্র পাঠে সাধারণের ফল নাই। বিষয় নির্ণয়ই শাস্ত্রের দ্বিতীয় অনুবন্ধ।

৩। সম্বন্ধ। অর্থাৎ গ্রন্থের বাচ্য-বাচকতা বা প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকতা লক্ষণই বা কি? বাচ্য-বাচকতাই সম্বন্ধ। শ্রীকৃষ্ণই এই গ্রন্থের বাচ্য বা প্রতিপাদ্য। এই গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণের বাচক বা প্রতিপাদক। শ্রীকৃষ্ণই এই গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধ নির্ণয়ই শাস্ত্রের তৃতীয় অনুবন্ধ।

৪। প্রয়োজন। অর্থাৎ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন কি? গীতাশাস্ত্রীয় বিষয় অবগত হইলেই বা কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? উত্তর এই যে—"অশেষ ক্লেশ নিবৃত্তি পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারই এই গ্রন্থের প্রয়োজন।"

সংক্ষেপেত গীতার অনুবন্ধ চতুষ্টয় এই। এই সকল অনুবন্ধ শাস্ত্রারম্ভের ও শাস্ত্রালোচনার প্রবৃত্তির হেতুস্বরূপ; শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাও এই অনুবন্ধ চতুষ্টয়াপেক্ষ। মায়াবাদী আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্কর উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহা গ্রন্থ তাৎপর্য্যের প্রতিকূল। শ্রীধরস্বামী, শ্রীমৎ শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইয়াও অনেক স্থলেই তাঁহার মতানুসরণ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, শ্রীধরস্বামী দ্বৈতবাদী নহেন। শঙ্কর আচার্য্যের মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদ প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীধর ভয় পাইতেন; তিনি পারতপক্ষে সে পথে বিচরণ করেন নাই। তিনি শঙ্করের গীতাভাষ্য ও আনন্দ-গিরির টীকা আলোচনা করিয়া তাঁহার সুবোধিনী টীকা লিখিয়াছেন। তিনি মায়াবাদ সম্বন্ধে সতর্কভাবে চলিতেন। এই জন্য ভাষ্য-

কারের সহিত অনেক স্থলে তাঁহার মতবিরোধ ঘটিয়াছে।

উপনিষদ্‌সমূহ গাভী-স্বরূপ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা; গীতা অমৃতোপম দুগ্ধ; বৎস-স্বরূপ অর্জ্জুন ও জ্ঞানী ভক্তগণ তাহা পান করিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যার উপনিষৎস্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ শাস্ত্র—যোগশাস্ত্র।

মহাভারতান্তর্গত ভীষ্ম-পর্ব্বের মধ্যে ভগবৎ-গীতা প্রকরণ,—সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ বলিয়া উক্ত। ঐ ভগবদ্গীতা প্রকরণের শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়কেই সাধারণে ভগবদ্গীতা বলিয়া সাদরে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ইহা কৃষ্ণা-র্জ্জুন সংবাদ। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এই যে—"প্রবৃত্তিপক্ষীয় দশ ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের দশবিধ প্রবৃত্তি ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যো-ধনাদি একশত তনয়, সাধককে সাধন-মার্গ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য, নিবৃত্তিপক্ষীয় পঞ্চ-পাণ্ডবের অর্থাৎ পঞ্চ-তত্ত্বের বিরুদ্ধে দেহরূপ রণক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্রে) দণ্ডায়মান হইলে, কুরুক্ষেত্র-সমর উপলক্ষে ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া যে উপদেশ দেন, তাহাই ভগবদ্গীতা বাচ্য।

বেদব্যাস প্রণীত মহাভারত গ্রন্থ অতীব সুবিস্তীর্ণ। সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই ইহাতে উপদেশমালা সন্নিহিত।* অথচ এই গ্রন্থ বিস্তীর্ণ বলিয়া সাধারণের পক্ষে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শেষ করা সহজ নহে। এজন্য এই সংক্ষিপ্ত গীতাতত্ত্ব প্রস্তাবে অবতরণিকা-স্বরূপ লেখা যাইতেছে যে,—মহাভারতে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সাংসারিক যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়েরই সার উপদেশ আছে। জ্ঞান-ধর্ম্মলিপ্সু পাঠকের যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ে তত আসক্তি নাই বলিয়া, যুদ্ধকৌশলাদি বিষয়গুলি এখানে পরিত্যক্ত হইল।

গল্পচ্ছলে উপদেশ দানই ভারতের উদ্দেশ্য। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ইতিহাস অবলম্বনে মহা-ভারত রচিত। ব্যাসদেব নানাশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া ব্রহ্মার আদেশে সিদ্ধিদাতা গণেশের দ্বারা এই গ্রন্থ লিখিয়া লয়েন। উভ-য়েরই সর্ত্ত থাকে। গণেশের সর্ত্ত এই যে,—"তিনি অবিশ্রান্ত লিখিয়া যাইবেন, লেখনী বিশ্রাম পাইলেই লেখা বন্ধ হইবে।" ব্যাসের সর্ত্ত এই যে,—"কোন শ্লোকের কূটার্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, গণেশ লিখিতে পারিবেন না।"

সংসারে ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের বিরুদ্ধভাবকে যুদ্ধ বলে। ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানান্ধ জীব। এই জীব-দেহরূপ রাজ্যে কি উপায়ে অধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকে বিনাশে উদ্যত হয়, এবং জীবের প্রতি ঈশ্বরীয় করুণা পতিত হইয়া কি উপায়ে অবিদ্যা-রূপী অধর্ম্ম-জ্যোতিকে নাশ করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া সংসারের কল্যাণ করেন, তাহাই অমৃত-ময় মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির অর্থে যুদ্ধেতেও যিনি স্থিরভাব অবলম্বন করিতে পারেন। দুর্য্যোধন, যাহাকে যুদ্ধে জয় করা সুকঠিন। শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা, যিনি চৈতন্য-স্বরূপে জীবে অবস্থিত। যাদবেরা সাত্ত্বিক, কৌরবেরা রাজসিক, আর যদুপতি কৃষ্ণ। ধর্ম্ম-পরীক্ষার্থ সংসার ক্ষেত্রকেই কুরুক্ষেত্র কহে।

* যুবা, বৃদ্ধ এমন কি, সুকুমারমতি বালক-বালিকা-গণের পক্ষেও এই গ্রন্থ সুখপাঠ্য।

অধর্ম্মের প্রাবল্য হইলে, ভগবান আপনিই আত্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে নিস্তার করেন। সেই নিয়মে সংসার মধ্যে যখন ভীষণ অধর্ম্ম প্রচার হইয়া উঠিল, তখন বিজ্ঞানরূপী অর্জ্জুনের দ্বারা পরমাত্মবিম্ব-স্বরূপ কৃষ্ণ আকর্ষিত হইয়া রিপুরূপী বীরগণের সহিত সমর আরম্ভ হইল। সেই সময় ভগবানের অস্তিত্বরূপী অর্জ্জুনের বিজ্ঞানাস্ত্র বৈরীগণের হৃদয়ে বিদ্ধ হওয়াতে, তাহাদের মানসিক কলুষিতভাব দূর হওয়াতে পরমাত্মাকে দেখিয়া, উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার সাযুজ্যাদি লাভ করিতে পারিল। মনোগত সাত্ত্বিক-বৃত্তিসমূহই দেবতা; হৃদয়-রাজ্যই স্বর্গ। রিপু প্রভৃতি স্বভাব-শক্তিই দৈত্যস্বরূপ। নির্ব্বাণ-জ্ঞানই বৃহস্পতি, আর কর্ম্মজ্ঞানই শুক্রাচার্য্য। মনোবৃত্তিসমূহ মনের সহিত যখনই কামনাসক্ত হয়, এবং বিষয়ে মত্ত হইয়া থাকে, তখনই বিজ্ঞান বুদ্ধিরূপী বৃহস্পতির তিরোভাব হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম-বুদ্ধির আবিষ্কার হয়; অর্থাৎ দেব-দৈত্যের যুদ্ধে, মন ও তাহার বৃত্তি সমূহ অহঙ্কারে দেবগুরু বৃহস্পতিকে অবমাননা করায়, গুরু তাহাদের ত্যাগ করেন; এবং শত্রুগুরু শুক্রাচার্য্যের উপদেশে দৈত্যেরা দেবতাদের পরাজয় করে। ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মন, সাধন-সময়ে বৃত্রাসুরের ন্যায় অজ্ঞান বা তমোগুণকে জয় করেন। সঞ্জয়—ইনি দিব্য-দৃষ্টি। ভীষ্মবধের পর, সঞ্জয় (দিব্যদৃষ্টি) ধৃত-রাষ্ট্রকে (মনকে) সংবাদ দেন; অর্থাৎ মনের দিব্যদৃষ্টি হয়। ভগবৎ-উপাসনায় যখন ভীষ্ম বধ হয় (ভয় দূর হয়) তখন দিব্যজ্ঞানে জানা যায় যে. দুর্ম্মতি প্রভৃতি মনের দোষেই হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক,রাজস ও তামস ইহারা প্রত্যেকেই এক মায়ার সন্তান; মায়া হইতে উৎপন্ন। সাত্ত্বিক—পাণ্ডু। গুণমর্য্যাদা-পূর্ণ তামস,—ধৃতরাষ্ট্র; তামস বলিয়া দৃষ্টিশূন্য; হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। রাজস—বিদুর, উভয় সত্ত্ব ও তামসের হিতানুসারী। বিদুর হইতেছেন—ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি। দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ—বিবেকে বুদ্ধি কৃতনিশ্চয় হইয়া, অধর্ম্ম আপনি গতিহীন হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ঐ গতিহীনতা উরু-ভঙ্গের রূপক। গদা—বিবেকাস্ত্র, যদ্দ্বারা মোহ নাশ হয়। গাণ্ডীব—বিজ্ঞানের শক্তি, যদ্দ্বারা কালের জয় করিয়া ঈশ্বর-পরায়ণ হওয়া যায়।

আর্য্য মিশন হইতে প্রকাশিত গীত দ্বারা নিম্নলিখিত সমস্ত গীতাধ্যায় সম্যকৃরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা :—

গীত।

(বাউলের সুর)

মানব দেহের মাঝে আজব কারখানা।
দেহ ধর্ম্মক্ষেত্র, দেহ কুরুক্ষেত্র, এ বিচিত্র, রহস্য
কেউ বোঝে না।
দেহ কুরুক্ষেত্র মাঝারে, পঞ্চ চক্র ভিতরে, পঞ্চ
পাণ্ডব বিরাজ করেন, তত্ত্বের আকারে;
শোভে কূটস্থে চৈতন্যহরি, আজ্ঞাচক্রে দেখ না।
দেহরাজ্যে রাজা মন, ইনি ধৃতরাষ্ট্র হন, সাক্ষাৎ
দেখিতে ইহার নাহিক নয়ন;
দেখ রাজপুত্র ইন্দ্রিয়গণ কারও কথা শোনেনা।
দেহে এই দুটী দলে, সদা দুই দিকে চলে,
পরস্পর বিরোধী হয়ে যুদ্ধ ঘটালে;
এরূপ নিয়ত হতেছে সমর, গুরু কৃপায় যায়
জানা।

পাগল আপন ভাবে কয়, কথা গুপ্ত অতিশয়,
ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হলে, রাজশ্রী স্থিরত্বলাভ হয়;
সৎগুরুর কাছে জেনে শুনে, ব্যাখ্যার কিরূপ
বোঝ না ॥

গীতা, জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। কাব্যাংশেও গীতা অতুলনীয়। ইহার অভিনেতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভারতের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, অর্জ্জুন। স্থান,—ধর্ম্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র। সময়,—মহাভারত যুদ্ধের প্রারম্ভ। দর্শক,—ভারতের সশস্ত্র যুদ্ধার্থী নৃপতিমণ্ডল। বিষয়,—কর্ত্তব্যপরায়ণ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্যকর্ম্মে রত করা। ইহা গীতার গৌণ উদ্দেশ্য। অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু মন্থন করিয়া, মানবজাতির জন্য পরম ধর্ম্মামৃত বা চরম মনুষ্যত্ব উদ্ভাবন করাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য। গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম,—নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই নিষ্কামত্ব বা কামনার নির্ব্বাণই বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআনন্দগোপাল সেন বি-এ।

সমালোচনা।

মণিরত্নমালা ও শিবানন্দলহরী।

শ্রীবিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা—বেদান্তভূষণ সম্পাদিত। কালীঘাটে ৺নকুলেশ্বরতলায় যে বেদান্তভূষণ ব্রহ্মচারী ক্ষুদ্র আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিয়ত জ্ঞানপিপাসুদিগের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছেন, ভক্তদিগকে নানা পুরাণাদির ভক্তিকাহিনী শুনাইয়া বিমোহিত, পুলকিত ও আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতেছেন, তিনি কালীঘাটে শিবভক্তি-প্রদায়িনী-সভায় আচার্য্য ও সম্পাদক-স্বরূপ উক্ত সভার ৩০শ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের অমূল্য মণিরত্নমালা ও শিবানন্দলহরীর মূল ও পদ্যানুবাদ সকলকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। তিনি ঠিকই করিয়াছেন; যাঁহার প্রত্যেক কথা অমূল্য, তাহার কি মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে? কাচ দিয়া কি কাঞ্চন ক্রয় করা যায়? বিশেষতঃ পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জ্ঞান বিতরণ হইতেছে। ভারতের বড় দুর্ভাগ্য, বড়ই দুর্দ্দিন, তাই সে চক্র পরিবর্ত্তিত; এখন মূল্য দিয়া বিদ্যা ক্রয় করিতে হয়; সে মূল্যও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, অনেকের পক্ষে বিদ্যালাভও দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছে।

বেদান্তভূষণ মহাশয় সমাজকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন,—উত্তম, মধ্যম ও অধম। "যাঁহারা চিত্ত-নৈর্ম্মল্য লাভ করিয়া সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া, ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, স্ব-পরভেদ রহিত ও শরীরেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা উত্তম শ্রেণীর অন্তর্গত; যথা,—জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, শুকদেব প্রভৃতি।" তিনি লিখিয়াছেন,—"এ পুস্তক তাঁহাদের মত মুক্তপুরুষদের কোন কাজে লাগিবে না।" তারপর তিনি লিখিয়াছেন,—"অধম শ্রেণী—যাহারা কিছুই বুঝে না, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিবর্জ্জিত, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদিরূপ গ্রাম্য-ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া যাহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করে; তাহারা কিছুই বুঝে না, তাহাদিগকে বুঝাইতে

যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।" অবশিষ্ট মধ্যম শ্রেণীর মানব-সমূহের জন্যই এই গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। যাহাদিগকে মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম, কীর্ত্তি-অপযশঃ ইত্যাদি দ্বন্দ্বপরম্পরা অবিরাম ক্লেশ প্রদান করিতেছে; যাহাদের জিগীষা, বিদ্বেষবুদ্ধি, পরশ্রীকাতরতা বলবতী, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বোধ আছে; জ্ঞান-বৈরাগ্য, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি আছে সবই, কিন্তু বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান্‌কেও ভ্রষ্ট করে। প্রত্যুত যাঁহারা শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সংসারের অসারতা বুঝিয়াছেন এবং সার সংগ্রহাভিলাষী হইয়া পশুরাজ যেরূপ পিঞ্জর ভেদ করিয়া বনে পলায়ন করে, সেইরূপ অনন্তকাল সঞ্চিত সুদৃঢ় বাসনা-জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া অর্থাৎ হর্ষ, শোক, ভয় নির্ম্মুক্ত হইয়া, ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তি-রূপ অত্যন্ত পুরুষার্থ প্রাপ্তি বাসনায় সদ্‌গুরুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, গুরুবাক্যরূপ কলস নিঃসৃত উপদেশ-সুধাধারা প্লাবিত হইয়া যাঁহারা দুর্ব্বার-সংসার-দাবানলের ভীষণ জ্বালা জুড়াইতে চাহেন, পূজ্যপাদ ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগের জন্যই এই অমূল্য উপদেশরত্নের মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন।

"মণিরত্নমালা" ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়া থাকিবে কিন্তু "শিবানন্দলহরীর" অনুবাদ, বোধ হয়, এই প্রথম। "মণিরত্নমালা" অনুদিত হইলেও তাহার অমূল্য উপদেশ চির-নূতন; যতবার পড়, ততবার যেন প্রথম পড়িতেছি বলিয়া তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ হয়। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও ভাগবত প্রভৃতি যেমন অসংখ্যবার পাঠ করিলেও কখন বিরক্তি জনক হয় না, মনে হয়, যে নূতন জ্ঞানলাভ করিতেছি; প্রতিবারেই যেন হৃদয়ে সুধারাশি ঢালিয়া দেয়। "মণিরত্নমালার" উপদেশ নিচয়ও সেইরূপ। ইহার প্রত্যেক শ্লোক ও তদনুবাদ উদ্ধৃত করিলেও দোষের হইত না কিন্তু তাহার স্থানাভাব। আমরা নিম্নে কয়েকটী শ্লোকের মাত্র অনুবাদ পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।

"কে দরিদ্র? সুবিশাল আশা আছে যার।
ধনী কে? সদাই চিত্ত সন্তুষ্ট যাহার॥
কোন্ ব্যক্তি জীবন্মৃত? উৎসাহী যে নয়।
অমৃত কি? সুখদাত্রী নিরাশা নিশ্চয়॥"

"সংসারে বন্ধনপাশ ধরে কিবা নাম?
জানিবে মমতা আর ঘোর অভিমান॥
সুরা সম মোহ কিসে? রমণী নিচয়ে।
কে মহান্ধ? কামাতুর দেখ বিচারিয়ে॥
মৃত্যু কিবা মহাশয়? মৃত্যু যশঃক্ষয়।
আশীর্ব্বাদ করি তোমা স্পর্শ নাহি হয়॥

* * * *

"কে সাধু? বিষয়ে যিনি বিতরাগ হন।
মোহশূন্য, শিবতত্ত্বনিষ্ঠ অনুক্ষণ॥" ৯
"বীর হ'তে মহাবীর হয় কোন্ জন?
স্মর-শরে ব্যথিত যে না হয় কখন।" ১৩

* * * *

"একমাত্র-তত্ত্ব কিবা? অদ্বিতীয় শিব,
কি উত্তম? সচ্চরিত্র, লভি সুখী জীব।
কোন্ সুখ ত্যজ্য সদা? নারীসুখজাত,
কোন্ দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? অভয় সতত॥" ২

পাঠক পাঠিকাগণ, বিশেষ চিন্তা করি প্রত্যেক শ্লোকগুলি ও তদনুবাদ পাঠ করি

বুঝিতে পারিবেন,—"মণিরত্নমালা" মধ্যম শ্রেণীর লোকের সম্পূর্ণ উপযোগী, বাস্তবিক মধ্যম শ্রেণীর জন্যই গ্রথিত। যাহাদের জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি আছে, অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রবল; যতদিন আশা হৃদয়ে পোষণ করিবে, ততদিন রিপুর দাসানুদাস থাকিতে হইবে; ততদিন তোমাপেক্ষা দরিদ্র আর কেহ নাই। যেদিন তোমার আশা পূর্ণ হইবে, কল্প আশা মিটিয়া শান্তি পাইবে; অথবা আশা ত কখন মিটে না; যে দিন তুমি আর আশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে না, আশার সঙ্গ পরিহার করিয়া চিত্তে সন্তোষলাভ করিবে, তখন তোমার চিত্ত প্রশান্ত হইবে; সেই দিন হইতে তুমি ধনীশ্রেষ্ঠ হইবে, অতুল সম্পদের অধিকারী হইবে।

তারপর দেখুন, এ সংসার প্রধানতঃ মধ্যম-শ্রেণীর জন্য। কিন্তু সংসার ত্রিবিধ দুঃখদাবা-নলে পরিপূর্ণ। অনেকে সংসারের এই দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বজ্রগম্ভীর-স্বরে উপদেশ দিলেন,—"উৎসাহী যে নয়, সে জীবন্মৃত। যতই শোকতাপের প্রবল ঝটিকায় তুমি বিধ্বস্ত হও না কেন, কর্ম্ম করিয়া যাও, কর্ত্তব্যে যেন ত্রুটী না হয়, কর্ত্তব্যে আদৌ অব-হেলা করিও না। স্থির জানিও, জগতের শোক-তাপ-দুঃখ জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলে ঘটি-তেছে; সে সব অনিবার্য্য, সে সব ঘটিতে দাও, তোমার কাজ তুমি করিয়া যাও। এই মহা তত্ত্ব নিয়ত স্মরণ রাখিবে, কাজের মত কাজ করিতে হইবে; নিয়ত কর্ম্ম করিবে বটে, কিন্তু যে সব কর্ম্মফলে এ জীবনে এত শোক, তাপ, দুঃখ ভোগ করিতেছ, সেরূপ কর্ম্ম আর করিও না।"

তারপর, মহান্, উদার কথা,—"সুখদাত্রী নিরাশাই অমৃত।" এ নিরাশা হতাশা নহে, আশার পরিহার, বাসনার হাত হইতে মুক্তি। যাহার কোন বাসনা নাই, সে ত অমৃতলাভ করিবে, সে অমর, সে মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছে।

অন্যান্য উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা স্থানাভাবে করা হইল না। এইবার "শিবানন্দলহরীর" দুইচারিটী শ্লোক পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

"নগরের মাঝে চিত্র সম সাজে
সবর্ণ ভূষণে হয়ে সুশোভিত।
নাগর নাগরী নাম রূপ ধরি
মনোহর বেশে সদা বিরাজিত।
সাক্ষী দ্রষ্টা মাত্র আপনি চিন্মাত্র,
ভাবিয়া, খেলিয়া তাদের সনে।
গুরু উপদেশে কভু না প্রবেশে
মোহের তিমির মুনির মনে।" ১
"কভু কুতূহলে বালকের দলে
করতালি তালে হেসে আকুল।
রমণীর সঙ্গে প্রেমের তরঙ্গে
রমণ প্রসঙ্গে কভু ব্যাকুল।
কভু বৃদ্ধ সহ চিন্তা অহরহঃ
কখন আলাপ যুবক সনে।
গুরু উপদেশে কভু না প্রবেশে
মোহের তিমির মুনির মনে।"
"কভু দিগম্বর দুকুল সুন্দর
কভু বাঘছাল কটির শোভা।

উদার হৃদয় সর্ব্বত্র নির্ভয়
কখন স্বজন মানস লোভা ॥
এরূপ আচার সদা নির্ব্বিকার
দেহ বাস ত্যাগ কিম্বা ধারণে।
গুরু উপদেশে কভু না প্রবেশে
মোহের তিমির মুনির মনে ॥" ১০

ইহা যেন ঠিক "পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" পদ্মপত্রে জলের তুল্য। পদ্মপত্রের উপর জল যেরূপ পৃথকভাবে টলমল করে, তেমনি জ্ঞানী পুরুষ বিষয় ভোগ করেন, কিন্তু নির্লিপ্তভাবে। সংসারীর এই নির্লিপ্তভাব, সংসারের মোহপাশ ছেদন গুরুর উপদেশেই সম্ভব। ভগবান শঙ্করাচার্য্য "শিবানন্দলহরীর" প্রত্যেক শ্লোকেই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"গুরু উপদেশে কভু না প্রবেশে
মোহের তিমির মুনির মনে।"

এ সংসার এই মোহের তিমিরে আচ্ছন্ন, মোহের তিমিরে পরিপূর্ণ। এই তিমির ভেদ করা, কামের মোহ, মদমাৎসর্য্যের মোহ কাটান বড়ই দুর্ঘট, বড়ই কঠিন। সাধারণ মানবের ত কথাই নহে, বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিত এই মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, এই মোহের দাস হইতেছেন। তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, গুরু উপদেশে মুনির মনে মোহের তিমির প্রবেশ করে না। সংসারের বিদ্বান্, পণ্ডিত শাস্ত্রজ্ঞ নহে, অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তি নহে, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী মুনি, গুরুর কৃপায়, গুরুর অমানুষিক শক্তিতে শক্তিলাভ করিয়া গুরুর শক্তি ও প্রভাব তাঁহার অন্তরে সঞ্চারিত হইলে, তবে মোহের তিমির কাটাইতে সমর্থ হন ; মোহের তিমির ভেদ করা এতই দুঃসাধ্য, বাসনা কামনাযুক্ত সংসারীর পক্ষে অসম্ভব। তুমি কবিই হও, দার্শনিকই হও, বৈজ্ঞানিকই হও, অথবা মহাশাস্ত্রজ্ঞই হও, তথাপি তুমি মোহের তিমির কাটাইতে পারিবে না। মোহপাশ ছেদন করিবার জন্য স্বতন্ত্র সাধনা চাহি, বিভিন্ন শক্তি সঞ্চয় প্রয়োজন। সে সাধনা, সে শক্তি একজন্মে সম্ভবে না। নিষ্কাম হওয়া, কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়া, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের বিপুল শক্তিলাভ করা, বহুজন্মের সাধনার, বহুজন্মের যোগ-তপস্যার ফল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব বহু যোনীতে জন্মের পর ৮৩ বার বৈরাগী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠক পাঠিকা ভাবিয়া দেখুন, বুদ্ধদেবের মত অবতার জন্মিতে, সর্ব্বপ্রকার মোহ পাশ ছেদন করিতে ৮৩ বার বৈরাগী জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছিল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব নিজ দিব্য দৃষ্টির দ্বারা তাঁহার যাবতীয় পূর্ব্বজন্ম-ঘটনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব বহুজন্মের সাধনার ফল। গুরু নানক, সাধক রামপ্রসাদ, সাধু তুকারাম, সাধু তুলসীদাস, সাধু কবীরদাস, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, রামদাসস্বামী; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ভাস্করানন্দ সরস্বতী, বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতিও একজন্মের ফল নহে, বহুজন্মের বহু সাধনার, বহু তপস্যার ফল।

তাই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন ঃ—

"বহুনি মে ব্যতিতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন,
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥"

(৪র্থ অঃ, ৫ম শ্লোক)

শ্রীভগবান কহিলেন,—

"কালচক্র আবর্ত্তনে আমার তোমার,
অতিক্রান্ত হে অর্জ্জুন! জন্ম বারংবার।
জানি আমি সে সকল পূর্ব্ব-বিবরণ,
নাহি জান পরন্তপ! তুমি কদাচন।
যেহেতু তোমার জ্ঞান আবৃত অজ্ঞানে,
দুরাসদ কামরূপ শত্রু অধিষ্ঠানে।"

তবে স্বয়ং ভগবানের জন্ম এবং যোগী ঋষি, সাধক-কুলের জন্ম প্রভেদ আছে। শ্রীভগবান তার পরের শ্লোকে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

(চর্থ অঃ, ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ)

বাস্তবিক নাহি মম জনম মরণ,
অখিল-ঈশ্বর আমি অনাদি কারণ।
স্বীয় প্রকৃতিতে তবু করি অধিষ্ঠান,
আত্মমায়াবশে আমি হই অধিষ্ঠান।"

(অন্ধ কবি শ্রীদুর্য্যোধন পাত্রের অনুবাদ)

ভগবান শঙ্করাচার্য্য মুনির মোহপাশ ছেদনের জন্য গুরুর প্রয়োজন, এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমাদের মত মলিন চিত্ত, বাসনা কামনায় পরিপূর্ণ, কামিনীকাঞ্চনে নিরত উদ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মোহপাশ ছেদন একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করিতেছে, যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবের গুরুকৃপালাভে পরিশ্রম, অধ্যবাস ও যত্নের ত্রুটি নাই। ভগবানের কৃপায় উল্লিখিত সাধুগণও যথাসময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের শিষ্য হইয়াছেন। ত্যাগী প্রকৃত কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে, তাঁহার অমূল্য উপদেশ পুস্তক কয়েকখানি পাঠ করিলে,উপদেশগুলি ভগবদ্বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আজ তাঁহার শক্তিকণা লাভ করিয়া, তাঁহার শত শত শিষ্য মুণ্ডিত মস্তক,গেরুয়াধারী, রিক্তপদ যুবকদল জীবের ক্লেশ মোচনে কি অনুপম শক্তি ও ত্যাগস্বীকার করিতেছেন, তাহা দেখিলে বা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহাদের সংযম ও বাসনা-কামনা-ত্যাগ দেখিলে দেবতা ভাবিয়া তাঁহাদের পদে লুণ্ঠিত হইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু All is not gold that glitters অর্থাৎ যাহাই চক্ চক্ করিবে, তাহাই সুবর্ণ নহে। কোন সাধকের, কোন মহাপুরুষের সব শিষ্যই সাধু ও মহাত্মা নহেন এবং গুরুপদে বরিত হইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু হুজুকপ্রিয় বঙ্গদেশে সকল বিষয়ে হুজুকের মত গুরুরও হুজুক উঠিয়াছে। স্কুল কলেজের ছাত্র ও অফিসের বাবুদিগের মধ্যে এইরূপ গুরুর আমদানীই বেশী। এই সব শিষ্যের মধ্যে দু'চারজন শিক্ষক, উকীল মোক্তার প্রভৃতিও দেখা যায়। ইংরাজি শিখিয়া যে বাঙ্গালী এক দিন নাস্তিক হইতেছিল, পৌত্তলিক কর্ম্ম বলিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছিল, কত অনাচার, কদাচার করিতেছিল, তাহারা যে পৈতৃককর্ম্মে আবার শ্রদ্ধাবান্ হইতেছে, নানারূপ কুকথা, কুপ্রথা ছাড়িয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অবসরকাল কাটাইতেছে। একপক্ষে ইহা শুভলক্ষণ বটে, দেশের সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু মুড়ি মিছরির একদর করিয়া তাঁহারা

নিজের যে কত অনিষ্ট করিতেছেন, কত সংসারে যে এ জন্য কত অনর্থপাত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে! গুরু করিতে হয়, প্রকৃত ব্রহ্মচারীকে, সংসার ত্যাগীকে গুরু কর; তাহা না করিয়া তোমারই মত বিলাসী, বিষয়-সুখে নিমগ্ন, অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত ব্যক্তির মুখে শাস্ত্রকথা শুনিয়া, অভ্রান্ত পুরাণ কাহিনী বা গীতার উপদেশ শুনিয়া, সাংখ্য বেদান্তের বিচার শুনিয়া, তাহার গুহ্য চরিত্র সম্বন্ধে কোন সন্ধান না লইয়া, অবিচারে তাহাকে গুরু করিয়া নিজে মজিতেছ, কত লোককে মজাইতেছ। এই সব গুরুকে প্রকৃত ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীগণের মত গেরুয়াবসন পরিধান করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন বা মৃগাজীনে উপবিষ্ট হইয়া শিষ্য-দিগকে উপদেশ দিতে হয় না, সে ত্যাগটুকু স্বীকার করিতে হয় না। গেরুয়াবসন পরিলেই যে সাধু হয়, তাহা আমরা বলিতেছি না, ব্যাঘ্র-চর্ম্ম বা মৃগচর্ম্মে বসিলেই যে নিষ্কাম হয়, তাহা নহে। এরূপ সন্ন্যাসীর মধ্যেও বহু লোভী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দুর্বৃত্ত ও নৃশংস আছে। কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইবে, পরি-ধেয়ের বিভিন্নতা অনুসারে মনোভাবের ব্যতি-ক্রম ঘটে। তুমি হেটকোর্ট পরিলে মনের যে ভাব হয়, ধুতিচাদর পরিলে সে ভাব কথনই হইতে পারে না; আবার গেরুয়াবসনে মনের আর এক ভাব হয়। বুকে হাত দিয়া বল দেখি, চর্ম্মাসনে বসিলে তোমার মনে যে ভাব আসিবে, তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া সেই ভাব আসে কি? নির্ব্বিকার চিত্তে, নিঃ-সঙ্কোচে এই সব গুরু,শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। বিস্ময়ের কথা, অপরিসীম ক্ষোভের বিষয় এরূপ গুরু ও শিষ্যের অভাব হইতেছে না। উপদেশের সহিত তাঁহারা অনেক বুজরুকি দেখান, অনেক অলৌকিক শক্তির গল্প করেন; কাজেই গৃহ দর্শক, শ্রোতা ও শিষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শিষ্যগণও প্রমাণ না পাইয়া, চাক্ষুষ পরিচয় না পাইয়া সেই সব গল্পে বিশ্বাস করেন। সময়ে সময়ে চাক্ষুষ পরিচয় পাইলেও সেই সব বুজরুকি বা অলৌকিক শক্তি দর্শাইবার ক্ষমতা চিত্তশুদ্ধি, নির্লোভ বা নিষ্কাম চিত্তের প্রমাণ নহে; তাহা জিতেন্দ্রিয়তার প্রমাণও নহে; পক্ষান্তরে দেখা যায় তাহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বিন্দুমাত্র জন্মে নাই। যে ভারতে যোগ-বলে, তপোবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, ঐশ্বরিক শক্তি পর্য্যন্ত লাভ করা যায়; যে ভারতে অষ্টসিদ্ধি লাভের পন্থা ও সাধনা বিদ্যমান; সে ভারতে ভোজবাজিরাও পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। আমাদের পরিচিত একজন ভয়ানক শঠ, মদ্যপায়ী, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি হিমালয়ের কোন মহাত্মার কৃপাবলে এক অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়া লোকের জীবনের অতীত ঘটনা অনেক বলিতে পারিত; ইংরাজিতে যাহাকে Thought reading বা মনের কথা বলিতে পারা—বলে, সে শক্তিও তাহার ছিল; অধিক কি মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় দেহের কোন্ স্থানে কোন্ চিহ্ন ছিল, তাহা বলিতে পারিত; অথচ সে ব্যক্তি কামিনীকাঞ্চনে ঘোর আসক্ত, তাহার বিন্দুমাত্র ধর্ম্মে মতি নাই। যাহা হউক, এই সব আলয়ে কেবল ভদ্রলোকগণের সমাগম হয় না, সরল, ধর্ম্মপ্রাণা বহু বঙ্গমহিলারও বিশ্বাস

করিয়া তাঁহাদের আলয়ে উপস্থিত হন। যাঁহারা নিজগৃহে শ্বশুর, ভাসুরের সহিত কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন, ধর্ম্মশিক্ষা পাইবার আশায়, তদ্দ্বারা পরলোকে সদ্গতি হইবে, এই অটল বিশ্বাসে সেই কোট-কামিজধারী বাবু গুরুদিগের সহিত তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে কথা-বার্ত্তা কহেন, তাঁহাদের পদসেবা পর্য্যন্ত করেন। পাঠকপাঠিকাগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, এই সব দুর্ব্বৃত্ত বাবু গুরু দীক্ষা দিবার, ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইবার, ঔষধ দিবার, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবার প্রসঙ্গে কত কুল-মহিলার সর্ব্বনাশ করিতেছে; তাঁহাদের অভিভাবক-গণকে বোকা বানাইতেছে; যেন যাদুমন্ত্রে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুসমাজে চিরদিন গুরুদেবই শিষ্যের আলয়ে গিয়া দীক্ষা দিয়া থাকেন, শিষ্য-শিষ্যাগণ গুরুদেবের আলয়ে দীক্ষা বা উপদেশ লইতে কখনই যান না। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে সবই বিপরীত হইতেছে; শিক্ষা,আচার,ব্যবহার সবই বিলাতী হইতেছে; সুতরাং উপদেশও বিলাতী ধরণের হইবে না কেন? কিন্তু বিজাতীয়েরা ত গির্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনেন; অনুকরণকারীগণ গুরুর বাস-গৃহে উপদেশ লইয়া বিজাতীয়গণকেও পরাজয় করিতেছেন।

ভরসার বিষয়, এরূপ বাবু-গুরুর সংখ্যা গণনা করা যায়। পৈতৃক অনভিজ্ঞ গুরু ত্যাগ করিয়া অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সাধু-সন্ন্যাসীকে গুরুপদে বরণ করিতেছেন। কত লোকের ভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞ যোগী, প্রকৃত সংসার-ত্যাগী গুরুও মিলিতেছে। তাঁহাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া হৃদয় আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হয়। তাঁহাদের উপদেশে, তাঁহাদের প্রভাবে কত উচ্ছৃঙ্খল যুবক সুপথে আসিতেছে; কত নাস্তিক আস্তিক হইতেছে; ক্রমে কত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও দার্শনিক,বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের যুক্তি-তর্ক তুলিয়া তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছেন। এই সকল সন্ন্যাসী গুরুর অধিকাংশই বারাণসী, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থবাসী। এই সন্ন্যাসী গুরুগণ অনুরুদ্ধ হইয়া গৃহী শিষ্যদের মধ্যে কাহারও কাহারও আলয়ে কিছুদিন করিয়া অবস্থান করেন; শিষ্যদিগকে ও তাঁহার বহু প্রতিবাসী, এবং দূরস্থ আত্মীয় বন্ধু ও কুটুম্বদিগের সহিত কত শাস্ত্রালোচনা করেন, কত উপদেশ দেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সংসার-ত্যাগী মুনিঋষিগণ রাজ্যের মঙ্গল-কামনায় মধ্যে মধ্যে রাজসকাশে আসিয়া কত উপদেশ দিতেন; রাজার কত মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিবার জন্য তপোবন হইতে তাঁহাদিগের আনা হইত; এইরূপে বিবিধ প্রকারে তাঁহারা রাজার ও রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া যাইতেন। সংসারের সমস্ত বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন, জীবন্মুক্ত মহর্ষি নারদ পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে যে সব কর্ম্ম করিয়াছেন, পুরাণ-সমূহে তাহার শত শত কাহিনী বর্ণিত আছে। সকল বাসনা, কামনা ত্যাগ করিয়া, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াও নিষ্কাম মুনিঋষিগণ ত্রিতাপে দগ্ধ জীবের শোক-তাপ যন্ত্রণার কথা ভুলিতে পারেন নাই। নিজ নিজ যোগ তপের ক্ষতি করিয়াও জীবের ক্লেশ, জীবের যাতনা মোচন

করিতে তাঁহারা সংসারে আসিতেন; মমতা-বিরহিত দয়া ও করুণায় তাঁহাদের হৃদয় সদাই পরিপ্লুত থাকিত; জীবের দুঃখে তাঁহাদের প্রাণ জ্বলিয়া যাইত। সেই সব মহাজ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ, নিষ্কাম, বাক্‌সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী মুনিঋষিগণকে এই পাপ কলিযুগে আমরা বড় একটা দেখিতে পাই না।

আমরা যাঁহার সম্পাদিত পুস্তক সমালোচনা প্রসঙ্গে এত কথা বলিলাম, কালীঘাটের নকুলেশ্বর তলার সেই ব্রহ্মচারী বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা বেদান্তভূষণ মহাশয়ের মত সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুবিচারক, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির শিষ্য হইতে পারা বা তাঁহার সহিত শাস্ত্রালোচনা করা অথবা তাঁহার কাছে শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; এরূপ গুরুলাভ অনেক সুকৃতির ফল। কত দিন আমরা তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়াছি। একদিকে তাঁহার নিকট শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে, অন্য দিকে কত দরিদ্রের তিনি ভরণ-পোষণ করিতেছেন, কত অনাথের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কালীঘাটের অসংখ্য যাত্রীগণ সন্ন্যাসী দেখিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে যে যাহা দান করে, সেই অর্থে তিনি নিজের গ্রাসাচ্ছাদন করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ দীন-দরিদ্রকে উক্তপ্রকারে দান করেন; কালীঘাটের অনাথ-আশ্রমেও সাহায্য করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের মহাজনগণের পন্থা অনুসরণ করিয়া বেদান্তভূষণ মহাশয় জীবনযাপন করিতেছেন, আমাদের বিশ্বাস। আমরা আশা করি, বেদান্তভূষণ মহাশয় আর্য্যঋষিগণের চরণ নিয়ত ধ্যান করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন। পাপযুগের বিষময় প্রভাব অতিক্রম করিবেন; শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় অধ্যাপনার সহিত শিষ্যগণকে জিতেন্দ্রিয় হইতে শিক্ষা দিবেন, কামিনী-কাঞ্চনের দুর্দ্দমনীয়, অনিবার্য্য প্রভাব ও প্রলোভন অতিক্রম করিতে শিক্ষা দিবেন। যে "মণিরত্নমালা" তিনি বিতরণ করিতেছেন, যাহার একটী উপদেশ,—"কে দরিদ্র? সুবিশাল আশা আছে যার।" সেই উপদেশ মত কার্য্য করিতে শিক্ষা দিবেন। তাঁহার নিকট আমাদের এই ভিক্ষা, তিনি যেন লোকের উক্ত দারিদ্র্য—ধনের আশা, বৃথা মানের আশা, বৃথা যশের আশা, লোকমুখে খ্যাতির আশা, ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেন। সকলে যেন তাঁহার উপদেশবলে প্রকৃত ধনী হইতে শিক্ষা করে। যুগধর্ম্ম, আত্মাভিমান, অহঙ্কার, গর্ব্ব পরিহার করিয়া প্রকৃত তেজশালী হইতে শিক্ষা করে। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী প্রকৃত সন্ন্যাসীগণই কলিযুগের মুনি-ঋষি। আমরা বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিকট মুনিদের মত সংসারের অশেষ কল্যাণ-সাধন প্রত্যাশা করি! "মণিরত্নমালা" ও "শিবানন্দলহরী" তাহার একটী নিদর্শন।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

বিজয়া-সম্ভাষণ।

পুরাতন গ্রীস ও রোম কতদিন হইল, কালের তিমির গর্ভে বিলীন হইয়াছে। কত দেশ, কত জনপদ যে এইরূপে কাল কবলে কবলিত, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বহু পুরাতন ভারতবর্ষ সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত লোকলোচনের সম্মুখে সমভাবে দেদীপ্যমান—যদিও ইহার ধর্ম্ম বিজ্ঞান, জাতীয়-সম্মান কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল-ভাবাপন্ন হইয়াছে—তথাপি তাহার স্মৃতি এখনও দেশবাসীর স্মৃতিপট হইতে চিরতরে বিলীন হয় নাই। বিলীন হয় নাই বলিয়াই আজ ত্রেতার কীর্ত্তিকলাপ কলিতে আমাদের স্মৃতিপটে সমারূঢ় হইয়া ধর্ম্মভাব পুনরুদ্দীপ্ত করে। সেই উদ্দীপনার ফলই এই বিজয়োৎসব। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের পর, এই বিজয়োৎসব বড়ই আমোদপ্রদ, বড়ই উল্লাসকর। আজ আমরা সেই স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, লেখক, পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতাবর্গকে যথাযোগ্য নমস্কার, আলিঙ্গন, অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এই বিজয়োৎসবের পর দেশের উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, দেশ শান্তিময় হউক, আমাদের রাজাধিরাজ বিপুল বিক্রমে যে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদের অঙ্কশায়িনী হইয়া বিজয় প্রদান করত: দেশের ভাবী অমঙ্গল নাশ করুন। শান্তি, শান্তি, শান্তি !!!

হরিনাম।

এত নিরাশায় তবু আশা হয়,
নিবিড় নিশায় উষার উদয়,
কি কুহক আছে ও নামের কাছে,
ভয় দেখাইয়া, দেয় যে অভয়।

ভাবি' পারণাম কাঁপি অবিরাম,
ওই নামে শুধু হৃদি শান্ত হয়,
(সে যে) তোমার আশ্বাস আমার বিশ্বাস,
উদ্ধারের শুভ সমাচার কয়।

ঘোর দাবানলে যবে প্রাণ জ্বলে,
সব শ্যামলতা হৃদয় হারায়,
তখন আকাশে বারিদ-আভাসে
সে যে স্নিগ্ধকরা বারি দিতে চায়।

সে যে বলে, হরি! তুমি নেবে হরি'
সব তাপিতের সকল সন্তাপ;
সে ঘোষণা করে, তোমার শ্রীকরে
বরদান আছে, নাহি অভিশাপ।

কাল বিষধর করে জরজর
যবে গরলের বিষম দশনে,
তার শিরোপরে মণি শোভা করে,
সেই জরসার ভাস্বর বরণে।

(সে যে) শূন্যভরা বাণী, আকাশ অবনী
ধ্বনিত তাহার অমৃত ঝঙ্কারে;
(সে যে) অনির্ব্বাণ ভাতি, দীপ্ত দিবারাতি
সুপ্তি জাগর্ত্তিতে মানস আঁধারে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

সভ্যতার ইতিহাসের একপৃষ্ঠা।

অগ্নির উৎপত্তি।

বেদে অগ্নির তিনটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—তিনি আকাশে সূর্য্য, মেঘে বিদ্যুৎ এবং গার্হপত্য বা গৃহাগ্নি। * স্কন্দনেভিয়ার ইড্ডাগ্রন্থে অগ্নি গৃহসূর্য্য নামে বর্ণিত হইয়াছেন। অগ্নি-উপাসক পারসিকগণের প্রাচীন বুন্দহস্ত গ্রন্থে সৃষ্টির গূঢ় বিবরণ প্রকাশ করিবার সময় পাঁচ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অগ্নির বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছিল :—প্রথম অগ্নি অহুর মজ্দের সম্মুখে বিস্ফুরিত হয়, দ্বিতীয় অগ্নি প্রাণরূপে সকল জীবদেহে বিদ্যমান; তৃতীয় অগ্নি তরু-লতাদিতে অবস্থিত, চতুর্থ অগ্নি বাশষ্ঠ; তাহা মেঘে অসুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বদা নিবিষ্ট; পঞ্চমাগ্নি, সাংসারিক কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়া থাকে। †

পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্য, অসভ্য প্রায় সকল জাতির মধ্যে অগ্নির পূজা ও দেবোপম সম্ভ্রম দেখা যায়। জাপানের ইতিহাসে কঁদো নামে এক দেবতার উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে, তাঁহার প্রসাদে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। তাঁহার প্রতিমার চারিদিকে অগ্নিচ্ছটা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। *

গ্রীসের পুরাণে বর্ণিত আছে, প্রমিথিয়স আকাশ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া মর্ত্তে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন রোমেতিহাসে দেখা যায় যে সেই দেশের প্রসিদ্ধ সপ্ত নৃপতির অন্যতম টুলিয়াস সর্ব্বিয়স্ গৃহাগ্নি হইতে গার্হস্থ্য দেবগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিলেন, সেই জন্য বহুকাল ব্যাপিয়া গ্রীস ও রোমের প্রতিগৃহেই চুল্লি মাত্রই অগ্নিদেবের পবিত্র বেদিকা রূপে সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে। বর্ণিত আছে, তাহারা সেই চুল্লির অগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাণ হইতে দিত না এবং প্রত্যহ মুখ্য আহারের পূর্ব্বে চুল্লিদেবতা হেস্তিয়াকে সর্ব্ব প্রথম প্রধান ভোজ্যের একখণ্ড উৎসর্গ করিত। † এই প্রথা অস্মদ্দেশে অদ্যাপি প্রচলিত দেখা যায়। উত্তর ও মধ্য আশিয়ার তুঙ্গজ, মোঙ্গলও তুর্কি জাতির মধ্যেও এইরূপ প্রথার এক সময়ে প্রবল প্রচলন ছিল। আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশেও অগ্নিপূজার এ প্রকার আড়ম্বর অতি প্রাচীনকালে পরিলক্ষিত হইত। ব্রহ্মদেশেও এক সময়ে অগ্নি পূজিত হইতেন।

---

* উইল্সন সাহেবের বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ৩৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পণ্ডিতবর স্যার উইলিয়ম জোন্স মনুসংহিতার অনুবাদে উক্ত ত্রিবিধ অগ্নির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—'1. Household, that which is perpetually maintained by a householder; 2. A fire for sacrifices, placed to the south of the rest, and 3. A consecrated fire for oblations. অর্থাৎ—১। যে অগ্নি সর্ব্বগৃহে সর্ব্বক্ষণ সংরক্ষিত হয়। ২। যে অগ্নি যজ্ঞকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ৩। যাহা হোমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ডমার জাতির মধ্যে তাহাদের দলপতির শিবিরে অগ্নি সর্ব্বদা জ্বালিয়া রাখিতে হয়। *Prehistoric Man and Beast.* P 78

† *Sacred Books of the East* Vol v, p. 123.

* *Calcutta Review* no. 156. 1883, p. 363.

† *Tylor's Primitive Culture* Vol. II. p. 254. *Calcutta Review* 1883. p. 394.

কাপ্তেন ফর্ব্বস স্বপ্রণীত "বৃটীশ ব্রহ্ম" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, মৃত্যুকালে প্রত্যেক গৃহস্থের সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইত। পরে স্থপারি, তামাক প্রভৃতি দ্রব্যের বিনিময়ে তাহারা অন্য গৃহ হইতে নূতন অগ্নি কিনিয়া লইত। *

প্রাচীন মিশরীয়গণের এই বিশ্বাস ছিল যে, সূর্য্যই সকল শক্তির আদি কারণ, পৃথিবীর সকল অগ্নি এবং মানবের জীবনী সেই সূর্য্য হইতেই উদ্ভূত। † মিশরের হেলিওপলিস্ নামক প্রাচীন নগরে একটী বৃহৎ সৌরমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মন্দিরে সূর্য্য 'রা' নামে পূজিত হইতেন। তাঁহার সেই প্রতিমূর্ত্তি অনেকাংশে শিব-লিঙ্গ সদৃশ। তিনি জগতের প্রধান উদ্ভব-কারণ; সকল প্রকার তেজ ও জ্যোতির নিদান। রা ব্যতীত অসিরিস, হোরস্, প্লুট, ছেম, সেট প্রভৃতি দেবতাও বিশ্বপ্রসবিনী শক্তির উদ্ভবস্থল বলিয়া প্রাচীন মিশরে পূজিত হইতেন। ‡ মিশরের প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা ডাক্তার টীন বলেন,—"উত্তর মিশরের অধিবাসীবৃন্দ অন্যান্য দেবতার ন্যায় নীথ দেবীকেও মূর্ত্তিমতী স্বর্গীয় অনলশিখা বলিয়া পূজা করিত। প্রাচীন মেক্সিকোর এজটেকদিগের ভীষণ নরমেধ যজ্ঞেও অগ্নিপূজার বিশেষ আড়ম্বর পরিলক্ষিত হইত। ¶

এইরূপে অতি প্রাচীনকালে সভ্য ও অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই সূর্য্য ও অগ্নির পূজা প্রচলিত ছিল। যে অগ্নি জগতের এত মঙ্গল-নিদান, যাহাকে না পাইলে মানবসমাজ অভাব ও অজ্ঞানের নিবিড় অন্ধকারে অসভ্যতার নিম্নতম কূপে এতদিন নিমগ্ন থাকিত, মানব তাহাকে কিরূপে কোন্ সময়ে ও কোন্ উপায়ে অধিকার করিল, তাহার প্রকৃত তথ্য কোথায় পাওয়া যাইবে? সত্য সত্যই কি ঋষি অঙ্গিরা ও মহাপুরুষ প্রমিথিয়স্ তাহাকে আকাশ হইতে মর্ত্ত্যে আনিয়াছিলেন, অথবা স্বয়মুৎপন্ন দাবানল বা আগ্নেয়গিরি হইতে তাহার স্বরূপ ও নিদান অবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রাচীন গ্রীক ইতিহাসে প্রমিথিয়সের অগ্নিচয়ন বিবরণে দেখিতে পাই যে, তিনি অলিম্পিয়ান পর্ব্বতে অনলের অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত যে, বেদের মাতরিশ্বা বা ভৃগুর আখ্যায়িকা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। *

* *Calcutta Review*, p. 365

† Maspero's *Dawn of Civilisation*, pp 40, 168, 495, 646.

‡ *Calcutta Review* p 365.

¶ Prescott's *Conquest of Mexico* Vol I, p. 63.

* The name of Prometheus himself is of Vedic origin, and recalls the process employed by the ancient Brahmins to obtain the sacred fire. They used for this purpose a stick which they called *mantha* or *pramantha*, the prefix *pra* adding the idea of *rubbing by force* to that contained in the root *matha* of the verb *mathami* or *mathnami*, to produce by friction. Prometheus is he who discovers fire, brings it from its hiding place and communicates it to men. From Pramantha or Pramathyus, he who hollows by friction, who steals fire, the transition is easy and natural, and there is but a step from the Hindu Pramathyus to the Greek Prometheus, who stole the fire from heaven to kindle the spark of life in the man of clay. N. Joly's *Man before Metals*, p. 189. Calcutta Review 1883 No 156 p p 361—378.

প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ টাইলর স্বপ্রণীত মানব-জাতির প্রাথমিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান (Researches on the Early History of Mankind) নামক পুস্তকে অগ্নি-উৎপাদন সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন। তদীয় পুস্তকের আলোচনায় যে সকল উৎকৃষ্ট তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, সভ্য ও অসভ্য প্রায় সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে ঘর্ষণ দ্বারাই অগ্নি উৎপাদিত হইত। বেদে বর্ণিত আছে, দুইখানি কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণ দ্বারা আর্য্যেরা যজ্ঞে অগ্নি-উৎপাদন করিতেন। সেই দুইখানি কাষ্ঠ অরণি প্রমন্থ বা মন্থ নামে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রমন্থ হইতে গ্রীকদিগের অগ্নিদেবতা প্রমিথিয়সের আবির্ভাব হইয়াছে। অগ্নি-উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া কেবল যে,আর্য্য-জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, এরূপ নহে, টাহিটি নিউজিলাণ্ড, স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ, এবং টিমর প্রভৃতি দ্বীপের আদিম অধিবাসিগণও অগ্নি-উৎপাদনে উক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিত।* অরণি ও প্রমন্থ অপেক্ষা "ফায়ার ড্রিলের" অধিকতর আদর ছিল ; কেন না তাহাতে সহজেই অগ্নি উৎপাদিত হইত। একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের এক স্থানে একটী গর্ত্ত করিয়া এবং সেই গর্ত্ত মধ্যে একটি কাষ্ঠদণ্ডের এক মুখ স্থাপিত করিয়া দুই হাতে ধরিয়া সজোরে ঘন ঘন ঘুরাইতে হয়। তাহাতে সহজেই অগ্নি উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র পূর্ব্বকালে অষ্ট্রেলিয়া, সুমাত্রা, কেরোলিন দ্বীপপুঞ্জ, কামস্কট্‌কা,—এমন কি চীন, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও বিশেষ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মেক্‌সিকানদিগের মধ্যে ইহার প্রবল প্রচলনের কথা শুনা যায়। সিংহলের বেদ্দা, এবং দক্ষিণ আমেরিকার গৌকোগণ এখনও ইহার ব্যবহার করে। *

পণ্ডিতবর টাইলর বলেন, বৌদ্ধদিগের মধ্যে আজিও অরণি ও মন্থদণ্ডের প্রচলন দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা পূর্ব্ব প্রক্রিয়ার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। দণ্ডে দড়ি জড়াইয়া দধি মন্থনের ন্যায় তাহারা অবিরত ঘুরাইতে থাকে। দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কার্য্যে অগ্নি-উৎপাদনে এখনও ঐরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে এই সকল প্রাচীন উপায় অনেক দিন পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন দীপশলাকার কীর্ত্তিকলাপ বঙ্গের সকল যজ্ঞস্থলই আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে লৌহ ও স্ফুলিঙ্গশিলার (চক্‌মকি পাথরের) প্রবল প্রচলন ছিল; পুরাতন বন্দুকগুলিতেও সেই উপায়ে অগ্নি উৎপাদিত হইত। †

* অধ্যাপক টাইলর ইহার নাম দিয়াছেন, *stick and groove* অর্থাৎ মন্থদণ্ড ও অরণি। কিন্তু ইহা অপেক্ষা *Fire drill* অর্থাৎ অগ্নিবেধ যন্ত্রের অধিকতর আদর ছিল বলিয়া জানা যায় ; কেননা তাহাতে সহজে অগ্নি উৎপাদিত হইত।

* মলয়দ্বীপপুঞ্জে কাষ্ঠের বা গজদন্তের নলে বায়ু সঙ্কোপিত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিবার প্রথা আজিও প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত *bow drill* ও *pump drill* নামে অপর দুই প্রকার কলের বিবরণ দেখা যায়। *Man before Metals* p. 194.

† Tylor's *Early History of Mankind* p. 244. Jolly's *Man before Metals* p.p. 122 193.

এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—প্রাগৈতিহাসিক মানব অগ্নির ব্যবহার জানিত কি না? প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক এবে বর্জ্জস্ বলেন, মিয়োসিন যুগ * হইতে মানব অগ্নি ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে দগ্ধ স্ফুলিঙ্গশিলা ও অঙ্গারজ্ঞান-মিশ্রিত কতকগুলি কৃত্রিম পদার্থ দেখিয়া তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতবর জলি বলেন তড়িৎ-সংযোগে ঐ সকল পদার্থের উক্ত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিবে। ইহাতে এবে বর্জ্জসের মত কিয়ৎপরিমাণে খণ্ডিত হইয়াছে। তবে জলি সাহেবের মত এই যে, মিয়োসিন যুগের মানব অগ্নির ব্যবহার না জানিলেও কোয়ার্টারণারী মানবগণের মধ্যে অবশ্য অগ্নি বিদিত ছিল। গুহাভল্লুক ও বল্গা হরিণের আবাস-গুহাসমূহে এবং মৃষ্ট পাষাণ যুগে অনেক গহ্বর মধ্যে অগণ্য চুল্লি, ভস্ম, অঙ্গার, দগ্ধ অস্থিখণ্ড, ধূমকৃষ্ণ বিস্তর স্থূল স্থূল মৃৎপাত্র প্রভৃতি দ্রব্য দেখিয়া পণ্ডিতবর জলি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, অগ্নির সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবগণ মৃতদেহের সৎকার করিত, ডোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া লইত এবং হ্রদগৃহের কাষ্ঠখণ্ড সমুদায়কে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া জলের অনিষ্টকরী শক্তি হইতে সংরক্ষিত করিতে পারিত। † হ্রদগৃহ ও গুহাবাসী মনুষ্যগণ অগ্নি-সাহায্যে যে, কেবল রন্ধন ও তাপোৎপাদন করিত, এমত নহে, নিশাকালে অন্ধকার-নাশের নিমিত্ত আলোক উৎপাদনও করিয়া লইত। * ফাইমন হ্রদের এক স্থলে একখণ্ড অর্দ্ধদগ্ধ সর্জ্জরস কাষ্ঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জলি বলেন, সম্ভবতঃ আলোকের নিমিত্ত তাহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। যখন তৈল-ব্যবহার প্রাচীন পাশ্চাত্য সমাজে অবিদিত ছিল, তখন ঐ প্রকার দাহ্য দারুখণ্ড, জন্তুর বসা, অথবা শৈবাল বর্ত্তিকা উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। আজিও এস্কিমোগণ শিল বা তিমি মৎস্যের তৈলপদার্থ দ্বারা আপনাদের তুষারকুটীর সকল আলোকিত করিয়া থাকে। †

এই প্রসঙ্গে অনেক পুস্তকে এই প্রশ্ন দেখা যায় যে, অগ্নি জানিত না, পৃথিবীতে এমন কোন জাতি কোন কালে ছিল কি না? অধিকাংশ পাশ্চাত্য লোকের মত এই যে, স্মরণাতীতকাল হইতে মানব অগ্নির ব্যবহার জানিত। ঋগ্বেদে আর্য্য হিন্দুর আদিম সভ্যতার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার প্রথম সূক্তই অগ্নির গুণকীর্ত্তনে উদীরিত। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আর্য্য হিন্দুর সৃষ্টিকাল হইতেই অগ্নি তাহাদিগের সুবিদিত ছিল। আর্য্যেতর অপর সকল জাতির সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। বেদমন্ত্র-নিচয় যখন আর্য্য ঋষিগণের মানসনয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখন মধ্য পশ্চিম ও দক্ষিণ য়ুরোপের গিরিগহ্বর ও হ্রদবসতি সমুদায়ে যে সকল জাতি বাস করিত, অগ্নি যখন কিয়ৎপরিমাণে তাহাদিগেরও বিদিত ছিল, তখন তাহা কোন্ সময়ে সেই সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা

* *Calcutta Review*, 1883, p. 365.

† *Ibid.*

* *Man before Metals* pp. 194. 195. 196.

† *Man before Metals* p. p. 194-95.

অভ্রান্তরূপে নিরূপিত হইতে পারে না। অবশ্য যাহারা আমমাংসাশী রাক্ষস বা অসভ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহারা অনেক সময় অগ্নিতে পাক না করিয়া মাংসাদি আহার করিত সত্য, কিন্তু তাহারাও কোন না কোন প্রকারে অগ্নির ব্যবহার জানিত। অগ্নি টাস্‌মেনিয়ার অধিবাসীগণের সম্পুর্ণ বিদিত, কিন্তু শুনা যায়, তাহারা আজিও তাহার উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই। সেইজন্য তাহাদের রমণীগণ জ্বলন্ত মশাল লইয়া সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে ভ্রমণ করে। সেই সকল জ্বলন্ত উল্কা-সাহায্যে পুরুষগণ নিবিড় বনগহনের গভীর প্রদেশসমুহে প্রবেশ করিয়া থাকে। * কোন কারণে মশাল নিবিয়া গেলে তাহারা সময়ে সময়ে অতি দুর পথ পরিভ্রমণ করিয়া অপর এক জাতির মশাল হইতে তাহা পুনর্ব্বার জ্বালিয়া লইয়া আইসে।

কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যে অগ্নি আবিস্কৃত হইবার পূর্ব্বে বসুন্ধরার গর্ভে লৌহাদি ধাতুনিবহ কিরূপ অবস্থায় ছিল, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। লৌহপিণ্ড সকল অসংস্কৃত অবস্থায় উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল, কেহ তাহার সন্ধান করে নাই। তাহারই পার্শ্বে বা চতুর্দ্দিকে সমসাময়িক স্তরে প্রচণ্ড সংঘর্ষণ অগ্নির শুষ্কীভূত সুশান্ত মূর্ত্তিতে মুলজার রূপে বিশ্বের কত মহান্ ফল কেন্দ্রীভূত করিয়া বাধিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? ক্রমে অগ্নির আবিষ্কারে যখন তাহার মহাশক্তি জগতের সর্ব্বত্র স্বীয় জয়কেতন উড়াইতে লাগিল,—যখন বার্মিংহাম, গ্লাসগো, উলভারহেম্পটন ও উলউইচের কর্ম্মশালা সমুদায়ে ওয়াট, আর্করাইট, ষ্টিফেন্‌সন প্রভৃতি বিজ্ঞানবীরগণের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শত শত বিশ্বকর্ম্মা সহস্র সহস্র অসাধ্য সাধন করিতে লাগিলেন, তখন জগতে কোন্ অপূর্ব্ব মহাযুগের আবির্ভাব হইল, ভাষায় তাহার গৌরব প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আজি সুদুর্গম আতলান্তিক সদৃশ মহাসিন্ধু সকল সুগম হইয়াছে, বাষ্পীয় পোত নিবহ তাহার বিশাল বক্ষে সেতু বিস্তার করিয়া কাল ও ব্যবধানের অধৃষ্যতা দুরীকৃত করিয়া দিতেছে। এদিকে নবাবিস্কৃত ব্যোমযান সকল শত শত পোতযানের সৃষ্টি করিয়া বিশ্বের অনন্ত ক্ষেত্রে কত সংহার বীজ বপন করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তড়িৎ, চৌম্বক ও বাষ্প আজি জগতে অসাধ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান-বারিধির এই প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস কোথায় কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশের কোন্ সূক্ষ্ম বিন্দুবক্ষে বিলয় পাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? অহংজ্ঞান-নিমূঢ় বিজ্ঞানদৃপ্ত মানবের জ্ঞানচক্ষু সামান্য স্বপ্নের কুহকেই উন্মীলিত হইবে। মানবীয় শক্তির চরম পরিণতি শেষে ভাগবতী মহাশক্তির একটী ভ্রূকুটী সম্মুখেই বিলয় হইয়া পড়িবে।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* *Man before Metals* p 198.

আর্য্যগণের গো চর্য্যা ও কৃষিকার্য্য

আর্য্যগণের সকল কার্য্যেই এমন একটা সরলতা ও সর্ব্বলোকহিতকারী অনুপ্রাণতা ছিল যে এখনকার লোকে তাহা মনে কল্পনা করিতেই পারে না। সেই ভাবে কার্য্য করা ত দূরের কথা। তাঁহারা ছোট বড় সকল কর্ম্মকেই ধর্ম্মের চক্ষে দেখিতেন এবং ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহাদিগের কর্ম্মে কেবল পরার্থ-পরতা ও সার্ব্বজনীনতাই পরিলক্ষিত হইত। এখন যেমন স্বার্থের দিকে সকলের দৃষ্টি, পুরাকালে পরার্থেই, জীবহিতার্থেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, সর্ব্ব কর্ত্তব্যেই মানবের একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। ইহা কেবল ভারতবর্ষেই নহে, ভূমণ্ডলের যে স্থলেই ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণের পদধূলি পড়িয়াছিল সেই সেই স্থানে তাহাদিগের সকল কর্ম্মই পবিত্র পুণ্য রূপে পরিগণিত ও পরিণত হইত। প্রত্যেক দেশ কাল পাত্র তখন দেবতা জ্ঞানে আরাধিত হইত, দিক-দেবতা, দিন-দেবতা ও জীবমাত্রেই দেব রূপে নিরীক্ষিত হইত। আজ কাল যেমন পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে কেবল রবিবারই বিশ্রামবার হইয়াছে, তখন কোন দিবসেরই উৎসবের বিরাম ছিল না। প্রত্যেক বারেরই এক এক জন দেবতা ছিল। ঘটিকার যেমন বিশ্রাম নাই, কোন দিবসই তখন উৎসব হীন ও কর্ম্ম হীন ছিল না। তখন কি কৃষি বিভাগ কি বাণিজ্য বিভাগ, কি শিল্প কলা, কি সঙ্গীত কলা একটা ধর্ম্মের সঙ্গে একটা শ্রেয় ও প্রেয়ের উদ্দেশ্য অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু হায়, এখন কর্ম্ম মাত্রই স্বার্থ ও ভোগ বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ন দেবায় ন ধর্ম্মায় ন জীব হিতায়,—বর্ত্তমান মানব কোন সদুদ্দেশ্যেই কর্ম্মে পোষণ করে না।

পুরাকালে ঋষিগণ মন্ত্র দ্রষ্টা ছিলেন, "মন্ত্রাধীনাস্তু দেবতাঃ" দেবতাগণও মন্ত্রের অধীন ছিলেন, মন্ত্র তৎকালে সুফল প্রদান করিত, মানব জীবনের সকল অঙ্গই মঙ্গলময় মন্ত্র যুক্ত ছিল। তখন অতি-বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, দৈব দুর্ব্বিপাকে, রোগে, শোকে, শ্রাদ্ধে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে মন্ত্র ফলদায়ক হইত, এখন সে নাদ-মন্ত্রের পরিবর্ত্তে কেবল হাহাকার ও আর্ত্তনাদেই ভারতভূমি ভরিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশের মধ্যে কৃষি মাহিষ্যগণ সংখ্যায় সর্ব্ব সম্প্রদায় অপেক্ষা বেশী এবং ইহারা অধিকাংশই কৃষি ও বৈশ্যজীবি। পুরাকালে ইহাদের বিশাল স্বাধীন রাজ্য মেদিনীপুর ও রাঢ়ে ছিল। প্রাচীন সমাজ তত্ত্বজ্ঞ এড়ু মিশ্র তাঁহার "কারিকরে" এ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন:—"সূর্য্যদ্বীপস্ত্রিভিভাগৈঃ... . বিরাজতে।" (সম্বন্ধ নির্ণয় তৃতীয় সংস্করণ ৭১৭ পৃষ্ঠা) শিবনিবাস ষ্টেসনের নিকট মহেশপুর গ্রামে গড় বেষ্টিত যশোহর জেলায় এখন বিদ্যমান আছে। এই শিবনিবাস ই, বি, এস, আরের একটী ষ্টেশন এইখানে জেলে রাজার গড়ের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। তাহার নক্সা যাহা আমি নিজে গিয়া বহু কষ্টে সংগ্রহ

করিয়া আনিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। সূর্য্য মাঝির মাঠ, সূর্য্য রাজার গড়, ইত্যাদি সবই বর্ত্তমান। এই সকলের নিদর্শন এখনও আছে। (মাহিষ্য প্রকাশ ৩৭০ পৃঃ, সম্বন্ধ নির্ণয় ৩য় সংস্করণ ৫৬৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই ক্ষেপে রাজার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সুলতান মাঝিকে মহেশপুরের ব্রাহ্মণ বংশীয় রায় চৌধুরীগণ ছলে বলে সবংশে ধ্বংস করিয়া ঐ বিশাল রাজ্য স্বাধিকারভুক্ত করেন। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর শাসনদণ্ড পরিচালনকারী বঙ্গের পাল রাজাগণ মাহিষ্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। বঙ্গের স্বনামধন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক লেখকগণ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মাহিষ্যজাতির প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ ও রাজদণ্ড পরিচালনকারী শক্তির সমাবেশ স্বীকার করিয়াও স্বীকার করেন না। মাহিষ্যের নাম হইলেই তাঁহারা নাক মুখ সিটকাইয়া বাঁকাইয়া উপেক্ষা করিতে, জালিয়া নৌবাহী বলিতে ত্রুটি করেন না। দীনেশ বাবু ও বিজয় চন্দ্র মজুমদার বাবুর লেখায় আমরা ইহার বিশেষ নিদর্শন পাইয়াছি। নিখিলবাবু, অক্ষয় বাবু প্রভৃতি সুলেখকগণ এই জাতির বিরুদ্ধে তত খড়্গ হস্ত নহেন। তাঁহারা স্বদেশ সেবক, অপক্ষপাতী ঐতিহাসিক, তাঁহারা প্রকৃত কথাই লিখিয়া সমাজে ও সভ্য জগতে অনুদ্‌ঘাটিত সত্য প্রকাশে দেশের মহীয়সী হিত সাধিত করিতেছেন।

মাহিষ্যগণ বঙ্গের কৃষি কৈবর্ত্ত জাতি এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পালক পিতার জাতি। এ বিষয়ে মাহিষ্য প্রকাশ দুই ভাগ, ভ্রান্তি বিজয়, মাহিষ্যবিবৃতি, মহেন্দ্র মোহমুদ্গর, বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত, মাহিষ্য সমাজ, মাহিষ্য-বান্ধব, মাসাশৌচ নির্ণয় প্রভৃতি পুস্তকগুলি পাঠ করিলে অন্ধ জগতের এ জাতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা আশু তিরোহিত হইতে পারে।

কলিকাতার দক্ষিণস্থিত সুন্দরবন বা বাদা প্রদেশ বর্ত্তমান কালের মত দুর্ভেদ্য বনে আবৃত বা শ্বাপদ সংকুল প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে ছিল না। ভগবানের লীলায় আজ যে স্থান সৌধাবলী শোভিত জনাকীর্ণ নগর বলিয়া পরিচিত, তাহা শত বর্ষ পরে নিবিড় বনাকীর্ণ অরণ্যানীতে পরিণত হইয়া মনুষ্যের পরিবর্ত্তে হিংস্র শ্বাপদকুলের অভিলষিত বাসস্থান হইয়া দাঁড়ায়। সুন্দরবনেরও সেই কথা। সুন্দরবন আবাদ করিতে করিতে কত মন্দির, হর্ম্ম্য, পুষ্করিণী, তোরণ, সৌধমালা, ভগ্নাবশেষ নগর ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে মাহিষ্যের পক্ষ প্রাচীন রাজ্যের, ঐ দেশের অন্যান্য স্থানে, দিনাজপুরের মহীপাল দিঘীর সন্নিকট, গয়া জেলান্তর্গত কোলাহল পর্ব্বতের প্রস্তর ফলকে (মাহিষ্য প্রকাশ ১ম ভাগ) হাবড়া জেলায় গড় ভবানীপুর, সিংটী শিবপুরে, কমলপুরে, আমতায়, ৺পুরুষোত্তম ধামে, যশোহরের স্বরূপপুরে, চাসকে, ৺দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে, বাওয়ালীতে, এবং বঙ্গের অনেক অপরাপর মাহিষ্য প্রধান স্থানে মাহিষ্য জাতির অতীত গুণগরিমার নিদর্শন পাওয়া যায়। লাট এবং কচ্ছদ্বীপে মাহিষ্য রাজার রাজধানী ছিল, তাহা আমি মাহিষ্য প্রকাশ প্রথম ভাগে ইতিপূর্ব্বে বংশাবলী

আলোচনা করিয়াছি। লাটদ্বীপ বর্ত্তমান লাটুদহ। কচ্ছদ্বীপের সম্বন্ধে বর্ত্তমান ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে মতদ্বৈধ দেখা যায়।

হুমায়ুন বাদসাহের রাজত্বকালে মহারাজ সিংহবাহু মোগল-সম্রাটের পক্ষ হইয়া মহারাণার বিরুদ্ধে ফতেপুর শিকরীর জগদ্বিখ্যাত সমরে প্রকৃত বীর-পুরুষের স্থায় যুদ্ধ করিয়া অসমসাহসিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় সিংহবাহু সিংহ কর্ণাটদেশবাসী ছিলেন। আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে ইনি পাঁচ হাজারির পদে উন্নীত হইয়া পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধেও খুব সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। ইনিই পাঠান সেনাপতি হিমুকে (হেমচন্দ্র সিংহ চৌধুরী) রণে বিপর্য্যস্ত করিয়া তীক্ষ্ণ শর প্রহারে চক্ষুহীন করেন। (মণ্ডলবংশের ইতিহাস দেখ) বাদসাহ আকবর তাঁহার বীরত্বে তুষ্ট হইয়া বহু জায়গীর দান করেন। এই জায়গীর ইংরাজ বাদসাহ স্বীয় তত্ত্বাবধারণে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এই রাজগণের দীন বংশধরগণ ইংরাজরাজের কৃপাকটাক্ষে রাজ্য হইতে কেন চিরবঞ্চিত হইয়াছেন, তাহা ভগবানই জানেন। বঙ্গের বহু স্থানে মাহিষ্যগণই প্রধানতঃ কৃষি-কার্য্যে নিযুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। রাণী রাসমনি, রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া প্রভৃতি মাহিষ্য-জাতীয়া রমণীরত্নগণ কি হীন পদবীতে উপনীত হইয়াছিলেন? তাহা আমরা কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

মাহিষ্য-জাতির মধ্যে যত বেশী সংখ্যা তালুকদার, জমীদার, গাঁতিদার ইত্যাদি আছে, এরূপ বঙ্গের আর কোন জাতির মধ্যে নাই। ২৪ পরগণার মধ্যে মাড়, মণ্ডল, ভবানীপুরের সরকার, ইটালির সরকার, শ্যামবাজারের দাস, সুঁড়ার দাস (দালাল), ডায়মণ্ডহারবারে পারুলিয়ার মণ্ডল, যুযুরযার মাথা, কমলপুরের বৈতালিক মালদহ, মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত ডাঙ্গাপাড়ার চৌধুরী, শিকারপুরের বিশ্বাস, পাথারের রায় প্রভৃতিগণ এই জাতির মধ্যে বিশিষ্ট ভূস্বামী সম্প্রদায় বলিয়া পরিগণিত। গয়া পালামু ও পাটনা জেলার মধ্যে সরকার চৌধুরী প্রভৃতি ভূস্বামীগণের নাম বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও উল্লেখযোগ্য এবং ইঁহাদের বিস্তৃত জমিদারী মাহিষ্য-সমাজের গৌরবের কথা।

কৃষি গো-রক্ষাই আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক দুঃখ মোচনে একমাত্র সমর্থ কিন্তু আমরা এতই বিলাসে অভিভূত যে, এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে আদৌ মনঃসংযোগ করি না; বরং যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগকে শ্লেষ ও উপহাস করি। পাটের চালান বন্ধ হওয়ায় দেশের কৃষক ও ভূস্বামীকুল মধ্যে কি হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসী মাত্রের অগোচর নাই। সমাজের এই দুর্দ্দশা সমাধানের উপায় কি, তাহা একবার আমাদের বিশ্লেষরূপে চিন্তা করা উচিত নহে কি?

দেশের কৃষককুল মধ্যে বিশেষ অভাব উপস্থিত হইয়াছে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস, কৃষক-গৃহে ক্রমিক বিলাসিতার প্রবেশ, স্বার্থপরতা, গ্রাম্যদলাদলির প্রভাব গোশক্তি উৎপাদনে শিথিলতা প্রদর্শন ও ঔদাস্য এবং

গৃহপালিত পশুগণ মধ্যে সংক্রামক রোগের প্রসার ও দেশে পশু-চিকিৎসকের অভাব, কৃষককুল মধ্যে এই সকল বহু অভাব আনয়ন করিয়াছে। মৎপ্রণীত "গোপালবান্ধব" প্রথম ভাগ এবং "সাহিত্য-প্রকাশ" দ্বিতীয় ভাগে এই সকল বিষয় সবিশেষ বিবৃত আছে। তাহার কতকাংশ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে এই বিশাল সাহিত্য সমাজ কৃষি গোরক্ষা, শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজোন্নতি-মূলক আন্দোলনে একেবারে নিদ্রিত নহে,—

"ভারতীয় গোজাতির রক্ষা বিধান প্রত্যেক হিন্দু মাত্রেরই কর্তব্য। এই বিষয়ে আমাদের অনাস্থা হওয়ায় শত শত গো প্রত্যহ রোগে, কশায়ের ছুরির দ্বারায় ও অনাহারে কালসদনে প্রেরিত হইতেছে। যাহা আমরা করি নাই, আমাদের দেশবাসী পার্শী ভ্রাতৃগণ বিলাতে তাহা করিতেছেন। পার্শী সম্প্রদায়ের অন্যতম কে,এস্, জাসাওয়ালা সাহেব বিলাতে ভারতীয় গোজাতির রক্ষার জন্য এক সমিতি স্থাপন করিয়া সেখানকার বড় বড় লোকের এমন কি, সম্রাট বাহাদুরের সহানুভূতি পাইয়া নীরবে কার্য্য করিতেছেন। বিলাতের মত বহু ব্যয় সাধ্য দেশে থাকিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহা হিন্দুমাত্রেরই দেখা কর্তব্য, বিশেষতঃ সাহিত্য-ভ্রাতৃগণের এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। আমি গো-জাতি সম্বন্ধে ২।১টী প্রবন্ধ হিতবাদীতে প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি বসুমতীতে ধারাবাহিক রূপে আমার প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হইতেছে। উহাতে গোজাতির সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত আছে। গো-সেবা, গো-উৎপাদন, তাহার বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী, গো-রক্ষা, গো-চিকিৎসা, ভারতীয় বিভিন্ন গোজাতি, দুগ্ধ ব্যবসা, বর্দ্ধিত মাত্রায় ডেয়ারি ফার্ম্মিং, সংকর উৎপাদন, প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ সকল প্রবন্ধে আছে। ঐ প্রবন্ধগুলিতে আমি দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার গোচায ও নিয়মাবলী ইত্যাদি আমার নিজ ৩২ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আলোচনা করিয়াছি। ভারত কৃষি প্রধান দেশ; গো-জাতির রক্ষা না করিলে অচিরে কৃষির বিশেষ হানি হইবে। নির্ম্মল দুগ্ধ ও ঘৃত ত প্রায়ই পাওয়া যায় না। আর কিছুদিন পরে ভারতের গাভীকুল নির্ম্মূল হইলে টীনের সুইশ দুগ্ধই দেশের সর্ব্বত্র বিরাজ করিবে। তাই বলি ভাই সাহিত্য-সম্প্রদায়! গোরক্ষায় অগ্রসর হইয়া মিঃ জাসাওয়ালাকে সাহায্য করুন। এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ই আমার নিকট পোষ্টেজসহ পত্র লিখিলে জানা যাইবে।

এই সমাজের পক্ষ হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনে, বঙ্গীয় লাট-সদনে, ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের নিকটে কৃষি এবং দুগ্ধ রক্ষার কারণ, গো-কুলের রক্ষা বিধান, যাহাতে আশু সম্পাদিত হয়, তাহার জন্য আবেদন করা হইয়াছে এবং বঙ্গীয় কৃষি-সমিতিতে এই লেখক প্রমুখ বহু ভারত-সন্তান কৃষির ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশা নিবারিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। যাহাতে বিশুদ্ধ ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনী দেশে পুনরায় সস্তাদরে পাওয়া যায়, যাহাতে বঙ্গের কৃষিবলের পুনঃ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি হয়,

তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইলে গোশক্তির উন্নতি বিধান করা প্রয়োজন। এই মহৎ কাজে একমাত্র মাহিষ্য-জাতিই বঙ্গের মধ্যে মনঃসন্নিবেশ করিয়াছে, অন্য কোন জাতির এদিকে দৃষ্টি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজকাল দেশের শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া কতিপয় সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণও এই বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেশের মধ্যে গোবীমা, চারণ, স্বল্প ব্যয়ে রেল ও জাহাজে নয়ন শুল্ক প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে দেশের কৃষি ও গোরক্ষার আশু উন্নতি কোন প্রকারেই সাধিত হইতে পাবে না।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

চিন্তা ও ভদ্রা।

(পৌরাণিক চিত্র।)

সপত্নীরে ভগ্নীস্নেহে আবরিয়া বুকে,
পূজিলা পতির পদ চিন্তা-ভদ্রা সুখে।

চিন্তা স্বনাম বিখ্যাত রাজা শ্রীবৎসের সহধর্ম্মিনী। রাজা শ্রীবৎস জ্ঞানে-গুণে এবং ধার্ম্মিকতায় ও মধুর আচরণে যারপরনাই সুজন বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। শ্রীবৎস মহিষী চিন্তাও স্বীয় অমিয়-মধুর চরিত্র প্রভাবে বুদ্ধিমতী ও পতিপ্রাণা সতী বলিয়া যশস্বিনী ছিলেন। ফলতঃ অনুরূপ সমাগমে রাজদম্পতির সুখের অবধি ছিল না।

একদা স্বর্গধামে আপনাদের শনি ঠাকুর ও লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মধ্যে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। তাঁহারা উভয়ের মধ্যে কে বড়, তাহার মীমাংসার জন্য ধর্ম্মাত্মা রাজা শ্রীবৎসের নিকট উপনীত হইলেন। রাজা মহা প্রমাদ গণিলেন। কারণ তিনি বুঝিলেন, ন্যায্য বিচারে যাঁহার পরাজয় হইবে, তাঁহারই অসঙ্গত রোষানলে আপনাকে দগ্ধ হইতে হইবে। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের বিচার নিষ্পত্তির ভার অর্পিত হইলে এমনটীই হইয়া থাকে। নৃপতি বিষম সমস্যায় পড়িয়া বিচার প্রার্থী দেবতাদিগকে পরদিন প্রভাতে পুনরাগমন জন্য বলিয়া দিলেন।

রজনী প্রভাতে রাজা শ্রীবৎস সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবতাদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেবতাদের বসিবার জন্য রাজ সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি স্বর্ণাসন এবং বাম পার্শ্বে একখানি রজতাসন সংরক্ষিত হইল। যথাসময়ে শনিদেব ও লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর আবির্ভাব হইল। রাজা সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া প্রণতি পূর্ব্বক দেবতাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজ-অভ্যর্থনা-তুষ্ট দেবতাগণ স্বইচ্ছায় স্বাভিমত আসন পরিগ্রহ করিলেন। রাজ সিংহাসনের দক্ষিণে স্বর্ণাসনে লক্ষ্মীদেবী এবং বামভাগে রজতাসনে শনিদেব উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মহারাজ! এখন বল আমাদের উভয়ের মধ্যে বড় কে?

রাজা বিনীত বচনে বলিলেন,—“আপনারা আসন গ্রহণ কালেই স্বয়ং সে বিচার মীমাংসা করিয়াছেন, এখন আর সে সম্বন্ধে আমি কি সিদ্ধান্ত করিব?”

রাজা শ্রীবৎসের সদুত্তর শ্রবণে বিজয়ী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রীতি-প্রফুল্লবদনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বর্গ-নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু পরাজিত শনি ঠাকুর নৃপতির প্রতি যারপরনাই রুষ্ট হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। স্বর্গের দেবতা অনর্থক গায়ে পড়িয়া মর্ত্ত্যের মানুষের সহিত ঝগড়া জুড়িয়া দিলেন। রাজার প্রতি শনির দুর্জ্জয় ক্রোধ-দৃষ্টি পড়িল।

শনির কোপে শ্রীবৎস রাজশ্রীভ্রষ্ট হইতে চলিলেন। দুর্ভিক্ষ, মহামারী সে রাজ্যের নিত্য সহচর হইয়া উঠিল। প্রত্যহ অসংখ্য প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল। দুর্ভিক্ষ-সহচর জ্বর, ওলাউঠা ও বসন্ত প্রবল বেগে শ্রীবৎসের মহা সমৃদ্ধ সোণার রাজ্যকে শ্রীভ্রষ্ট করিতে লাগিল। নিয়ত হাহাকার ও ক্রন্দন ধ্বনিতে দেশ পূর্ণ হইল। রাজ্যের শোচনীয় দুরবস্থা দর্শন করিয়া শোকে-দুঃখে নৃপতির হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সোণার রাজ্য শ্মশানে পরিণত হইল। রাজা সে শ্মশানতুল্য শ্রীভ্রষ্ট রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন সঙ্কল্প করিলেন।

রাজ-দুহিতা ও রাজ-বণিতা কুসুমকোমলা চিন্তা অরণ্যবাস ক্লেশ সহিতে পারিবেন না মনে করিয়া রাজা শ্রীবৎস সেই দুর্দ্দিনে পত্নীকে তাঁহার পিতৃভবনে রাখিয়া স্বয়ং বনযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পতিব্রতা সতী চিন্তা তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি পতিসহ বনযাত্রায় অভিলাষিণী হইয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আমি রাজমহিষী, এক সময় তোমার ঐশ্বর্য্য গৌরবে গৌরবিনী হইয়া মহামহিমান্বিতা রাজরাণীর বেশে মহা সম্ভ্রম-সমাদরে পিতৃভবনে গিয়াছি; আজ নিরাশ্রয়া দীনা ভিখারিনীর ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার সেই চিরউন্নত গৌরব-স্তম্ভ ম্লান করিতে—তোমার মহা সম্ভ্রম-গরিমায় কলঙ্ক লেপন করিতে পারিব না। আর আমি তোমার পত্নী হইয়া তোমাকে এই ঘোর বিপদের মুখে ডালি দিয়া কোন্ প্রাণে পিতৃভবনের রাজকন্যা যোগ্য ও রাজরাণীর ভোগ্য সে সব বিলাসের উপকরণগুলি ভোগ করিব? আমি প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না। আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিনী—সুখ-দুঃখে চিরসঙ্গিনী। এ দুঃখের সময় তোমার সহচারিনী হইয়া তোমার পদসেবা করিয়া যতটুকু পারি তোমার দুঃখ-দগ্ধ প্রাণে শান্তি প্রদান করিতে যত্ন করিব। অরণ্যবাস যতই ক্লেশপ্রদ হউক না কেন, আমি তোমার সঙ্গে থাকিলে অকাতরে তাহা সহ্য করিতে পারিব।

পত্নীর আব্দার-অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অগত্যা রাজা শ্রীবৎস সাধ্বী পত্নী ও কিছু ধন-রত্নসহ যামিনীর গাঢ় অন্ধকারে অঙ্গ আবরিয়া রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া বনে যাত্রা করিলেন।

রাজা-রাণী স্বরাজ্যের প্রান্তসীমায় উপনীত হইলে এক তীব্রগামিনী সুপ্রশস্ত স্রোতস্বিনী তাঁহাদের গতিরোধ করিল। তরীবিহীন জনমানব শূন্য বাপীতটে দাঁড়াইয়া পর-পারে যাইবার চিন্তায় রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন,

ক্ষণকাল পরে এক অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র তরী সহ জনৈক মাঝি তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই জীর্ণ তরীতে গুরুভার ধনরত্ন ও মণিমাণিক্যাদি সহ উভয়ে একেবারে পরপারে যাওয়া অসম্ভব হইল। রাজা সর্ব্বাগ্রে রত্ন পুঁটলীটী নৌকায় তুলিয়া দিলেন। কিন্তু শনির চক্রে রত্নসহ তরণীখানি অন্তর্হিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি পথের কাঙ্গাল হইলেন। দেব-চক্র—নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা কে রোধ করিতে পারে ?

সম্বলবিহীন রাজদম্পতী পথের কাঙ্গাল কাঙ্গালিনীর ন্যায় মনের দুঃখে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় অন্ন ও তৃষ্ণায় জল অভাবে তাঁহারা নিয়ত ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। একদা ক্ষুৎপিপাসাতুর রাজা বহু অনুসন্ধানে একটী শকুল মৎস্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। রাণী পরম যত্নে তাহা দগ্ধ করিয়া ধৌত করিবার নিমিত্ত অদূরবর্ত্তী এক জলাশয়ে উপনীত হইলেন। কর্ম্মবশে, অদৃষ্ট দোষে, শনি ঠাকুরের দারুণ রোষে হস্তস্থিত দগ্ধ মৎস্য সুগভীর জলে অন্তর্হিত হইল। রাণী বহু যত্নেও সে পোড়া মাছ আর খুঁজিয়া পাইলেন না। হায়! এখন তিনি ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর মুখে কি তুলিয়া দিবেন ?—দারুণ চিন্তায় রাণী আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুমুখী রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে পতির পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এ সবই শনির চক্র ভাবিয়া নৃপতি নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া রাণীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। হায়! বহু আয়াস লব্ধ কটু-কষায় বনফলে এবং বনস্থ ক্ষুদ্র ডোবার পঙ্কিল জলে, রাজদম্পতির দারুণ ক্ষুধা তৃষ্ণার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইল।

ক্রমশঃ বনে জীবন ধারণোপযোগী ফল মূলাদি খাদ্য পদার্থের অভাব হইয়া উঠিল। অগত্যা রাজা-রাণী এক নগরে উপনীত হইয়া কাঠুরিয়ার ব্যবসায় অবলম্বনে মহাক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস অন্তে রাজার পর্ণকুটীর গৃহের অদূরে বনপ্রান্তরস্থ নদীর তীরে একখানি পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বাণিজ্য তরী আসিয়া নদীর সৈকতে—চড়াভূমিতে দৃঢ় আবদ্ধ হইল। বণিকের শত যত্নেও সে দৃঢ় বদ্ধ নৌকা জলে ভাসিল না।

তখন গণকের ছদ্মবেশে শনিঠাকুর আসিয়া বণিকের কর্ণে কি জানি কি এক আশার মোহন উপদেশবাণী বলিয়া চলিয়া গেলেন। সদাগর, কাঠুরিয়া পত্নীদিগকে নদী পুলিনে সাদর নিমন্ত্রণ করিলেন। দলে দলে কাঠুরিয়া রমণীগণ নিমন্ত্রণে আসিয়া আহারান্তে একে একে সে চড়াভূমি সংলগ্ন বাণিজ্য তরী স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু কাহারও পুণ্য-পবিত্র হস্তস্পর্শে সদাগরের গুরুভার তরী জলে ভাসিল না। সদাগর বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। তখন যে ব্যক্তি কাঠুরিয়া পল্লীতে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল সে বলিল, নিমন্ত্রণ কালে একজন স্ত্রীলোক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই; হয়ত তিনি স্পর্শ করিলে নৌকা জলে ভাসিত।

বণিকের নিরাশ-প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। নৌকার লোকেরা কাঠুরিয়া পল্লীতে যাইয়া অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক চিন্তাকে বাধ্য করিয়া তাঁহাকে নদী-তীরে উপস্থিত করিল।

পরদুঃখ-কাতরা চিন্তা শরণাগতের উপকার—বিপন্নের সাহায্যার্থে তরী স্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন। সতীর পুণ্য-পবিত্র করস্পর্শে বণিকের বাণিজ্য-সম্ভার পূর্ণ গুরুভার তরণী মুহূর্ত্তে জলে ভাসিল।

পুনরায় বিপদে পড়িলে—আবার নৌকা আবদ্ধ হইলে ইঁহাকে কোথায় পাইব?—এই ভাবিয়া দুর্ব্বুদ্ধি সদাগর বল পূর্ব্বক উপকারিণী চিন্তাকে আপনার নৌকায় তুলিয়া লইল। নৌকা তীব্রগামী বিহঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। বন্দিনী দুঃখিনী রাজরাণী বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গীর ন্যায় প্রাণের জ্বালায় চীৎকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

চিন্তার হৃদয়-বিদারক করুণ ক্রন্দন-বিলাপ সবই বিফল হইল। পাষণ্ড সদাগর কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। মুক্তিলাভে নিরাশ হইয়া সতী আপনার অমূল্য নারীধর্ম্ম-রক্ষার্থ বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন শ্রীহরির পবিত্র নাম স্মরণ এবং তাঁহার চির-মঙ্গলময় অভয়পদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যোগনিরতা যোগিনীর ন্যায় কাতর প্রাণে নিয়ত তাঁহারই রাতুল পদ ধ্যানে সময়পাত করিতে লাগিলেন।

সতীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি—আন্তরিক প্রার্থনা মঙ্গলময় বিধাতার দরবারে পৌঁছিল। দেখিতে দেখিতে দৈবশক্তিপ্রভাবে অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি যারপরনাই কুরূপ পরিগ্রহ করিলেন। নিয়ত গভীর দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুদীর্ঘ কেশ অশীতিপর বৃদ্ধার পক্ক কেশের ন্যায় দুগ্ধফেননিভ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল। ঘোরতর বিষাদে তাঁহার সোণার অঙ্গ কালীমা-মগ্ন হইল; পদ্ম চক্ষু বসিয়া গেল। তরুণী রাজরাণীর অনুপম যৌবন-শ্রী গ্রীষ্ম প্রপীড়িত কোমল কুসুমের ন্যায় শুকাইয়া গেল। মানসিক দুঃশ্চিন্তা ও অনশন অনিদ্রায় তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি বিলীন হইল। শুভ্র কেশিনী বিমলীন-বিগতশ্রী কোটরগত চক্ষু, বিষাদিনী চিন্তাকে দেখিয়া তখন আর এই সেই চিন্তা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। সতী সাশ্রু-নয়নে প্রার্থনা করিলেন, ভগবন! পুনঃ স্বামী-পদে আশ্রয়লাভ না করা পর্য্যন্ত আমি যেন এমনি কুরূপা—কুৎসিতাই থাকি। ভগবান্ সতীর করুণ প্রার্থনা শুনিলেন। সর্ব্বজনঘৃণ্য কুরূপা চিন্তা আপন অভীষ্ট কদাকার দেহ লইয়া পাপিষ্ঠ বণিকের বাণিজ্যতরীতে বন্দিনী হইয়া রহিলেন।

রাজা, দুষ্ট সদাগর কর্ত্তৃক সাধ্বী-পত্নীর অপহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। প্রাণের গভীর যাতনায় তিনি উন্মাদের ন্যায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কালপ্রবাহে পত্নী-বিরহ দুঃখ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, নৃপতি কাঠুরিয়ার ছদ্ম-বেশে নদীতীরস্থ এক বনপ্রান্তরে বাস করিতে লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে তিনি ভূরি পরিমিত স্বর্ণপাট প্রাপ্ত হইলেন। একদা কাঠুরিয়াবেশী রাজা শ্রীবৎস বাপীতটে বসিয়া সেই পাট-গুলির সংস্কারকালে সেই অসাধু বণিকের বাণিজ্যতরী আসিয়া তটে লাগিল। রাজা আপনার স্বর্ণপাটগুলি নগরান্তরে বিক্রয় করিবার অভিলাষে সদাগরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। লুব্ধ বণিক স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ বুঝিয়া স্বর্ণপাট-সহ তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন।

পাপাত্মা বণিক স্বর্ণপাট লাভের বিষম লোভে অস্থির হইল। ধর্ম্মাত্মা শ্রীবৎস, পাষণ্ড সদাগর কর্ত্তৃক উত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুলা সুগভীর স্রোতস্বিনীর জলে বিসর্জ্জিত হইলেন। জীবনে নিরাশ হইয়া জলমগ্ন রাজা মনের দুঃখে বলিলেন,—হা চিন্তা! এ দুঃসময়ে তুমি কোথায়? মনে বড় দুঃখ রহিল, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একবার তোমায় দেখিয়া মরিতে পারিলাম না। বন্দিনী চিন্তা রাজার এই করুণ বিলাপ-বাণী, শুনিতে পাইলেন। পতির এ বিপদবার্ত্তা শ্রবণ এবং নৌকার গবাক্ষপথে নদীর জলে ভাসমান রাজার মোহনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পতিব্রতা চিন্তা শোকে-দুঃখে অভিভূতা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। বিধাতার কৃপায় সহসা তাঁহার মনে কর্ত্তব্য বুদ্ধির উদয় হইল। অনতিবিলম্বে তিনি পতির প্রাণ রক্ষার্থ একটা সুবৃহৎ উপধান গবাক্ষপথে জলে নিক্ষেপ করিলেন। পতিগত প্রাণা সতী এমন সাবধানে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত একার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন যে, নৌকার আরোহীরা ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। ভাসমান স্থূল উপাধান অবলম্বনে রাজার স্থূলোন্নত দেহ ভাসিয়া চলিল। ভাসিতে ভাসিতে তিনি বহুক্লেশে সৌতিপুর নামক এক সমৃদ্ধ নগরে উপনীত হইয়া জনৈক মালাকার-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

সৌতিপুর-রাজগৃহে আজ স্বয়ম্বর সভার মহা ঘটা। নানাদিগ্দেশাগত শত শত রাজা ও রাজকুমারগণ রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ জন্য সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। এমত সময় অপ্সরা বিনিন্দিতা পরম রূপসী বাহুদেব-রাজ দুহিতা ভদ্রা আপনার অনন্ত রূপ-যৌবন প্রভায় দশদিক উজ্জ্বল করিয়া বরমাল্য করে কন্দর্প-কামিনীর ন্যায় স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন।

পতিপ্রার্থনী ভদ্রা বহুদিন পূর্ব্বে রাজা শ্রীবৎসের শৌর্য্য-বীর্য্য ও ধর্ম্মভাব শ্রবণে তাঁহারই শ্রীচরণে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া, ঈপ্সিত স্বামীলাভের আশায় দীর্ঘকাল শিব ও শক্তির নিত্য আরাধনা ও দেবতার রাতুলপদে নিয়ত প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এখন স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত নৃপতিগণের পরিচয়কালে ভদ্রা তাঁহার প্রাণারাধ্য ধন রাজা শ্রীবৎসের দর্শন না পাইয়া মহা প্রমাদ গণিলেন।

তখন ঈপ্সিত পতি লাভের ঐকান্তিক প্রতিলাষে ভদ্রা মনে মনে, তদ্গতপ্রাণে যোগনিরতা যোগিনীর ন্যায় ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। সতীর কাতর প্রার্থনা জগৎপতির দরবারে পৌঁছিল। দীনহীন পথের-কাঙ্গাল শ্রীভ্রষ্ট রাজা শ্রীবৎস মালির আশ্রিত ব্যক্তির উপযোগী দীনবেশে স্বয়ম্বর সভার অদূরে দর্শক শ্রেণীর মধ্যে কদম্বমূলে দণ্ডায়মান ছিলেন। বিধাতৃবিধানে দৈববাণী প্রভাবে রাজকন্যা ভদ্রা ছদ্মবেশী রাজা শ্রীবৎসের পরিচয় ও দর্শন পাইয়া তাঁহারই গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সতীর মনোরথ পূর্ণ হইল।

কন্যা একজন অজ্ঞাত কুলশীল দীন ব্যক্তির গলে বরমাল্য অর্পণ করায় ভদ্রার পিতা রাজা বাহুদেব যারপরনাই ক্ষুণ্ণ হইলেন। ক্রুদ্ধ পিতা অবশেষে রাজপুরীর বাহিরে কন্যা-

জামাতার থাকিবার উপযোগী এক সাধারণ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। পিতৃ-পরিত্যক্তা পতি-ব্রতা সতী অভিলষিত পতি লাভ করিয়া কায়-মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়া যারপরনাই সুখী হইলেন। কিন্তু রাজা শ্রীবৎস ভদ্রার ন্যায় সতী-লক্ষ্মী স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াও অপহৃতা পতি-ব্রতা পত্নীর কথা ভুলিতে পারিলেন না। তিনি চিন্তার বিরহ-চিন্তায় নিয়ত বিমর্ষভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পতির বিমর্ষতার কারণ জ্ঞাত হইয়া পত্নী বড় দুঃখিতা হইলেন। এবং সপত্নীর দর্শন লালসায় নিয়ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভদ্রার সমবেদনাসূচক সান্ত্বনাবাক্যে বা অপরি-সীম প্রেম-ভক্তিতেও রাজা শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তিনি দিনের অধিকাংশ সময় বিমর্ষভাবে নদীতীরে বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন।

দ্বাদশ বর্ষ অন্তে একদিন সৌতিপুরের নদীর তটে রাজবাটীর অদূরস্থ ঘাটে সেই দুষ্ট সদাগরের নৌকা আসিয়া লাগিল। শ্রীবৎস সেই নৌকা আবদ্ধ করিয়া বন্দিনী চিন্তার উদ্ধার করিলেন।

পতিলাভের পর কুরূপা চিন্তা দৈবানুগ্রহ প্রভাবে পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া পাই-লেন। মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার অনন্য-সাধারণ রূপে গৃহ উজ্জ্বল হইল। ভদ্রা জ্যেষ্ঠ সহোদরা জ্ঞানে সপত্নী চিন্তার চরণে প্রণাম করিলেন। এবং চিন্তাও সহোদরার পবিত্রস্নেহে তাঁহাকে সাদরে বুকে টানিয়া লইলেন। মধুরে মধুর মিলন হইল। এ গঙ্গা যমুনা সম্মিলনে রাজা শ্রীবৎস যারপরনাই সুখী হইলেন। তাঁহার শুষ্ক অধরপ্রান্তে বহুদিন পরে আজ আবার হাসির মধুর রেখা ফুটিয়া উঠিল।

এত দিন পরে অভিনব শ্বশুর রাজা বাহুদের অনাদৃত ও অবহেলিত জামাতার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া আপনার ঘোর অবমৃশ্যকারিতা ও ত্রুটির জন্য লজ্জিত হইয়া সগৌরবে মহাসমাদরে কন্যা-জামাতা এবং চিন্তাকে মহাসমারোহে রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। শনি-কোপ-মুক্ত শ্রীবৎসের রাজ্যে পূর্ণ লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল। ধনধান্য ও মহা সমৃদ্ধিতে প্রকৃতিপুঞ্জের গৃহ পূর্ণ হইল। নিত্য উৎসব আনন্দে রাজার রাজ্য আবার মুখরিত হইয়া উঠিল। সতী-লক্ষ্মী চিন্তা ও ভদ্রার কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল। রাজা শ্রীবৎসের সত্যবাদীতা, ধার্ম্মিকতা ও ন্যায়-বিচারপরায়ণতার জয় হইল। সাধনায় সিদ্ধি-লাভ এমনি কঠোর! রাজা মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। দেবতারা ছল করিয়া ধার্ম্মি-কের ধর্ম্ম পরীক্ষা—পতিব্রতা সতীর পতি-প্রেম পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে চির অমরতার পবিত্র-আসনে বসাইয়া দিলেন। স্বর্গে দুন্দুভী বাজিয়া উঠিল—সুরপুরবাসিনী পুরাঙ্গনাগণ বিজয়ী রাজ-দম্পতির মস্তকে আশীর্ব্বাদের পবিত্র নির্ম্মাল্য-পুষ্প বর্ষণ করিয়া নশ্বর জগতে সত্য ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিলেন। উচ্চ আদর্শ লাভে নরলোক কৃতার্থ হইল।

শ্রীবরদা কান্ত কবিরত্ন।

গীতাতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গীতার প্রথম হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত জ্ঞান—গৌণরূপে এবং কর্ম্ম—প্রধানরূপে; সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত, জ্ঞান—গৌণরূপে ও উপাসনা—প্রধানরূপে; এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে শেষ অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—সমন্বয় পূর্ব্বক, জ্ঞান-প্রধান ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বেদব্যাস কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ, সুতরাং ইহা স্বভাবিক আপ্ত বাক্য, এবং বেদব্যাস ঋষিপ্রোক্ত বলিয়া ইহা সিদ্ধ আপ্ত বাক্য। গীতা শ্রীভগবদ্বাক্য, কারণ ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণ, যিনি স্থূল, শরীরি ঐতিহাসিক পুরুষ; আর বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সুক্ষরূপী চিন্ময়ীমূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে অসুরগণের বধার্থ উদয় হইয়াছিলেন, এমত নহে; তিনি বিলুপ্তপ্রায় মোক্ষ সাধক বৈদিক অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পথেরও উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। সাধকের কর্ত্তব্য যথা :—

(১) চিত্তশুদ্ধি করা, অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্দ্বারা নিত্য বস্তু নির্ণয়ে সমর্থ হওয়া।

(২) ইহলোকের সুখভোগ এবং পর-লোকের স্বর্গাদিরূপ অনিত্য সুখের প্রতি বিদ্বেষ জন্মান।

(৩) নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্ত ও সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া চিত্তশুদ্ধি ও আত্মসংযম করা।

(৪) এইরূপে একান্ত মুক্তি পিপাসু হওয়া।

এই সাধন চতুষ্টয় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার হয়। কিন্তু ভক্তি লাভার্থীর এ বাধা নাই। ভক্তি পথের পথিক হইতে হইলে চিত্তা-বস্থা ঈশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হওয়া চাই। ভক্তের মুক্তিপথ সুবিস্তৃত।

রাজা পরীক্ষিত, হনুমান ও পৃথুরাজা, ইঁহারা গুণমাহাত্ম্য; পৃথুরাজা—পূজাসক্ত, প্রাহ্লাদ শবণাশক্ত, হনুমান, বিভিষণ, অক্রুর, বিজয় প্রভৃতি দাস্যাসক্ত ভক্ত ছিলেন। অর্জ্জুন সুগ্রীব, উদ্ধব, কুবের, ব্রজরাখালগণ—সখ্যা-সক্ত। নন্দ, উপানন্দ, দশরথ, কশ্যপ, অদিতি, কৌশল্যা, যশোদা, মেনকা—বাৎসল্যের পরিচয়। ব্রজ-গোপিগণ কান্ত ভাবে উদ্বার হইয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বলিরাজের আত্মনিবেদনাসক্তি! নারদ, শুক, কৌণ্ডিল্য—ভগবানের তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে সৈন্য দর্শন বা অর্জ্জুন-বিষাদযোগ বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সমগ্র নৃপতি-মণ্ডল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধের প্রতিক্ষা করিতে-ছেন। এমত সময়ে অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনা মধ্যে রথ লইয়া গেলে অর্জ্জুন দেখিলেন যে, তাঁহার সমুদয় আত্মীয় স্বজন যুদ্ধার্থে উপস্থিত। তখন তিনি শোকে একান্ত কাতর হইয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ পূর্ব্বক উদ্বিগ্ন মনে রথোপরি বসিয়া পড়িলেন।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যালাপ বর্ণিত। ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, এরূপ সঙ্কট সময়ে তাঁহার এরূপ মোহ ও ক্লীবত্ব আর্য্যোচ

অযোগ্য। অর্জ্জুন বলিলেন যে,তিনি বরং ভিক্ষা করিয়া খাইবেন, তথাপি গুরুজন নিধন করিতে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। তাঁহার এই ইন্দ্রিয় বোধক শোক ধরার রাজ্যে কিম্বা সুর-রাজ্যেও বিমোচন হয় না। তখন ভগবান সহাস্যবদনে তাঁহাকে গীতোক্ত ধর্ম্ম বুঝাইতে লাগিলেন। এই খানে গীতা আরম্ভ হইল। ভগবান বলিলেন যে, অর্জ্জুন জ্ঞানী হইয়াও, যে বিষয়ে শোক করা উচিত নহে, তাহাতে শোক করিতেছেন। ভগবান তিন প্রকারে বুঝাইলেন, যথাঃ প্রথমতঃ, এই যে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই, কেবল দেহমাত্র অন্ত হয়। অতএব আত্মাকে কেহ বধ করিতে পারে না, আত্মাও কাহাকে বধ করে না, মানুষের দেহেঃযেরূপ কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সংঘটিত হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থান্তর মাত্র। দ্বিতীয়তঃ যদি মনে কর যে আত্মা নিত্য জন্মিতেছে, নিত্য মরিতেছে, তাহাতেও শোক অনুচিত। আত্মা নিত্য, তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। আর দেহ আদিতে অব্যক্ত থাকে বলিয়া কেহই শোক করে না, তবে নিধনে অব্যক্ত হয় বলিয়া শোক কেন? তৃতীয়তঃ অন্য কারণে না হইলেও স্বধর্ম্ম জন্য যুদ্ধ করা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ, ইহার উদ্দেশ্য পরস্বাপহরণকারী দুরাচারের দমন, ইহারই নাম সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ। ভোগ ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি ফল কামনা করিয়া যে কর্ম্মাদি করা যায়, তাহাতে চিত্ত ভগবানে সমর্পিত বা স্থিরীকৃত হয় না, এ কারণ কর্ম্ম হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তবে কি কর্ম্ম করিবে না? অবশ্য করিবে? সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয় উভয়ই সমান, এরূপ যোগ অবলম্বন করিলে, তোমার জ্ঞান ব্রহ্মেতে স্থির হইবে অর্থাৎ তুমি স্থির-প্রজ্ঞা লাভ করিবে। নিষ্কাম, জিতেন্দ্রিয় এবং ঈশ্বর-পরায়ণ যোগীই স্থির-প্রজ্ঞ।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ বর্ণিত। উপরে ভগবান বলিতেছেন যে কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তাহাতেই অর্জ্জুন বলিলেন যে তবে কেন আমাকে ও ঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন? ভগবান উত্তর করিলেন যে কর্ম্ম না করিয়া লোক নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না, প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়াও কর্ম্ম করিতে হয়। যতদিন আত্মতৃপ্ত অবস্থা না হইবে, ততদিন নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করাই উচিত। তদ্ভিন্ন লোকশিক্ষার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। অজ্ঞানীরা যে কার্য্য সকামভাবে করে, জ্ঞানীরা তাহা নিষ্কামভাবে করিয়া থাকে। তুমি দুষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতেছ, অর্থাৎ যুদ্ধ করিতেছ না, তাহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; এবং তাহাও যদি ভাল হয়, কিন্তু শাস্ত্রে আছে যে, অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বিগুণ স্বধর্ম্মও ভাল। কাম ও ক্রোধ দ্বারা চিত্ত-বিকার জন্মাইয়া পুরুষকে অনিচ্ছায় পাপে নিযুক্ত করে; এ জন্য ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া ইহাদিগকে ধ্বংস করিবে।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্ম্ম বিভাগ যোগ বর্ণিত। ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করাই, কর্ম্মযোগ। কিন্তু কোনটী সুকর্ম্ম, কোনটী দুষ্কর্ম্ম এবং কর্ম্মহীনতাই বা কি, তাহা কি প্রকারে

জানিবে। যখন লোকের এরূপ দুরবস্থা হয় যে, সুকর্ম্মে দুষ্কর্ম্মে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ সংসার হইতে ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন ভগবান শরীর গ্রহণ করিয়া মানব জাতিকে প্রকৃত ধর্ম্ম এবং প্রকৃত কর্ত্তব্য জ্ঞান শিক্ষা দেন, যাহা লাভ করা বহু জ্ঞান ও তপস্যার ফল।

এই অধ্যায়ে সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অবতার গ্রহণের হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে ভগবান শ্রীমুখে অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন ঃ—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ—হে পার্থ! যে পুরুষ যে প্রকারে আমাকে ভজন করে, আমি যে পরমেশ্বর, সেই পুরুষকে তাহার ভজন অনুরূপ অনুগ্রহ করি। কর্ম্মের অধিকারী মনুষ্যসকল সর্ব্বপ্রকারে আমারই ভজনরূপ পন্থার অনুসরণ করিতেছে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

অর্থাৎ, ভগবানের নামরূপ নাই, নামরূপ মায়ার অংশমাত্র। কিন্তু ভক্ত, শুদ্ধ অন্তঃকরণে যে নামে যে রূপে ভগবানকে উপাসনা করেন,সেই ভাবেই ভক্ত উপাসকের ভাবনা ভগবান পূর্ণ করেন। কারণ এক বৈদিক-ধর্ম্মের মধ্যে অনেক প্রকার উপাসনা আছে। দ্বৈত, অদ্বৈত, সগুণ, নির্গুণ, ভক্তের ভাবনাভেদে এবং ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা অধিকারীভেদে অনেকপ্রকার উল্লেখ আছে। উক্ত নানাবিধ উপাসনা লক্ষ্য করিয়া ভগবান প্রাগুক্ত শ্লোক বলিয়াছিলেন। উপরিলিখিত "যে যথেতি" শ্লোকের ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ—

হে অর্জ্জুন! ইহসংসারে দুঃখ দ্বারা পীড়িত যে আর্ত্ত পুরুষ, তথা ধনাদিপ্রাপ্ত ইচ্ছাযুক্ত যে অর্থার্থী পুরুষ, তথা আত্মাকে জানিবার ইচ্ছাযুক্ত যে জিজ্ঞাসু পুরুষ, তথা তত্ত্ব সাক্ষাৎযুক্ত যে জ্ঞানী পুরুষ, এই চারি প্রকার ভক্তের মধ্যে যে যে ভক্ত সকামরূপে অথবা নিষ্কামরূপে সর্ব্বকার্য্য ফলদাতা যে "আমি পরমেশ্বর" আমাকে ভজনা করে, সেই সেই ভক্তের মনোবাঞ্ছিত ফল পূর্ণ করিয়া "আমি পরমেশ্বর" তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, আমার ভক্তজনকে তাহার ভাবনার বিপরীত ফল কখন প্রদান করি না। আর্ত্ত ভক্তকে তাহার দুঃখরূপ পীড়া নিবৃত্তিরূপে অনুগ্রহ করি। অর্থার্থী ভক্তজনকে ধনাদি পদার্থ প্রাপ্তি দ্বারা অনুগ্রহ করি। বেদবিহিত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী যে জিজ্ঞাসু ভক্ত তাহাকে "আমি পরমেশ্বর" আমার স্বরূপভূত জ্ঞানের যোগ-ক্ষেম প্রদান রূপই অনুগ্রহ করিয়া থাকি, এবং জ্ঞানবান ভক্তকে ত মোক্ষরূপই আমার পদ প্রদান পূর্ব্বক অনুগ্রহ করি। ইহাতে অর্জ্জুন শঙ্কা করিয়া বলিলেন—"হে ভগবান! আপনি আপনার ভক্তজনকেই ত রক্ষা করেন, অনুগ্রহ করেন, কিন্তু যে পুরুষ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহাকে ত আপনি কিছুমাত্র অনুগ্রহ করেন না। অন্তর্যামী ভগবান অর্জ্জুনের অন্তরের ভাবনা জানিয়া উক্ত শ্লোকের উত্তরার্দ্ধে বলিয়াছেন ঃ—

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন! কর্ম্মের অধিকারী পুরুষ যিনি ইন্দ্র, অগ্নি,সূর্য্য ইত্যাদি দেবতাকে ভজনা করেন, তাহাকেও "আমি" অন্তর্যামী বাসুদেব ইন্দ্রাদি দেবতা রূপে তৎতৎ ফল প্রদান করি।

ইহাপেক্ষা আশ্বাসের কথা আর কি হইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ বর্ণিত। ঈশ্বর জ্ঞান লাভার্থে কর্ম্ম ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ ফল কামনা ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। উভয়ই শ্রেয়স্কর। তথাপি সন্ন্যাস বা কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। অতএব সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পৃথক নহে।

কর্ম্মযোগ বিহীন সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ। কেননা, কর্ম্মযোগী সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দেখে এবং সে মনে করে যে ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয় জন্য ইন্দ্রিয়েরা কর্ম্ম করিতেছে। অতএব সে কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসীর ন্যায় কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। সে কেবল আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করে মাত্র; সে কেবল প্রকৃত রূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তিলাভ করে। এত অল্প কথায় ভগবান এমন একটী মহৎ ও পূর্ণচিত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোগ বর্ণিত, অর্থাৎ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ বা "যোগের" কথা। যে ব্যক্তি যোগাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্ম তাহার অবলম্বন। আর যে ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হইয়াছে, তাহার অবলম্বন শান্তি, তাহার আর কর্ম্ম নাই। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেন—যাহারা মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন যোগে অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা কি ছিন্ন মেঘের মত উভয়-লোক ভ্রষ্ট হয়? উত্তরে ভগবান বলিলেন—কখন না! কল্যাণকারী ভিন্ন দুর্গতি কখন হয় না, এবং পর পর জন্মে যত্ন করিয়া সিদ্ধ হয়।

সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞান যোগ বর্ণিত। সকল যোগের লক্ষ্য কেবল পরমগতি বা পরমব্রহ্মের প্রকৃতি কিরূপ? তদুত্তরে ভগবান বলেন—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার—এই ভগবানের অষ্ট প্রকৃতি। ইহারা অপরা প্রকৃতি। জীবভূত অন্য যে পরাপ্রকৃতি আছে, তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক ভাবে জগৎ বিমুগ্ধ। কেবল চতুর্ব্বিধ পুণ্যবানেরা ভগবানের ভজনা করে, যথা—১ পীড়িত, ২ তত্ত্বজিজ্ঞাসু, ৩ অর্থাকাঙ্ক্ষী, এবং ৪ জ্ঞানী, যাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষয় ব্রহ্মযোগ বর্ণিত। অধিভূতাদি কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝাইলেন এবং আরও বলিলেন—যে ভূতগণের এই ব্যক্ত অব্যক্ত অবস্থা ভিন্ন বুঝাইয়া, ভগবান শেষে এই রকম উপদেশ দিলেন যে, তুমি যোগান্বিত হইয়া যুদ্ধ কর।

নবম অধ্যায়ে রাজগুহ্যযোগ বর্ণিত, অর্থাৎ ঐশ্বরিক রাজগুহ্য ভাব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিগূঢ় তত্ত্ব। ভগবানই জগতের সর্ব্বেসর্ব্বা, লোকেরা একত্বে বা পৃথকত্বে তাঁহারই পূজা করে।

দশম অধ্যায়ে বিভূতিযোগ বর্ণিত। ভগবানের বিভূতি বার্ত্তা অনন্ত। জগতের যে জাতীয় দ্রব্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাই তাঁহার বিভূতি।

একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন। বিশ্বব্যাপী ঐশী-রূপ দেখিতে হইলে দিব্যচক্ষু বা দিব্যজ্ঞান দরকার। যাঁহারা যোগ-শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের উক্তি এই যে আত্মা "মহিমা সিদ্ধির দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিতে পারে। আমরা বিশ্বের

দ্বারাই একশত বিশ্বেশ্বরকে জানিতে পারি, ইহার দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব বিশ্বই তাঁহার রূপ; তিনি বিশ্বরূপ। দিব্যচক্ষু বা দিব্যজ্ঞানের দ্বারা অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপ দেখিলেন, দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া ধ্যান করিলেন। কালগ্রাস বা মৃত্যু, প্রাণীমাত্রেরই অপরিহার্য্য অদৃষ্টলিপি, তাই বলিলেন—যুদ্ধ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বর্ণিত। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবানকে যাহারা সাকার-ভাবে উপাসনা করে, আর যাহারা অব্যক্ত নিরাকার ভাবে উপসনা করে, এই দুই প্রকার উপাসক মধ্যে কাহারা উত্তম।" ভগবান বলিলেন যে,—"নিরাকার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ; যাহারা এরূপ ভাবে অব্যক্তের উপাসনা করে এবং সর্ব্বভূতের হিতে রত, তাহারাই আমাকে পায়।" কিন্তু নিরাকার উপাসনা বড় কঠিন। উপসংহারে ভগবান বলিলেন যে,—"যাহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যাহার দুঃখাদিতে সমজ্ঞান, জীতেন্দ্রিয়, সেই আমার প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ বর্ণিত। শরীর, ক্ষেত্র; ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞ এই ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ভূতগণের সাধারণ প্রকৃতি যাহা, তাহা ক্ষেত্রের বিকৃতি এবং পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট প্রকৃতি সকলের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞেয় স্বয়ং ভগবান। এই জ্ঞেয় পুরুষ আর প্রকৃতি উভয়ই অনাদি; এবং গুণ ও বিকার মাত্রই প্রকৃতি সম্ভূত। গুণসঙ্গ জন্যই সদসৎ যোনিতে জন্ম; পুরুষ তাহাতে লিপ্ত নহেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয় বিভাগ যোগ বর্ণিত। গুণরাশি তিন ভাগে বিভক্ত,—সত্ত্ব, রজঃ ও তম। তাহার পর এই তিন গুণে মানুষকে কি প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, ইহারা বর্দ্ধিত হইলে কিরূপ হয়, সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে কি শক্তি হয়, এবং তাহার ফলাফল কিরূপ, ভগবান তাহা বিস্তারিত রূপে বুঝাইলেন। এই ত্রিগুণ অতিক্রম না করিতে পারিলে মুক্তি নাই। এই তত্ত্ব নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের মূল-মন্ত্র। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, সমজ্ঞানী এবং নিষ্কাম, সেই ব্যক্তিই গুণাতীত।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগ বর্ণিত। সেই ত্রিগুণাত্মক সংসার কিরূপ, তাই একটী "ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখা অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষের" সঙ্গে তুলনা করিয়া অতি সুন্দর রূপ বুঝান হইয়াছে। বৈরাগ্য দৃঢ়াস্ত্রে ইহাকে ছেদন করিয়া পরম-ধাম অন্বেষণ কর, ইহাই চরম উপদেশ। মৃত্যু ও জন্ম সময় এই গুণভোগী ইন্দ্রিয়গণ কোথায় যায়? শেষে মিমাংসিত হইল যে, ত্রিগুণান্বিত ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত ভূতগণ ক্ষয় এবং ভূতস্থ পুরুষ অক্ষয়।

ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ যোগ বর্ণিত। ত্রিগুণান্বিত ও ইন্দ্রিয় সমন্বিত লোক দুই প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। যাহারা দৈব সম্পদে অভিজাত অর্থাৎ দৈবগুণ বিশিষ্ট হইয়া জন্মায়, তাহারা উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল লাভ করে; আর যাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরায়ণ তাহারা আসুরী সম্পদে অভিজাত। এই অসুর জন্মবাদের প্রবৃত্তি যেরূপ

বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমাদের আধুনিক সমাজের একটী জীবন-চিত্র। পুরুষানুক্রমে সচরাচর যোগীর সন্তান যোগী, পাপীর সন্তান পাপী, এবং পুণ্যাত্মার সন্তান পুণ্যাত্মা হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্র অনুসারে পতি—পত্নীর গর্ভে সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য পত্নীর নাম জায়া।

সপ্তদশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ বর্ণিত। মানুষের দুই প্রকার প্রকৃতি এবং মানুষের শ্রদ্ধা তিন ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। এ তিন শ্রদ্ধানুসারে লোকের পূজা, আহার, যজ্ঞ এবং তপ সকলই তিন প্রকার।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষযোগ বর্ণিত। উপরোক্ত যজ্ঞ, দান, তপ কর্ম্মাদির দ্বারা মনিষীরা পবিত্র হইয়া থাকেন। অতএব তাহা কদাচিৎ ত্যাগ করিবে না। দেহকর্ত্তা, ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টা, এবং দৈব, ইঁহারা কর্ম্মের হেতু।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এ তিন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা ইহারা কর্ম্মের আশ্রয়। জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং সুখ, গুণভেদে ত্রিবিধ অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই স্বাভাবিক কর্ম্ম করিলে কদাচ পাপ হয় না। এখানে গীতা শেষ হইল। "লক্ষ তুমি এক মাত্র শরণ আমার।"—এইটী গীতার মূলমন্ত্র ও চরমশিক্ষা।

ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার প্রকৃতির বা শক্তির ব্যক্তভাবই পরিদৃশ্যমান জগৎ। তাঁহার প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট; তাহার প্রকৃতির দ্বারা জগৎ বর্দ্ধিত ও পালিত; এবং তাহার প্রকৃতিতেই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। তিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মা। অতএব আত্মা অমর। মৃত্যু দেহের অবস্থান্তর মাত্র। এই প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্যের নাম স্বধর্ম্ম। অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া এবং ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া, নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিলেই চরম মনুষ্যত্ব বা চরম সুখলাভ হয়। ভগবান সর্ব্বভূতস্থ। অতএব সর্ব্বভূতকে আত্মসম জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বভূত হিতার্থে কর্ম্ম করিলেই, কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পিত হয়। ভারতের হৃদয়ে কৃষ্ণ, বাহুতে পার্থ অধিষ্ঠিত না হইলে ভারতের শ্রী, বিজয়োন্নতি ও ধ্রুবনীতির আশা নাই।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণোযত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

The Gita is the cream of Hindu philosophy. The Gita speaks of devotion; it treats of jnan (জ্ঞান) or omniscience. When we understand the world, the soul and Supreme Brahma, we are said to have jnan. The Gita talks of yoga (যোগ) or communion with Him through meditation. The Essence of Brahma is Sattwa (সত্ত্ব) or present existence, jnan (জ্ঞান) or omniscience, and ananda (আনন্দ) or pleasure is included in jnan (জ্ঞান)

Karma (কর্ম্ম) or act is indispensably necessary for purifying the mind and paving the way to emancipation. The mind, purified, becomes capable of yoga (যোগ) or meditation. Purusha and Prakriti (পুরুষ প্রকৃতি) are merely the evolutions of one

Supreme Being. Supreme Energy.

Act we must, even when we attain to the transcendental stage. Yet liberation from the effects of act is the highest aspiration, called Mukti (মুক্তি) or emancipation from the bonds of Karma (কর্ম). Act, without the yearning for reaping the fruit is not an act, which can trammel the soul. This is (নিষ্কাম কর্ম). We are to act with the sense that we are doing it because it is our duty. We should abandon all craving for the benefits that can be had from acts.

The theory the Gita admits, is the existence of both the created and the creator, of both Brahma (ব্রহ্ম) on the one hand and the world on the other, including spirit and matter. As regards the *sammau bonum* of jiva soul (জীব) "Service to Him" the view of Bhakti (ভক্তি). Realization of the identity of Supreme Brahma with one's own self is principal Bhakti. The foremost place is given to Bhakti (ভক্তি). All the three, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি should be united in jiva (জীব) to achieve his highest aspiration. These are means, and the one end is Brahma (ব্রহ্ম). Jiva (জীব) is restrained by his own nature ; he can not transcend it. He can not be merged into Brahma (ব্রহ্ম). Distinction must remain between the two.

The Gita teaches that all systems of religion are so many paths towards God. They may be circuitons, bent or straight, but certainly the devotee shall approach God by any one of them.

Philosophy can not bestow consolation or peacse of mind, but religion can, and does. All sages get it through religion. Study divine laws under a Saint, and thou shalt never be disappointed. Make your body and mind pure to retain spiritual lessons. Cast off prejudice and impurity in thought and action ; cultivate faith and earnestness. Truth and God will appear as brilliant as the sun. Any religion followed sincerely leads to purity and faith. Follow the saints but never depend upon the untutored soul to lead you to God. God is pure and holy. He is approachable. In his infinite goodness, He teaches men to conceive the infinite and the absolute.

The Gita came into existence owing to Arjun's unwillingness to do his duty as a Khettriya (ক্ষত্রিয়) to fight for a just cause—because it involved the destruction of his own people. Not that Arjuna failed recognise the justice and right of the cause, but he would rather renounce the world and try for Moksha (মোক্ষ) than kill his relations and friends. Krisna's characterization of this weak sentimental attitude of Arjuna is well known. He called it "Unarjya" (অনার্য্য) like, delusive, contrary to the attainment alike of heaven and honor, and exerted Partha (পার্থ) to yield not to unmanliness, but to cast off this mean faintheartedness. "Could a coward

who fails to do his duty, be worthy to attain Moksha (মোক্ষ) ?"—seems to be Krisna's rejoinder. Could a man not purified by the primordeal of his Swadharma (স্বধর্ম), could a renegade a slave attain Moksha (মোক্ষ) ? No ! says the Lord. And this is the lesson we Indians have forgotten all these years, though we have been reading the Gita all the time.

The Gita opens with Dhritarastas query to Sanjoy about the progress of events. Sanjoy faithfully reported to Dhritarastra all the occeurrences in connection with the war as reflected in his mind. The Gita is Upanishad (উপনিষদ), because it contains the essence of self-knowledge, and as its teachings like those of the Vedas (বেদ) are divided into three sections of Karma or Work, Upashana or devotion and Gyan or knowledge.

The first chapter is introductory, and the second is a summary of the whole work. Self-less work devoid of desire for fruits, is taught for the purification of the heart. Devotion is taught to the pure hearted, to qualify them further for the holy work of highest Sanyas (সন্ন্যাস).

It is also usual to divide the work into three sections, illustrative of the three terms of the mohabakya (মহাবাক্য) "thou art that" তত্ত্বমসি. In this view, the first six chapters explain the path of work without desire for fruits and the nature of "thou". The next six chapters deal with devotion and the nature of "that". The last six chapters describe the state of the highest knowledge and the nature of the middle term "art", the means of re-establishing the *identity* of "thou" and "that".

The central teaching of the Gita is the attainment of Freedom, by the performance of one's Swadharma (স্বধর্ম) or duty in life. Do thy duty without an eye to the result thereof. Thus shouldst thou gain the purification of heart which is essential for Moksha (মোক্ষ)"—seems to be the key-note of Krisna's teachings to Arjuna.

Life in this world is but transitory, that there is another existence after death, and that man is to be rewarded or punished according to the nature of his Karma (কর্ম) or acts in this world. Man is endowed with both high and base faculties, and the highest duty of man is to cultivate his higher sentiments and keep his lower, under control. By such culture a man may become something like a God or angel, and by a reverse process he may convert himself into something like an animal or anything lower even than that. Therefore—

"Act, act in the living present
Heart within, and God over head.'
"The highest bliss is rooted deep
in woes".

In conclusion, let us pray :—

"Thou art, O God ! the life and light
Of all the wondrous world we see
Wherever we turn, thy glories shine

And all things fair and bright are thine".

All mercy and everloving God, we seek refuge in Thee and with love and reverence pray to Thee that in thine infinite mercy, prevent the wandering of our hearts and draw us into intimate unision with Thyself, giving us salvation, which is eternal peace.

Let peace be with us all.

শ্রীআনন্দগোপাল সেন।

আশা।

(ক্ষুদ্র গল্প)

হরমোহন বাবুকে বড়ই নির্লিপ্ত স্বভাবের লোক বলিয়া বোধ হইত। জগৎ সংসারের সহিত তাঁহার বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। যথাসময়ে পোষাকটী পরিয়া ছাতাটী মাথায় দিয়া আফিসে যাওয়া ও আফিস হইতে বাটী ফিরিয়া আসা এই দুইটী তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে তাঁহাকে বড় একটা দেখা যাইত না। তবে প্রয়োজন হইলে পাড়ার কাহারও কাহারও সহিত ২।৪টী কথা বলিতেন মাত্র।

হরমোহন বাবুর সংসারটী ক্ষুদ্র। শ্রীমতী হরিমতী এই ক্ষুদ্র সংসারের গৃহিণী। হরমোহন নিজের গুড়গুড়ি, তাকিয়া ও দুই একখানি পুস্তক লইয়া সময় কাটাইতেন। আর হরিমতী গৃহের পারিপাট্য করিতে ও সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে তাঁহার সমস্ত সময় ব্যয় করিতেন। অভ্যাগতের গতি বিধি নাই, বালক বালিকার কোলাহল নাই—কাজেই হরমোহন বড় শান্তি-সুখে কাল কাটাইতেন।

বিধাতার খেলা কে বুঝিতে পারে। সহসা একদিন আঁধার ঘরে একটী ক্ষুদ্র আলো জ্বলিয়া উঠিল। হটাৎ একদিন সন্ধ্যাকালে হরমোহনের নিস্তব্ধ গৃহ আনন্দ-কোলাহলে ভরিয়া গেল। যেন দেবতা-পূজার একটী নির্ম্মাল্য দেবপাদচ্যুত হইয়া হরিমতীর শূন্য অঙ্কে খসিয়া পড়িল। প্রতিবেশিনীগণের এ গৃহে বড় একটা গতাবিধি ছিল না, কিন্তু আজ সে নিয়ম ভাঙ্গিয়া গেল। এতদিনের পর হর-মোহনের একটী মেয়ে হয়েছে শুনিয়া সকলে দেখিতে আসিলেন। মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া হরিমতীর বহুদিনের শুষ্ক মাতৃস্নেহ এক-বারে উথলিয়া উঠিল। এতদিন হরমোহনের সংসার ছিল, কিন্তু তিনি সংসারী ছিলেন না। বন্ধন-রজ্জু তাঁহাকে কোনরূপে বাঁধিতে পারে নাই। আজ তিনি নিজে আসিয়া বাঁধা পড়িলেন। মেয়েটী যেন একটা আকস্মিক উৎপাতের মত তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে হাঙ্গামা বাঁধাইয়া দিল। প্রসবের পর হইতেই হরি-মতী পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হর-মোহনের শান্তি সুখ একেবারে গিয়াছে। গৃহ অভিভাবক শূন্য; পীড়িতার যথারীতি শুশ্রূষা হইতেছে না, কন্যাটীরও যত্ন হয় না। হর-মোহনের এ বিপদের সময়, যাঁহারা পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকে এখন তাঁহার সাহায্য করিতে আসিলেন। হরমোহনকে আবার জগতের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইল, এরূপ

বিপদ-আপদে একমাস অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় মাসে হরমোহনের অন্নলক্ষ্মী কন্যা-রত্নটীকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বর্গগামিনী হইলেন।

পত্নীর আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া হরমোহন যখন গৃহে আসিলেন, তখন একজন বর্ষীয়সী প্রতিবেশিনী কন্যাটীকে আনিয়া তাঁহার কোলে দিলেন। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া পিতার দুই চক্ষু বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পত্নীবিয়োগের পর তাঁহার এই প্রথমঅশ্রুপাত। পীড়িতার সেই শীর্ণ দেহলতা ও অন্তিম-বাক্য সবই আজ মনে পড়িল। "খুকীকে কোলে লও" এই হরিমতীর শেষ কথা। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া হরমোহনের সে কথা মনে পড়িল। বোধ হইল যেন, হরিমতীর প্রেতাত্মা সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"ছি! কাঁদ কেন? চোখ মুছে ফেল; আমার স্মৃতিচিহ্ন ত তোমায় দিয়া আসিয়াছি। একবার আমার খুকীকে কোলে লও।" হরমোহন প্রগাঢ় স্নেহে খুকীকে বুকের মাঝে টানিয়া মুখচুম্বন করিলেন।

বন্ধুরা বলিলেন— এমন করিয়া আর কতদিন থাকিবে। মেয়েটীকে ত বাঁচাইতে হইবে। আবার বিবাহ কর। প্রবীণেরা বলিলেন "হরমোহন, এত অল্প বয়সে কি গৃহশূন্য হওয়া শোভা পায়। বয়স্কা পাত্রী দেখিয়া আবার বিবাহ কর। হরমোহন এ সকল কথায় নীরব থাকিতেন।

মেয়ের মুখের দিকে চাহেন আর চোখে জল আসে। আহা কি সুন্দর মুখশ্রী! একি বাঁচবে! ভগবান কি দয়া করিয়া হতভাগার তাপিত প্রাণ শীতল করিতে মেয়েটীকে জীবিত রাখিবেন?

মেয়েটী বাঁচিল। এত অযত্নেও মেয়ে বলিয়া বুঝি বাঁচিল। বহুদিনের সঞ্চিত আশা রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইল "আশা"।

হরমোহনের আয় অল্প, সংসারটীও ক্ষুদ্র। সংসারে এক অতি বৃদ্ধ পিতা-মাতা, বেশীর ভাগ এক ঝি। আশা এই সবেমাত্র ছয় বৎসরে পা' দিয়াছে। কিন্তু সে এই অল্পবয়সেই বুঝিতে পারিয়াছে, সেই এ গৃহের গিন্নী। ঘরের জিনিষ পত্র সে এখনই গুছাইয়া রাখিতে শিখিয়াছে। বাবা আফিস থেকে আসিবার পূর্ব্বে জলের ঘটিটী, গামছাখানি এ সকল সে নিজেই রাখিয়া দেয়। পিতার উপরে তাহার শাসনের ভাগ বেশী। যদি কোন দিন ভুলক্রমে ছাতাটী বাড়ী ফেলিয়া যান, তাহা হইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে আশা "এত রোদ লাগিয়াছে এখনই অসুখ করিবে।" এ সমস্ত বলিয়া সে পিতাকে শাসন করে।

বর্ষার সন্ধ্যায় ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশ মেঘাবৃত, আশা হরমোহনের নিকট বসিয়া গল্প শুনিবার জন্য আবদার করিতে থাকে; হরমোহন কি করেন, গুড়গুড়ি ছাড়িয়া আশার মনোরঞ্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

হরমোহন সকালে দুটি ভাত রাঁধিয়া আশাকে খাওয়াইয়া আপনি খাইয়া আফিসে যাইতেন। যাহা থাকে পিতামাতা ও ঝিয়ের জন্য। ক্রমে আশার সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। "বাবা! তুমি রোজ রোজ রাঁধ কেন? আমি বেশ রাঁধিতে শিখেছি। তুমি দেখই না, তুমি তাড়াতাড়ি পার না—আমি বেশ ভাল রাঁধিতে পারি" ইত্যাদি নানারকম আবেদন আরম্ভ হইত।

সন্ধ্যাবেলা। গলির শেষের বাড়ীটীর ক্ষুদ্র জানালার দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে একটি ছোট মেয়ে কেবল একদৃষ্টে গলির মোড়ের দিকে চেয়ে আছে। কাল কাল চুলের থোপা-গুলি চোখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। আর দুখানি ছোট ছোট হাত তাহা সরাইয়া দিতেছে, যেই ছাতা-হাতে হরমোহন গলির মোড়ে দেখা দিতেন, অমনি চারিটি চোখে চোখোচোখি হইত।

* * * *

পূর্ণিমার শশিকলার ন্যায় আশা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। দশ বৎসরের মেয়ে আর কতদিন রাখা যায়। হরমোহন বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সৎপাত্রে দিবেন একান্ত ইচ্ছা কিন্তু টাকা কই? সঞ্চিত অর্থ যাহা আছে, তাঁহাতে এখনকার দিনে অসৎ পাত্রই প্রায় জুটে না। মেয়েকে লইয়া হরমোহন বড়ই বিব্রত হইলেন। পাড়ার সকলে বলাবলি করেন "মেয়ের মা নেই কেই বা বে'র কথা বলে। হাজার হক সে এখন বড়টি হয়েছে। বিয়েতে কি আর সাধ হয় না। বিয়ের ভাবনায় রাত দিন মুখ মলিন থাকে। হরমোহন আজ কাল এত অন্যমনস্ক যে একবার আশার মুখ পানেও চাহিয়া দেখেন না। আশা কোন জিনিষ দিতে গেলে "আয় আমার লক্ষ্মী" বলে আদর করেন না।

বঙ্গদেশে কেন মেয়ে জন্মগ্রহণ করে? বোধ হয় পিতামাতার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই তাহাদের জন্ম হয়। হরমোহনের সহিত জগৎ সংসারের কোন সম্বন্ধই ছিল না। এখন তাহার প্রতিশোধ পাইতেছেন। মেয়ের বিবা-হের কি উপায় করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। এই ভাবনায় তাঁহার আর এখন চোখে ঘুম নাই।

একদিন রাত্রি অধিক হইল, তবুও হর-মোহনের দেখা নাই। আশা একবার দরজার কাছে উঁক দিয়া দেখিতেছে, একবার জানা-লায় আসিতেছে, কত ঠাকুর দেবতাকে স্মরণ করিতেছে, যেন তাহার পিতা শীঘ্র শীঘ্র ঘরে ফেরেন। অবশেষে হরমোহন ফিরিয়া আসিলেন, তখন আশার দেহে প্রাণ আসিল। হরমোহন দুয়ারে পা দিবামাত্রই আশা হাত দুখানি ধরিয়া বলিল, "বাবা, তোমার আজ এত দেরী হল কেন?" তোমাকে না দেখিয়া যে আমি এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারি না। হরমোহন কেবলমাত্র একটু কাজ ছিল বলিয়া বিমর্ষভাবে অপর ঘরে চলিয়া গেলেন, একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায়, তেমনি আশার মুখখানি আঁধার হইয়া গেল।

* * * * * *

এইবার বুঝি আশার বিয়ের ফুল ফুটিল। আজ ৬।৭ মাস কাল হরমোহন কত বন্ধুর বাড়ী ঘুরিয়া, কত ছেলের বাপের পায়ে ধরিয়া যে পাত্র যোগাড় করিতে পারেন নাই, এবার বুঝি বিধি অনুকূল হইয়া তাহা মিলাইয়া দিলেন। এতদিনে একটি ছেলে ঠিক হইল। ছেলেটি সৎ-স্বভাব, লেখাপড়ায় নেহাৎ মন্দ নয় কিন্তু তাহার পিতামাতার একজনও বর্ত্তমান ছিলেন না। আসামে কোন এক পোষ্টাফিসে তিনি কাজ করেন, বিবাহ করিয়া আশাকে সেইখানে লইয়া যাইবেন, এইরূপই ইচ্ছা ছিল।

একদিন হরমোহন ভাবী জামাতা সুকুমারকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। আশা একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। সুকুমার একবার ঈষৎ কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিলেন।

আজ ৭ মাসের পর হরমোহনের বুকের উপর হইতে একটী গাঁব নামিয়া গেল। এতদিন আশার কোথায় বিবাহ দিবেন, কিরূপ পাত্র হইবে, শ্বশুর-বাটীর সকলে ভালবাসিবে কিনা, ইত্যাদি চিন্তায় তিনি কন্যার মুখের দিকে চাহিতেন না। আজ যে বিষয় নিশ্চিন্ত হইলেন। আশা সৎপাত্রে পড়িবে, আশা সুখী হইবে, এই চিন্তায় আজ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ। সুকুমার চলিয়া গেলে তিনি আশার ঘরে গিয়া দেখিলেন, আশা দরজায় বিমর্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আশাকে দেখে হরমোহনের চক্ষুতে একবিন্দু জল আসিল। তিনি তথা হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। পুনরায় তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "ছি মা অমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছ কেন? মা লক্ষ্মী, তুমি অত কাহিল হইয়া গেছ কেন? অনেক দিনের পর পিতার এই আদব পাইয়া অভিমানে তাহার দীর্ঘ চক্ষু-যুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। হরমোহন বলিলেন, "ছি মা কান্না কেন?" চিরকালই কি তুমি আমার ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে থাকিবে, পরে আশার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মা লক্ষ্মী আমার! স্বামীর ঘরে গিয়ে এমনি লক্ষ্মী হয়ো, যেন কেহ তোমার নিন্দা না করে, সকলে যাহাতে ভাল বলে তাহার চেষ্টা করিবে!

রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল দেখিয়া উভয়ে আহার করিয়া শয়ন গৃহে গমন করিলেন। পিতা কন্যাকে কোলে বসাইলেন। পরে তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা আমার আনন্দময়ি! কেমন করিয়া তোমায় পরের হাতে দিব। দেবতা করুণ চির জীবন সুখী হইও। হরমোহন আর কিছু বলিলেন না। আশা ক্রন্দন স্বরে আস্তে আস্তে বলিল—আমি কোথাও যাইব না" আর কোন কথা হইল না।

সম্মুখে আষাঢ় মাস। তাহার পরই অকাল। অতএব হরমোহন ঐই মাসেই বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। চারি হাত এককরে দিতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। হরমোহন বিবাহের আয়োজন ও প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র ক্রয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। সময় অভাবে আশার উদ্দেশ লইতে পারিতেন না সমস্ত আয়োজন ঠিক হইল বটে, কেবল বিবাহ সম্পন্ন হইল না, কারণ আশা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িল। সমস্ত আষাঢ় মাস গেল, তবুও আশার পীড়া আরোগ্য হইল না।

ইতিমধ্যে সুকুমারের ছুটী ফুরাইল। তিনি কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। যাইবার সময় আশাকে একবার দেখিয়া গেলেন। আর ভাবী শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন, সম্মুখে অকাল আর আমারও শীঘ্র ছুটী পাইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। হরমোহন এ কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু আশার আরগ্যের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যাইতেছে না। দিন দিন আশার পাণ্ডুখানি

রক্ত শূন্য ও চক্ষু জ্যোতিঃ হীন হইতেছে। হর মোহনের আহার নিদ্রা নাই। দিবা রাত্র কন্যার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আশারও ঘুম নাই। কেবল বলে বাবা আমার অসুখ ভাল হবে। তুমি শোওগে। হরমোহন বলেন—লক্ষ্মী মা, একটু চুপ করে ঘুমিয়ে পড়। আশা বলে আর তুমি রাত জেগে বাতাস করো না। তুমি না ঘুমাইলে আমি ঘুমাইব না। এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল তবুও আশা আরোগ্য লাভ করে না। ডাক্তার ডাকা হইল। কিন্তু ডাক্তার আশার নাড়ী দেখিয়া ভাল মন্দ কিছু বলিলেন না। কেবল তাঁহার মুখে একটী নৈরাশ্যের চিহ্ন দেখা গেল।

সেদিন শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যায় পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্র আকাশে উঠিয়াছে। ম্লান জ্যোৎস্না আসিয়া আশার বিছানায় ও আশার শীর্ণ মুখ খানিতে পড়িয়াছে, আশা ঘুমাইতেছে, হর-মোহন এক পার্শ্বে, ডাক্তার আর এক পার্শ্বে বসিয়া আছেন। হরমোহন যেন আকুল দৃষ্টিতে মেয়ের মুখপানে চাহিয়া আছেন। ডাক্তার মুহূর্মুহু নাড়ি দেখিতেছেন। অবশেষে ডাক্তার বাবু আশার হাত ছাড়িয়া দিয়া ঔষধ আনিবার জন্য উঠিলেন। হরমোহন ডাকিলেন, "মা" আশা, মা আমার!" আশা জাগিয়া উঠিল। "বাবা" বলিয়া হাত দুখানি হর-মোহনের কোলের উপর তুলিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তেই হরমোহনের ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র আলোটুকু চির কালের মত নিবিয়া গেল।

ইহার চারিদিন পরে একদিন হরমোহন আফিস হইতে আসিয়া গৃহের বহির্দ্বারে বসিলেন। অমনি জানালার দিকে মুখ পড়িল, সেখানে আজ আর কেহই নাই। খোলা জানালায় অশান্ত বায়ু প্রবেশ করিয়া হুঁহুঁ করিয়া উঠিতেছে।

হরমোহনের দুচক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন "মা আমার' তোমাকে নিয়ে আমার বড় ভাবনা ছিল, তোমাকে নিয়ে আমি অকুল পাথারে ভাসিতেছিলাম, তুমি আমার বড় আদরিণি! কাহার হাতে সঁপিয়া দিব, সে তোকে আদর করিবে কি না এই ভাবনায় মন বড় ব্যাকুল হইত। আমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়াছি, যাঁহার ধন তাঁরই হাতে দিয়েছি। হায় প্রভো! বন্ধন ভাল, না বন্ধনের মুক্তি ভাল! এখনও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া হরমোহন শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আশা চিরকালের মত নিভিয়া গেল।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

বঙ্গ-বিধবার আক্ষেপ।

কত কাল, কত বর্ষ, কত দুঃখ, কত হর্ষ,
অনন্ত কালের গর্ভে হইতেছে লীন;
কিন্তু এই পোড়া প্রাণে, সুখ নাই কোন দিনে,
কি জানি কি হারায়েছি ভাবি নিশিদিন।
যা' ছিল তা' গেছে চলে, আর না আসিবে ব'লে,
তাই কিরে দিনে দিনে হয় তনু ক্ষীণ;
আর কত দিন ভবে, র'ব নাথ এই ভাবে,
কত কালে পরিশোধ হবে মম ঋণ।

করিয়াছি কত পাপ, তাই এই মনস্তাপ,
অনুতাপ এ হৃদয়ে র'বে চিরদিন;
কাঁদিয়া জনম যাবে, অনেক কাঁদিতে হ'বে,
অশ্রুনীরে দৃষ্টিশক্তি হ'বে মম ক্ষীণ।
কোথা প্রভু দীননাথ! কৃপা-নেত্র কর পাত,
আর কত দুঃখ বল আছে মম জীবনে;
দেখা দিয়া নাশ তাপ, নতুবা এই আশা নাথ,
শান্তি দাও অভাগীরে টানিয়া মরণে॥

শ্রীবেহিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

কীর্ত্তন।

নমঃ শ্রীমধুসূদন দিন ভক্ত শরণ,
অনাথ পালন হৃষীকেশ।
ভকত মনোরঞ্জন ভব-ভয়-ভঞ্জন,
নিত্য নিরঞ্জন শ্যাম।
এ ভব জলধি পারে তরাবে গো কে আমারে
ভাবিয়ে আকুল সদাই।
দিও চরণ তরী ভব দুঃখ পরিহরি,
চলে যেতে পূর্ণ শান্তিধাম।
মায়ার খেলনা সম্মুখে ফেলনা,
দাও মোরে বাঞ্ছিত সে ধন।
(ভবে) সকলি অনিত্য দারা ধন পুত্র,
সত্য সুধু (তব) পূর্ণ ব্রহ্মনাম।
এস সবে মিলে জ্ঞান আঁখি মেলে,
খুঁজি পথ হরি-প্রেমালয়।
পথে যেতে বাধা যত সবে করি দূরীভূত,
লক্ষ্য পথে হই আগুয়ান।

শ্রীতারানাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতীয় প্রজা ও নৃপতি-বর্গের প্রতি শ্রীশ্রীমান্ ভারত-সম্রাটের সম্ভাষণ।

মানবজাতির সভ্যতা ও শান্তির বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব্ব আক্রমণ হইয়াছে, তাহা প্রতিরুদ্ধ ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমার স্বদেশ ও সমুদ্রের পারাপারে অবস্থিত সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রজাগণ, এক মনে ও এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতেছেন। এই সর্ব্বনাশকর সংগ্রাম আমার ইচ্ছায় সংঘটিত হয় নাই। আমার মত পূর্ব্বাপরই শান্তির অনুকূলে প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল বিবাদের কারণ ও বিসম্বাদের সহিত আমার সাম্রাজ্যের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, আমার মন্ত্রিগণ সর্ব্বান্তঃকরণে সেই সমস্ত কারণ দূর করিতে ও সেই সমস্ত বিসম্বাদ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সকল প্রতিশ্রুতি পালনার্থ আমার রাজ্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, সেই সকল প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া যখন বেলজিয়ম্ আক্রান্ত ও তাহার নগরসমূহ বিধ্বস্ত হইল, যখন ফরাসি জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইল, তখন যদি আমি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে আমাকে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে হইত ও আমার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির স্বাধীনতা ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে হইত। আমার এই সিদ্ধান্তে আমার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক

প্রদেশ আমার সহিত একমত জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। নৃপতিগণের ও জাতি-সমূহের কৃত সন্ধি ও তাঁহাদের প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ইংলণ্ড ও ভারতের সাধারণ জাতিগত ধর্ম্ম আমার সমগ্র প্রজাবর্গ আমার সাম্রাজ্যের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য একপ্রাণে অভ্যুত্থান করিয়াছেন। যে কয়েকটী ঘটনায় ঐ অভ্যুত্থানের পরিচয় পাওয়া যায়,তন্মধ্যে আমার ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ এবং ভারতবর্ষের সামন্ত নৃপতিবর্গ আমার সিংহাসনের প্রতি যে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন ও সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় স্ব স্ব ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিবার যে বিরাট্ সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমি যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছি এমন আর কিছুতেই হয় নাই। যুদ্ধে সর্ব্বাগ্রগামী হইবার জন্য তাঁহারা একবাক্যে যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে; ও যে প্রীতি ও যে অনুরাগের সূত্রে আমি ও আমার ভারতীয় প্রজাগণ আবদ্ধ আছি, সেই প্রীতি ও অনুরাগকে প্রকৃষ্টতম ফললাভের নিমিত্ত অনুপ্রাণিত করিয়াছে। দিল্লীতে আমার অভিষেকোৎসবার্থ মহাসমারোহে যে দরবার আহুত হয়; সেই দরবারের অবসানে, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, ভারত ইংরাজজাতির প্রতি অনুরাগ ও সৌহৃদ্যসূচক যে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা অদ্য আমার স্মরণপথে উদয় হইতেছে। গ্রেট-ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভাগ্য পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ আছে বলিয়া আপনারা আমাকে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই সঙ্কট সময়ে আমি দেখিতেছি যে, তাহা প্রচুর ও সুমহৎ ফল প্রসব করিয়াছে। ইতি ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৪। ২২শে ভাদ্র ১৩২১।

বিজয়ার গান।

রাগিনী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

“কেমনে থাকিব গো মা তুমি আমায় ছেড়ে গেলে,
একান্ত না থাক যদি লও চরণ-কমলে।
ছিলে গো মা যে তিন দিন,
গেল বড় সুখে দিন,
চাহিয়ে তব চরণ,
মন চক্ষু থাকৃত ভুলে।
তুমি মা হৃদয়-ধন,
জুড়ে বসো মম মন,
থাকি যেন সর্ব্বক্ষণ,
লুটায়ে ঐ পদতলে।”

শ্রীগোবিন্দ গোপাল ঘোষ বর্ম্মা।

কৃতজ্ঞতা।

(গল্প)

সে আজ অনেক দিনের কথা।—তখনকার এণ্ট্রেন্স আজ কাল্‌কার মেট্রিকিউলেশনের মত এত সোজা ছিল না। হারাণ তখন এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া এফ-এও পাশ করিয়াছিল। তৎপরে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলে, হারা-

ণের মাতা পিতা মনে করিলেন, হারাণ এবার মানুষ হইয়া আসিবে।

হারাণ কলিকাতায় গিয়া মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ছাত্রাবাসেই অবস্থান করিতে লাগিল। কয়েকদিন বেশ মনোযোগের সহিত পড়িল, তৎপরে কলিকাতার মজলিসে মত্ত হইয়া গেলেন। আজ থিয়েটারে যায়, কাল সার্কাসে যায়, একদিন বায়স্কোপে যায়, এমনি করিয়া রোজই এখানে ওখানে যায়, এবং বক্স ভাড়া করে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে বসেন, না হয় একাই বসেন। সে সমস্ত রাত্রি রঙ্গ-কৌতুকে কাটায়, এবং দিনের বেলা কলেজে গিয়ে কুম্ভ-কর্ণের মত নিদ্রা যায়। ছাত্রাবাসের পাচকগুলি বড় ধূর্ত্ত; তারা যার নিকট হইতে ঘুষ পায়, তাকে মাছ ভাজা, তরকারী ইত্যাদি বেশী করে দেয়, তাই হারাণ নিজের এবং অপরাপর অনেকের জন্য পাচক মহাশয়কে কর প্রদান করিয়া থাকে। হারাণ মেসের ছাত্রদের নিকটে কল্পতরু হইল--কাহারও বাসনা বিফলে যায় না। যে যাহা চায়, সে তাহাই পায়। আজ হারাণ ওকে বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়ান, কাল তাকে খাওয়ান। টাকা পয়সাকে লোষ্ট্র-বৎও জ্ঞান করে না। তার মাসে একশ টাকায়ও ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। আজ পঞ্চাশ টাকার জন্য চিঠি লিখলে—পিতার বিপুল সম্পত্তি থাকাতে পিতাও এদিক ওদিক না চেয়ে পাঠাতে লাগ্‌লেন। আমরা জানি, কোন কিছু অত্যধিক হইলে ধৈর্য্যচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। তাই পিতারও টাকা পাঠাতে পাঠাতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি এখন আর পঞ্চাশ টাকার অধিক এক কড়িও পাঠান না। হারাণ কিরূপে ৫০৲ টাকা দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে? তাহার যে হাতখরচা অতিশয় বাড়িয়াছে। কত চিঠি লিখা সত্ত্বেও আর পিতা টাকা পাঠান না। হারাণ টেলিগ্রাফ করিল, তবুও কিছুতেই কিছু হ'ল না। শেষে হারাণ লিখিল, "এবার টাকা না পাঠাইলে বাড়ী ফিরে আসব।" পিতা তবু প্রশান্ত সাগরের মত শান্ত হ'য়ে রইলেন, তাঁহাকে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না! মাতা ভাবিলেন, টাকা না পাঠালে হারাণ ফিরে আসবে; তাই নিজের টাকা হতে স্বামীর অপ্রকাশ্যে টাকা পাঠাতে লাগলেন।

হারাণ প্রকৃতপক্ষে দীনের বন্ধু, বিপন্নের সহায়, কারণ অনেক গরিব ছাত্র তাহার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছে। আজ কোন গরীব ছাত্র দু'টাকা চাহিল, হারাণও তাকে দু'টাকার স্থানে চার টাকা প্রদান করিল। আবার কোন দুষ্ট ছাত্র গিয়ে বল্‌লে, "হারাণ একটা টাকা দাও না!" হারাণ অমনি ক্যাস বাক্সের চাবি দিয়ে বল্লেন, "খুলে নিয়ে যা।" এ রকম করে কেহ কেহ এক টাকার স্থানে পাঁচ টাকা নিয়ে যেত' এবং তাহা পরিশোধও করিত না। হারাণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিত না। হারাণ টাকা নষ্ট করিত বটে কিন্তু অধিকাংশ টাকাই দরিদ্রের প্রতি ব্যয় হইত; তাই তাহার দানের প্রশংসা করি।

এদিকে ফাইনেল্ পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইল। ফাইনেল্ পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে হারাণের পিতাও ইহলীলা সাঙ্গ করিলেন। তাই ফাইনেল্ পরীক্ষায় সে উপস্থিত হ'তে না পারিয়া বাড়ী

ফিরিয়া আসিল, এবং পিতৃশ্রাদ্ধের পর আর কোথাও যায় নাই, বাড়ীতেই থাকে। হারাণ এখন পিতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। টাকা পয়সা থাকিলে চাটুকারের অভাব হয় না। তাই হারাণেরও অনেক চাটুকারী বন্ধু আসিয়া জুটিল। দুর্গাপূজা আসিয়াছে, হারাণের চাটুকারী বন্ধুবর্গ পূজার ব্যয়ের অনেক ফর্দ্দ দিলেন, হারাণও মঞ্জুর করিলেন। কেবল দুর্গাপূজা কেন, যে কোন রকমের উৎসবই মহাসমারোহে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

হারাণের যৌবনকুসুম এখন প্রস্ফুটিত। তাই এখন তিনি বারাঙ্গনার প্রেমে উন্মত্ত এবং তাহাদিগকেই মরুভূমির পিপাসা-বারি স্বরূপ মনে করেন। এ রকম করিলে ধনই বা ক'দিন থাকে? শীঘ্র শীঘ্রই পিতৃসঞ্চিত সম্পত্তি নিঃশেষিত হইল। এখন হারাণ কোথা যান? হারাণের চাটুকারী বন্ধুগণ আর তাঁর দোরেও পদার্পণ করেন না। কারণ মধুহীন ফুলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতে আসিবে কেন? হারাণ এখন নিঃস্ব, দু'বেলারও আহার জুটে না, সঙ্গে সঙ্গে অভাগিনী মাতাও অনাহারে ভুগিতেছেন।

আজ হারাণের বাটী বহুলোকে সমাকীর্ণ। কেহ কাপড়ের টাকা, কেহ মদের টাকা,— এই রকম করে অনেকে অনেক জিনিষের বিল হারাণের সম্মুখে ধরিল। "কাল আসিও", "পরশ্ব আসিও" এরকম করে সকলকেই হারাণ বিদায় দিলেন। হারাণ এখন কি করিবেন, ভাবিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। এখন তার বেশ বুদ্ধি হইয়াছে, 'হায় কি হল' বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। মাতার ক্রন্দন দেখিয়া তিনি আরো অস্থির হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হারাণ চাকরীর উদ্দেশ্যে মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছেন। সুতরাং ডাক্তারীতে যে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তা স্বীকার করিতেই হইবে। কলিকাতার কোন ঔষধালয়ে চাকরী করিবেন ভাবিয়া কলিকাতায় আসিলেন। তখন ডাক্তার জে, মিত্রই কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার ঔষধালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। জে, মিত্রের পূর্ণ নাম যোগেন মিত্র। তিনি এল, এম, এস পাশ ডাক্তার। হারাণ তাঁহার নিকটেই চাকরীর উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন। মিঃ মিত্র চেয়ারে বসিয়া সংবাদ পত্র পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে হারাণ নমস্কার করিয়া নিয়োগ পত্র মিঃ মিত্রের হস্তে দিলেন। মিঃ মিত্র নিয়োগ পত্রখানা পড়িয়া হারাণের দিকে চেয়ে দেখলেন, পরে চেয়ার হইতে উঠিয়া হারাণের গলা জড়িয়ে বল্লেন, "হারাণ, তোর কি এই দশা ভাই?"

হারাণ ভাবলেন, "লোকটা পরিচিত হবে, নতুবা আলিঙ্গন করতে সাহস করবে কেন?"

"কি হারাণ, চুপ করে রইলে যে?"

"আপনি কে?"

"ছি ভাই, তোমার মুখে 'আপনি' ভাল শুনায় না, আমার মুখে উহা ভাল শুনাইত।

"ঠাট্টা করিবেন না মহাশয়; আমি অতি দুঃখী অথচ অসহায়, তাই আপনাদের সাহায্য-প্রার্থী, রূপা প্রদর্শন করিবেন কি?"

"সে সব কথা ছেড়ে দাও; জিজ্ঞাসা করি, আমায় চেন কি?"

"না, আপনার পরিচয় দিউন।"

"এখনও পরিচয়ের প্রয়োজন? মনে করে দেখ, ছাত্রাবাসে অবস্থান কালে যোগেন বলে কেউ তোমার পরিচিত ছিল কি?"

"তবে কি তুমি সেই যোগেন মিত্র?"

"এখন কিরূপে চিনিলে?"

"হাঁ, বাক্ চিনেছি, ক্ষমা করবে। তোমার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাই শীগ্‌গির চিনে উঠ্‌তে পারি নাই।"

"আজ আমার সৌভাগ্য যে তোমার দেখা পেয়েছি তোমার অনেক অনুসন্ধান করেছি, তবুও খোঁজ খবর পাই নাই। তুমি আমার পূর্ব্বাবস্থা বেশ জান। শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া মামার আশ্রয় গ্রহণ করি। মাও মাতুলালয়ে

জ্বরে মারা যান। তখন এণ্ট্রান্স পাশ করি; আমার অবস্থাও শোচনীয় ছিল, তাই পড়া ছেড়ে এল, এম, এস কলেজে ভর্ত্তি হই। তখন তুমিই আমার সকল প্রকার সহায় ছিলে। আমার মাসিক ব্যয় তোমার সাহায্যেই চলিত। তুমি সাহায্য না করিলে কি আজ এই গর্দ্দভ ব্যাধ হইতে পারিত?"

এসব কথা শুনিয়া হারাণ একটু লজ্জিত হইলেন, কারণ যিনি পূর্ব্বে পরকে সাহায্য করিয়াছেন, আজ কিনা তিনি পরের সাহায্য-প্রার্থী। তবে মানুষের দশদশা ভাবিয়া তিনি মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রহিলেন। হারাণ তাহার সুসময়ে অনেক বন্ধুকে অকাতরে অর্থ দান করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রতিদান বা তজ্জন্য তাঁহার নিকট কেহ কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে—এরূপ আশা করিতেন না। তাহার নষ্ট-চরিত্রে ইহাই একটী মহৎ গুণ ছিল, আর এই গুণেই হারাণ বোধ হয় দরিদ্রতার ভীষণ কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। হারাণকে লজ্জিত দেখিয়া, যোগেন বাবু বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হারাণ কিরূপে ধন হারাইল, কিরূপে কি হইল—সমস্তই বলিলেন। মাতার দুরবস্থার কথাও বলিলেন। সে সকল হৃদয়-বিদারক কথা শুনিয়া তখনই যোগেনবাবু তাঁহার মাতার নামে একশত টাকা টেলিগ্রাফ করিলেন। এবং হারাণের সমস্ত ঋণও পরিশোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যোগেন বাবু তৎপর হারাণের সঙ্গে তাঁর বাটীতে আসিলেন। যোগেন বাবু আসিয়া হারাণের মাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। হারাণের মুখে যোগেন বাবুর পরিচয় পাইয়া, মাতা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। যোগেন বাবু বলিলেন, "মা, আপনার স্নেহে মাতৃ-স্নেহ-জনিত-সুখ অনুভব করিতেছি, মা আমি মাতৃহীন, আমার বাড়ী ঘরও নাই, আমি বিবাহও করি নাই। মনে করিয়াছিলাম; কোন স্থানে সামান্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া কাল কাটাইব। কিন্তু আমার সে সবের দরকার নাই। আজ হতে এ বাড়ীই আমার, হারাণ আমার ভাই, আপনি আমার মা। যদি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক অভাগাকে ধর্ম্মপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, তবে আপনাকে মা বলিয়া ডাকিয়া কৃতার্থ হইব।" হারাণের মাতা বলিলেন, "বাবা, তোমার মা সম্বোধনে আমি এতদূর প্রীত হইয়াছি যে, হারাণও কোন দিন আমাকে এত সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। অভাগিনীর আজ সুপ্রভাত, তাই তোমার মা হইতে পারিয়াছে। তুমিও আজ হতে আমার পুত্র-স্নেহের অংশ গ্রহণ কর্‌বে।"

ইহার পর যোগেনবাবু প্রচুর অর্থে তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া হারাণকে সংসারী করিলেন। অপরিচিত যোগেনবাবুর সহৃদয়তা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। পরে দুই ভ্রাতায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারী করিয়া কলিকাতা হইতে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যশো-সৌরভে চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইবার হারাণের মা বলিলেন—"বাবা যোগেন! শেষের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে; এক্ষণে আমার অনুরোধে তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। তোমাকে সংসারী হইতে দেখিলে আমি বেশ সুখে মরিতে পারিব। যোগেনবাবু মাতার বাক্য এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার কৃতজ্ঞতার পূর্ণ নিদর্শন এইখানে প্রকটিত হইল, তিনি বিবাহ করিলেন।

শ্রী———

কল্পনা।

অয়ি শান্তিময়ী সখি! মধুর কল্পনে,
এস গো, মাধুর্য্যময়ী মধুরতা সনে;
মম জীর্ণ শীর্ণ, শোক, সন্তাপিত প্রাণ,
তোমারি প্রেমের তরে, ক'রেছি অর্পণ।
শুনিবে কি সখি! তুমি, আমার রোদন,
প্রেমিক বলিয়া মোরে, করি' সম্ভাষণ।

সদয় হইয়ে সখি ! প্রেম সম্ভাষণে,
বলিবে কি "সখিবলি" কৃপা সুধাদানে
ধরিবে কি সখি ! তব করে মম কর,
বলিবে কি প্রেমভরে, "নহি আমি পর" ।
তোমার মোহিনী আস্যে হাসিয়া হাসিয়া ;
ক'বে কি প্রাণের কথা হৃদয় খুলিয়া ।
মম এই চির-দগ্ধ হৃদয় শ্মশানে ;
সাজাবে কি ফুল্ল মনে, প্রেমের বাগানে
ফুটিবে কি সেই গাছে পুষ্প রাশি রাশি ;
মলয় সমীর তথা আসিবে কি হাসি ?
"কুহু" রব গাহিবে কি, কোকিল সুজন,
গাহিবে কি, অলি তথা গুন্ গুন্ স্বন ?
বিরচিয়া প্রেম-কুঞ্জ, সে প্রেম-কাননে
বসিবে কি মম পাশে প্রেম-সিংহাসনে ?

বিশ্বাস নছিমউদ্দীন আহম্মদ ।

বন্ধু-বিয়োগে ।

বৃন্ত-চ্যুত পুষ্পবৎ পড়িয়ে ধরায়
　কেন ভাই চিরতরে করিলে শয়ন ?
শোক পারাবার মাঝে নিক্ষেপি সবায়
　কোন দূর দেশে তুমি করিলে গমন !
তোমার সুচারু মুখে মৃত্যুর কালিমা
　কে দিল ঢালিয়া ভাই বলনা আমায় ।
কে হরিয়া নিল তব অতুল সুষমা
　জীবন-কুসুম তব কে ছিড়িল হায় ;
জননীর হৃদি মাঝে জ্বালি শোকানল
　অনন্ত বিষাদ ঢালি পিতার হৃদয়ে,
হৃদি মাঝে ঢালি মম দুঃখ-হলাহল
　চিরদিন তরে তোমা কে নিল কাড়িয়ে ।
তোমায় হইয়ে হারা সমপাঠিগণ
　দেখ এসে ভাসিতেছে শোক-সিন্ধু-নীরে,
কত কষ্ট পায় তোমা করিয়ে স্মরণ
　দিওনা তাদের দুঃখ এসো ভাই ফিরে ।
এবে কি শুনিলে মোর সকাতর স্বর
　দয়া পূর্ণ ছিল ভাই হৃদয় তোমার ।
দেখিলে মোদের দুঃখ হইতে কাতর
　এখন কি নাই দয়া মোদের উপর ?

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য ।

মেরীর প্রতি ।

১

জানিতাম যদি কাল হরিবে তোমারে
ঝরিতনা আঁখি তবে তোমার কারণ
ভুলেছিনু তোমা সহ সতত বিহারে
স্বভাব ভঙ্গুর তব নশ্বর জীবন ॥

২

জাগে নাহি কভু হেন হৃদয় মাঝারে
ফুরাইলে দিন তুমি যাবে পলাইয়া
নেহারিব তব মুখ জনমের তরে
আর না হাসিবে তুমি আমারে দেখিয়া ॥

৩

সেই মুখ, সেই কান্তি, সম্মুখে আমার
সে হাসি দেখিব পুনঃ হেন লয় মনে
এখনও হৃদয় মম না মানে প্রত্যয়
ফুটিবে না হাসি আর ও চারু বদনে ॥

৪

মম সম্ভাষণে তুমি না দেহ উত্তর
হেন নিষ্ঠুরতা কভু সাজেনা তোমায়
তাই যে হৃদয়ে সদা জাগিছে আমার
প্রিয়তমে, প্রণয়িণী ত্যেজিয়াছ কায় ॥

৫

থাক যদি এই ভাবে রয়েছ' যেমন
শান্তিমাখা ছবিখানি হিম কলেবর
নীরব অধর তব করিব চুম্বন
ছিল যেথা তোমার সে হাসি মনোহর ॥

৬

যতক্ষণ হিম তনু আছে মম পাশে
ততক্ষণ ভাবি তুমি আমার আমার
লীন হ'লে বিশ্ব-আত্মা বৈশ্বানর গ্রাসে
একাকী হেরিব আমি [illegible]াধার ॥

৭

এ বিশ্ব সংসার মাঝে যেথা থাক তুমি
হেন নাহি মনে লয় ভুলিবে আমারে
শোকানল দীপ্ত হৃদে শান্তি পাব আমি
অন্তরেতে অন্তরিত না ক'রে তোমারে ॥

৮

কিন্তু যে অপূর্ব্ব প্রভা ঘেরিত তোমার
বিমল কোমল কান্তি অদৃষ্ট সংসারে
সাধ্য নহে চপলা সে প্রকৃতি কল্পনার
চিত্রিতে এ চারু চিত্র মানব অন্তরে ॥ *

কুমারী প্রফুল্ল নলিনা সরস্বতী।

অবসান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[সরোবর-তীর]

বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। (স্বগতঃ) আচ্ছা, লোক ঠকিয়ে উদরটা নিটোল করা ভাল, কি না ঠকিয়ে ঘরে বসে চিঁচিঁ করা ভাল? আমার মতে ও দুইই সমান। না ঠকালেও ঠক্‌তে হয়। আবার ঠকাতে যদি হিসাব মত না চল্‌তে পারা যায়, পা ফস্‌কে যায়, তা হ'লেও ঠক্‌তে হয়। এই যে দাসী মাগীটাকে ঠকিয়ে রোজ রোজ মিষ্টান্নের বৃষোৎসর্গ কর্‌ছি, এতে কি আমার পাপ আছে? তাকে বুঝিয়েছি, আমার অব্যর্থ মন্ত্রশক্তিতে তুমি পাতাল পুরীতে গিয়ে বলীরাজার পাটরাণী হবে। মাগীর চোখ দেখলে ত ভয় পায়। ঠকাবার জন্যে পদ্মপলাশলোচনা বলে ডাকি; মুখপানে চাইলে পেত্নী বলে ভ্রম হয়, প্রাণটা যেন আঁৎকে উঠে। আমি বলি চন্দ্রাননী! সে তো তাই বিশ্বাস করে। অতখানি যে হালকা বুদ্ধি বিধাতা তাকে দিয়েছে, কিসের জন্য? যে [illegible] তাকেই ঠকাবে বলে; যদি তাই না হবে, তাহ'লে সে সেইরূপে বলীরাজার পাটরাণী হবে এ কথা বিশ্বাস করে। মোটের উপর ধর্‌তে গেলে দোষটা আসল সেই কর্ম্মকর্ত্তার অর্থাৎ বিধাতা-পুরুষের! যাই হোক, আমি কিন্তু নির্দ্দোষী, পথ হেঁটে অনেক দূর আসি, অনেক ছল-চাতুরী করি। হাঁ করে মাগী যখন শুনে, তখন তার মুখপানে চাইলে নাড়ী মুচড়ে হাসি আসে, কত কষ্টে যে চাপতে হয়, আমিই তা জানি, কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন সংগ্রহ হইলেই সটকান্। পাপ-পুণ্য তা এ নিরিবিলি জায়গায় দেখে কে? কিন্তু কৈ এ বিড়ালাক্ষীর যে এখনও দেখা নাই, আমার যে আবার অভ্যাসের দোষে দাবানল জ্বল্‌তে আরম্ভ হয়েছে।

(দূরে দেখিয়া)

ঐ না আস্‌ছে, আ মরি মরি, চলনের কি ভঙ্গী; যেন ঢেঁকিতে পাব দিতে দিতে আস্‌ছে। এ পাথুরে সূর্পনখা বিধাতা নির্জ্জনে ব'সে গ'ড়েছিলেন নাকি? হুঁ হুঁ এদিকের খবরটা ভাল, কাপড় ঢাকা বাঁ-হাতের হাঁড়ী ভারী ভারী ঠেক্‌ছে, আজ বোধ হয় হাঁড়ীটা ভরাই আছে।

হাঁড়াহস্তে দাসীর প্রবেশ।

বিদূষক। এস এস চম্পকবরণী, চন্দ্রাননী, চকোরনয়নী সুমধ্যমে এস!

দাসী। হ্যাঁ এই এলাম, কি গুণ ক'র্‌লে ঠাকুর, ঘরে কি আর মন টিক্‌ছে—শুয়ে বসে স্বস্তি নাই; মনে হচ্ছে রাত দিন, তোমার কাছে বসে থাকি, তোমার কাছে খাই, তোমার কাছে শুই, আর তোমার ঐ মধুমাখা কথাগুলি শুনি।

বিদূষক। মন্ত্রটা কিছু জাঁকালো কিনা, প্রথম প্রথম ওরকম হয়। দু'চার দিনেই ওটা সেরে যাবে। বলি মন্ত্রটা কি কানে জপ করেছিলে?

দাসী। জপেছিলাম বৈ কি! তবে এক টানে চার দণ্ড নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারি নাই।

বিদূষক। তা না পার ক্রমেই অভ্যাস হবে। কিছু দেখতে পেয়েছিলে কি?

দাসী। আব্‌ছায়ার মত তিনবার দেখতে পেয়েছিলাম, চোখ বুজে নাক টিপে থেকে

---

* কবিবর Wolfe লিখিত "To Mary" নামক কবিতার অনুবাদ। লেখিকা—।

যেই মন্ত্র জপ্‌তে আরম্ভ করলাম, অমনি দেখি পাতালের রাজা হাতে একগাছি মালা করে সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন; আহা কি সুন্দর রূপবান পুরুষ!

বিদূষক। ধরেছে ধরেছে, মন্ত্র ধরেছে—কথাবার্ত্তা কিছু হ'ল?

দাসী। নাক টিপে নিশ্বাস যে রাখতে পারি না, তা কথাবার্ত্তা হবে কি? পেট যে ফুলে উঠে। আচ্ছা কাল যে বলেছিলে বনের ভিতর গিয়ে একটা সুরঙ্গ দেখ্‌তে হবে, বাড়ী হাতে করে সুরঙ্গ পার হব, তার পর কি কর্ত্তে হবে?

বিদূষক। তার পর সেই সুরঙ্গ পার হ'য়ে, দেখতে পাবে বলীরাজার বাড়ী। তার পাশেই খাসা একটা পুষ্করিণী।

দাসী। এই নাও, সেখানেও আবার পুকুর? পুকুর ছাড়া শ্বশুর বাড়ী হবে না। সে শ্বশুর বাড়ীর দুয়োরের কাছে অমনি একটা পুকুর ছিলো। আচ্ছা তার পর কি হবে?

বিদূষক। তার পর যে কাজলের কথা ব'লেছি, সূর্পনখার নাক পুড়িয়ে যে কাজল হ'য়েছে, সে কাজল তোমাকে দেবো। একটা তেলের বাটীতে করে নিয়ে যাবে তুমি। সেই কাজল চোখে দিয়ে, সেই পুকুরে একশ একটা ডুব দেবে আর যাও কোথা, অমনি রূপের ডালি, নবযৌবন পা হ'তে মাথা পর্য্যন্ত থৈ থৈ ক'রবে।

দাসী। এখনকার চাইতে তখনকার চেহারাটা বুঝি ভাল হবে? আচ্ছা ঠাকুর, আমার এখনকার এ চেহারাটা কি খুব মন্দ? আমার মায়ের পিসিমা বোল্‌তো কুসুমধ্বজি, আগেকার কালে তুই যদি বিধবা না হ'তিস, তাহ'লে কত রাজপুরুষ তোর পায়ে লুটোপুটি করতো।

বিদূষক। সে কথা কি আর ব'লতে? তোমার এ রূপের কি তুলনা আছে! তবে কথা হচ্ছে কি তুমি এখন মানুষ; মানুষের গন্ধ কি দেব-দানবের নাকে সয়? সেই পুকুরে ডুব দিলেই তুমি দেখবে, তুমি আর এ মানুষ নাই, তোমার নাম হ'য়েছে লম্বোদরী, না হয় ভুভাম্র-বাহিনী, মাথায় চাঁচর চুল, মুখে পদ্মফুলের বাস, গালভরা হাসি আর সর্ব্বাঙ্গে রূপের ঢেউ খেলছে! হাতে ওটী ত সন্দেশের হাঁড়ী? ভরা আছে ত—না খালী আছে?

দাসী। আর কি খালী হাঁড়ী দেখাই, তুমি আমার পরকালের কাজ করছো, ভাঁড়ারী মিন্সের পা টিপে হাঁড়ী ভরে এনেছি। এই নাও। (হাঁড়ী প্রদান) সত্যি মুখে পদ্মফুলের বাস হবে, তার পর?

বিদূষক। তার পর, তুমি সেই পুকুরের ধারে বকুলতলায় ভঙ্গী ক'রে দাঁড়াবে, ভোঁমরা গুলো উড়ে এসে তোমার মুখের কাছে ভন্ ভন্ ক'রবে। তুমি আঁচল দিয়ে দিয়ে তাড়াবে। এমন সময় বলীরাজা উঠবেন তেমহলের উপর হাওয়া খেতে, যেমন চোখোচোখী হ'বে, অমনি তুমি নয়ন-বাণ হানিতে আরম্ভ করবে; পারবে তো?

দাসী। তা আমি খুব পারবো; এমনি ক'রে তো? (নয়ন সঙ্কেত)

বিদূষক। পিছু ফিরে, পিছু ফিরে, আমাকে আর প্রাণে মের না? ও যে ধারাল বাণ, কত পাহাড় পর্ব্বত ধসে যায়; আমি ত কোন ছার! হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে, ঐ রকমই বটে আর কাজ নাই বাণ সম্বরণ কর। ও চাহনি দেখলে কি, বলী রাজা আর আস্ত থাক্‌বে, যদি একটু মুখ বাঁকাবে তো ঐ পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিয়ে পড়বে।

দাসী। এই ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি, সত্যি করে ব'ল আমার এমন অদিষ্টি কি হবে?

বিদূষক। হ'য়েছে আর বাকী কি? আমার মন্ত্র কি নিষ্ফল হয়?

দাসী। আচ্ছা তখনতো পদ্মগন্ধা হ'ব। এখন একবার আমাকে তেমনি ক'রে দেখাতে পার, কেমন হই একবার দেখে নিই।

বিদূষক। (স্বগতঃ) সারলে রে মাগী সারলে, আবার বাঁকা পথে চলতে আরম্ভ কো'রলে। (প্রকাশ্যে) ক'রে তোমাকে এখন দেখাতে পারি, তবে কথা হচ্ছে কি এখন হলে

তখন ত আর কাজলের গুণ খাটবে না, সন্ধ্যা বেলায় তুমি অবসর পাওতো, আমার ঘরে একবার যেও,পারত সন্দেশ আরও কিছু বেশী করে নিয়ে যেও। আমি রোজ ব্রাহ্মণীকে রাত্রিতে দেবকন্যা করি, আবার সকাল বেলায় মানুষ করে থুই---"

দাসী। সত্যি নাকি,--তা যাবো, একবার দেখবো,সন্দেশ তা তুমি যত পার নিও। ভাণ্ডারীকে আমি যা বলি সে তাই করে। কিন্তু মিন্সের বড় দোষ,--আমি কাছে গেলে কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখ পানে চেয়ে থাকে; মরণ আর কি বামন হ'য়ে চাঁদে হাত, তাতেই বড় একটা তার কাছে যাই না।

বিদূষক। সাধে কি ফ্যাল ফ্যাল্ করে চায়, নজর পড়লে কি আর উঠ্বার যো আছে—তবুত এখন কাজল-পড়া পরনি।

দাসী। যা'ক এখন আর ও সব ছোট মানুষের কথায় কাজ নাই। তার পর বলীরাজা আমায় দেখবে, দেখে কি করবে?

বিদূষক। কি আবার করবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখে পাগল হবে, বুকের কলিজে জ্বলে জ্বলে উঠ্বে। হা কুশধ্বজি, যো কুশধ্বজি মুখের বুলি হবে, তুমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, সে তোমার পিছু পিছু দৌড়াবে।

দাসী। দুর! তাই যেন কেউ পলায়!

বিদূষক। সাধে কি পলাবে, ওসব কাজলের গুণ!

তারপর দুই জনার মিলন। কাঁসর ঘণ্টা বাজবে ভারে ভারে চন্দন কাঠ আসবে, মেয়েরা সব উলু দেবে। চতুর্দ্দোলে উঠবে।

দাসী। তার পর ঠাকুর! উঃ হু হু শীঘ্র শীঘ্র বল, আমার প্রাণটা কেমন আই ঢাই করছে।

বিদূষক। তারপর, খাসা খাসা ফুলের বিছানায় শোবে, ফুলের মধু খাবে। রাজা গোলাম, রাণীরা সব দাসী হয়ে তোমার পা টিপে দেবে। কেহ বা ঘোড়া শালায় যাবে, কারও বা বনবাস হবে।

দাসী। আচ্ছা ঠাকুর! তোমার কথাগুলি যেন মধুমাখা। যা বল্লে তা যে মিথ্যা হবে, এমন তো মনে হয় না। ছোট বেলায় এক গণৎকার ঠাকুর আমার হাত দেখে বলেছিলো "কুশধ্বজি" সাড়ে ষোল গণ্ডা বয়সের পর তোর রাজটীকে হবে। তা এমন অদৃষ্ট কি করেছি! (দীর্ঘনিশ্বাস)

বিদূষক। করেছ বৈকি! এই হল আর কি, কিন্তু গোটা কতক কাজ তোমাকে কর্ত্তে হয়েছে।

দাসী। কি বল, যা কর্ত্তে বলবে তাই করবো।

বিদূষক। আর কিছু নয়, এতকাল রাজবাড়ীতে থেকে যা কিছু উপার্জ্জন করেছো, অতি গোপনে এক জন বিশ্বাসী ব্রাহ্মণকে দিয়ে যাবে। এ আর কি নিজের শ্রাদ্ধটা নিজে করা বই আর কিছু এমন নয়। আর কাল থেকে অতি গোপনে একটী করে ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে। আর তোমাকে রাজরাণী হতে হবে কি না, আদব কায়দা গুলো রাণীদের মত হওয়া চাই। ছ'ড়া টড়া দু'চারটী শিখতে হবে। নাচ গান তাও কর্ত্তে হবে।

দাসী। তুমি কি ভেবেছ তা আমি জানি না, আমি সে সব খুব জানি।

বিদূষক। তা জানবে না কেন? তুমি বরাবর রসবতী; কৈ দুচারটী ছ'ড়া বল দেখি?

দাসী। তা শোন,—

"কাল ভোমরা রে—
বস আমার হৃদ-কমলে,
তোর নয়ান মরি জলে,
প্রাণ বঁধু হে, দশ জুতে জুটে,
আমার যৌবন নিলে লুটে।"

বিদূষক। আহা! চমৎকার! চমৎকার!!

দাসী। আবার শোন;—

যৌবন জোয়ারের জলে ভাস্লো তরণী,
চেয়ে দেখলো সজনী।"

কেমন—এ সব রাজার মনে ধরবেতো?

বিদূষক। খুব ধরবে, খুব ধরবে; [illegible]

গানটী ভাল হওয়া চাই, জানত রাজা রাজড়ার মন!

দাসী। ভাল গানই'ত জানি, তবে ঐটেয় আমার বড় লজ্জা করে।

বিদূষক। তা বল্লে কি চলবে, রাজার যেই ঘুম আসবে, অমনি গান গেয়ে তাঁকে জাগিয়ে দেবে, রাজা যেই চোক মেলে চাইবেন, অমনি তুমি দাঁত বার করে রাজার মুখের কাছে মুখ খানা নিয়ে যাবে। এখন আর লজ্জায় কাজ নাই, জানত সুখ-সারী পাখী আছে। সারি কি শুখের কাছে গান গাহিতে লজ্জা করে?

এখন গাও দেখি শুনি, রাজার মনের মত হবে কিনা বুঝে নিই।

দাসী। গাহিতেই হবে, তবে শোন,—

দুরন্ত বসন্ত বঁধু এল কৈ
গাছে তুলে দিয়ে যাদু কেড়ে নিলে মই।

ঐ যা ভুলে গিয়েছি, পুকুরে ফোটে সে গুলোর নাম কি?

বিদূষক। কি পদ্ম!

দাসী। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—

পদ্ম ফোটে বিজু বনে,
কোকিল ডাকে কুহু তানে,
মদনের পঞ্চ বাণে ম'লাম বুঝি সই।

বিদূষক। অতি সুন্দর, প্রাণ হরে নিলে'। এইবার নেচে নেচে গাও দেখি, আমি এই অবসরে সন্দেশ কটী খেয়ে নিই।

(দাসীর নৃত্যের সহিত গীত, বিদূষকের সন্দেশ ভক্ষণ ও বিদূষক দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া)

বিদূষক। ওগো রাজ মহিষী বিপদ বুঝি ঘটলো, কুমার লক্ষ্মণ আগুনের ফুলকার মত এই দিকে আসছে।

দাসী। অ্যা তবেইত মলেম, না বলে যে অন্দর হতে বেরিয়ে এসেছি।

(দাসীর পলায়নোদ্যোগ)

বিদূষক। ওকি একলা রেখে পালাও যে, আমি তোমার নাম বলে দিব। (অঞ্চল ধারণ)

দাসী। ও ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি, আঁচল ছেড়ে দাও, এখনি কেটে কুচি কুচি ক'রবে। মলে আর রাজরাণী হবে কে?

(অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া পলায়ন, বিদূষকের পতন এবং লক্ষ্মণের প্রবেশ)

বিদূষক। গিয়েছেরে বিষ্ণু পল্লব গুড়ো হয়ে গিয়েছেরে—

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) চারি দিকে বিভীষিকা, কোটী কোটী রাক্ষসে যেন মুখ ব্যাদন ক'রে গ্রাস করতে আ'সছে। শোনিতাপ্লুত শত শত কঙ্কাল মূর্ত্তি যেন আমাকে বেষ্টন ক'রে নৃত্য ক'রছে। এসব কি! ভূত না প্রেত? কে তোরা আমার অনুসরণ কো'রছিস? কি খল খল হাস্য, কি ভীষণ মূর্ত্তি, প্রচণ্ড ভৈরব হুহুঙ্কার, কে তুই দুরাত্মা ছায়াময় দেহ আমার সম্মুখে পথ অবরোধ করে দাঁড়ালি! দূরে যাও, নইলে লক্ষ্মণের তরবারে দ্বিখণ্ড হবে? কৈ! আরতো কিছুই নাই, হৃদয়! স্থির হও, কিসের ভয়; পাষাণ-গঠিত হৃদয়ে আবার ভয়। কিন্তু কাল মেঘের উপর দাঁড়ায়ে ও কে? অঙ্গুলি সঙ্কেতে আমাকে বারম্বার আহ্বান করিতেছে! একি মাগো সুমিত্রে! অভাগা সন্তানকে কি কোলে নিতে এসেছ। দাঁড়াও মা, অনেক দিন মা বলে ডাকি নাই। মা বলে ডেকে এ দগ্ধ প্রাণ জুড়াই মা।

বিদূষক। রাম রাম রাম, ভূতে মেরে ফেল্লে!

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) আবার সেই আর্ত্তনাদ, আবার সেই করুণ রোদন? অযোধ্যা প্রেতা-ত্মার নৃত্যাগার, মহা শ্মশান, চারিদিকে চিতার আগুন জ্বলছে, যেন রাশি রাশি শব জ্বলন্ত হুতাশনে অবিরাম দগ্ধ হচ্ছে। চারি দিকে পিশাচের হুহুঙ্কার রব। পিশাচ শ্রেণী বিকট হাস্যে বিকট নৃত্য ক'রছে। (প্রকাশ্যে) কে তুমি ভীত হয়েছ?

বিদূষক। উত্তর দিবার শক্তি নাই, ভূতে আমার গলা টিপে ধরেছে।

লক্ষ্মণ। দৈব ইন্দ্রজাল! আজ অস্ত্র বলে ছিন্ন ভিন্ন হবে, কি ভয়ঙ্কর! রাম রাজ্যে হাহাকার! স্বর্গে অশান্তি, লক্ষ্মণের হৃদয়ে দুর্ব্বলতা। ঐ উজ্জ্বল প্রাচী দেশ, মরি মরি

ঊষার কনক মুকুট কি সুন্দর! কি সুন্দর বন বিহগীর হৃদয়োল্লাসকারী প্রভাতী সঙ্গীত কিন্তু কৈ? সব যে মহান অন্ধকার রূপে মহা কলরবের ভিতর বিলীন হ'যে যাচ্ছে। ঐ দূরাগত প্রভাত পবন হিল্লোল যেন কোন অপরিচিত রাজ্যের শোকের বার্ত্তা বহন ক'রে আসছে; ঐ দীপ্ত দীনমণির তরুণ কিরণে যেন কি ভীষণ শোকের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

বিদূষক। (বেগে লক্ষণের নিকট আসিয়া) কুমার রক্ষা করুন, গোটা আষ্টেক রাক্ষুসে ভূত আমাকে ঘেরাও ক'রেছিল।

লক্ষ্মণ। ভয় নাই বিভীষিকা ছায়ামাত্র, (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল, অযোধ্যাবাসী সকলের হৃদয় কি ভীতি-বিহ্বল হয়েছে? বিকট বিভীষিকা কি সকলের সম্মুখে নৃত্য করছে? জানিনা অযোধ্যায় কি পাপ প্রবেশ করেছে।

বিদূষক। কুমার। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, লঙ্কার রাক্ষসগুলো মরে মরে সব ভূত হয়েছে, তারাই এসে সব উপদ্রব আরম্ভ করেছে। আট রকমের বিভীষিকা,কোনটা নাক কোড়ান,কোনটার মুখের ভিতর আগুন জ্বলছে। এখনি আমাকে গিলে ফেলেছিল আপনি যেই এখানে এলেন,সেই রক্ষা নইলে এতক্ষণ—

লক্ষ্মণ। নির্ভয়ে গৃহে যাও আমি অস্ত্রধারী হযে তোমার অনুসরণ কর্‌ছি।

বিদূষক। আপনাকে আর অনুসরণ কর্ত্তে হবে না; এখান হতে আমি এক ছুটে পালাচ্ছি। (বেগে প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) মেঘের উপর স্বর্ণ সিংহাসন, তাহার উপরি সহস্র কমল দলে, কে ঐ মহিমাময়ী রমণী মূর্ত্তি! পার্শ্বে ও কে, মলিন-বদনা, ধূলি-ধুসরিতা পূর্ণ গর্ভবতী! ওকি মা জনকনন্দিনী, নয়ন-যুগল অশ্রু-প্লাবিত কেন মা। লক্ষ্মণের প্রতি ওরূপ ঘৃণার নয়নে চাইছ কেন মা! (সচকিতে) কি ভীষণ স্বপ্নময় প্রলাপ!! কে তুই দুরাত্মা আমার সম্মুখ-পথ অবরোধ করে দাঁড়ালি? একি! এ যে অসংখ্য অনন্ত শ্রেণী চলেছে, সীমা-শূন্য পথ, দৃষ্টি-প্রবাহত, শ্রেণীর পর শ্রেণী, তাহার পর উত্তাল-তরঙ্গময, উঃ, কি বিস্তির্ণ শোনিত-সমুদ্র। অনন্ত অপার, স্তূপীকৃত অন্ধকার, তার পর কৈ? আর যে কিছুই নাই। শুভ্র মেঘ খণ্ডবাহী আকাশ, স্বচ্ছ সুনির্ম্মল রবি করে হাস্য করছে। উন্মত্ত হৃদয়, জাগ্রত অবস্থায় এ সকল প্রলাপ কেন? যাই আর একাকী থাকবো না। সহস্র চেষ্টাতেও হৃদয়ে বল সঞ্চার হ'ল না।

(নেপথ্যে)

লক্ষ্মণ রে, আয় বাপ, অনেক দিন চাঁদমুখ দেখি নাই, অনেক দিন মা বলে ডাকিস্ নাই, কোলে আয় বাপ্।

লক্ষ্মণ। একি! এ যে মায়েরই কণ্ঠ বটে, স্বর্গ হতে অভাগা সন্তানকে কি কোলে নিতে এসেছেন? মা, মা, দাঁড়াও কোলে যাই মা।

বেগে প্রস্থান।

পটক্ষেপণ। ক্রমশঃ—

শ্রীমহেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

গ্রাহকগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন।

আমরা আজ আঠার বৎসর কাল "আলোচনা" পরিচালনা করিতেছি। প্রতি মাসে মায় মাশুল বার্ষিক ১৷৹ টাকা মূল্যে রয়েল ৮ পেজী পাঁচ ফর্ম্মা করিয়া পত্রিকা দেওয়া অসম্ভব কিন্তু আমরা লাভের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল সাহিত্য-সেবার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ কার্য্য করিতেছি। এ দেশে ১৷৹ টাকা মূল্যে এত বড় মাসিক আর একখানিও নাই। আমরা বহু তাগিদ সত্বেও এই দুঃসময়ে অনেক গ্রাহকের নিকট হইতে টাকা পাইতেছি না। যেরূপ সঙ্কট সময় পড়িয়াছে, তাহাতে পত্রিকা চালান দায়; কাগজের মূল্য দ্বিগুণ, ছাপার মূল্যও ঐরূপ। এক্ষণে গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টি একান্ত প্রার্থনীয়। প্রার্থনা—নিজে সাহায্য প্রদান করিয়া এবং প্রত্যেকে ১ জন করিয়া গ্রাহক করিয়া দিয়া আমাদের দুঃসময়ে সাহায্য করুন।

ম্যানেজার।

খাদ্য ও রন্ধন।

মানবের দন্ত ও পাকাশয়ের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ঈশ্বর ফলভোজী করিয়াই তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বিষয়ে বানরগণের সহিত মানবের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। * কন্দ, মূল ফলাদি সাত্ত্বিক আহাররূপে আর্য্য হিন্দুর শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ সাত্ত্বিক আহার ভাল বাসিতেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে রাজসিক ও তামসিক খাদ্যের যে, বহুল প্রচলন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ জগতের অন্যান্য স্থানেও মানবের মৎস্য ও মাংস ভোজনেরও প্রভূত বিবরণ পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর জলি বলেন, মানব আদৌ ফলভোজী হইলে কি হয়, প্রয়োজন বশতঃ অল্প দিনের মধ্যেই সর্ব্বভোজী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। † পুষ্টিকর ফলমূলাদি সকল দেশে সুপ্রাপ্য ছিল না, পরন্তু কৃষিকার্য্যে মানবের অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। যখন ত্রিতাপে অভিতপ্ত হইয়া তাহাকে গিরিগুহায় লোমশ গণ্ডার, বিরাট্ ভল্লুক ও সিংহাদি শ্বাপদগণের সহিত একত্র থাকিয়া অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতে হইত, অথবা বন্য হরিণের অনুসরণে দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করিতে হইত, তখন পশু মাংস ভিন্ন অপর কোন আহারের অন্বেষণে সে অবসর পাইত না।

প্রথম প্রথম সেই সকল মানব আম মাংসেই কোন উপায়ে উদর পূর্ত্তি করিত। কিন্তু অগ্নি আবিস্কৃত হইবা মাত্র তাহার দগ্ধ, সিদ্ধ বা রন্ধন করিয়া তাহা ভোজন করিতে লাগিল। ক্রমে শঙ্খ শম্বুকাদির ক্ষার লবণের এবং কাঁচা চর্ব্বি, ঘৃত ও তৈলের অভাব পূরণ করিল। জীরে, মরিচ ও ধন্যাকাদি বেশবারের ধারণাত তৎকালে সুদূরপরাহত। গুহাবাস হইতে মানব যখন পল্লীমধ্যে সমাজবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিল, তখন প্রকৃতির উপহারে তাহাকে অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইল। অবশেষে দেশীয় ও সামাজিক আচার ব্যবহার তাহাকে অনেক পরিমাণে অধিকার করিয়া বসিল। এইজন্য আমরা জগতে পক্কভোজী, মৎস্যাশী, ও মৃদ্‌ভোজী মানবগণের বিবরণ দেখিতে পাই। এমন কি অনেক সময় সে স্বজাতির প্রাণসংহার করিয়া তাহাদেরই

* Tylor's *Early History of Mankind* 273—74. *Man before Metals* p 198 *Prehistoric Man and Beast* p. 78

† *Prehistoric Man and Beast.* p 78.

শোণিত-মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হইত না। *

মুশে ডিউপোঁ এক সময়ে বলিয়াছেন যে, বেলজিয়মের গুহাবাসী আদিম মনুষ্যগণের মধ্যে গন্ধমুষিক একটী প্রধান খাদ্যরূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু মুশে ষ্টীনষ্ট্রাপ্ তাঁহার সেই মতের খণ্ডন করিয়া বলেন যে, বেল্জিয়মের গুহা সমুদায়ে মূষিকাদির যে রাশি রাশি অস্থি পরিলক্ষিত হয়, তৎসমস্তই নিশাচর পক্ষিসমূহের ভুক্তাবশিষ্ট ভিন্ন আর কিছুই নহে। †

লবণ।—অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমুদ্রলবণ মানবের বিদিত ছিল। প্রকৃতির পশুশালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। আমরা দেখিতে পাই, গবাদি পশুদিগকে লবণ খাওয়াইতে পারিলে, তাহাদের পুষ্টি সাধিত হয় এবং দুগ্ধ প্রভূত পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে। মেষদিগকে লবণ খাইতে দিলে তাহাদের ঊর্ণা অধিকতর কোমল ও চিক্কণ হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে লবণ যে সকল দেশে দুষ্প্রাপ্য ছিল, তথাকার অধিবাসিগণ মুদ্রারূপে ইহার ব্যবহার করিত। অর্থাৎ লবণের বিনিময়ে অপর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত। পুরাতত্ত্ববিৎ র্লিবিগ বলেন, গোল্ড কোষ্টের বর্ব্বর এবং গাল্লাজাতির মধ্যে এরূপ জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল যে, একমুষ্টি লবণের বিনিময়ে তাহারা একটী, এমন কি কখন কখন দুইটী ব্যক্তিকে অম্লানবদনে বিক্রয় করিত। ‡

* *Man before Metals* p. 209.

† *Ibid* p. 201.

‡ *Ibid* p. 202.

পাত্রাদি।—অগ্নি ও রন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধন ও পানভোজনাদি পাত্রের কথা স্বতই সমুত্থিত হয়। স্থালী, কলস, থালা, ঘটী, বাটী প্রভৃতি পাত্র আজিকালি আমাদের রন্ধন ও ভোজনাগারের শোভাবিস্তার করিতেছে, কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন আমাদিগকে ইহাদের দুই একটী স্থূল স্থূল তৈজসে তৃপ্ত থাকিতে হইত। অখণ্ড কদলীপত্রে যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের সকল উপকরণ ও ভোজ্যাদি আজিও সাজাইয়া রাখিতে হয়। কদলীত্বক ও কদলীপত্র চারি যুগই হিন্দুর যজ্ঞশালায় ও পূজামণ্ডপে সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। হিন্দু ধনকুবেরগণ স্বর্ণ বা রৌপ্য থালে পূজার নৈবেদ্য সজ্জিত করিলেও জগন্মাতার তৃপ্তি যেন কদলীপত্রেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। দক্ষিণাপথে বড় বড় ব্রাহ্মণভোজনে আজিও শুষ্ক কদলীপত্র-নির্ম্মিত ঘটী, বাটী, গেলাস, রেকাব প্রচুর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এমনকি বড় বড় যজ্ঞশালায় থালা, বাটী প্রভৃতি তৈজসপত্রের কচিৎ ব্যবহার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

রন্ধনপাত্র নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে জগতের অনেক স্থলে লোকে মাংসাদি অগ্নিতে অর্দ্ধ দগ্ধ করিয়া আহার করিত। আন্দামান দ্বীপবাসিগণ শূন্যগর্ভ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায়ের কোটরে সর্ব্বদা আগুন জ্বালিয়া রাখিত এবং প্রয়োজন হইলেই তাহার ভিতর হইতে ভস্মরাশি বাহির করিয়া লইয়া সেই অগ্নিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূকরশাবক বা মৎস্য দগ্ধ করিয়া লইত। আফ্রিকার কোন কোন স্থলের অধিবাসিগণ প্রকাণ্ড বল্মীকস্তূপ হইতে পুত্তিকা সমুদায়কে হত বা নিঃসারিত

করিয়া তাহাদের অভ্যন্তর ভাগ পরিষ্কৃত করিত এবং তন্মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিত। অতিরিক্ত তাপে সেই স্তূপগুলি রক্তবর্ণ ধারণ করিলে তাহারা তদুপরি গণ্ডারের অস্থিসন্ধিগুলি সাঁকিয়া লইত। পণ্ডিতবর টাইলর বলেন এ প্রক্রিয়া তাহারা সর্ব্বদা অবলম্বন করিত না। প্রায়ই তাহারা মাটীতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক তৎসমুদায়কে উত্তাপিত করিত এবং তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লাল হইয়া উঠিলে অঙ্গার ও ভস্মরাশি উত্তোলিত করিয়া মৎস্য, মাংস পুড়াইয়া বা সাঁকিয়া লইত। *

উক্ত প্রকার রন্ধনকার্য্যে পলিনেশিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে অগ্নিতপ্ত শিলাখণ্ড সকল অনেক সময় ভর্জ্জনপাত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। মেরিয়া নামক দ্বীপের অধিবাসিগণ প্রথমে গর্ত্ত মধ্যে আগুন জ্বালিয়া সেই অগ্নির উপর একটী পূর্ণ ছাগ বা মেষশাবক স্থাপিত করিয়া উত্তপ্ত পাষাণখণ্ড দ্বারা তাহাকে চাপিয়া রাখিত; তাহাতে মাংস কিয়ৎপরিমাণ ভৃষ্ট বা সিদ্ধ হইলে মেরিয়ান পর্য্যটকগণ পরমানন্দে ভোজ সমাপিত করিত। কানারী দ্বীপবাসিগণ একটা গর্ত্তমধ্যে মাংস পুঁতিয়া রাখিয়া তদুপরি অগ্নি স্থাপন † করিত।

Stone-boiling.—

শিলা-সেধন।—উত্তর আমেরিকার একটী প্রাচীন জাতি তাহাদের প্রতিবেশী ওজিব্যগণের নিকট অশিনাবোইন অর্থাৎ শিলাসেধন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সেই অশিনাবইনগণ যে প্রক্রিয়া দ্বারা মাংস সিদ্ধ করিত, তাহা অতি বিচিত্র। তাহারা একটী গর্ত্ত করিত, এবং তাহার অভ্যন্তরে গর্ত্তগাত্রে সংলগ্ন করিয়া সেই নিহত জন্তুর চর্ম্ম এরূপভাবে সঞ্চাপিত করিত যে, তাহাও একটী গর্ত্তের বা থালীর রূপ ধারণ করিত। সেই থালী জলে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে মাংস স্থাপন করিত। তাহার পর নিকটস্থ অনলকুণ্ডে কতকগুলি শিলাখণ্ড উত্তাপিত করিয়া সে গুলি তাপে রক্তবর্ণ ধারণ করিলে সেই এক একটী আরক্ত পাথর লইয়া সেই মাংসপূর্ণ থালী মধ্যে নিক্ষেপ করিতে থাকে। যতক্ষণ জল প্রয়োজন মত উত্তপ্ত হইয়া মাংস সিদ্ধ করিতে না পারিত, ততক্ষণ তাহারা তপ্ত শিলাখণ্ড তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিত। এসিনাবইনগণের মধ্যে সেই প্রথা বহুদিন প্রচলিত ছিল, পরিশেষে তাহারা মন্দান জাতির কাছে মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিতে শিখিয়া শিলাসেধ একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছিল। ফাদার চার্লেভই বলেন,উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রকার কেটলীতে জল রাখিয়া তপ্তারক্ত শিলাখণ্ড সেই জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া গরম করিয়া লইত। এই শিলাসেধন প্রথা পূর্ব্বকালে অনেক প্রাচীন মার্কিন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। সার এডোয়ার্ড বেলচার আইস্‌লণ্ডের এস্কিমোগণের মধ্যে এই প্রথা ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। আশিয়ামণ্ডলের উত্তর পূর্ব্ব কোণে কামস্কাটকার প্রাচীন অধিবাসিগণ উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার সংস্রবে থাকিয়াও রুষগণের প্রবর্ত্তিত লৌহপাত্র সহজে ব্যবহার করে নাই। শিলাসেধে তাহাদের এত আসক্তি ছিল যে, অন্য কোন পাত্রে মাংস পাক করিয়া তাহারা কিছু-

* *Early History of Mankind* p. 263.
† *Ibid* p. 265.

তেই চিত্তের পরিতর্পণ করিতে পারিত না। অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া নদীর তীরে বেন্‌স নামে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ১৮৫৫।৬ খৃষ্টাব্দেও শিলাসেধন প্রথা প্রবল দেখিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন কুক নিউজিলাণ্ডেও এই প্রথা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। *

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ টাইলর বলেন, য়ুরোপের অনেক স্থানে এক কালে যে শিলা-সেধন প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমান পাওয়া যায়। ইন্দু-য়ুরোপীয় জাতির সংস্রবে বহুকাল থাকিলেও তাহার জাতির ফনিগণ সেই প্রাচীন প্রথার সামান্য অংশমাত্র আজিও অক্ষুণ্ণ রাখি য়াছে। লিনিয়স্ নামক জনৈক পর্য্যটক ল্যাপ-লাণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, পূর্ব্ব বথল্যাণ্ড নামক স্থানের অধিবাসি-গণ তদ্দেশের লূরা নামক সুরা শিলসেধন প্রক্রিয়া দ্বারাই প্রস্তুত করিত।

শিলাসেধন প্রথা যতদিন আমেরিকায় প্রচলিত ছিল, তৎপ্রতি প্রাচীন মার্কিনবাসি গণের প্রগাঢ় আসক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত, কিন্তু কলম্বাস কর্ত্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কারের পর স্পেনবাসীদিগের লৌহ কেট্‌ল সকল মার্কিণভূমে আনীত হইবা মাত্র রেড্ইণ্ডিয়ান-গণ অবিলম্বে সেই পূর্ব্ব প্রথার পরিহার করিয়া ভূরি পরিমাণে জেতৃগণের আয়সপাত্র ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপ অল্পকালের মধ্যেই একমাত্র উত্তর পশ্চিম আমেরিকা ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই শিলাসেধন প্রথা পরিত্যক্ত হইল।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

* *Early History of Mankind.* pp 265—70. 309.

ব্রাহ্মণ।

(১)

উঠহে ব্রাহ্মণ অবনী-অমর !
ত্যজিয়ে শয়ন আজি একবার,
তোমার পবিত্র ধর্ম্মের মন্দিরে,
প্রবেশি' অধর্ম্ম করিছে বিহার !

(২)

অমূল্যরতন যা ছিল তোমার
ঘুমন্ত তোমায় করি বিলোকন,
সাজায়ে কাঙ্গাল নিঃশঙ্ক মনসে
লুটিছে অনিশ সে সকল ধন।

(৩)

পাপের পশার পূর্ণ প্রকটিত !
দিয়ে করতালি তাই অনিবার,
উদ্দাম নর্ত্তনে অকূল উল্লাসে,
হাসিছে গাইছে পাপ দুরাচার !

(৪)

উঠ ত্বরা করি ভূদেব ব্রাহ্মণ্ !
জ্ঞান শরাসনে জুড়ি ব্রহ্মবাণ'
প্রণব হুঙ্কারে দলিয়া তাহায়,
করহ ধরায় অভয় প্রদান।

(৫)

ধ্বনিয়া গগন, পাতাল ভুবন
কাপায়ে অতল জলধির ঝাঁরি,—
বাজাও আবার জলদ-মন্দ্রে—
ধর্ম্মের বিজয়- বিশাল-ভেরী।

(৬)

অম্বর ভেদিয়া উঠাও আবার,—
ধর্ম্মের নিশান রঞ্জিত করিয়া !
তুলি সামগান বিশ্ব জাগরণ,'
পরহিতে প্রাণ দাওহে ঢালিয়া।

(৭)

গিয়াছে মুছিয়া অতীতের স্মৃতি ?
ভাব এক বার পূর্ব্ব রীতি, নীতি
কি ছিল তোমার কি নাই এখন
কিসের অভাবে হেন দুর্গতি।

(৮)

পিতৃ পিতামহ পূর্ব্ববর্ত্তিগণ—
কেমন তোমার তুমিবা কেমন,
তাঁদের তুলনা জগতে ছিলনা,
ব্যাঙের উপমা তুমি না এখন ?

(৯)

বিশ্ব শিক্ষাগুরু আর্য্যঋষিগণ
পবিত্রতা খনি পরার্থ জীবন ;
বিলাস ব্যসন ছিলনা তাঁদের,
আছিল তাঁদের শান্তি তপোবন।

(১০)

যুগ যুগান্তর জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম,
সত্যের, মহিমা করিত প্রচার,
ধর্ম্মের আসনে বসিয়া তাঁহারা
শাসিত অবনী করিত বিচার।

(১১)

ত্যাগ, সরলতা শিখাত জগতে
পুণ্য পথে যেতে দিত উপদেশ,
স্বরগের শান্তি এনেছিল তাঁরা
নরকের মাঝে খেদায়ে ক্লেশ।

(১২)

আয়ুর্ব্বেদ স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শন,
এ সব তাঁদের সাধনার ফল,
ভুবন-মঙ্গল করিতে বিধান
করিলা নির্ম্মাণ পেয়ে যোগবল।

(১৩)

জ্ঞানের বিমল শীতল কিরণ
ছড়ায়ে-বিশ্বের ফুটাল নয়ন।
যোগবলে তারা পারিত সকলি,
ফিরাতে আপন অকাল মরণ।

(১৪)

জ্বালি হোমানল মন্ত্র উচ্চারণে
করিত যখন আহুতি প্রদান,
দ্যুলোক ত্যজিয়ে ইন্দ্রাদি দেবতা
নামিত ভূলোকে লইতে সে দান

(১৫)

শ্যামলা ঊষায় রম্য তপোবনে—
তুলিত বেদের কি মোহন তান!
বিভু প্রেমে মাতি কতনা উল্লাসে—
ললিত কন্ঠে খুলিয়া পরাণ।

(১৬)

রোগ পাপহারী পূত পদরেণু
তাদের, যতনে মাখিয়া মস্তকে,
নৃপ, লক্ষপতি কিংবা দীন হীন
ভাবিত এবার জনম সার্থক!

(১৭)

উন্নত ললাট দীপ্তকলেবর
প্রত্যক্ষ দেবতা দয়ার মুরতি ;—
পাষণ্ডের (ও) দল করি দরশন
লুণ্ঠিত চরণে লভিত সুমতি।

(১৮)

কাশ্যপ, গৌতম, কণ্ব, ভরদ্বাজ,
বিশ্বামিত্র আদি বিশ্ব গুরুগণ—
বাজায়ে ধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি
করেছিল সত্য নিশান স্থাপন।

(১৯)

তুমিনা ব্রাহ্মণ লয়েছ জনম
সাধনার ফলে সেই পূত কুলে !
অতীতের কথা যোগ, ধর্ম্মনীতি,
ত্যাগ, সরলতা, গিয়াছ কি ভুলে ?

(২০)

নাই দান ধ্যান সদা পাপাচার,
অলস, বিলাসী অধমের প্রায়,
কলঙ্ক কালিমা— মলিন বদন,
দাসত্ব শৃঙ্খল পরিয়াছ পায়।

(২১)

কোথা ব্রহ্মচর্য্য, বেদ অধ্যয়ন,
সত্য, ধৃতি, ক্ষমা স্বধর্ম্ম রক্ষণ ?
হয়ে স্বার্থহীন পরার্থে জীবন
ঢালিতে ব্রাহ্মণ ! দেখিনা এখন।

(২২)

সতত লাঞ্ছিত অধমের করে,
ঘৃণিত সবার মানব প্রধান,
হে বরেণ্য দ্বিজ ! কোথা সে তোমার
ধর্ম্মের গরব উচ্চ অভিমান ?

(২৩)

আপনার দোষে হারায়ে সকল,
মাগিয়ে করুণা অপরের দ্বারে,
শুধু রিক্ত হস্তে বিমুখ হইয়া
বিরস বদনে আসিতেছ ফিরে।

(২৪)

ছি ছি কি লজ্জা হে দেব ব্রাহ্মণ।
এখনও নিশ্চিন্তে রয়েছ বসিয়া ?
উচ্চের পতন আর কিবা হয়
দেখ একবার জগতে খুঁজিয়া।

(২৫)

অলস হইয়া থাকিও না আর
উঠ ত্বরা করি জাগাও ভুবন।
বিনে জাগরণ তোমার আহ্বান
জাগিবেনা সুপ্ত জগত কখন।

(২৬)

হে পৃথ্বীঋৎত্বিক্ ভূদেব ব্রাহ্মণ !
এ দুঃখ দুর্দ্দিনে থে'কোনা শয়নে
মঙ্গল আরতি কর আরম্ভণ
ধরম অর্চ্চনা শুভ আয়োজনে।

(২৭)

মুরজ গম্ভীরে গাহিয়ে আবার
ধর্ম্ম, প্রেম, গীতি, মাতাও ভুবন,
ধর্ম্মেরই জয় হইবে নিশ্চয়,
উঠিবে হাসিয়া তরুণ তপন।

(২৮)

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কর উদ্‌যাপন,
কর হোমজপ বেদ শিক্ষা দান,
যশের মুকুট শোভিবে মস্তকে
পাইবে আবার বিশ্বের সম্মান ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শিক্ষা।

(১)

যে দিন অনিল কুমারের বি, এ পাশের খবর কাগজে বাহির হইল, সেদিন অন্নাকালীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে অনেক কষ্টে বেচারি ছেলেটীকে মানুষ করিতেছে।

অনিল কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িত, ছুটী হইলে রাজপুরে মার কাছে আসিত। অনিলের বাটী রাজপুরে। অনিল ছেলেটী বড় ভাল, তাহার মত শান্তশিষ্ট ছেলে আজকালকার বাজারে প্রায় দেখা যায় না। অনিলের যেমন গুণ, বিধাতা আবার তাহাকে তেমনই রূপ দিয়া মনিকাঞ্চনের যোগ সাধন করিয়াছিলেন।

রাজপুরের দারোগা উমেশবাবু এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক; তিনি ভাবিতেন—জগতে তাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তাঁহার ইচ্ছা সকলেই তাঁহার নিকট নত থাকিবে। উমেশবাবু বি, এ পাশ হইয়া পুলিশ-সবইন-স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; দুই মাস হইল "স্বদেশী" হাঙ্গামায় ইঁহার পদোন্নতি হইয়াছে। এখন ইনি ইনস্পেক্টার। সুকুমারী উমেশবাবুর একমাত্র কন্যা। সুকুমারীর যখন এগার বছর বয়স তখন হইতেই উমেশবাবু তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু পুলিশ ইনস্পেক্টারের কন্যা বলিয়া কলেজের কোন ছাত্রই বিবাহে রাজি হয় নাই। স্বদেশীর ধূয়া উঠা অবধি স্কুল কলেজের ছাত্র এবং পুলিশের মধ্যে যে এক অদ্ভুত সম্বন্ধ জন্মিয়াছিল, তাঁহারই প্রভাবে কোন কলেজের ছাত্র প্রবল প্রতাপ দারোগাবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হয় নাই।

সুকুমারীর মা ক্ষীরোদা একদিন উমেশ বাবুকে বলিলেন—"হাঁগা তুমি কি কচ্ছ? তের' বছরের মেয়ে হল, আর কি রাখা চলে? শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর একটা বিয়ে দাও; আর দু'দিন পরে সমাজের লোকেরা বল্‌বে কি?"

উমেশবাবু বিষণ্নবদনে বলিলেন—"কি আর করব আমি? এত চেষ্টা কচ্ছি, কেউ রাজি হয় না।"

ক্ষীরোদা—তবে মেয়ে কি চিরকাল আইবুড় থাকবে, এমন চাকরি কেন করা; লোকে চাক্‌রি করে—নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ইজ্জৎ রাখ্‌বার জন্য। তোমার এমন চাক্‌রি যে তার জন্য সমাজে ইজ্জৎ থাক্‌বে না?"

উমেশবাবু খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, অনিলের সঙ্গে সুকুর বে' হলে কেমন হয়?

ক্ষীরোদা—অমন বর ত লোকে কত পুণ্য করে পায়।

উমেশ—ছেলেটী খুব ভাল, এত অল্প বয়সেই বি-এ পাশ হয়েছে, তবে কিনা বড় গরীব।"

ক্ষীরোদা—তা' হ'লই বা গরীব!

উমেশ—তুমি একবার আন্নাকালীকে ডেকে বল্‌তে পার? দেখো নিজে ছোট হ'য়ে বলো না। আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে তার ছেলেরও ত গৌরব।

সেই দিন মধ্যাহ্ন কালে উমেশবাবুর স্ত্রী আন্নাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমেশবাবুর বাটীর খানিক দূরেই অনিলদের ছোট খোলার বাটীখানি।

আন্নাকালী আসিলে দারোগা বাবুর স্ত্রী অনিলের সহিত সুকুমারীর বিবাহের কথা পাড়িলেন।

আন্নাকালী বলিল—"এত খুব সৌভাগ্যের

কথা! আমারও একান্ত ইচ্ছা এবার ছেলে-টাকে সংসারী করে দিই; কবে মরে যাব, আমার অবর্ত্তমানে তাকে দেখ্‌বার লোক একটীও নেই, তা' তোমাদের মতন যদি শ্বশুর শাশুড়ী থাকে, তবে আর ভাবনা কিসের! এই দিন পাঁচেক পরে গরমির ছুটী হবে, সে বাড়ী আস্‌বে, তাকে বলব এখন।"

ক্ষীরোদা—শুভকার্য্যটা যত শীঘ্র হ'য়ে যায়, ততই ভাল। যাতে শীঘ্র হয় তাই ক'র। আষাঢ় মাসের মধ্যে নিশ্চয় হওয়া চাই।

গ্রীষ্মাবকাশে অনিল কুমার বাটি আসিল, অন্নাকালী উমেশবাবুর অভিমত জানাইল।

অনিল বলিল—সে বিবাহ করিবে না।

অন্নাকালী পুত্রকে অনেক বুঝাইয়া বলিল, কিন্তু অনিল কোন মতেই উমেশবাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। অন্নাকালী বিষণ্ণ হইয়া উমেশবাবুর স্ত্রীকে পুত্রের অসম্মতির কথা জানাইল।

উমেশবাবু স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে গরীবের ছেলে অনিল তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। তাঁহার অহঙ্কারে আঘাত লাগিল। দলিত ফণ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দারোগাবাবু তীব্র দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা"। গৃহিনীকে বলিলেন—"দেখো একথা যেন লোকে না জান্‌তে পারে।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্বদেশী অন্দোলনে ভারতে নবযুগের নবচিন্তার উদ্বেল তরঙ্গ বহিতেছিল। কলেজের ছাত্রগণের এই ঘোর উন্মাদনার দিনে তাহারা বৈধ, অবৈধ নানা উপায়ে নির্য্যাতিত হইতেছিল। এই নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিতেরাই সে দিন জাতীয় জীবনে যে একটী উজ্জ্বল বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহারাই একদিন সেই আলোকে আলেয়ার আলো দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছিল। সেই স্বদেশ প্রেমী যুবকদের মধ্যে অনিলকুমার একজন।

রাজপুরে আসিয়াই অনিল কুমার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় পল্লীবাসীর প্রাণে স্বদেশের সুপ্ত-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। রাজপুরে বিদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার ও তাহার আদান-প্রদান করা অনিল বন্ধ করিয়া দিল। দেশীয় শিল্পের যাহাতে আদর হয়, দেশীয় পণ্যজীবিগণ যাহাতে মানুষ হয়, অনিল নিজের অর্থব্যয় করিয়া তাহা করিতে লাগিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই রাজপুরে স্বদেশীর ধুম পড়িয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া উমেশবাবু অনিল কুমারকে রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করিলেন। বিচারে অনিলকুমারের তিনমাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা হইল। অনিলকুমার দেশের জন্যে হাসিতে হাসিতে কারাগারে গেল। তিন মাস পরে যে দিন অনিলকুমার জেলখানা হইতে বাহির হইল, সেদিন অসংখ্য স্কুল কলেজের ছাত্র আসিয়া পথে ফুল ও খই ছড়াইয়া তাহার গৌরব বৃদ্ধি করিল। কারামুক্ত হইয়া সে যখন আবার রাজপুরে আসিল, তখন সরল বিশ্বস্ত হৃদয় পল্লীবাসীগণ ষ্টেশনে গিয়া ফুলমালা দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল "বন্দে মাতরম্‌" শব্দে

গগন কাঁপাইয়া আনন্দিত চিত্তে স্বদেশ-ভক্ত অনিলকুমার গৃহে আসিয়া জননীর পদবন্দনা করিল।

উমেশবাবুর বাটীতে আজ বড় ধূম। বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তায় বাঁশ পুঁতিয়া দেবদারু পাতা ও গাঁদাফুলের মালা দিয়া সাজান হইয়াছে। মাঝে মাঝে লাল নীল রংএর কাগজের ফানুস ও পতাকা শোভা পাইতেছে। বাটীর দাসী চাকরেরা লাল রংএর ছোপান নূতন কাপড় পরিয়া এদিক্ ওদিক বেড়াইতেছে। কতকগুলি সুসজ্জিত পুলিশ-কনেষ্টবল গর্ব্বিতভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে।

আজ সুকুমারীর বিবাহ। কন্যাদায়গ্রস্ত উমেশবাবু অনেক চেষ্টায় ১৩ বৎসরের মেয়ে সুকুমারীর সহিত হরিপুরের ডেপুটীবাবুর একমাত্র কুলধুরন্ধর পুত্র হরসুন্দরের বিবাহের ঠিক করিয়াছেন। পিতামাতার অত্যধিক আদর-লাভে হরসুন্দরের নৈতিক চরিত্র ভদ্রসমাজেরও সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এবং পাপের অবশ্য সহচরের মত দেহটীও ব্যাধি-মন্দির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরসুন্দরকে কোনও পিতা কন্যা দানে সম্মত হইবে, ইহা ডেপুটীবাবু একদিনও ভাবেন নাই।

উমেশবাবু হরসুন্দরের গুণের কথা ভালরূপেই জানিতেন; কিন্তু কন্যাদায়োদ্ধারের কোনও উপায় না দেখিয়া হরসুন্দরের সহিতই সুকুমারীর বিবাহের স্থির করিয়াছেন।

মায়ের প্রাণ—ক্ষীরোদা এমন কুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত ছিলেন না। জানিয়া শুনিয়া কে কবে আপনার কন্যাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া থাকে? উমেশবাবু অনেক করিয়া ক্ষীরোদাকে বুঝাইয়াছেন, বিবাহ হইলেই হরসুন্দরের সব দোষ সারিয়া যাইবে। আর হরসুন্দর ডেপুটীবাবুর একমাত্র পুত্র; সুকুমারী বড় আদরের বৌ হইবে ....ইত্যাদি।

(৩)

উমেশবাবুর উঠানে প্রকাণ্ড এক সামিয়ানার তলে সভা হইয়াছে, বরযাত্রীর দল বসিয়া নানা কথাবার্ত্তা তর্ক-বিতর্ক করিতেছে; কন্যাযাত্রী একরকম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল দারোগাবাবুর ভিন্ন স্থান হইতে জনকতক আত্মীয়-কুটুম্ব মিলিয়া কন্যাযাত্রীর আসর সরগরম রাখিয়াছে।

উমেশবাবুর শ্যালক শ্যামবিহারী বিবাহবাটীতে ক্রমাগত এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল। শ্যামবিহারী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, মাথায় একখানি চাদর বাঁধা; খালি গা, খালি পা, কপালে একটা মস্ত রক্তচন্দনের ফোঁটা; শ্যামবিহারীকে দেখিলে ভদ্র বলিয়া মনে হয় না।

বরকর্ত্তা—ডেপুটীবাবুর ভাই কালীকিঙ্কর তাহাকে চাকর মনে করিয়া বলিলেন—"ওরে ব্যাটা, শিগ্‌গির এক ছিলম্ তামাক নিয়ে আয় ত।" শ্যামবিহারী রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া কালীকিঙ্করকে সজোরে এক চড় মারিয়া বলিল —"তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুই কিনা আমাকে চাকর বলিস?" কালীকিঙ্কর স্বভাবতই বড় দুর্ব্বল, চড় মারিবা মাত্র তিনি পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ বিবাহ সভায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

তার পর কয়েকজন পুলিশ-প্রহরি প্রতিপন্ন করিল—শ্যামবিহারী মারে নাই, তাহাকে মারিবার জন্য কালীকিঙ্করই উঠিয়াছিলেন, হঠাৎ পায়ে কি বাধিয়া পড়িয়া গিয়াছেন।

এই সময় দারোগা প্রভৃতি উমেশবাবুও শ্যালকের পক্ষ হইয়া বরযাত্রীদের দুই চারিটী রূক্ষ কথা বলিলেন। বিবাদ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল; ডেপুটীবাবু রাগ করিয়া বর লইয়া চলিয়া গেলেন।

উমেশবাবু হাবাগঙ্গারামের মত সভায় বসিয়া রহিলেন। বিবাহ বাটীতে মহা গোল-যোগ পড়িল, আনন্দে নিরানন্দ হইল। আত্মীয়গণ বলিতে লাগিল—"ওমা এ কি গো, মেয়ে যে দোপড়া হয়ে রইল; কি সর্ব্বনাশ।"

বলা বাহুল্য প্রতিবাসী হইলেও এ বিবাহে উমেশবাবু অনিলদের নিমন্ত্রণ করেন নাই। অনিল তাহার বাটীতে মাতার নিকট বসিয়াছিল, এমন সময় উমেশবাবুর স্ত্রী ক্ষীরোদা পদব্রজে সামান্য স্ত্রীলোকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নাকালীর নিকট আসিয়া উপস্থিত।

অন্নাকালী ক্ষীরোদাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ক্ষীরোদা অন্নাকালীর হাত ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল—"আমাদের এ বিপদে রক্ষা করো, আমাদের জাত-ধর্ম্ম সব গেল, মেয়ে দোপড়া হ'য়ে রইল। আগেকার কথা সব ভুলে যাও দিদি, মনে কর সুকু তোমারি মেয়ে—তোমার অনিলের সঙ্গে সুকুর বিয়ে দিয়ে আমাদের জাত-মান রক্ষা কর।"

অন্নাকালী পুত্রের দিকে চাহিল, বলিল—"আমিত আগেই বলেছিলুম,—ছেলে যে রাজি হয় না।"

ক্ষীরোদা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে অনিলকে বলিল—"বাবা, তুমি এত লোকের এত উপকার করছ, আমাদের এ মহৎ উপকার করবে না? তুমি বিনা আমাদের উপায় নেই—বাবা আমাদের জাত-মান রক্ষা কর।"

অনিলকুমার নীরবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর বলিল—"আচ্ছা, আমি কেবলমাত্র বিয়ে ক'রে আপনাদের জাত রক্ষা করব, কিন্তু আপনাদের বাড়ীর জল গ্রহণও করবনা।" ক্ষীরোদা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—"আচ্ছা বাবা, বিয়ে করেই আমাদের জাত কুল রক্ষা কর।"

অনিলের সহিত সুকুমারীর বিবাহ হইল, বিবাহ করিয়াই অনিল কোথায় চলিয়া গেল।

উমেশবাবু এতক্ষণাবধি পাষাণ প্রতিমার মত সভাতেই বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ শ্যামবিহারী আসিয়া হাসিয়া বলিল—"দাদা ভাবছ কি আর? সুকুর বিয়ে হয়ে গেছে।"

উমেশবাবু হতাশ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিলেন—"আর বিয়ে হ'লো। হঠাৎ রাগের মাথায় এমন কাজটা না করলেই হ'তো।" "অনিলকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে দাদা, অনিল বলেছে 'বিয়ে ক'রে তোমাদের জাত রক্ষা ক'রব কিন্তু আমি তোমাদের বাড়ী জল গ্রহণও করিব না।'" কথাটা উমেশবাবুর নিকট আরব্য উপন্যাসের মত বোধ হইল। বিবর্ণ বিস্মিত মুখ হইতে কেবল মাত্র এই শব্দটী বাহির হইল—"অ্যাঁ—অনিল!"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আর কেহ দারোগা বাবুকে দেখিতে পাইল না।

বিবাহের তিনমাস পরে একদিন একখানি পত্র আসিল। উমেশবাবু লিখিয়াছেন, তিনি এখন শ্যামনগরে হেড্‌মাষ্টারি করিতেছেন।

কুমারী প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী।

গান্ধারী।

(পৌরাণিক চিত্র।)

পতি অন্ধ বলি সতী নিজে অন্ধ সাজি,
সার্থক করিলা জন্ম স্বামি-পদ পূজি।

আধুনিক কান্দাহার প্রদেশের প্রাচীন নাম গান্ধার দেশ। স্মরণাতীত কালে সুবল নামে জনৈক রাজা এই গান্ধারের অধীশ্বর ছিলেন। গান্ধারী উক্ত রাজা সুবলের প্রাণাধিকা নন্দিনী এবং ভুবন বিখ্যাত কুরুবংশোদ্ভূত স্বনাম প্রসিদ্ধ রাজাধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পতিগত প্রাণা সহধর্ম্মিণী। গান্ধারাধিপতির কন্যা বলিয়া তাঁহার নাম গান্ধারী ছিল।

গান্ধারী স্নেহ-প্রীতিময়ী ধর্ম্মপরায়ণা, উন্নত-চরিত্রা, তেজস্বিনী, রাজরাণী। গুরুজনে ভক্তি, আশ্রিতের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি এবং স্নেহভাজন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি স্নেহানুরক্তি তাঁহার অবশ্য-কর্ত্তব্য, নিত্যব্রত ছিল। চরিত্র সৌরভে এবং সতীত্ব-গৌরবে তৎকালে তিনি সর্ব্বজন বরণীয়া মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তাঁহার অমিয়-মধুর ব্যবহার সর্ব্বজন প্রীতিপ্রদ ছিল। স্বর্গীয় নন্দনকাননজাত পারিজাত-কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভের ন্যায় গান্ধারীর চরিত্র-সৌরভে বাল্যে পিতৃভবন এবং যৌবনে ভর্ত্তৃভবন পরিপূর্ণ ছিল। গান্ধারী উন্নত হৃদয়া আদর্শ-মহিলা।

মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। তাই পতিব্রতা গান্ধারী পরিণয় কাল হইতে আজীবন বস্ত্রখণ্ডে স্বীয় স্নেহোজ্জ্বল নয়নদ্বয় দৃঢ় বন্ধনে নিয়ত আবরিয়া অন্ধা সাজিয়া অন্ধ স্বামীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি পরিণামে যাহাতে প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে স্বামীদেবতার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, কঠোর বিবাহের পূর্ব্বেই দেব-আরাধনা পূর্ব্বক দেবতার পবিত্র চরণে সেইরূপ প্রার্থনায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। স্বীয় কর্ম্মবশে মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষের কঠোর নির্দ্দেশে তাঁহার স্বামী অন্ধ হইলেও তাঁহাকেই প্রাণারাধ্য প্রাণদেবতা জ্ঞানে নিয়ত প্রীতিভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে পূজা করিয়া আপনার নারীজন্ম সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন। জীবনে একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি জন্মান্ধ পতির প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অভক্তি বা বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার সদাচার সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা প্রভাবে ধৃতরাষ্ট্র-ভবন শান্তিনিকেতনে পরিণত হইয়াছিল। নববধূর মধুর ব্যবহারে পুরবাসীগণ যারপর নাই সুখী হইয়া স্নেহ-প্রীতি ও ভক্তি-ভালবাসা প্রদর্শনে নিয়ত তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। গান্ধারীর শৈশব শিক্ষা সার্থক হইল।

কাল প্রভাবে ক্রমে গান্ধারী শত পুত্রের জননী হইলেন। পুত্র-পুত্রবধূ ও পৌত্র-পৌত্রীগণের ক্রীড়াকৌতুক ও হর্ষকোলাহলে ধৃতরাষ্ট্রের ভবন নিয়ত মুখরিত হইতে লাগিল। যথা-

কালে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর দুর্য্যোধন কুরু-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। গান্ধারী রাজমাতা হইয়া রাজরাজেশ্বরীর অধিক সুখ সম্পদের অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু রাজাধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ম্মদোষে বা অদৃষ্টবশে রাজা দুর্য্যোধন বড় দুশ্চরিত্র হইয়া উঠিলেন। রাজ্যে অশান্তির বীজ রোপিত হইল। শান্তির গৃহে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিল।

দুর্য্যোধনের দুর্ব্ব্যবহারে জ্ঞাতি-পুত্র পাণ্ডবেরা তাঁহার ঘোর শত্রু হইয়া উঠিলেন, গান্ধারী উচ্ছৃঙ্খল পুত্রদিগকে সুপথে আনিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন, পাণ্ডবদের যথার্থ প্রাপ্য ধর্ম্মরাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে শত উপদেশ দিলেন, কিন্তু অন্ধপতির ঔদাস্য-অবহেলায় তাঁহার সকল যত্ন সকল উপদেশ বিফল হইল। জ্ঞাতি শত্রুতা মহা আহবে পরিণত হইল। অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী ঘোরতর জ্ঞাতি-যুদ্ধে কুরুক্ষেত্র রণপ্রাঙ্গনে গান্ধারীর শতপুত্র অকালে কালের গ্রাসে ঢলিয়া পড়িল।

রাজা দুর্য্যোধন ঘোর দুরাত্মা হইলেও বড় মাতৃভক্ত বীর ছিলেন। তিনি প্রত্যহ মাতৃপদ বন্দনা করিয়া তাঁহার পবিত্র পদরজঃ মস্তকে লইয়া রণ যাত্রা করিতেন। ধার্ম্মিকা জননী প্রত্যহই "ধর্ম্মের জয় হউক" বলিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। দুর্য্যোধন ঘোর অধার্ম্মিক আর পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক। সতীর আশীর্ব্বাদ সফল হইল, ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় হইল। বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডবপক্ষ আশ্রয় করিলেন। কুরু-কুল নির্ম্মূল হইল শতপুত্রের জননী রাজমাতা গান্ধারীর হৃদয়বিদারক ক্রন্দন বিলাপে সদা হাস্য-কোলাহল-মুখরিত সুবিশাল কুরুরাজ-ভবন শোক দুঃখের চির-নিকেতনে পরিণত হইল। শান্তির আশ্রমে মহাশ্মশানের ভীষণ অনল জ্বলিয়া উঠিল।

পতিব্রতা সতী গান্ধারী মহাপ্রতাপান্বিত শত পুত্রের অকাল মৃত্যুজনিত দুর্ব্বিসহ ভীষণ শোক হৃদয়ে নিহিত রাখিয়াও স্বামী সান্ত্বনায় নিয়ত যত্নবতী হইলেন। শত পুত্রবধূর বৈধব্য যন্ত্রণায় তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় সদা দগ্ধ হইতে থাকিলেও তিনি পতির প্রীতি সম্পাদনের জন্য তাঁহার শোকদগ্ধপ্রাণে শান্তির অমৃত বিন্দু শেচনের নিমিত্ত সতত প্রয়াস পাইতেন। এবং সমবেদনাসূচক স্নেহ-মধুর উপদেশে পতি-বিয়োগ বিধুরা নব-বিধবা পুত্রবধুগণের কাতর প্রাণে শান্তির অমৃত ধারা ঢালিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে কুরুকুল রাজলক্ষ্মী পাণ্ডবগণের অঙ্কশায়িনী হইল। পাণ্ডবগণের ঐকান্তিক যত্নে পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী পাণ্ডব-রাজভবনে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পুর-বাসীগণের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পতিসহ বনবাসিনী হইলেন। বনগমনের কিয়দ্দিবস অন্তে একদা যোগনিরতা যোগিনী—পতিব্রতা সতী শতপুত্রের জননী, রাজমাতা রাজরাণী গান্ধারী আকস্মিক দাবানলে পতিসহ দগ্ধীভূতা হইয়া স্বর্গবাসিনী হইলেন। প্রকৃতির মহা-শ্মশানে পতিসহ সতী এক চিতায় সহমৃতা হই-লেন। তাঁহার নারীজন্ম সার্থক হইল।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

আর্য্যগণের গো চর্য্যা ও ভারতে কৃষি।

আমাদের বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান ও খুব উর্ব্বরা। এদেশে সকল প্রকার ফসল জন্মে। গয়া জেলা হইতে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত আমি বঙ্গদেশের মধ্যে গণনা করি। কিন্তু বিগত ২০।২৫ বৎসর হইতে দেশের গো-বলদ আদি কৃষ্যোপযোগী পশু সংক্রামক রোগে, চামারের বিষে, কশায়ের ছুরীতে এত নষ্ট ও হ্রাস হইয়াছে যে,তাহার জন্য কৃষির বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। আজকাল সকল সংবাদ পত্রেই এ বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি গভর্ণর সদনে এবিষয়ে আইন লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। কর্পোরেশনের রঙ্গমঞ্চে বাবু অমূল্যচরণ আঢ্য নিশ্চেষ্ট নহেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাবু হাসানন্দ বর্ম্মাও চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। বিলাতে মিঃ জাসাওয়ালাও সম্রাট সদনে আবেদন পেশ করিয়া বসিয়া নাই। এখন আমাদের দেশের লোকের কর্ত্তব্য যে কৃষি বিভাগকে এবিষয়ে আকৃষ্ট করা। তাহা হইলেই কাজ হইতে পারে। আমাদের রাজসভায় কৃষি-দলের পক্ষ হইতে কোন সভ্যই নাই। আমার বিবেচনা হয় যে, যেমন বঙ্গীয় কৃষি-পরিষৎ বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ রাজসভায় বড়লাট সদনে কৃষককুলের পক্ষ হইতে সভ্যপদ পাইবার বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গের মাহিষ্য সম্প্রদায় এ বিষয়ে আর বসিয়া থাকিবেন না। আমি এ বিষয়ে বিগত ৪।৫ বৎসর হইতে বহু সংবাদ পত্রে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি,কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এখন এবিষয়ে মনোযোগ দিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর বসিয়া থাকিবেন না। দেশের গো-জাতির উন্নতির চেষ্টা করুন, মিঃ জাসাওয়ালাকে সাহায্য করুন, বিলাতের কৃষক সম্প্রদায়ের মত আপনারাও রাজদরবারে প্রতিনিধি পাইবার জন্য চেষ্টা করুন। রাজার সমক্ষে আবেদন পেশ করুন। চেষ্টায় অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হইবে। গভর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে কৃপা না করিলে প্রজাকুলের দ্বারায় এ অভাবনীয় কার্য্য সমাধা করা দুরাশা মাত্র। সেই জন্য বলি যে, ভাই হিন্দু মুসলমান জৈন খৃষ্টান বঙ্গবাসী,বঙ্গের কৃষির অবনতির গতি অবরোধ করুন, গোরক্ষা ও গোজাতির উন্নতি করুন এই আমার দেশের লোকের নিকট সানুনয় নিবেদন।

মাহিষ্যগণ বঙ্গের মধ্যে প্রধান কৃষক জাতি, তাহারাই আমাদের খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন এবং যোগাড় করে কিন্তু সমাজের উৎপীড়ন তাহাদেরই প্রতি সর্ব্বাধিক। হাবড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত সন্তোষপুর, খালোড় প্রভৃতি গ্রামে এই মাহিষ্যগণ প্রকাশ্য প্রাচীন কালীবাটীতে ব্রাহ্মণাদি জাতির নব-নির্য্যাতনে পূজা বিধিতে বঞ্চিত হইতেছেন তাহা শীল ষ্টেটের সহৃদয় দণ্ডধর রিশিবর মহোদয়গণের মিমাংসা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অশৌচ বৈষম্যই এই নির্য্যাতনের কারণ। এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত

অংশটুকু পাঠ করিলেই সকল সন্দেহ নিরাকৃত হইবে।—

আজকাল কৃষি কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য জাতির পক্ষাশৌচ লইয়া সংবাদ পত্রাদিতে বিশেষতঃ হিতবাদী ও অনিন্দবাজার পত্রিকায় খুবই লেখা লিখি চলিতেছে। মাহিষ্য জাতিকে এবং তাহারা হিন্দুসমাজের মধ্যে কোন পরিবারের অন্তর্গত তাহা বলিয়া চর্ব্বিত চর্ব্বন করিবার আমার আদৌ প্রয়াস নাই।

মদ্ লিখিত ভ্রম সংশোধিত ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের উপর অযথা শ্লেষ বিবর্জ্জিত পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ মাহিষ্য প্রকাশ এবং মাহিষ্য বিবৃত, ব্যবস্থা পঞ্চবিংশতি, বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত, মাহিষ্য কৈবর্ত্ত জাতি, মাহিষ্য সন্দর্ভ, প্রভৃতি পুস্তক এই জাতির বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য হিন্দুসমাজে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই অশৌচ মীমাংসার জন্য বহু সভা-সমিতি হইয়া গিয়াছে; বাদ প্রতিবাদও সংবাদপত্রে বহুদিন হইতে চলিতেছে। মাহিষ্য বা বঙ্গীয় কৃষি-কৈবর্ত্তের পক্ষাশৌচ গ্রহণ যে অশাস্ত্রীয়, তাহা অদ্যাবধি কেহ দেখাইতে পারিলেন না। মাননীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর প্রাণত্যাগের পর তাঁহার নবনীতসম কোমল হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহা হইতে আজও শান্তি না পাইয়া বলকান শক্তিপুঞ্জ এবং তুরস্কের যুদ্ধের ন্যায় মাহিষ্যদলনরূপ যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া শাস্ত্রীয় কথা বিস্মৃত হইয়া ঋষি বাক্যের যাহা তাহা ব্যাখ্যা করিয়া সমাজকে ভুলাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার সে পাণ্ডিত্য হাবাসপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত বাবু সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত "বঙ্গীয় মাহিষ্য পুরোহিত" পুস্তকে খাটে নাই।

শ্রীবিকাশি কবীশ্বর, বিশ্বকোষ প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, বাবু লালমোহন বিদ্যানিধি, "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" লেখক দুবরাজপুর নিবাসী বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জালিয়া সমাজের নেতা বাবু অধরচন্দ্র দাস, হাবড়ার মোক্তার বাবু প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কত রথী মহারথীগণ এক এক করিয়া মাহিষ্যদলন জন্য সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

১২৯৩ সাল হইতে কত যোদ্ধা এই দীন জাতির প্রতি সংবাদপত্রের স্তম্ভে গালিরূপ ইক্ষু হানিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু "মাহিষ্যবান্ধবের" মহিষাসুরের কঠিন ত্বক ভেদ করিতে পারিল না। এখন "মহিষ" পাশ মোড়া দিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজ শশব্যস্ত হইতেছে। হিন্দুসমাজ মধ্যে মাহিষ্য জাতি একটি ক্ষুদ্র পরিবার নহে। যে জাতি প্রাচীনকালে বঙ্গ ও উৎকল প্রদেশে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছে, তাহাদের সামান্য ফুৎকারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যে জাতির রণপোত ও বাণিজ্যতরী এককালে "সর্ব্বদা সদর্পে ভ্রমিত ভারতসাগরময়" তাহারাই বর্ত্তমান মাহিষ্যজাতির পূর্ব্বতন পুরুষ। এক কথায় ইহাদিগকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ইহারাই ভগবান কৃষ্ণের পালক পিতা নন্দঘোষের বংশ (মাহিষ্যপ্রকাশ প্রথমভাগ ৬০৭-৫৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এবং বর্ত্তমান বঙ্গের মাহিষ্য জাতি।

নিখিল বাবু, অক্ষয় বাবু, দীনেশ বাবু, বাবু প্রভাসচন্দ্র সেন, বাবু নগেন্দ্রনাথ সোম, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি এই মাহিষ্য জাতিকে সমাজে হীনপ্রভ করিবার জন্য যাহা তাহা বলিয়া অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ....act ; cannot be altered with hundred texts. ঐতিহাসিক সত্য প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারকগণের পরিশ্রম সত্যই প্রকাশ করে ; তাহা অন্যথা করা কঠিন। সত্যের উপর আবরণ দূরদর্শী এবং সত্য অনুসন্ধিৎসু লোকের নিকট বেশীক্ষণ থাকে না। বঙ্গের মাহিষ্যগণ অনূন ২০।২১ লক্ষ অধিবাসীর কম হইবে না। ইহারা কৃষিপ্রিয় ও কৃষক জাতি। নীরবে ইহারা সমাজ মধ্যে বিদ্যা বিস্তার, রাজসেবা, সমাজ-সংস্কার, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভ্রাতৃভাব স্থাপন, বৈশ্যোচিত আচার-ব্যবহার অনুসরণ, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বিকীর্ণ মাহিষ্য শক্তি পুঞ্জীভূত করিতেছে দেখিয়া বঙ্গের অপরাপর জাতির মনে "ইয়লোপেরিলের" মত বিশেষ সন্দেহের কারণ হইয়াছে।

মাহিষ্য-নেতারা একত্রীভূত হউন, কুসংস্কার সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিন। পশ্চিম, উত্তর, রাসসুন্দরী সমাজ এক হইয়া গিয়াছে। এখন মেদিনীপুরের বা দক্ষিণ সমাজের সহিত যৌন সম্বন্ধ আবদ্ধ করণীয় প্রথা নিজ বৃহৎ মাহিষ্য-সমাজে প্রচলিত করুন। দেখিবেন আপনাদের সমাজ ঐক্যশক্তির বলে পরিচালিত হইয়া বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের উচ্চ পদবীতে অচিরে আরোহণ করিবে। বঙ্গের কায়স্থ-সমাজ pales of long and deep noted prejudice ভাঙ্গিয়া উত্তর, দক্ষিণ, বারেন্দ্র ও বঙ্গসমাজ ভাঙ্গিয়া এক জাতিতে পরিণত হইতেছে। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আপনারা এই রীতি অনুসরণ করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

তাহার পর মাহিষ্য-সমাজে অশৌচ বৈষম্য কেন। ইহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন কি? ব্যক্তিগত দ্বেষ-হিংসায় কলিকাতার মাহিষ্য-সমাজে বর্ত্তমান অশৌচ বিপর্যায় হইয়াছে। বাওয়ালীর জমীদার বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল কতকগুলি ছেলে-ছোকরাকে লইয়া একটি দল গঠন করিয়া কলিকাতা-সমাজে অশৌচ বিপর্য্যয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি কাশী, ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকখানি ব্যবস্থা আনাইয়া সমাজকে দেখাইতেছেন যে, মাহিষ্যগণ এতাবৎকাল শূদ্রবৎ আচারী ছিল, এখন মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিবা তাহারা যে পঞ্চদশ দিবসে অশৌচান্ত হইতেছে, তাহা অশাস্ত্রীয় এবং শাস্ত্রবর্জ্জিত। ইহার সম্যক উত্তর এ স্থলে আলোচনা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহা যথা-সময়ে যথা স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে ও হইবে। এই প্রশ্নের উত্তর ফরিদপুর নিবাসী বাবু সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস তাঁহার প্রণীত "বঙ্গে মাহিষ্য পুরোহিত" নামক পুস্তকে, মাহিষ্য-প্রকাশ দ্বিতীয়ভাগে, ভ্রান্তি-বিজয়ে, আনন্দবাজার পত্রিকায়, হিতবাদী স্তম্ভে বহুবার প্রদত্ত হইয়াছে।

একতা এবং বিদ্যাই শক্তির উন্মেষণ সমাজে প্রকটিত করে। মাহিষ্য-সমাজ বিশাল এবং বিক্ষিপ্ত হইলেও আজকাল বিদ্যার বিস্তারে তাহাদের শক্তি পুঞ্জীভূত হইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মাহিষ্য-সমাজের যে শক্তি অনুভূত

হয় নাই, আজ তাহা পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্য-সমাজ বঙ্গের গবর্ণরকে আবেদন পত্র দিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতিও বঙ্গের কেন্দ্রীভূত মাহিষ্য-সমাজের বল। তাঁহাদেরও এই উন্নতি-প্রয়াসী জাতির পক্ষ হইতে শাসনকর্ত্তার সমিতিতে মাহিষ্য কৃষি-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আসন পাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উন্নতিশীল জগতে এই জাতিকে সমাজ-স্রোতে ভাসিতে হইবে, নচেৎ নিপাৎ ও লয় নিশ্চিত। সেইজন্য বলি যে, হে মাহিষ্য ভাইগণ, আপনারা বিগত ৪০ বৎসর নীরবে কাজ করিয়া যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সহসা নষ্ট করিবেন না। এই বিষয়ে যাহা যাহা বক্তব্য তাহা পর প্রবন্ধে আরও বিবৃত হইবে।

সহৃদয় ইংরাজ-রাজের কৃপায় এই জাতির মধ্যে ক্রমশঃ বিদ্যা বিস্তার হওয়ায় অজ্ঞ লোক-সমূহের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিতেছে। সকল সভ্যদেশে উন্নতির যুগ উপস্থিত হইলে, এক এক জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের লেখার দ্বারায়, হয় সমাজ-বিপ্লব অথবা ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত করেন। ইতিহাস ইহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লুথার, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, কনফুশিয়স্, কভারডেল, ল্যাটিমার প্রভৃতি খ্যাতনামা পুরুষগণ ধর্ম্মবীর ছিলেন। গারিবল্ডি, বোনাপার্ট, নেল্‌সন্, টোগো,ব্লুকার, আরবী,মাহাদী, ক্রুগার, শিবজী, নানা ধুন্ধুপন্থ, তান্তিয়াতোপী, প্রথম উইলিয়ম, ব্লাকপ্রিন্স, বুলার, আরবীপাশা, ওসমানপাশা প্রভৃতি প্রথিতনামা পুরুষসিংহগণ ইতিহাস পৃষ্ঠায় সমরবীর বলিয়া খ্যত হইয়া থাকেন। ইহাদের ন্যায় সাহিত্যজগতে ভল্‌টেয়ার, লাফেৎ, রুসো, রোসেটি, টেনিশন, সেক্সপিয়ার, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি সুলেখকগণ সাহিত্য-বীর বলিয়া বিখ্যাত। ভল্‌টেয়ার এবং রুসোর লেখা ফরাসী বিপ্লব ঘটায়। লাফেৎ প্রভৃতির লেখা সমাজ সংস্কার করে। সেইরূপ বাবু বসন্তকুমার রায়, সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস, রামপদ বিশ্বাস, হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রকাশচন্দ্র সরকার, অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী, প্যারীমোহন দাস প্রভৃতি মাহিষ্য সুলেখকগণের লেখা এই জাতির ইতিহাস, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্যবসা, আচার, ব্যবহার, শাস্ত্রীয় বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সভ্য জগৎসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া বিক্ষিপ্ত কণাগুলিকে সমষ্টিভূত করিয়া বিগত ৩৫ বৎসরের চেষ্টায় এক মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছে। মাহিষ্য-জাতির অস্তিত্ব চিরকালই আছে, কিন্তু এই জাতির রাজ্যবিস্তার, রাজ্য-স্থাপন, শাসন-দণ্ড পরিচালনের কথা এতাবৎকাল সভ্যজগতে অপ্রকাশিত ছিল।

মাহিষ্য-জাতি হিন্দু-সমাজের মধ্যে এক বিশাল পরিবার। ইহাদিগকে সমাজে চাপিয়া রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইহারা নীরবে নিজেদের সমাজে কাজ করিতেছে। ইহাদিগকে সমাজে চাপিয়া রাখা এবং ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের চীনকে রাজনৈতিক আকাশে চাপিয়া রাখা একপ্রকার সমান বলিয়া অনুমিত হয়। মাহিষ্য-নেতাগণ এই বৎসর নীরবে কাজ করিয়া সুহৃদয় বৃটিশ-রাজের কৃপায় কি করিয়াছে, তাহা আমি সবিশেষ মাহিষ্য-প্রকাশ দ্বিতীয়

ভাগে বিবৃত করিয়াছি, ঐ সমিতির অন্যতম প্রধান বাবু প্রফুল্লচন্দ্র সরকার, উকীল, হাইকোর্ট এবং সহ সম্পাদক মাহিষ্য সমিতি, কলিকাতা এবং ভবানীপুরের অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি নিবাসী শ্রীযুক্ত চরণ দাস সরকার, কালিপদ দাস প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত। প্রাচীন দলের মধ্যে ইটালী কামারডাঙ্গা নিবাসী বাবু মহেন্দ্রনাথ দাসই সনাতন ধর্ম্মরক্ষার বিশেষ পাণ্ডা।

বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবারে চেতলা নিবাসী বাবু প্যারীমোহন রায় নাজীরের বাটীতে অপর পক্ষের এক বিরাট একদলীয় দ্বার রুদ্ধ (One sided & closed door meeting) সভা হইয়া গিয়াছে। জানবাজারের জমীদার রাণী রাসমণির ষ্টেটের অন্যতম অংশীদার বাবু অমৃতলাল দাসের সভাপতিত্বে ঐ সভা আহুত হয়। সুতরাং কোন মীমাংসাই হয় নাই। বরং কাহারও কোন আপত্তি ওজর না শুনিয়া সমবেত সভ্যগণ এক তরফা বিচারে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা প্রকাশ করায় খুলনা, জয়পুর, আমতা প্রভৃতির সভ্যগণ খুবই চটিয়া উভয় দলে বচসার সূত্রপাতে হাতাহাতি হইবার যোগাড় হইয়া পড়ে। সভ্যগণ সভাপতিকে বিশেষ অপদস্থ করিতে ক্রটী করেন নাই। বাবু উপেন্দ্র মণ্ডল সভ্যগণের এইরূপ ব্যবহারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবার কারণও আছে; যেহেতু তাঁহার মনোগত ইচ্ছা সফল হইল না। পঞ্চদশ দিবসীয় গণের সাহসিকতা ও নির্ভীকতায় কোনরূপ সামাজিক বাধা দিতে পারিলেন না। এই তাঁহার মনের ক্ষোভ!!!

আমার এসম্বন্ধে ২।৪ কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে। আমি যদিও নগণ্য লোক কিন্তু আমার এই সমাজের হিতকল্পে ২।৪ কথা বলিবার অধিকার আছে এবং আমার Freedom of speech কেহই হনন করিতে পারেন না বলিয়া ২।৪ কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। প্রথমতঃ—মহেন্দ্র বাবু ১৫ দিবসীয়গণকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দু এবং সমাজ বিপর্য্যয়কারী বলিয়া যে প্রচার করিতেছেন তাহার প্রমাণ কৈ? ১৫ দিন অশৌচ গ্রহণ করিলে যে জাতিপাত হয়, তাহার বিধি ব্যবস্থাই বা তিনি কোথায় পাইলেন? সমাজে কেলেঙ্কারি উপস্থিত করিবার প্রয়োজনই বা কি? অমৃত বাবু এই অশৌচ বৈষম্যের ধুয়াতে পড়িয়া তাঁহার কন্যার বিবাহ মণ্ডল গৃহে ভাঙ্গিয়া বোধ হয় খুব সুবিবেচকের পরিচয় দিয়াছেন কি না তাহা বলিতে পারি না। এসব পারিবারিক কথায় আমার সামাজিক ব্যাপারে কোন প্রয়োজন নাই। আমার বক্তব্য এই যে পঞ্চদশ অশৌচধারীগণ যে অধর্ম্ম ও অশাস্ত্রীয় কাজ করিতেছেন তাহার প্রমাণ কোথায়? অশৌচ সংকোচ করিলে (অবশ্য গুপ্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম সম্যক্ অবগত নহি।) কোথায় জাতিপাত হয় তাহা হিন্দুর সমগ্র শাস্ত্র খুঁজিয়া পাইলাম না। সেইজন্য এতদ্ ব্যাপারে—"সপিণ্ডীকরণ অবধি &c &c" [illegible] এর বিষয় পূর্ব্বে কলিকাতার দৈনিক সম্বাদপত্রে অনেক বাদানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। আমাদের পার্শ্বস্থিত কায়স্থ সমাজে এইরূপ দ্বাদশ ও ৩০ দিনের অশৌচ বৈষম্য দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের মধ্যে

আমাদের মত দলাদলি ঠেলা ঠেলি লম্ফ ঝম্ফ ত দেখি না। কাজেই বলিতে হয় "হাজার ধন হউক, লেখা পড়া শিখুন বা হবা ভবা গবা সভ্য হউন, "চাসা কদাচ ন সজ্জনায়তে।" ত্রিংশৎ দিবস অশৌচধারীগণ আমাদের বুঝাইয়া দিন যে যে মাহিষ্যগণ পোনের দিনে অশৌচান্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ভুল অধর্ম্ম ও অশাস্ত্রীয় ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিতেছেন। তবেই আমরা আপনাদের ভুল বুঝিয়া তাহা সংশোধন করিতে পারি। যাঁহারা পাগলের মত সমাজের গতির অভ্যন্তরস্থ ঐশীগতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মিছা হৈ চৈ করেন তাঁহারা সমাজের শক্তির হননকারী এবং প্রকৃতপক্ষে সমাজের শত্রু। সমাজ শক্তির গতির প্রতি যাঁহারা আঘাত প্রদান করেন,তাঁহারা কখনই সমাজের নেতা বা সমাজরক্ষক বলিয়া বাহবা লইতে পারেন না।

বৈশ্য-ক্ষত্রিয় হইব, মাহিষ্য বলাইব, অথচ মাহিষ্যের মাতৃধর্ম্ম অনুসরণে পশ্চাৎপদ হইব। ইহা অপেক্ষা আর অর্ব্বাচীনতা কি হইতে পারে? যে সমাজের মধ্যে এইরূপ অবস্থা, তাহাদের বিপথগামী নেতাদের বর্ত্তমান চঞ্চলতা উন্নতির প্রতি ধাবমান সমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করাই ভাল। যে সমাজে এইরূপ সামান্য অশৌচ লইয়া বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাদের শিক্ষালাভ করিয়া অপর উন্নতিশীল জাতির সহিত এক নৌকায় চলা আরও ২০০ বৎসরের শিক্ষার প্রয়োজন।

বিগত জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের আনন্দবাজার পত্রিকায় চান্দুড় নিবাসী ডাঃ রায় বসন্তকুমার ভৌমিক মহাশয় প্রকাশিত উপরোক্ত সমস্যায় সবিশেষ সকল বিষয় আলোচনা না হওয়ায়, আমি তাহার এই এবং পরবর্ত্তী ২।১টী অপর প্রবন্ধের পরিশিষ্ট লিখিতে বাধ্য হইলাম।

পূর্ব্ব লিখিত প্রশ্নগুলির লৌকিক জবাব এই যে, আমাদের বাপ পিতামহের সময়ে স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি গ্রন্থ এরূপ ঘরে ঘরে আসিয়া পঁহুছিত না। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় আমাদের সে অভাব নাই। প্রাচীনকালে সমাজের উপর ব্রাহ্মণকুল শাস্ত্র-গ্রন্থাদির ভাণ্ডারী ছিলেন। তাঁহারা আমাদের বাপ দাদাকে যাহা বুঝাইতেন, তাঁহারা সরল প্রকৃতির লোক বিধায় তাহাই বুঝিতেন, সে এক সময় ছিল, এখন আর সে সময় নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে প্যারীবাবু, সুদর্শনবাবু, বসন্তবাবু, কমলবাবু প্রভৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্রবাবু, হরিমোহনবাবু, প্রকাশবাবু, অক্ষয়বাবু, হরিশ-বাবু, রামপদবাবু, সেবানন্দ ভারতী প্রভৃতি প্রথিতনামা মাহিষ্য-নেতাগণ এই জাতির সম্বন্ধে যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য সাধারণ সভ্য জগৎ-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া এই জাতির মধ্যে শক্তি সমাবেশ করিয়াছেন। কায়স্থ মহোদয়গণ চারি থাক ভাঙ্গিয়া আজকাল এক বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইতেছেন। ইহার উদাহরণ, মাহিষ্য-সমাজের কি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে? মাহিষ্য-সমাজ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম থাক লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে এক দক্ষিণ থাক ছাড়া অপর তিন থাকের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ আজকাল স্থাপিত হইতেছে। ইহা অত্যন্ত সুলক্ষণ। একীভূত হইয়া এক সমাজে পরিণত হওয়ায় মাহিষ্য-সমাজের ক্রমশঃ নির্ব্বিবাদে বিনা অর্থ ও বাক্যব্যয়ে মহীয়সী শক্তি সঞ্চিত হই-

তেছে। এই শক্তির পরিচালনা করা, সমাজের ক্রমিক উন্নতি করা বিচক্ষণ লোকের দরকার, পাকা মাঝি এই নৌকাঘূর্ণি ও চড়া বাঁচাইয়া তীরে আনিতে পারে। এইরূপ মাঝি আমাদের সমাজে কয়জন আছেন, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

এই শক্তির সমাবেশে মাহিষ্য-সমাজ একদিন চীনের ন্যায় অকরণীয় ব্যাপারকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। একদিন এই শক্তির প্রভাবে মাহিষ্য-সমাজের উপযুক্ত স্বার্থহীন নেতাগণ লাট-সদনে বসিতে প্রয়াসী হইতে পারেন, কৃষির উন্নতিসাধন করিতে পারেন এবং অনেক বিষয় এমন সম্পাদন করিতে পারেন, যাহার ধারণা স্বপ্নেও হইতে পারে না। সেই জন্য বলি মাহিষ্য ভাইগণ, এই শক্তির অপব্যয় করিও না। শাসকগণের সাহায্যে ঠিক নৌকা বহিয়া যাও, একদিন না একদিন অচির ভবিষ্যতে লণ্ডন, বোষ্টন বা বম্বাই হেন বন্দরে আপনাদের নৌকা লাগিবে।

মাহিষ্য-সমাজের মধ্যে আজকাল ১৫ ও ৩০ দিন ব্যাপী অশৌচ লইয়া খুবই বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। এই বৈষম্যের প্রভাবে ২১ লক্ষের মাহিষ্য-সমাজকে খুবই ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে। কলিকাতা বঙ্গের কেন্দ্রস্থল। এই কলিকাতা সমাজের মধ্যেই দ্বিবিধ অশৌচ লইয়া খুবই গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। একদলের নেতা বাওয়ালীর প্রখ্যাত জমীদার বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল এবং তাঁহার স্বদলস্থিত ইটালী নিবাসী বাবু বলরাম দাস ও যদুনাথ সরকার, জানবাজারের বাবু অমৃতলাল দাস, ভবানীপুরের সরকার-বংশাবতংশ বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার প্রভৃতিগণ এবং অপর পক্ষে দিবসীয়গণ মধ্যে ইটালীর জমীদার এবং বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস, জানবাজারের খ্যাতনামা ভূস্বামী বাবু চণ্ডীচরণ চৌধুরী, বাবু গুরুদাস বিশ্বাস ভবানীপুরের সরকার-বংশের ন্যায় ব্রাহ্মণদের মতে কাজ করিয়া যাইতেন। এখন ইংরাজরাজের কৃপায় আচণ্ডাল মধ্যে বিদ্যার বিস্তার হইয়া জ্ঞানচক্ষু প্রসারিত হইতেছে এবং যুক্তিতর্ক ও বিচারশক্তি সকল জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আগেকার তমঃ নাশ করিতেছে। এখন শাস্ত্র কি বলে দেখা কর্ত্তব্য ;—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ ঘটিলে শ্রুতির প্রধান্য মানিতে হইবে ; স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতির প্রধান্য মানিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রুতির প্রধান্যে স্মৃতির ও পুরাণের যে অমান্য হইবে তাহা নহে, কিন্তু শ্রুতি বাক্যে সঙ্কোচ কি লক্ষণ ভিন্ন যদি মন্বাদি স্মৃতি নির্ব্বিষয় হয় তাহা হইলে শ্রুতি বাক্যে লক্ষণাদি স্বীকার করিতে হইবে ;—

লোকে প্রেত্যেব বিহিতো ধর্ম্মঃ।
তদভাবে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্॥ (বঃ সংহিতা)

লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয় ; শাস্ত্রের বিধান না পাইলে শিষ্টচার প্রমাণ।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়াং লোকসংগ্রহঃ॥
(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব)

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে বেদ সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ।

এস্থলে দেশাচার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল প্রমাণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বেদস্মৃতি দেশাচার অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ, সুতরাং দেশাচার প্রথা অবলম্বন পূর্ব্বক বেদ ও স্মৃতির ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচার কুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥
(স্কন্দপুরাণ)

যথায় বেদে বা স্মৃতিতে স্পষ্টবিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে, তথায় দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যে যে বিষয়ে শাস্ত্রে বিধি অথবা নিষেধ নাই, সেই বিষয়েই দেশাচার প্রমাণ। মাহিষ্য জাতির অশৌচ শাস্ত্র মতে ১৫দিন, মাসাশৌচের ব্যবস্থা কোথাও নাই। সুতরাং দেশাচার দেখিয়া শাস্ত্রবিধি অমান্য করা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ হইতেছে ;—

স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥
(প্রমাণ পারিজাত ধৃত স্মৃতি)

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে স্মৃতি ও দেশাচার পরস্পরের বিরোধ হইলে দেশাচার অগ্রাহ্য হইবে।

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি সত্ত্বেও নিরুদ্ধবাদিগণ, বিশেষতঃ বংশুয়ালার জমাদার বাবু উপেন্দ্র কৃষ্ণ মণ্ডল প্রভৃতিগণ, ঐশি শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উন্নতিশীল সমাজের গতিকে রোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এই চেষ্টা দুরাশা মাত্র।

মাহিষ্য প্রকাশ ও মাহিষ্য বারিধিতে যে সমস্ত ব্যবস্থা সংগ্রহ আছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া উপেন্দ্র বাবু নিজ জেদ বজায় রাখিবার জন্য কাশী প্রভৃতি হইতে বিরুদ্ধ অপভাষ পত্র আনাইয়া বঙ্গমতা, ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ প্রভৃতি পত্রিকায় ছাপাইয়া প্রকাশ করিতেছেন। ইহাতে মাহিষ্য সমাজের কি ক্ষতি হইবে বলিতে পারি না। ঐশি-শক্তির গতিরোধ করা কি মানুষিক শক্তির ক্ষমতা? কখনই নহে।

মেদিনীপুর, হাবড়া, ২৪ পরগণার স্থানে স্থানে এবং হুগলী, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার সহস্র সহস্র লোক পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিল এবং করিতেছে, কেবল কলিকাতার সংকীর্ণ সমাজে উপেন্দ্র বাবু তাঁহার অজ্ঞ তমসাচ্ছন্ন কতকগুলি নিজ প্রজাকে লইয়া মাহিষ্য শক্তির বিরুদ্ধে দল বাঁধিলেন। ফলে তাঁহাকে সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইতেছে তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। আলোচনার অনেক পাঠক হয়ত আমাকে ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতে দেখিয়া পাগল মনে করিতেছেন। আমি বঙ্গের কৃষি ও গোচর্য্যা প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে জাতিতত্ত্ব ব্যাপারের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি; কৃষি ও গোচর্য্যার সহিত এ জাতির নৈকট্য সম্বন্ধ, তাই তাহাদের সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম—তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বেদের একটী অংশ।

(উপবেদ)

অসীম কৃপানিদান শ্রীভগবান্ জীবগণের অশেষ কল্যাণ-সাধনের জন্য, আর্য ঋষিগণের যোগযুক্ত অন্তঃকরণে যেরূপ বেদরাশির আবির্ভাব করিয়াছেন, মনুষ্যগণকেও সেইরূপ লৌকীক-রাজ্যে সাহায্য প্রদান করিবার নিমিত্ত পদার্থ-বিদ্যা ও শিল্প-বিদ্যা-সম্বন্ধীয় বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল শাস্ত্রের নাম উপবেদ। উপবেদ চারিভাগে বিভক্ত। যথা, "আয়ুর্ব্বেদ", "ধনুর্ব্বেদ", "গান্ধর্ব্ববেদ" ও "স্থাপত্যবেদ"। বেদ যেরূপ লৌকিক পুরুষার্থ-যুক্ত যোগসাধন ও উপাসনা এবং বৈদিক-কর্ম্ম-সমূহ ইহলোকের ও পরলোকের শ্রেয়ঃলাভের সহায় হইয়া থাকে এবং যে প্রকার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, পুরুষ্পরারূপে মোক্ষপ্রাপ্তির ও জীবের লৌকিক উন্নতির হেতুভূত হয়, সেই প্রকার উপবেদ-সমূহও মনুষ্যের ক্রমোন্নতির সহায়ক হইয়া থাকে এবং পরম্পরারূপে জীবের সহায়তা প্রদান করে বলিয়া পৌরুষেয় হইলেও উহারা বেদ-বহির্গত বলিয়া উপবেদ-বাচ্য হইয়া থাকে।

সাধন বা সিদ্ধির একমাত্র মূল—শরীর। শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে, মানব ইহকাল ও পরকালের কোন উন্নতিই সাধন করিতে পারে না; এই নিমিত্ত শরীরের মঙ্গলসাধন জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্ররূপী আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বপ্রথম স্বীকৃত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে—"সৃষ্টি-বিজ্ঞান", "ধাতু-বিজ্ঞান", "রোগোৎপত্তি-বিজ্ঞান", "রোগ-পরীক্ষা-বিজ্ঞান", "কাইলিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান", "রসায়ন চিকিৎসা-বিজ্ঞান", "অস্ত্রচিকিৎসা-বিজ্ঞান", ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিক রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যজাতির সমস্ত শাস্ত্রই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অবস্থিত। অধুনাতন পাশ্চাত্য উন্নত জাতিদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত পদার্থ-বিদ্যা-সমূহ ক্রমশঃ পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণ লৌকীক বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করতঃ ঐ সকল বিদ্যার প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন-কালে পদার্থ বিদ্যা (Science) সম্বন্ধীয় যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছিল, আর্য্যঋষিগণই তাহার একমাত্র কারণ। এই হেতু সেই সময়ের নিমিত্ত আবশ্যকীয় যাহা কিছু তাঁহারা যোগযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা দেখিয়াছিলেন সে,সমস্তই অভ্রান্ত। প্রাচীন পদার্থ-বিদ্যা দার্শনিক সিদ্ধান্ত দ্বারাও সিদ্ধ ছিল; তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বুঝিতে পারা যায় যে,"সপ্ত-উর্দ্ধলোক", "সপ্ত-অধঃলোক", "সপ্ত-ব্যাহৃতি", "সপ্ত-রস", "সপ্ত-স্বর" "সপ্ত-জ্ঞানভূমি" ইত্যাদি সপ্তভেদ যেরূপ সৃষ্টির স্বাভাবিক দর্শনসিদ্ধ, সেই-রূপ আয়ুর্ব্বেদানুসারেও শরীরে সপ্তধাতু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—সৃষ্টি ত্রিগুণাত্মক হওয়াতে যেরূপ ত্রিবিধভাব, ত্রিবিধকর্ম্ম ত্রিবিধজ্ঞান, ত্রিবিধঅধিকার প্রভৃতি সৃষ্টির সমুদয় বিভাগই ত্রিগুণাত্মকভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদ অনুসারেও সমস্ত শারীরিক-বিজ্ঞান, বাত, পিত্ত এবং কফ এই তিনের উপরই স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদ অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত-যুক্ত এবং তাহার লিখিত ঔষধি-সমূহ ভারতীয় প্রকৃতির অনুকূল হওয়ায় আর্য্যজাতির নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর।

পুরাকালে আর্য্যঋষিগণ এই শাস্ত্রের শাখারূপে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। (উহার অনেকাংশ এখন পাওয়া যায় না) এই শাস্ত্র কিছু প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া অন্যান্য উপবেদ অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের অনেক গ্রন্থ পাওয়া যায়, উদ্যমশীল পাশ্চাত্য জাতি, আর্য্যজাতির এই লোকহিতকর বিদ্যা প্রাচীন গ্রীক্-জাতির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পরে তাঁহারা অস্ত্র-চিকিৎসা ও রসায়ন-চিকিৎসা বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ধনুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে—"মনোবিজ্ঞান", "শরীর-বিজ্ঞান", "মন্ত্র-বিজ্ঞান", "লক্ষ্যসিদ্ধি", "শস্ত্র-বিজ্ঞান", "যুদ্ধ-বিজ্ঞান", ইত্যাদি অনেক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র যে প্রকার শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল প্রদান করিয়া থাকে, এবং শরীরের সুস্থতা মুক্তি-পদপ্রাপ্তিরও সহায়ক হয়, সেই প্রকার ধনুর্ব্বেদ-শাস্ত্র—স্বধর্ম্ম রক্ষা, জাতিগত জীবনরক্ষা, শান্তিরক্ষা ও স্বদেশ-রক্ষাদির প্রধান সহায়ক এবং আধিভৌতিক-মুক্তি অর্থাৎ জাতিগত স্বাধীনতারূপী মুক্তি-পদ প্রাপ্তির একমাত্র অবলম্বন হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের নিমিত্ত মহর্ষিরা কেবল দুই প্রকার মৃত্যুর বিধান লিখিয়া গিয়াছেন। যথা,—(১) যোগ দ্বারা উত্তম মৃত্যু; (২) ধর্ম্মযুদ্ধে কীর্ত্তির মৃত্যু; এই দুই প্রকার মৃত্যুই মুক্তিদায়ক। * এতদ্ব্যতীত পর্য্যাঙ্কে শয়ন করিয়া যে মৃত্যু, উহা আর্য্যজনোচিত মৃত্যু নহে। যোগমৃত্যু এবং যুদ্ধমৃত্যু—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্তও সমান ফলপ্রদান করিয়া থাকে। (এস্থলে যুদ্ধবিদ্যার দ্বারা কেবল ধর্ম্মযুদ্ধই লক্ষিত হইয়াছে। কারণ, অধর্ম্মযুদ্ধ সর্ব্বদা নিন্দনীয় এবং অহিতকর।) এই শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন ইহার একখানিও সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। যদ্যপি বর্ত্তমান দেশপ্রথানুসারে পাশ্চাত্য-জাতিসমূহ বিবিধ যুদ্ধপোত ও জলযানাদির আবিষ্কার করিয়াছে এবং আধুনিক কল-কৌশল-সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার শতঘ্নী এবং নালাস্ত্রাদির নির্ম্মাণ ও বিমানারোহণের কল-কব্জাদিও নির্ম্মাণ করিয়াছে, তথাপি প্রাচীনকালে যেরূপ লৌকীক দিব্য অস্ত্রশস্ত্র ও বিমানারোহণের কল-কব্জাদির নির্ম্মাণ-বিধি প্রচলিত ছিল এবং তাঁহারা যেরূপ ব্যূহরচনা প্রণালী অবগত ছিলেন, সেরূপ উন্নতি এ সময়ে হওয়া কঠিন। ইহাতেই জানা যায়, আর্য্যজাতি যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। বীরত্বের পরাকাষ্ঠা, সমরনীতির পূজা এবং সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মের প্রাধান্য রক্ষা, এই সমস্ত গুলি আর্য্যযুদ্ধবিদ্যার অনুমোদিত ছিল। শ্রীরামচন্দ্র, ভীষ্ম, অর্জ্জুনাদি বীরগণের সময়ের কোন কথাই নাই। গত দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও মিবারাধিপতির বীরাগ্রগণ্য বংশধরগণ ধর্ম্মপালনে যেরূপ কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, যেরূপ শৌর্য্যাদিগুণাবলীর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার উদাহরণ জগতে দুর্ল্লভ। রামায়ণ, মহাভারত গ্রন্থেও এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পরন্তু মিবার রাজবংশে এরূপ অনেক ধার্ম্মিক যোদ্ধা ছিলেন যে, তাঁহারা দিবাভাগে ধর্ম্মযুদ্ধ

* দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখোহতঃ।
(যোগি যাজ্ঞবল্ক্য)

করিতেন এবং যুদ্ধাবসানে রাত্রিতে পরস্পরের শিবিরে গমন করতঃ পরস্পরের সেবা ও চিকিৎসার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। * ধনুর্ব্বেদ লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে সেই সমস্ত ক্ষাত্র-তেজের অবসান হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-তেজও সহায়তাবিহীন হওয়াতে মলিনতাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ধনুর্ব্বেদ গ্রন্থ-সমূহের যেরূপ চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না, গান্ধর্ব্ববেদের সেরূপ দশা নহে। গান্ধর্ব্ববেদ সম্বন্ধীয় লৌকিক গ্রন্থ অনেক গুলি পাওয়া যায়। সাধারণ কথায় গান্ধর্ব্ব-বেদকে সঙ্গীত বিদ্যা বলে। এ বিষয়ের আর্য্য-গ্রন্থও দু'চার খানি প্রাপ্ত হওয়া যায়। শরীরের সহিত যেরূপ আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধ, মনের সহিতও সেইরূপ গান্ধর্ব্ববেদের সম্বন্ধ আছে, যেহেতু সঙ্গীতের সহায়তায় মন সুস্থ এবং বলশালী হয়। শ্রীভগবান্,—"বেদের মধ্যে আমি সামবেদ †" বলিয়া সামবেদের যে প্রাধান্য বর্ণন করিয়াছেন, গান্ধর্ব্ববেদের সহায়তাই তাহার কারণ। অন্য কোন বেদই সামবেদের ন্যায় লোক মঙ্গকর নহে। এই নিমিত্তই অন্য বেদ-সমূহ অপেক্ষা ইহার বিস্তার সহস্রগুণ অপেক্ষা অধিক হইয়া ছিল। উপাসনা কাণ্ড সম্বন্ধীয় শাস্ত্র-সমূহ দ্বারা সঙ্গীতের সর্ব্বোচ্চ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ‡ প্রাচীনকালে স্বর্গীয় গান্ধর্ব্ববেদ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা—দেশী বিদ্যা ও মার্গী বিদ্যা। উহাদের মধ্যে দেশী বিদ্যা লোকরঞ্জন-কর এবং মার্গী বিদ্যা বেদ-গানের উপযোগী। বর্ত্তমান সময়ে মার্গী বিদ্যার চিহ্ন পর্য্যন্তও পৃথিবীতে নাই। অধুনাতন সামগানবিধি যথার্থ নহে। অধিকন্তু উহা দ্বারা অসাধারণ সাম মহিমাই ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়। পুরাকালে ষোড়শ সহস্র রাগ-রাগিণী এবং তিন শত ষট্‌-ত্রিংশৎ তাল ব্যবহৃত হইত। পরন্তু অধুনা ব্যবহারযোগ্য পঞ্চাশৎ শুদ্ধ রাগরাগিণী এবং দশ তালও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন-কালে লোকরঞ্জনকর দেশী বিদ্যা—ত্রয়ী বিদ্যা নামেও অভিহিত হইত। কারণ, দেশী বিদ্যা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা,—গীত, বাদ্য ও নৃত্য। আধুনিক নৃত্য-গীত প্রাচীন নৃত্যবিদ্যার শুষ্ককঙ্কালরূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং এতদ্বিষয়ের একখানি আর্য্যগ্রন্থও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারাই সঙ্গীত-শাস্ত্রের বর্ত্তমান ঘোর অবনতি অনুমিত হইতে পারে। সঙ্গীত-শাস্ত্র শব্দময় সৃষ্টির নির্ণায়ক। যে প্রকার মূল প্রকৃতি হইতে এই ভৌতিক সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ সঙ্গীতা-চার্য্যগণের মতে প্রণব হইতে প্রথম সপ্তস্বর এবং তৎপশ্চাৎ সপ্তভাবময় সৃষ্টির আবির্ভাব হয়। প্রণবের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলিয়া সঙ্গীতের সাহায্যে অন্তঃকরণের উন্নতি এবং ঈশ্বর সাক্ষাৎময়, গান্ধর্ব্ববিজ্ঞানসিদ্ধ। ইদানীং এই শাস্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে দেখা যাইতেছে। উহার বিশেষ উন্নতি হইলে, নিশ্চয়ই আর্য্য-জাতির মানসিক অবস্থার উন্নতি-বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্তি হইবে। আর্য্য-জাতির

* History of Rajastan, by Toda's.

† বেদানাং সামবেদোঽস্মি। (গীতোপনিষৎ)

‡ পূজাৎ কোটী গুণং স্তোত্রং, স্তোত্রাৎ কোটী গুণোজপঃ।
জপাৎ কোটী গুণং গানং, গানাৎ পরতরং নহি।
(গীতোপনিষৎ উপাসনা কাণ্ড।

বর্ত্তমান অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এ বিদ্যাও অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায়শঃ অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্তে ইহার ক্রিয়া সিদ্ধাংশ চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে বিবাহাদি উৎসবে এখন জাতীয় গীত-বাদ্যের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় গীত-বাদ্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকলের সংস্কার করতঃ সঙ্গীতের পুনরভ্যুত্থান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্থাপত্য বেদে—নানাপ্রকার শিল্প, কলা, কারুকার্য্য এবং পদার্থ বিদ্যার বর্ণন ছিল। শাস্ত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বেদ অত্যন্ত বিস্তৃত ও চতুঃষষ্টি ভাগে বিভক্ত ছিল। দার্শনিক উন্নতি যে প্রকার মানবের অন্তর্জগত সম্বন্ধীয় উন্নতির পরিচায়ক, সেই প্রকার শিল্প-কলাদির উন্নতির দ্বারাই মনুষ্যের বাহ্য উন্নতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে আর্য্যজাতি অট্টালিকা, সেতু ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ এবং প্রস্তর সম্বন্ধীয় কারুকার্য্যাদি বিষয়ে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা অতি পুরাতন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে এখনও কিছু কিছু অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন শিল্প-নৈপুণ্যের এখনও এরূপ অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা দেখিলে পাশ্চাত্য শিল্পিগণ চকিত হইয়া ঐ সকলকে অমানুষিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে পশুবিদ্যা, প্রস্তর-বিদ্যা, লৌহাদি কঠিন ধাতু এবং সুবর্ণাদি কোমল ধাতুর উপযোগী বিদ্যা, বনস্পতি বিদ্যা, বিবিধ যান নির্ম্মাণ বিদ্যা, ভূমির অন্তর্গত পদার্থ এবং জল নিরাকরণ বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, নানাপ্রকার বস্ত্র, ভূষণ এবং রত্ন সম্বন্ধীয় শিল্পবিদ্যা আকাশ-তত্ত্ব, বায়ু-তত্ত্ব এবং অগ্নি-তত্ত্ব-বিদ্যা ইত্যাদি অনেক লোকোপকারী শিল্প এবং পদার্থ বিদ্যার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন এবং প্রাচীন গ্রন্থ-সমূহে বিস্তর পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পোন্নতিই উদ্যমশীল পাশ্চাত্যজাতির জলপথ আবিষ্কারের হেতুভূত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত চার উপবেদ এখন লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত এবং দেশীয় ভাষা দ্বারা এই চারি উপবেদ ভাণ্ডার যথাসম্ভব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ধার্ম্মিক বিদ্বানগণের যত্ন লওয়া উচিত।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

সঙ্গীত।

ভৈরবী—ঠুংরি।

আমি কি হে প্রভু এমনি অভাগা,
প্রাণের এ জ্বালা কি জুড়াবে না?
দিবানিশি মোর কেঁদে কেঁদে যায়,
নয়নের জল কি মুছাবে না?
বুকভরা দুঃখে কতই যে ডাকি
শুনেও কি তুমি তা' শুনিবে না?
হৃদয়ের ব্যথা তুমি না বুঝিলে
আর তাহা কেহ ত বুঝিবে না!
শত দোষে দোষী তোমার চরণে
সে সকল দোষ কি ক্ষমিবে না?
দীনহীন দাস আমি যে তোমার
এ ভেবেও কি পদে রাখিবে না?

শ্রীব্রজলাল ইন্দ্র বর্ম্মা।

রাজা নীলাম্বর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শচীপাত্র।

স্তিমিত দীপালোকে বসিয়া রংপুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী শচীপাত্র কি ভাবিতেছেন। এক একবার মস্তক তুলিয়া দেখিতেছেন—কেহ আসিতেছে কি না। এক একবার বিমর্ষভাবে মৃত্তিকা পানে চাহিতেছেন। তখন রজনী এক প্রহর অতীত, অনেকেই প্রায় নিদ্রিত, শৃগাল কুক্কুর ধ্বনি করিতেছে। পেচকগণ গৃহের উপর বসিয়া কর্কশ শব্দ করিতেছে। চন্দ্র সেই সময় অস্ত গেলেন, অতএব অন্ধকার বিরাজ করিতে লাগিল। বেশ শীত পড়িয়াছে. বৃদ্ধ মন্ত্রী শচীপাত্র শীতবস্ত্র গাত্রে দিয়া বসিয়া আছেন। এত রাত্রেও নিদ্রা নাই কেন?

শচীপাত্র ব্রাহ্মণ,অনেক দিন হইতে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত। রাজা নীলাম্বর তাঁহাকে বেশ ভক্তি ও বিশ্বাস করেন। যুবক রাজা নিজে ধার্ম্মিক, অতএব মনে করিতেন—তাঁহার মন্ত্রীও তদ্রূপ, একদিনও তিনি তাঁহাকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখেন নাই। শচীপাত্রের একমাত্র পুত্র দেবদাস বহু চেষ্টা করিয়াও লেখা পড়া শিখিতে পারে নাই। পিতা তাহার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সবই বৃথা হইল, দেবদাসের সে দিকে মনোনিবেশ হইল না। দেবদাসের ধূর্ত্তামি বুদ্ধি ক্রমশঃ বেশ পরিপক্ক হইল, সে কাহারও নিকটে বড় ঠকিত না। নিজে মন্ত্রিপুত্র, অর্থের অভাব ছিল না, অনেক সঙ্গী আসিয়া জুটিল, সংসর্গ দোষে দেবদাস নষ্ট হইল। পিতা মন্দ লোক ছিলেন না, কিন্তু অতিশয় স্নেহ করিয়া ও শাসন না করিয়া পুত্রটীর সর্ব্বনাশ করিলেন। তিনি পুত্রকে কিছুই বলিতে সাহসী হইতেন না, অতএব সে দিন দিন অসুর ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। দেবদাসের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশের অধিক হয় নাই, দেখিতে সুপুরুষ, এখনও বিবাহ হয় নাই। সে রাজাকেও বড় গ্রাহ্য করিত না, মনে করিত তাহার পিতাই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা।

মন্ত্রী কতকক্ষণ এইরূপে বসিয়া থাকিলে বাহিরে পদশব্দ হইল, দেবদাস গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতাকে প্রণাম করিল। শচীপাত্র তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন। দেবদাস নিকটস্থ একখানি আসনে উপবেশন করিয়া বলিল—"সেবারত আমাদের চেষ্টা নিস্ফল হ'ল. কিন্তু এবার পাকাপাকি করতে হবে। আপনার কিছুই করতে হবে না, আপনা হতেই ফল ফলছে।" মন্ত্রী বলিলেন—"বাবা! এসব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভাল নয়, যদি ধরা পড়,তবে প্রাণ রক্ষা হইবে না। রাজা দয়ালু বটেন, কিন্তু বিচার কার্য্যে কোন অনুরোধ শুনবেন না বা কাহারও মুখের দিকে তাকাইবেন না। এ কাজ কি না করলেই নয়?" পুত্র বলিল—"আপনি ব্যস্ত হবেন না, এবার দেখতে পাবেন কি হয়, কামাক্ষার রাজা নির্ব্বোধ, তাই আমাদের পরামর্শ শুনলে না। যদি আমাদের বুদ্ধি মত চলত,তবে তাঁর রাজত্ব আর এই নির্ব্বোধ রাজার হস্তে আসত না।" মন্ত্রী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"চুপ, চুপ, কেহ শুনবে। কি সর্ব্বনাশের কথা! যদি কেহ জানতে পারে, তাহা হইলে কি আর

আমাদের রক্ষা আছে ?" দেবদাস বিরক্ত হইয়া বলিল—"আপনি এত ভয় পান কেন ? এই দুর্ব্বল রাজা আমাদের কি করতে পারে ? আপনি না থাকলে এ রাজত্ব এত দিন উড়ে যেত। এই নির্ব্বোধ রাজাটাকে সরা'য়ে আপনি রাজা হ'ন, দেখবেন প্রজারা কত সন্তুষ্ট হয়।" মন্ত্রী বলিলেন—'বাবা! এত আশা কর না, সব মাটি হবে। অতি সাবধানে চ'ল, আমাদের অনেক শত্রু। যদি কেহ ঘুণাক্ষরেও টের পায়, জানবে আমাদের রক্ষার উপায় থাকবে না। এখন তুমি কি করতে চাও ?" এই সময়ে হঠাৎ বাহিরে খট্ খট্ শব্দ হইল, ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন, দেবদাস লম্ফ প্রদানে বাহিরে আসিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কেবল একটা বিড়াল দৌড়াইয়া গেল মাত্র। সে তখন হাসিতে হাসিতে পিতার নিকট আসিয়া বলিল—"আপনি সহজেই ভয় পান। একটা বিড়াল বাহিরে ছিল,দৌড়াইয়া গেল।"মন্ত্রীর মুখ তখন প্রফুল্ল হইল, তিনি বলিলেন—"যাও, একবার সব দে'খে এস, অপর কোন লোক আছে কি না।" দেবদাস অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাহিরে গেল, চারিদিকে বেশ করিয়া দেখিল, কোন লোক দেখিতে পাইল না। ফিরিয়া আসিয়া আবার আসনে বসিল। মন্ত্রী বলিলেন—"এখন কি করতে চাও ?" পুত্র নিম্নস্বরে বলিল—"এই রাজার সর্ব্বনাশ।" মন্ত্রী শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন—"এ কার্য্য ভাল নয়। এ কার্য্য করলে ভগবান নারাজ হবেন। এতকাল এর অন্নে প্রতিপালিত হ'য়ে ইহার সর্ব্বনাশ করা কি সঙ্গত ?" দেবদাস উত্তর করিল "আপনিত ইহার মধ্যে নাই ? আমি এই নির্ব্বোধ রাজার অন্নে প্রতিপালিত নহি। আপনার পাপ হ'তে পারে, আমার পাপ নাই। ভগবান একজনকে উপলক্ষ্য ক'রে শাস্তি দেন, আমি সেই উপলক্ষ্য মাত্র। আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। তবে সাবধান! যেন কোন কথা আপনার মুখ দিয়ে বাহির না হয়। আমি এমন কল্ এবার পাতবো, তাহাতে পড়তেই হবে। এবার রংপুরের অদৃষ্ট ফিরবে। আপনি রাজা হবেন, আমি যুবরাজ হ'ব।" এই সময়ে রাস্তায় উচ্চ-হাস্য উঠিল, সে হাস্য মন্ত্রীর কর্ণে পৌছিল, মন্ত্রী শিহরিয়া উঠিলেন এবং ভয়-চকিত-স্বরে বলিলেন—"দেখত রাস্তায় কে ?" দেবদাস দ্বার খুলিয়া বাহিরের রাস্তায় গেল, দেখিল একটি লোক ধূলী মাখা অবস্থায় হাসিতে হাসিতে যাইতেছে। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"একটা পাগল যাচ্ছে।" মন্ত্রীর মনে শান্তি হইল না,তিনি বলিলেন—"অদ্য ক্ষান্ত দাও, চ'ল এখান থেকে যাই। তুমি পূর্ব্বে বাহির হ'য়ে যাও।" দেবদাস চলিয়া গেল, মন্ত্রী কতকক্ষণ পরে সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাণী মলয়াবতী।

অন্তঃপুরের একটি সুসজ্জিত কক্ষে রাণী মলয়াবতী বসিয়া আছেন। সম্মুখে একখানি পুস্তক খোলাভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু অদ্য সে বিষয় মনোযোগ নাই, অদ্য কিসের জন্য মুখখানি ম্লান। পুস্তকখানি সংস্কৃত মেঘদূত। মেঘদূত তাঁহার প্রিয় পুস্তক কিন্তু আজ আর এ পুস্তকের আদর নাই। বিরহী যক্ষের কথা

তাঁহার মনে হইল। তিনি একবার পুস্তকখানি তুলিয়া লইলেন, দুই একটি শ্লোক পড়িয়া তাহার অনুবাদ দেখিলেন, তারপর আবার রাখিয়া দিলেন। রাণী মলয়াবতী দেখিতে পরমা-সুন্দরী। বয়ঃক্রম বিংশ বৎসরের অধিক হয় নাই। মুখ খানি বেশ ঢল্ ঢলে, চক্ষু দুটি সর্ব্বদাই নৃত্য করিতেছে। হাসি হাসি বদন-খানি যেন সকলকে মাতাইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি চম্পক সদৃশ বর্ণের উপরে এক শোভা করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন, কৃষ্ণ মেঘের কোলে বিজলী হাসিতেছে। হস্তে হীরক খচিত চুড়, গলায় মুক্তার হার, মস্তকে চুণী বসান ফুল। কর্ণে নীলিমা যুক্ত স্বর্ণ দুল। রাণী মলয়াবতীকে দেখিলে বোধ হয় যেন, স্বর্গ হইতে উর্ব্বশী মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়াছে। রাণী মলয়াবতী সর্ব্বদা প্রফুল্ল, দাসদাসী সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট, কাহাকেও কখনও তিনি কটু বাক্য বলেন না। অদ্য রাজা বাটীতে নাই, তাই রাণী বিমর্ষ।

কতক্ষণ বসিয়া আছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া ডাকিল—কি সই! এত মলিন কেন? এক দিন বিরহ সহ্য হয় না?" রাণী হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন, একজন ষোড়শী যুবতী আসিয়া নিকটে বসিল। রাণী বলিলেন "কি সই! নিজের মনের কথা বুঝি অপরের উপর দিয়ে চালাচ্ছ?" যুবতী অমনি উত্তর করিল—"আমারত আর বিরহ নাই। আমি চির-কুমারী, আমি অত বুঝিনা। তোমরাই ভাই—"বিরহ-বুক, 'মেঘদূত' পড়, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল, মুখ-খানি ম্লান-হয়।" রাণী বলিলেন— [illegible] বুঝেছ, আর বড় বিলম্ব নাই। আমি রাজাকে ব'লে সত্বরই বরের জোগাড় ক'রে দেওয়াচ্ছি।" যুবতীর মুখ হঠাৎ ম্লান হইল, চক্ষুতে যেন বিদ্যুৎ খেলিল, আবার তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—"আমার আর "বরের" দরকার নাই, আমার "বর" যম। সেজন্য তোমায় তাড়াতাড়ি কর্‌তে হবে না।" রাণী হাসিয়া বলিলেন "দেখা যাবে, কতজনকেই এ ভাব কর্‌তে দেখেছি, আবার বিয়ে হ'লেই সব ভুলে যায়।"

আমরা এস্থানে যুবতীর পরিচয় দিব। যুবতী ষোড়শী, দেখিতে বেশ সুন্দরী, তবে গাত্রে বিশেষ কোন অলঙ্কার নাই। রাণী অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার গাত্রে গহনা পরাইতে পারেন নাই। যুবতী অন্য বিষয়ে রাণীর বাক্য রাখিত, কিন্তু এ বিষয়ে সে তাঁহার কথা শুনিত না। যুবতীর নাম ভুবনেশ্বরী। রাজা নীলাম্বর যখন কামাক্ষ্যা রাজ্য জয় করেন, তখন এই রাজ-কন্যাকে সঙ্গে আনেন, তদবধি রাজকন্যা ভুবনে-শ্বরী রাণী মলয়াবতীর নিকট বাস করিতেছেন। কামাক্ষ্যার সেই যুদ্ধে কামাক্ষ্যার রাজার মৃত্যু হয়, ভুবনেশ্বরী কয়েকদিন সেই শোকে ম্রিয়মান থাকে, তারপর সে শোক ভুলিয়া রাজগৃহে বাস করিতে লাগিল, এবং পালনকর্ত্তা রাজাকে ও তাহার সখী রাণী মলয়াবতীকে বিশেষ ভাল-বাসিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরীর বিবাহ হয় নাই, ভুবনেশ্বরী বিবাহে বড় নারাজ, সেইজন্য রাজাও বড় গরজ করেন না, তবে রাণী সময় সময় এই বিষয় লইয়া রাজাকে বড় ত্যক্ত করেন। রাজা বলেন "উপযুক্ত পাত্র পেলেই বিবাহ দিব, যাকে তাকে ত ধ'রে দিতে পারি না।"

রাণী মলয়াবতী ভুবনেশ্বরীকে বড় ভালবাসে না। তাহার পিতামাতা নাই, রাজ্যভ্রষ্ট, পাছে মনে কোন কষ্ট পায়, এই জন্য নিজে কখনও কিছু বলিতেন না, এবং দাসদাসীদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ন্যায় ভুবনেশ্বরীকেও সকলে যেন মান্য করে। ভুবনেশ্বরী সকলের সঙ্গেই মিশিত, দাসদাসীদের কার্য্যে যোগ দিত, কাহাকে "কিল" দেখাইত, কাহাকেও বা "চড়" মারিত, কাহাকেও চুল ধরিয়া টানিয়া আনিত, আবার তখনই পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইতে দিত বা কিছু টাকা তাহার খরচের জন্য দিত। অতএব সকলেই ভুবনেশ্বরীকে ভালবাসিত, তাহার অত্যাচারে সকলে আনন্দিত, কেহই দুঃখিত হইত না। ভুবনেশ্বরীর জন্য ভাল কাপড়,ভাল গহনা,সকল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া রাণী পরাইতে যাইতেন, কিন্তু এ বিষয়ে সে রাণীর কথা রাখিত না,বলিত—"এখন এসব কি দরকার। সব তুলিয়া রাখ, আমার বিবাহের সময় দিও। রাণী বাধ্য হইয়া সে সব যত্ন করিয়া রাখিয়া দিতেন। ভুবনেশ্বরী সামান্য বস্ত্র পরিধান করিত, সামান্য গহণা গাত্রে দিত, তবে সে ফুল বড় ভালবাসিত, প্রায়ই ফুলের গহনা পরিত। রাণী তাই দেখিয়া দাসদাসীকে নানারূপ ফুল আনিতে আদেশ করিতেন, ভুবনেশ্বরী তাহা লইত না, সে অন্তঃপুরের পুষ্পোদ্যানে স্বয়ং যাইত, ফুল তুলিত, মালা গাথিত, অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। এই সময়ে তাহার মন বড় প্রফুল্ল হইত। যখন সে একাকিনী থাকিত, এক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িত, তখন তাহার মূর্ত্তি ভীষণ হইত, চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত, কিন্তু মুখে কোন কথা বলিত না। একখানি ছোরা সর্ব্বদা তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকায়িত থাকিত, সে সময় সময় তাহা বাহির করিয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিত, তারপর আবার বস্ত্রের মধ্যে এমনভাবে লুকাইত যে কেহ দেখিতে না পায়। ভুবনেশ্বরীকে কেহ চিনিতে পারিত না।

রাণী মলয়াবতী ভুবনেশ্বরীকে ছোট ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিতেন। তিনি আদর করিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন। ভুবনেশ্বরী বলিল—"দুধের তৃষ্ণা ঘোলেতে মিটবে না।" মলয়াবতী বলিলেন—"তা তো জানি, তোর এখন কিসের তৃষ্ণা?" রাণী কখনও "তুমি", কখনও "তুই" বলিতেন, ভুবনেশ্বরী তাহাতে বিরক্ত হইত না। ভুবনেশ্বরী রাণীর চিবুক ধরিয়া বলিল—"ওলো সোহাগের ডালা! কতক্ষণে আশা মিটবে?"

সে গান ধরিল,—

প্রাণে প্রাণে বেঁধেছি তারে।
সে যেন হায় আর ছুটে না
রেখেছি প্রেম-ডোরে।
পথ পানে তাকায়, বাঁধন ছিঁড়তে চায়,
দিব নাকো বাঁধন ছেড়ে
রাখ্‌বো ধরে মনচোরে
প্রেমের তুফানে,
হাবুডুবু খায় গো সদা আপনার মনে,
ধর্‌বো তুলে রাখ্‌বো তারে প্রাণের আদরে।"

ভুবনেশ্বরীর স্বর বড় মিষ্ট, লহরে লহরে স্বর উঠিতে লাগিল, রাণী স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। এই সময়ে কে বলিল—"বেশ গান হচ্ছে ত?" ভুবনেশ্বরী পশ্চাতে ফিরাইয়া

দেখিল—দ্বারের নিকট রাজা নীলাম্বর দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, সে অমনি অন্য দ্বার দিয়া পলাইল। রাণী হাসিয়া বলিলেন—"চোরের মত এসেছ কেন?" রাজা বলিলেন—"তোমার নিকট চিরকালই ত চোর, ভাল ত আর হ'তে পারবো না। নিজে যে চোর, সে পরকে চোর বলে।"

রাজা অগ্রসর হইয়া মলয়াবতীর নিকট গেলেন, এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"কেমন ছিলি?" রাণী উত্তর করিলেন—"বেশ ছিলেম, কোন গোলমাল ছিল না।"

রাজা। তবে আমি বুঝি তোমার উৎপাত? বল্‌লেই ত হয়, আমি অন্যত্র যাই।

রাণী। তাতেই বা আপত্তি কি? আমি সঙ্গে যাবো। যেখানে তুমি, সেখানে আমি।

রাজা। তাহ'লে গোলমাল কিসের?

রাণী। তোমার গোলমাল, তুমি ছিলে না, বেশ শান্তিতে ছিলেন।

রাজা। তবে আরও কিছুদিন শান্তিতে থাক না কেন?

রাণী। ইচ্ছা ত হয়, কিন্তু পারি না। তবে শান্তিতে একটু লাভ আছে।

রাজা। কি লাভ?

রাণী। ঐ মূর্ত্তি মনে মনে ধ্যান করার অবসর পাই। তুমি নিকটে থাক্‌লে ত আর তাহা ঘটে না।

রাজা আদর করিয়া রাণীর অধর চুম্বন করিলেন, রাণীর গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

রাণী। বেশ শোধ দিলে। এখন বল ত কোথায় ছিলে?

রাজা। আমার দুটি রাজ্য—একটী তুমি, আর একটী এই প্রজাপূর্ণ রাজ্য। একটিকে নিয়ে ত দিবারাত্রি কাটাতে পারি না। দু'জনকেই দেখ্‌তে হয়, নইলে তোমার সপত্নী যে রাগ করবে। তাই একটু রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেম। আবার এখন তোমাকে নিয়ে আমোদ করি—তাপিত প্রাণ শীতল করি।

রাণীর অভিমানের চিহ্ন হইল, তিনি বলিলেন—"তবে আর আমাকে দরকার কি? রাজ্য নিয়েই থাক। আমি বুঝি তোমার রাজকার্য্যের অন্তরায়?

রাজা। তুমি না হ'লেও ত রাজ-কার্য্য চল্‌বে না। দুটিই চাই। আমার একটীতে হয় না। দুজনের সমান মন জোগাতে হবে।

রাণী। কেন? আমাকে ছেড়ে দেও।

রাজা। আর অভিমান করতে হবে না। তুমিও ত রাজ্যেশ্বরী, আমি কি একা রাজা। রাণী ছাড়া কি রাজা চলে।

রাণী। যা'ক, ও সব খোসামুদে কথা শুন্‌তে চাই না। বল, কোথায় ছিলে? আমি ভেবে ভেবে মরে গেলেম।

রাজা। আমি ভাবনার কিছু দেখ্‌ছি না। শরীরখানাও মোটা হচ্ছে, পোষাকও বেশ চাকচিক্যশালী।

রাণী। আমি কাপড় ফেলে দেব, তোমার বুঝি এ সব ভাল লাগে না।

রাজা। বেশ ভাল লাগে, তুমি এ সব পর্‌লে আমার ভ্রম হয় বুঝি বা উর্ব্বশী মর্ত্ত্য-লোকে এসেছে।

রাণী। এত ঠাট্টা কেন? আমি না হয়

কুৎসিৎ হ'লেম।

রাজা। তোমাকে ঠাট্টা! যাক, এ সব কথা রেখে দেও। এখন ভুবনেশ্বরীর বিষয়ে একটা কথা আছে। ওর বিয়ের জন্য চেষ্টা কচ্ছি, দুই একটী পছন্দও হচ্ছে। চল দু'জনে উদ্যানে যাই, সেখানে এ বিষয় আলাপ করব।

উভয়ে তখন অন্তঃপুরের উদ্যানে চলিয়া গেলেন।

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

"সুখ কোথায়"।

সুখ সুখ সুখ করি; অথবা দহিয়া মরি—
সুখ কি নর-দৃষ্টে হয় রে উদয়।
আছে সুখ তাঁর পদে; সেই বিভু প্রেমনদে,
সে সাথী সুখে দুঃখে মরণ সময়!

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

থামে বেঁধে মারা।

থামে বাঁধিয়া মারিলে যেমন পিঠ পাতিয়া মার খাইতে হয়, প্রহারকারীকে প্রতিশোধ দিবার উপায় থাকে না, কলিকাতায় জীবন রক্ষার উপায় কলের জলের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। কোম্পানি বা মিউনিসিপালিটি সাধারণের স্বাস্থ্য, জীবন রক্ষার ও সুবিধার জন্য (Public health safety and convenience) সহরের যাবতীয় বাটীর পুষ্করিণী ও কূপ ক্রমে বুজাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে কলের জলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুর্গন্ধশূন্য, স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার জল এবং তৎসরবরাহের ব্যয়-স্বরূপ কোম্পানি আমাদিগের নিকট হইতে বাটীর নির্দ্ধারিত টেক্সের শতকরা ৬৲ হারে টেক্স লইয়া থাকেন। জীবন-রক্ষার প্রধান উপাদান বলিয়া জলের একটী নাম জীবন। বিধাতা বিবিধ প্রণালীতে, কত কৌশলে নানা উপায়ে আমাদিগকে মুক্ত-হস্তে অবিরাম এই জীবন দান করিতেছেন। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! রাজধানীতে ভগবানের এই অনন্ত প্রবাহ রুদ্ধপ্রায়; আমাদের দোষে, আমাদের অবহেলায়, আমাদের পাপে আমরা পুষ্করিণী ও কূপে বঞ্চিত হইয়া এখন জীবনের জন্য সম্পূর্ণ রূপে কোম্পানির অধীন, অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, মুখা-পেক্ষী। যে জন্য আমরা টেক্স দিতেছি অথবা পূর্ণ মূল্য দিয়া জল ক্রয় করিতেছি, সে জল আমরা আবশ্যকমত পাই না, ঘর হইতে টাকা দিয়া চোর হইয়াছি, করযোড়ে মিউনিসি-প্যালিটির দ্বারে দণ্ডায়মান। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথমে কলের জল হইল, তখন দিন রাত্রি জল থাকিত; কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই ব্যবস্থা হইল, পূর্ব্বাহ্নে তিন ঘণ্টা ও অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা জল থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ প্রচার হইল, অদ্যাবধি পর্য্যন্ত সহরের যে সকল বাটীতে পুষ্করিণী ও কূপ আছে অবিলম্বে সে সব বুজাইয়া দিতে হইবে। কেমন করিয়া নিজ মুষ্টির মধ্যে আনিতে হয়, মিউনিসি-প্যালিটি তাহা বিলক্ষণ জানেন। চব্বিশ ঘণ্টা জলের পরিবর্ত্তে পাঁচ ঘণ্টা মাত্র জল দিবার কারণ যন্ত্রশক্তির অভাব—স্বাভাবিক উপায়

বোধ করিয়া কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য ফল। সে যাহা হউক, ২৪ ঘণ্টার স্থলে ৫ ঘণ্টা মাত্র জল দিবার ব্যবস্থা হইল বটে কিন্তু তদনুযায়ী টেক্স হ্রাস করা হইল না; তাহা হইলে "পেটে খেলে পিঠে সয়" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম। টেক্স যাহা পূর্ব্বে ছিল তাহাই রহিল। পৃথিবীর সকল দেশে জিনিষের দাম লইয়া তদপেক্ষা কম জিনিষ দিলে প্রতারণা হয়; এরূপ প্রতারণা গবর্ণমেণ্ট আইনে দণ্ডার্হ। এ দেশের মিউনিসিপ্যালিটিকে দণ্ড দিবার শক্তি কাহারও নাই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের তিন আইনে এই প্রতারণা নিবারণের ব্যবস্থা হইল, সমস্ত দিন রাত্রি জল দেওয়া হউক,(continuous supply)। আইন হইল বটে, কিন্তু করদাতাদিগের (rate-payers) দুঃখ, কষ্ট, অভাব প্রায় পূর্ব্ববৎই রহিল। কারণ দিবাভাগে সেই ১০ টার সময় কল বন্ধ হয়, ২ টা ৩ টার সময় জল আসে হাসির কথা, বিষম বিড়ম্বনার বিষয়, নিয়ত যোগান (continuous supply) হয় রাত্রিতে। যখন গৃহস্থ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, জলের কোনও প্রয়োজন নাই, তখন অবিশ্রান্ত জল দেওয়া হয়; যাঁহার সিকি ইঞ্চ ফেরিউল (ferrule) এবং যাঁহাকে দিবাভাগে তাহার অর্দ্ধেকও জল দেওয়া হয় না, রাত্রিতে তাঁহাকে আধ ইঞ্চ বা ততোধিক জল দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যালিটির ইঞ্জিনিয়ারগণ এবং তাঁহাদের অধঃস্তন কর্ম্মচারীবর্গের এতদপেক্ষা অকর্ম্মণ্যতা এবং প্রজাকুলের রক্তশোষণ করিয়া টেক্সের অপব্যবহারের এতদপেক্ষা জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? যখন পূর্ব্বাহ্নে তিন ঘণ্টা ও অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা জল দেওয়া হইত, তখন এত বে-বন্দোবস্ত ছিল না, এত জুলুম অত্যাচার হইত না। এখন অগ্রে কোন বিজ্ঞাপন (Notice) না দিয়া জবরদস্তী করিয়া যখন ইচ্ছা কল বন্ধ করিতেছে, তখন তাহা করিত না। ওজর কর,—পাইপ মেরামত করিবার জন্য কল বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু তজ্জন্য অগ্রে সংবাদ দেওয়াতে আপত্তি কি? অনুগ্রহ করিয়া ত জল দিতেছ না যে, যখন খুসি জল বন্ধ করিবে আবার যখন দয়া হইবে,জল দিবে। জল বিক্রয় করিতেছ, তবু এত জুলুম! ছিঃ! এত ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য, এত নির্লজ্জ।

তোমরা আইন করিয়াছ, যিনি যত টেক্স দেন, তদপেক্ষা অধিক জল ব্যয় করিলে অতিরিক্ত টেক্স দিতে হইবে; সে জন্য মিটার বসাইয়াছ। কিন্তু যাহার যত জল ন্যায্য প্রাপ্য, মিউনিসিপ্যালিটি তাহা না দিলে টেক্স বাদ দিবার আইন কর নাই কেন? ন্যায়ের তুলাদণ্ডে এরূপ পক্ষপাতিতা, এরূপ একদেশদর্শিতা, এরূপ অবিচার অত্যাচারের দণ্ড দিবে কে? হাইকোর্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন কি? বিপদে পড়িয়া অথবা অভাবে অনটনে টেক্স দিতে বিলম্ব হইলে তোমরা জলের কল কাটিয়া দিবার কঠোর আইন করিয়াছ। বর্ব্বরতা, নির্ম্মমতা ও নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা বটে। দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ, সুসভ্য রাজা হইয়া কেন যে মিউনিসিপ্যালিটিকে এইরূপ পৈশাচিক ব্যবহারের শক্তি দিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমরা একটী অভিনব প্রস্তাব করিতেছি। যখন বুঝা যাইতেছে, কলের জলের দুরবস্থায়

ক্রমশঃ বৃদ্ধি অনিবার্য্য—যাবতীয় কৃত্রিম ব্যাপারের সর্ব্বত্রই এইরূপ দশা হইয়াছে ও হইবে—তখন মিউনিসিপ্যালিটি এক কার্য্য করুন। জলের কল উঠাইয়া দিয়া আবার পুষ্করিণী ও কূপ খননের ব্যবস্থা করুন। সেই সব পুষ্করিণী ও কূপের জল বিশুদ্ধ রাখিবার বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করুন। প্রতিমাসে দু'তিন বার পুষ্করিণী ও কূপ ঝালাইবার বন্দোবস্ত করুন। জলে ময়লা ফেলিলে বা কোনপ্রকারে জল কলুষিত করিলে দণ্ড দিবার আইন হউক। হিন্দু আজ হিন্দু থাকিলে এ দণ্ডের প্রয়োজন হইত না; কারণ প্রকৃত হিন্দু জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্বীকার করেন। জলে ময়লা ফেলা বা জল কলুষিত করা মহাপাপ বলিয়া গণ্য করেন। জলাশয়-প্রতিষ্ঠা হিন্দুর একটী প্রধান পুণ্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য। আইনের দ্বারা পরিষ্কার রাখাইলে পুষ্করিণীর জল কলের জলাপেক্ষা বোধ হয় নিকৃষ্ট হয় না; তাহার প্রমাণ—লালদীঘি, গোলদিঘি, হেদুয়ার দিঘি এবং ময়দানের কয়েকটী দিঘি। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট এক্ষণে কলের জলের জন্য যে টেক্স লওয়া হয়, পুষ্করিণী ও কূপের জল ঝালাইবার ও সর্ব্বদা পানযোগ্য করিবার বৈজ্ঞানিক উপায়ের জন্য সেই টেক্স লওয়া হউক। আমাদের বিশ্বাস এখন কলের জলের জন্য যে বিপুল ব্যয় হইতেছে, তদপেক্ষা অল্পব্যয়ে মিউনিসিপ্যালিটি সুহরময় পুষ্করিণী ও কূপ সংরক্ষণ করিতে পারিবেন। অথচ জলের কলের নিত্য সংস্কারের জন্য যে পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক বৃথা ব্যয় করিতে হইতেছে, তাহার সহস্রাংশ করিলেই প্রজাকুল সুখে, স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে বাস করিবে। ঈশ্বরদত্ত জলের জন্য হাহাকার ঘুচিয়া যাইবে। মিউনিসিপ্যালিটির দুরপনেয় কলঙ্ক ক্ষালিত হইবে।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

অবসান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপুরোদ্যান।

(উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতিকীর্ত্তি)

উর্ম্মিলা। দেখ শ্রুতি, পুষ্প ভূষাময়ী
ব্রততী মল্লিকা হাঁসি,
গাঢ় আলিঙ্গনে, বেঁধেছে যতনে,
কুসুমিত অশোকেরে,
দেখে মনে হয়, প্রাণ বিনিময়
করেছে দু'জনে যেন,
পেয়ে প্রাণ দোঁহে, দোঁহা পাশে
হাসে দোঁহে কুসুমের ছলে।
ধায় অলি চুম্বিতে অধর
অনুরাগে,
দুলি' বীর মলয়-হিল্লোলে,
সরিয়া দাঁড়ায় বালা
মানিনী যেমতি,
কভু পড়ে ঢ'লে, হাঁসির হিল্লোলে,
লুটাইয়ে অশোকের হৃদে।
এ মিলনে কে চাহে সাধিতে বাদ?
কে পারে কুঠার হানিবারে,
হেন অশোকের মূলে?

শ্রুতি। দিদি!
প্রণয় কি মানুষের শুধু?
চেয়ে দেখ চারিদিক্ পানে,
তরুলতা পশুপাখী যত,
প্রেমে উন্মত্ত যেন,
ভালবাসে যে জন যাহারে,
টানে তারে আপনার পানে।
পিপাসিতা চাতকিনী ওই,
উড়িছে মেঘের কোলে
পাশে পাশে চাতক উড়িছে তার,
নয়নের আড়
যেন করিবারে নাহি পারে;
ভ্রমরার সাথে ভ্রমরী করিছে গান
কপোতীর প্রাণ, কপোত পেয়েছ বুঝি
নহে কাছে কাছে কি লাগি
রয়েছে তার?

মাধবী। মিথ্যা নয় শ্রুতির এ কথা,
যথা দৃষ্টি পড়ে, পাই দেখিবারে,
প্রেমের এ মাধুরি-সম্ভার
দেখ চেয়ে সরসী-সলিলে
বাসন্তি হিল্লোলে,
হেলে দোলে কমলিনী,
দৃষ্টি কিন্তু আছে রবি পানে।
ভ্রমর পবন
অতিথি দাঁড়ায়ে দ্বারে,
তোষে তারে দিয়ে পরিমল-ভার।
সোহাগে আপনা হারা, ধনী
গুণমণি নেহারী সম্মুখে—
অনিমিখে নেহারে বদন
রবিও কেমন,
নলিনীরে জানায় সোহাগ তার
দূর হতে কর পসারিয়া
সুবর্ণ মণ্ডিত যেন
নীরবেতে করিতেছে আলিঙ্গন।
ফুল্লাসন চুম্বন করিছে স্নেহ-ভরে
কপোলের শিশির কণা
ধীরে ধীরে দিতেছে মুছায়ে।

উর্ম্মিলা। বটে তাই, বাঁধা আছ দুই জন,
কিন্তু দিদি! বুঝিতে না পারি,
নলিনী সুন্দরী কি
লাগি কেঁদেছে আজ?
কি যাতনা পেয়েছে সরলাবালা,
কোমল হৃদয়ে?
ভিজায়ে আননখানি বহে চারিধারে,
অশ্রুধারা শিশিরের ছলে,
ওরাও কি মানুষের মত,
নীরবে গুমরি কাঁদে?

শ্রুতি। প্রেম ফাঁদে পড়িলেই জ্বালা,
চেয়ে দেখ—আপন হৃদয় পানে?
কত কাঁদ নিরজনে বসি।
সারা নিশি আঁধারে ডুবিয়া,
ছিল ধনী একাকিনী,
গুণমণি সুদূর প্রবাসে ছিল,
অবশ পরাণে চাহি পথ পানে,
জেগেছে, কেঁদেছে সারা রাতি
প্রাণপতি কখন আসিবে বলে,
নয়নের জলে
তাই ভাসিতেছে দুটী আঁখি।

উর্ম্মিলা। কেঁদেছিল, পেয়েছে তো ফিরে,
নয়নের মণি তার

আমি কিলো ! ফিরে পাব দেখা,
সেই হাসি বলে,
শয়ন অলসে,
শয্যা ত্যজি গেছেন চলিয়া,
আঁখিজলে ভাসি সেই হ'তে।
কাল সারা নিশি, কি জানি ভগিনী,
নয়নে আসেনি ঘুম ;—
জাগিয়াছি সকল যামিনী,
মুখপানে চেয়ে তাঁর,
উষার সে তরল আঁধারে—
পুরবাসী জাগেনি তখন,
ডুবে নাই আকাশের তারা,
পাখীগুলি ডাকেনি তখন।
চমকিয়া উঠি প্রাণনাথ,
কহিলেন সম্ভাষি আমারে,
আসি সুহাসিনী, থাক একাকিনী,
দেখা হবে আসি যদি ফিরে—
আথীবিথী ধরিনু যুগল কর,
প্রাণেশ্বর রহিলেন মুখ চাহি মোর।
যেন কত আকুল পরাণ।

শ্রুতি। সাবধান, কেড়ে যেন নাহি লয় কেহ ;
দেহ দুটী ভিন্ন নাহি হয়ে,
এক হ'লে হ'ত দিদি ভাল।
তিলকের তরে, নয়নের আড়ে
রাখিতে হ'ত না তব নয়নের মণি।
জ্বালাত না বিরহ যাতনা
জাগিত না বিচ্ছেদের ভয়।
সাধে কি আকুল প্রাণে তব মুখপানে—
চেয়েছিল বার বার ?
প্রাণটুকু তাঁর লয়েছে সে নিজ করে—
মনটুকু বেঁধেছে আঁচলে নিজ
অলি ফিরে যায়, পুনঃ ফিরে চায়
আসে পুনঃ ফিরি,
নলিনীর হৃদয়-মন্দিরে।

উর্ম্মিলা। না ভগিনী—কাতরতা বিদায়ের নয়,
মনে হয় বিপদ ঘটিবে বুঝি !
আজি দুই দিন হ'তে আঁখি-পথে
আপনি ঝরিছে জল,
অমঙ্গল মনে হয় কত,
হায় আমি অভাগিনী,
না জানি কপালে কিবা আছে ?

মাণ্ডবী। ছি উর্ম্মিলা ! উতলা কিসের লাগি ?
উন্মাদিনী হবি নাকি ?
আসি এই প্রমোদ-কাননে
ভালবাস নিতি নিতি শুনিতে সঙ্গীত,
গাই শোন হবি অন্যমনা।

গীত।

ফুল্ল কুসুম হাসে, ফুল্ল কুসুম পাশে,
দিশি সৌরভে অবগাহে—
চুত পরিমল, পানে বিভোরা,
কোকিলা কুহু গাহে।
বিমল জ্যোছনা রাতি,
বিমল চাঁদিনী ভাতি,
নীল আকাশে, ঘুমের অলসে,
হাসিছে তারকা পাতি,
উড়িছে চকোর হইয়ে বিভোর
চকোরী প্রেম চাহে।

উর্ম্মিলা। এ সঙ্গীত মিশে যায় কোথা,
ঐ শূন্য—শূন্যপথে বুঝি
সংগীতের ধ্বনি মনে হয় শুনি,

শ্রবণ পাতিয়া রহি।
পশে কার্ণে, মরমে পশিতে
নাহি পারে।
মনে পড়ে নাথের মলিন মুখ
দিদি! ইচ্ছা করি পাসরি এ ব্যথা
চিন্তা-ছলে কেন বৃথা সন্দেহ বাড়াই?
কিন্তু হায়, হারাই হারাই মনে হয়।
নিশি শেষে নিদ্রার আবেশে
দেখিনু যে দারুণ স্বপন
করিতে স্মরণ শরীর শিহরে মোর।

শ্রুতি। স্বপন কি সত্য হয় কভু
কত স্বপ্ন দেখি কত দিন,
ভাল মন্দ কত কি যে
নাহি পড়ে মনে,
ভুলে যাই ভাঙে যেই ঘুম।
কত দিন কত যত্ন করে,
রাখি মনে স্বপনের কথা,
জাগিয়ে ঘুমের ঘোরে,
মনে নাহি পড়ে
বাহিরেতে আসি যেই।
মন যার বেশী এলো মেলো,
বেশী স্বপ্ন দেখে সেই,
স্বপন সফল নাহি হয়।

উর্ম্মিলা। এ স্বপন সে স্বপন নয়,
আমিও অমন কত দিন,
দেখিয়াছি স্বপ্ন শত শত
ভুলিয়াছি নিমিষের মাঝে।
আজি যেন শোণিত অক্ষরে,
কে যেন অন্তরে
লিখিয়াছে স্বপনের কথা,
ভুলিবারে যাই, তাড়াইতে চাই
পাড়ি অন্য কথা মর্ম্মে,
শত আবরণে ঢাকিতে
পারি না তাহা।

মাণ্ডবী। কি স্বপন দেখেছ ভগিনী,
প্রকাশিয়া বল শুনি,
কুস্বপন হ'লে প্রকাশিয়া বলা ভাল,
শুনেছি, তা হ'লে,
ফলেনাকো স্বপনের ফল।

উর্ম্মিলা। শুন দিদি স্বপন-কাহিনী,
অভাগিনী দেখেছি যা নিশ শেষে,
সে স্বপন করিতে স্মরণ
প্রাণ মম উঠিছে কাঁদিয়া।
কেমন যে অন্ধকার দেশ
কে যেন আমারে,
নিয়ে গেল সেই দেশে,
আলো নাই সে দেশের মাঝে;
নাহি যেন জীবের সঞ্চার
শুধু অন্ধকার মাখান বিষম ভয়।
দীর্ঘ তরুরাশি—আকাশ পরশে শিরে,
শাখে তার নাহি ডাকে পাখী,
হা হা রবে কে যেন কাঁদিছে
তার তলে।
চিতা ধুমে আবৃত কানন দেশ
পূতিগন্ধ শণিত শবের চারিধারে,
তার মাঝে বিকট মুরতি এক,
করে তার শাণিত কৃপাণ,
সম্মুখে দেখিয়া মোরে অসি উলঙ্গিয়া,
আসিল কাটিতে।
স্বপ্ন-ঘোরে মূর্চ্ছিতা হইনু আমি।

কিছুক্ষণ পরে স্বপনে আবার,
চেতনা সঞ্চার হইল আমার যেন,
তারপর, দেখিলাম যাহা,
কেমনে তা প্রকাশি ভগিনী।

শ্রুতি। বল দিদি! পরাণে রেঁখো না চেপে,
গুমরি কাঁদিলে পরে—প্রাণের বেদনা,
বাড়ে যেন শত গুণ,
ফুকারিয়া কাঁদে যেই জন,
তাহার বেদন,
অশ্রুজলে যায় যেন ধুয়ে
বল বল কিবা হ'ল তার পর,
শুনি তব স্বপন-কাহিনী,
শিহরিছে শরীর আমার।

উর্ম্মিলা। তার পর দেখিনু স্বপনে,
সে কাননে আমি যে নাহিক আর,
এনেছে আমারে যেন সরযূর তীরে,
প্লাবনে ছুটিছে নদী
শোণিত-মণ্ডিত উর্ম্মী রাশি,
কূলে কূলে করিছে গর্জ্জন।
উচ্ছ্বাসিত সরোবর কূলে
পাতা আছে বালির বিছানা,
উপরে তাহার,
মৃতদেহ নাথের আমার
অভিভূত অনন্ত নিদ্রায়,
মুক্তকেশী বিধবার বেশে
হা মন্দভাগিনী আমি,
বসে আছি যেন মৃত নাথ পদমূলে।
কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম দেবতায়,
কে কোথায় আছ এস কাছে,
দিয়ে যাও নাথেরে বাঁচায়ে মোর।
উত্তর না দিল কেহ,
হায় নদীকূলে, আকুল কুন্তলে
আছাড়িয়া পড়িলাম যেন
পুনরায় হারানু চেতনা।

মাণ্ডবী। ব'লনা ব'লনা আর
শুনিয়া না দহিছে হৃদয়,
ভগিনী, বচন রাখ মোর,
ভুলিতে যতন কর
কপাল ভাঙিতে কতক্ষণ লাগে বল?
অকুশল পায় পায় সতত বেঁড়ায়।
মাগ বর দেবতার কাছে
কপালে যা আছে—
খণ্ডিতে নারিবে কেহ
আজি ভক্তিভাবে—
দেহ অর্ঘ বরদার পায়
তাঁর বরুণায় অকুশল খণ্ডিবে সকল,
এবে চল যাই অই লতাকুঞ্জ পাশে।
বসি গিয়া বকুলের মূলে,
প'ড়ে আছে রাশি রাশি ফুল
কুড়াইয়ে মালা গাঁথি মোরা।

শ্রুতি। সেই কথা ভাল দিদি!
তোলা পাড়া না করাই ভাল।
দেখ দেখ ওই উড়ে গেল,
ভ্রমর কেতকী পাশে,
অন্ধ হয়ে ফিরিবে এখনি,
চম্পক তরুর পাশে,
চম্পক ফুটেছে থরে থরে,
অনাদরে, কি লাগি ভ্রমর তারে
নাহি চায়,
নাহি যায় কি লাগি চম্পক পাশে

মাণ্ডবী। ভালবাসে যে না যারে,
বিরাগ যেখানে যার,
সেখানে কি লাগি যাইবে ?

মাণ্ডবী। গীত।

ভালবাসে না বাসে আভাসে তা জানা যায়,
কি যে কার প্রাণের কথা, নয়নে তা না লুকায়!
যে ভালবাসে যারে,
রাখে কি তায় আঁখির আড়ে,
থাকে সেই চো'খে চো'খে
অনিমিখে দু'জনায়।

নেপথ্যে গীত।

"গুমরি-গুমরি কাঁদে কেন আজি মন প্রাণ ;
দুঃখের জীবন ওগো হ'ল বুঝি অবসান।
আনন্দে মগন, ভুবন গগন,
আনন্দে বিভোর সবার প্রাণ।
এ আনন্দ মাঝে, কেন হৃদে বাজে,
কেন হৃদে উঠে বিষাদ তান॥"

মাণ্ডবী। উর্ম্মিলা! বেদন গেল দূরে।
কণ্ঠস্বর পে'ছ কি শুনিতে ?
আসে তব গুণমণি
আয় শ্রুতি যাই পলাইয়ে
একাকিনী বসি উপবনে,
নিবা'ক বিরহ জ্বালা।

উভয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) নিদারুণ সংসার-শ্রমেতে
শ্রান্ত দেহ হইত যখন,
বিষময় দারুণ বেদনে,
নিষ্পিড়ীত হইতাম যবে,
আসি দাঁড়াতাম ঐ স্নিগ্ধ ছায়াময়ী
ব্রততীর ছায়াতলে।
দূরে যেত হৃদয় বেদনা।
শ্রান্ত দেহে হ'ত নব বল,
স্বপ্নাতীত যেন এক জগত হ'তে
ছুটিয়া আসিত সুধা-ধারা,
আত্মহারা করিয়া আমারে,
প্লাবিত করিত প্রাণ মোর।
আশা প্রাণভরা—আঁখি নির্নিমেষ,
পরাণ বিবশ, চিত্ত অনলস,
চাহিতাম মুখখানি পানে।
প্রাণে প্রাণে ছুটিত প্রেমের স্রোত।
দেখি পুনঃ দেখি ফিরি দেখিতাম চেয়ে,
মিটিত না আকাঙ্ক্ষা আমার।
রেণু রেণু করি বারিত আশার আশা
সে প্রেম সম্ভাষে, ভালবাসা
মোহন-মন্ত্র তার,
দূরাগত বীণা ধ্বনী সম,
পশিত শ্রবণে মোর।
জীবন প্লাবনী, প্রেম প্রবাহিনী,
বহিত অন্তর-পথে, কয়দিন হ'তে
সে ভাব না হেরি যেন আর!
মনে হয় আমি যেন এ দেশের নই
আমার নহেক কেহ।
স্নেহে যেন নাই আকর্ষণী,
শূন্য যেন প্রেমের আগার,
স্নেহ প্রেম দূর হ'তে দূরে
যায় যেন স'রে
ছিঁড়ে ধীরে প্রাণের বন্ধন।
মনে হয় জীবনের বহু দূর পথে
যেন দুটী আত্মার মিলন
মরি মরি চির পরিচিত
জীবন্ত প্রতিমা একখানি,
রহিয়াছে প্রাণে যেন করি আলিঙ্গন।
ওকি! প্রিয়ে উর্ম্মিলে আমার
ঐ উর্দ্ধ ছায়াপথে তারকার দেশে
কি আশে রয়েছি দুইজন ?
পার্থিব মিলন সত্য কি ভাঙ্গিয়া যাবে ?
কৈ তুমি কৈ প্রিয়তমে!
নয়নে না পাই দেখিবারে
অন্ধকারে ঘেরা চারিধার।

উর্ম্মিলা। একি হ'ল নাথের আমার
মলিন বদন, সজল নয়ন,
উদাস চাহনি যেন,
কি বিষাদে হ'ল হেন মনের বিকার ?
(প্রকাশ্যে) নাথ! সদাশ্রিতা দাসী
দাঁড়ায়ে যে রয়েছে সম্মুখে।

লক্ষণ। না না প্রিয়ে ! সম্মুখেতে নাই তুমি
ও যে শুধু আঁধারের ছায়া,
দেখ চেয়ে, দেখ দূর ভবিষ্যতে
দাঁড়ায়াছি মোরা দুইজন
জীবনের পর পারে যেন,
সম্মুখে দেখিছ যাহা, শুধু বিষাদের ছায়া,
দেহ দেহ নয়।
চিরিয়া চিরিয়া দেখ এ
দেহ-পঞ্জর মোর অশ্রুজল ময় !
থাক যদি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
এস প্রিয়ে দাও আলিঙ্গন।
ঐ ফুল্ল পারিজাত জিনি,
মুখখানি, করে যাই সস্নেহ চুম্বন।

উর্ম্মিলা। হায় বিধি কি বাদ সাধিবি আজ ?
অভাগিনী নাহি জানি আমি,
কিবা মনে আছে তোব !
(প্রকাশ্যে) কেন নাথ বাড়াও বেদন
প্রকাশিয়া বল শুনি—
(হস্ত ধরিয়া) ফেলি ঘোর সন্দেহ মাঝারে
কেন বজ্র হানিতেছ আর ?

লক্ষণ। পরিহাস, পরিহাস শুধু
ছি ছি ব্যাকুলতা,
প্রিয়তমা ব্যথা পাবে প্রাণে,
শুন প্রিয়তমে দুই আকর্ষণে,
দুইদিক হতে কে যেন টানিছে মোরে,
পৃথিবীর স্নেহ ভালবাসা টানিতেছে
পৃথিবীর পানে।
অন্য দিকে, অনন্ত বিদায়,
দৃঢ় আকর্ষণে, টানে অনন্তের পানে।
তাই প্রিয়ে এসেছি দেখিতে,
ফিরে এ বদনখানি
জানি মিটিবে না
প্রাণের পিয়াসা মোর
তবু দেখে যাই, দেখে যাই একবার
প্রেমভরা বদন-চন্দ্রমা।

উর্ম্মিলা। ছলে ভুলাও না নাথ
বল অভাগীরে, কেন বারে বারে,
বলিতেছ অকুশল কথা।
কোথা কেবা আছে,
কে কারে ডাকিছে,
প্রাণেশ্বর !
প্রাণে প্রাণে বাহু পসারিয়া
আমি যে বেঁধেছি নাথ সুদৃঢ় বন্ধনে।
কে চাহে ছিঁড়িতে তাহা ?

লক্ষণ। সত্য প্রাণেশ্বরী, বুঝিতে না পারি,
কত চিন্তা উদ্ভব বিলয়।
আর্য্যের আদেশে, মন্ত্র-গৃহ পাশে
সতর্ক প্রহরী আমি।
দাঁড়াইতে না পারি তথায়,
ছুটে তাই আসিলাম হেথা।
এঁকে যাই, রেখে যাই
চাঁদমুখে জীবনের স্মৃতি !

(উর্ম্মিলার চিবুক ধারণ করিয়া)

গীত।

যদি ভেসে চলে যাই দূরে অতি দূরে।
নিবে যায় ক্ষীণ দীপ নীরব আঁধারে ॥
ভুলনা'কো প্রেমময়ী ভুলনা আমারে
আঁকিয়া রেখো এ স্মৃতি হৃদয় মাঝারে ॥"

(সস্নেহে চুম্বন)

বহুক্ষণ পাবনা দেখিতে
তাই দেখিবারে
একবার আসিয়াছি ছুটী ;
হ'ল বুঝি এতক্ষণ নির্দ্দিষ্ট সময়,
মন্ত্রণার।
যাই দ্রুতগতি আমি।

উর্ম্মিলা। (করযোড়ে)
কোথা মাগো দনুজদলনি।—
বিপদবারিণী শুভঙ্করী,
ডাকে দাসী কাতরে তোমারে,
হায় আমি ভয়ে যে কাতরা,
হয়ে আছি অনুক্ষণ—
অদৃষ্ট লিখন,
শেষে কি তাহাই হবে ?
নিরানন্দ কভু দেখি নাই নাথে,
কখন দেখিনি হেন অপ্রফুল্ল ভাব !
সত্য কিগো ভাঙ্গিবে কপাল ?

সত্য কিগো হারাবে দুঃখিনী
নয়নের মণি তার,
এ ধরণী মাঝে
কেবা বীর কেবা বীর আছে
আমার নাথের মত ?
সেই বীর হৃদি আশঙ্কায়
হয়েছে কাতর ?
তবে আর কেন
ছিঁড়ে ফেলি হৃদয়-বন্ধন
বীরপত্নী মরণে কি ডরে কভু
প্রবাহে তো ঢালিয়াছি দেহ,
দেখি ভেসে কতদুর যাই ?

প্রস্থান।

পট ক্ষেপন।

(ক্রমশঃ) শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

গ্রন্থ সমালোচনা।

আকিঞ্চন।—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত, একখানি কবিতা পুস্তক। কলিকাতা ৩০।৩ মদন মিত্রের লেন "দীনধাম" হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার আমাদের হাস্যরস রসিক, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কমিক নাট্যকার স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের সুযোগ্য পুত্র, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম,এ, বি, এল উপাধীধারী, এক্ষণে জজীয়তী করিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে মাসিক-পত্রিকাদিতে ইহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়াছি। সম্প্রতী তাঁহার "অকিঞ্চন" আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। গ্রন্থকার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তাহার মোহে মোহিত হইয়া মস্তিষ্ক বিকৃত করেন নাই। যে সকল কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই ধর্ম্মভাবময় আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। হৃদয়ে যে ভাব উচ্ছ্বসিত, লেখনীতে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাবুকের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের অমিয় উচ্ছ্বাস পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি—পাঠকমাত্রেই মুগ্ধ হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ইহার "মর্ম্মগীতি", "শ্রীকৃষ্ণ", "স্বদেশ স্তোত্র", "সাধকের নিবেদন" প্রভৃতি কবিতা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইয়া পিতার পন্থা অনুসরণ করতঃ বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করুন।

গোপাল-বান্ধব।—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা, ১৮নং রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশবাবু বহুদিন হইতে গোজাতির উন্নতি-কল্পে জীবন পাত করিতেছেন। কৃষিপ্রধান হিন্দুর দেশে গাভী মাতৃ-স্বরূপিনী, ইহার উন্নতি ও বৃদ্ধি দ্বারা হিন্দুর শ্রীবৃদ্ধি হয় অন্যথায় হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হয়। গ্রন্থকার নানা প্রকার উপদেশ এবং গবেষণার দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই পুস্তকেই তাহার নিদর্শন। "গোপাল-বান্ধব" পাঠে এ দেশবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। হিন্দু মাত্রেরই ইহার একখানি ক্রয় করা উচিত।

সাহিত্য-কুঞ্জ।—শ্রীযুক্ত জীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থকারের নিকট ১নং কালী কুণ্ডুর লেন, হাওড়া ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আবাল্য বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুরাগী, নানাবিধ সাময়িক ও সাপ্তাহিক পত্রে ইহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইংরাজী প্রবন্ধাদি লিখিতেও তিনি পারদর্শী, অদ্যাবধি যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি মাসিক ও সাপ্তাহিকের পাঠকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, এ পুস্তকে তাহার অধিকাংশ বাঙ্গালা ও ইংরাজী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রবন্ধই পাঠোপযোগী এবং তাহার কৃতীত্বের পরিচায়ক। গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হউন।

লগ্ন ভস্ম।—প্রজাপতি সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার প্রণীত মূল্য ⅟০ আনা। প্রজাপতি কার্য্যালয়ে ৬৯নং নিমতলা ষ্ট্রীট কলিকাতায় পাওয়া যায়। পুস্তকখানির আগাগোড়া বেশ মাধুর্য্যময়; পাঠে বেশ আসক্তি জন্মায়—লেখা সরল ও প্রাঞ্জল।

সদ্গোপ জাতি ইতিহাস।—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত মূল্য ৷৷৹ আনা। এই জাতীয় ইতিহাসে সদ্গোপ জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত জাতি সম্বন্ধে এই পুস্তকে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে,সজাতি মহলে ইহার আদর হইবে, আশা করা যায়।

গৃহস্থ-চিকিৎসা।—শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর প্রণীত মূল্য ৷৷৹ আনা। ইহাতে প্রধান প্রধান রোগগুলির আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা-প্রণালী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; ভাষা এত সহজ ও সরল যে স্ত্রীলোকেরও বোধগম্য হইবে। ইহার একখানি গৃহে রাখিলে সময়ে অনেক উপকার হইবে।

সাজান বাগান।—একখানি গল্পের বই, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সম্পাদিত। প্রজাপতি মাসিক-পত্রিকায় কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সকল গল্প বাহির হইতেছিল, তাহাই পুস্তকাকারে গ্রথিত, গল্পগুলি মন্দ নহে। অপর পরিচয় অনাবশ্যক।

ANNUAL REPORT—আচার্য্য শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মের যে সভা স্থাপন করিয়াছেন—ইহা তাহারাই যাবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী। সভার উদ্দেশ্য মহৎ; ভগবানের নিকট ইহার উদ্যোক্তাগণের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

আর্ত্তের আবেদন।

(১)

কেন বাঞ্ছাময় বল এ লাঞ্ছনা পলে পলে ?
এ প্রাণের বাঞ্ছাগুলি দলিতেছ পদতলে ?
কেন এ যাতনা দাও ?
আরো কি, দেখাতে চাও—
আমি কীট ক্ষুদ্রতম, তুমি রুদ্র বলাধার ঃ
এ কথা ত' জানিয়াছি এ জীবনে শতবার।

(২)

আমি বাসনার তৃণ, তুমি বাত্যা ঘটনার ;
যে দিকে তোমার ইচ্ছা; উড়াইছ অনিবার ;
শত সতর্কতা মম,
ভিত্তিশূন্য স্তূপ সম,
সতত হ'তেছে ব্যর্থ, কোন অদৃষ্টের ঘাতে ;
তীরচ্যুত এ ব্রততী ঘুরিছে আবর্ত্ত সাথে।

(৩)

কণ্টক এড়ায়ে, যত চলিতেছি মুক্তপথে,
ততই কণ্টক যেন উড়ে আসে কোথা হ'তে ;
তুমি নাহি দিলে স্থল,
কোথা রাখি পদতল ?
আমি ব'সে যুক্তি করি সতত মুক্তির তরে;
তুমি বিধানের গুরু র'য়েছ বিধান ধ'রে।

(৪)

আর কি দেখাতে চাও? আর কি বুঝাবে বল?
এ আবর্ত্ত হ'তে আর্ত্তে স্থিরতায় ল'য়ে চল ;
যেথা চির ধীর স্রোতে
অভিন্ন অনন্য পথে,
তোমার আমার বাঞ্ছা মিলে যাবে সমতায়,
উভকূল পূর্ণ করি' সফলতা শ্যামতায়।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র মিত্র।

কাব্যে হিন্দুমাতার গৌরব।

মাতার গৌরব হিন্দুর জাতীয় চরিত্রে কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে—জগতের অতুলনীয় রাম ও যুধিষ্ঠির চরিত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার, সমস্ত সদ্‌গুণের পূর্ণ সমাবেশ তাহাতে হইয়াছে—সুতরাং মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠাও যে তাহার চরিত্রে দেখা যাইবে তাহা [illegible] পিতৃসত্য পালন অবশ্যই রাম চরিত্রের বিশেষ। [illegible] কিন্তু মাতৃভক্তির নিকট তাহা নিতান্তই নিষ্প্রভ বলিয়া বোধ হয়। পিতার প্রতিশ্রুতি পালনে পুত্রের স্বার্থত্যাগ লৌকিক বাধ্যতা বা legal obligation। কিন্তু বিমাতার অন্যায় স্বার্থসাধনে [illegible] আত্মত্যাগ অসামান্য নৈতিক-বাধ্যতা বা [illegible] obligation। পুত্রগত প্রাণ, সরল, সাধু পিতার সত্যপালনে আরও অধিক বলবতী লৌকিকবাধ্যতা, কিন্তু তাহার তুলনায় দুর্বৃত্তসক্তা, ঈর্ষাপরতন্ত্রা, দুষ্টকার্য্যকারিণী বিমাতার প্রতি অচলা ভক্তি তদধিক নৈতিক বলের পরিচায়ক।

রাম চরিত্রের এই মহত্ত্ব কবিও স্পষ্টাক্ষরেই রাম চরিত্রের প্রথম রেখাপাতেই নির্দ্দেশ করিতেছেন:

স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।
পিতুর্ব্বচনানির্দ্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ॥

রামায়ণম্ বালকাণ্ডঃ ২৪ অধ্যায়ঃ।

“সেই বীর পিতার বাক্যে ও কৈকেয়ীর প্রীতির জন্য প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বনে গিয়াছিলেন।

রাম চরিত্রের এই মাতৃভক্তির চিত্র কবি নানাপ্রকার বর্ণ সংযোগে কিরূপ উজ্জ্বল, মনোহর ও অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা একবার অযোধ্যাকাণ্ডের রামাভিষেক দৃশ্যটী স্মরণ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অভিষেকের সমস্ত মঙ্গলায়োজন প্রস্তুত—রাত্রি প্রভাত হইলেই রামের যৌবরাজ্যাভিষেক হইবে। ইহার মধ্যেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অপেক্ষাও আকস্মিক ও বেদনাকারী বিঘ্ন উপস্থিত। আশার মনোরম উজ্জ্বল চিত্র নিরাশার কালিমাব্যাপ্ত। অনুকূল ও অনুরক্ত প্রজাকুলও পৌরবর্গ সমস্তই সহানুভূতি ও সহায়তা ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত। দশরথ নির্দ্দয় ভৎর্সনা দ্বারা কৈকেয়ীর অন্যায় প্রমাণিত করিয়া দিতেছেন—এমন কি রাম বনে না গেলেই তিনি সুখী হইবেন, এরূপ ভাব ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না—কৌশল্যা, দশরথও কৈকেয়ীর কৃতকার্য্যের কঠোর সমালোচনা করিয়া প্রতিজ্ঞাপালনে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বাধা না দিতেছেন—মহাবীর লক্ষ্মণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উত্তেজনার প্রবল বহ্নি জ্বালিয়া কৈকেয়ীর ন্যায়বিগর্হিত, ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন ও বিপুল বিক্রমে ভরতাভিষেকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবেন বলিয়া বীরদর্পে অযোধ্যা কাঁপাইতেছেন—কেবল রামচন্দ্র ইঙ্গিত করিলেই যেন কৈকেয়ীর সমস্ত ষড়যন্ত্র নিমেষে চূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে পরীক্ষার পর পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত হইয়াছে—কল্পনার দ্বারা যত বিষমতম পরীক্ষা উদ্ভাবিত হইতে পারে, সমস্তই কবি রাম

চরিত্রের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন কিন্তু এই সকল প্রলোভনের মধ্যেও সেই অকৃতকারিণী পাষাণী বিমাতার প্রতি রামচন্দ্রের মনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিকার উদিত হই... —পুত্রভাবের অণুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিল না। সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, হিমাচলের ন্যায় স্থির রামচন্দ্র অচল অটলভাবে বিমাতা কৈকেয়ীর ও পিতার দোষ ক্ষালন করিয়া সকলকে নিরস্ত ও শান্ত করিয়া দিতে লাগিলেন, যথা—

"কৈকেয়্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মমবেদনে।
যদিতস্যা ন ভাবোঽয়ং কৃতস্তে বিহিতোভবেৎ॥"১৬
"জানাসি হি যথা সৌম্য নমাতৃষু মমান্তরম্।
ভূতপূর্ব্বং বিশেষোবা তস্যা ময়ি সুতেঽপিবা॥"১৭
"সোঽভিষেকনিবৃত্তর্থৈঃ প্রবাসার্থৈশ্চ দুর্ব্বচৈঃ।
উগ্রৈর্ব্বাক্যৈরহং তস্যা নান্যদৈবাৎ সমর্থয়ে॥"১৮
"ন লক্ষ্মণাস্মীন্ মম রাজ্যবিঘ্নে মাতা যবীয়সাভিশঙ্কিতব্যা।
দেবাভিপন্নো ন পিতা কথঞ্চিৎ জানাসি দৈবং হি তথাপ্রভাবম্॥"৩০
(অযোধ্যাকাণ্ড)

"আমার কষ্টের নিমিত্ত কৈকেয়ীর কেন ইচ্ছা হইবে—যদি তিনি দৈব দ্বারাই চালিত না হইবেন! হে শান্ত লক্ষ্মণ! তুমি জান যে মাতাদিগের মধ্যে আমার কোন প্রভেদ নাই। পূর্ব্বে কৈকেয়ীরও আমার প্রতি পুত্র ভাবের কোন বিশেষ (প্রভেদ, ছিল না। আমার অভিষেক নিবারণের ও বন গমনের জন্য যে তিনি দুর্ব্বাক্য ও তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার কারণ আমি দৈববাতীত, আর কিছুই দেখিতে পাই না। হে লক্ষ্মণ! আমার রাজ্যবিঘ্নে পূজনীয়া মাতা বা দৈবগ্রস্ত পিতাকে কখনও কারণ বলিয়া সন্দেহ করিও না—কেননা জানিও যে দৈব অতিশয় প্রবল।"

রামচন্দ্রের নিজের কথাতেই যে কেবল তাঁহার চরিত্র ব্যক্ত হইয়াছে—তাহা নহে, দশরথও কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"সদা তে জননী তুল্যাং বৃত্তিং বর্ত্তি রাঘবঃ।"

"রাঘব তোমার প্রতি সর্ব্বদাই নিজের গর্ভধারিণীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।" তাহার পর, পূর্ব্বোক্ত উক্তি যে কেবল মিথ্যা প্রবোচনা নহে, কৈকেয়ীর মন বিগলিত করিবার ছলমাত্র নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য দৃঢ়তার সহিত বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা বলিতেছেন,—

"রামোঽহভরতাদ্ভূয়স্তবশুশ্রূষতে সদা।
বিশেষং ত্বয়িতস্মাত্তু ভরতস্য নলক্ষয়ে॥২৫
শুশ্রূষাং গৌরবঞ্চৈব প্রমাণং বচনক্রিয়াম্।
কস্তুভূয়স্তরং কুর্য্যাদন্যত্র পুরুষর্ষভাৎ॥২৬
সত্যেন লোকান্জয়তি দ্বিজান্ দানেন রাঘবঃ।
গুরূন্ শুশ্রূষয়া ধীরো ধনুষা যুধিশাত্রবান্॥২৯
(২৯।১২শ সর্গঃ, অযোধ্যাকাণ্ডঃ)

"রাম, ভরত হইতে তোমার অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকে। তোমার প্রতি ভরতের রাম হইতে অধিক ভক্তিভাব ত লক্ষিত হয় না। সেবা, সম্মান, একান্ত আনুগত্য স্বীকার, বাক্য-প্রতিপালন, প্রভৃতি পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম অপেক্ষা অধিক আর কেইবা করিবে? রাঘবলোকদিগকে সত্যাচরণ দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, দ্বিজদিগকে দানের দ্বারা তুষ্ট করিয়াছেন, গুরুদিগকে (পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে) সেবার দ্বারা প্রীত

করিয়াছেন, আর যুদ্ধে ধনুর দ্বারা শত্রুদিগকে জয় করিয়াছেন।"*

কৈকেয়ীর গুণবান্ নিজপুত্র ভরত অপেক্ষাও রামচন্দ্র তাঁহার প্রতি অধিক ভক্তিযুক্ত ও তাঁহার সেবানিরত; ইহা হইতে রামচন্দ্রের মাতৃভক্তির অধিক প্রশংসা আর কি হইতে পারে? অপিচ এইটী সর্ব্বজনবিদিত সত্য বলিয়াই দশরথ প্রতীপদর্শিনী কৈকেয়ীকে অনুনয় করিতে যাইয়া ইহার আশ্রয় লইতে সাহসী হইয়াছিলেন।

কৌশল্যা যখন বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প রামচন্দ্রের নির্ব্বিঘ্ন-বনবাস কামনায় আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তখন তিনিও মাতৃভক্তির পুণ্যকে বনে পুত্রের রক্ষক হইবার জন্য দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিতেছেন,--

"পিতৃ শুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেনচ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ॥"

হে মহাবাহো! পিতৃসেবা, মাতৃসেবা ও সত্যের দ্বারা চিরকাল রক্ষিত হইয়া বাঁচিয়া থাক। সহজ সাধনায় মাতৃভক্তির এরূপ বল হয় না।

রামচরিত্রেই মাতৃভক্তির পূর্ণচিত্র। এইরূপ চিত্র জগতের আর কোন সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ। স্বয়ং ঈশ্বর অভিনেতা না হইলে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন দৃশ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এক্ষণে আমরা মহাভারতের চিত্র প্রদর্শন করিব। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ বলিয়া কথিত। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানের পরীক্ষাজন্য দ্বৈতবনে স্বয়ং ধর্ম্ম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। বনে সকলে তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইলে, যুধিষ্ঠির অনুজ নকুলকে জল আনয়ন করিতে নিকটবর্ত্তী সরোবরে প্রেরণ করিয়াছেন। নকুল জল লইয়া ফিরিতেছেন না, সুতরাং সহদেব তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, এইরূপে অর্জ্জুন, ভীম ও ক্রমে ক্রমে অনুজগণের অনুসন্ধান ও জলান্বেষণে গিয়াছেন, কিন্তু একজনও ফিরিয়া আসিতেছেন না, সরোবরে যক্ষের নিষেধ সত্ত্বেও জলপান করিয়া সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একান্ত চিন্তাকুলমনে সরোবরে উপস্থিত হইলেন, অনুজদিগের তদবস্থা দর্শনে তাঁহার অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া গেল। ভবিষ্যতের যে সুখস্বপ্ন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এক মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া গেল। ছায়ার ন্যায় অনুগত ভ্রাতৃগণ-বিরহে আপনাকে নিতান্তই নিঃসহায় দেখিতে লাগিলেন। লোকবিজয়ী, অমিতবিক্রম ভীমার্জ্জুনের মৃত্যুতে আপনার চিরপোষিত সাম্রাজ্য-আশা সমূলে ছিন্ন হইয়া গেল। এইরূপ একান্ত কাতর ও দীনভাবাপন্ন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মরূপী যক্ষ প্রথম অতিকট প্রশ্নদ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিল কিন্তু ধর্ম্মরাজ গভীর শোক ও উৎকট চিন্তার মধ্যেও স্থিরভাবে যক্ষের সকল প্রশ্নেরই যথাযথ সদুত্তর দিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আরও কঠোর দ্বিতীয় পরীক্ষায় তাঁহাকে নিক্ষেপ করা হইল। অবশেষে যক্ষরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার যে কোন ভ্রাতাকে তদীয় ইচ্ছানুসারে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের পক্ষে ইহা আরও বিষম পরীক্ষা হইল। কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে বাঁচাইবেন ভাবিয়া তিনি বিষম গোলে পড়িলেন। যাহা

হউক, তাঁহার লোকোত্তর ধর্ম্মবুদ্ধিবলে তিনি শীঘ্রই কর্ত্তব্যাবধারণে সমর্থ হইলেন। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে বিস্মিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বিচলিত করিবার উদ্দেশ্যে যক্ষ ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন নকুলের জীবন অপেক্ষা বহুগুণ অধিক মূল্যবান অতএব ইঁহাদের কাহারও জীবনই সমধিক প্রার্থনীয় এবংবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজের বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি এই কূটতর্কের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অচিরেই প্রখর সূর্য্যরশ্মির ন্যায় দেদীপ্যমান হইল। তিনি যেরূপভাবে যক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিলেন, তাহাতে একদিকে যেমন সুনির্ম্মল ধর্ম্মবুদ্ধির উচ্চতমসীমা প্রদর্শন করিলেন, তেমনই অন্যদিকে সুতীক্ষ্ণ ন্যায়বুদ্ধিরও উচ্চতমসীমা প্রদর্শন করিলেন।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন—ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে, ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; অতএব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না এবং ধর্ম্মও যেন আমাকে কখন পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ! আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম, আমি আনৃশংস্য অবলম্বন করিতে সতত অভিলাষ করি। সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন; অতএব আমি কোনক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। কুন্তী ও মাদ্রী ইঁহারা আমার জননী। উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন এই আমার অভিলাষ। আমার পক্ষে উভয়েই সমান। অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।

কি স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগ! কি অলৌকিক মাতৃভক্তি! বলিতে হইবে না যে ইহাঁর সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতারই জীবনদান পাইলেন। ইহার অদৃষ্টফল তাঁহার স্বর্গারোহণের সোপান গঠিত করিল। কারণ ধর্ম্ম স্বয়ং এই দিব্যপুণ্যপ্রভাবকেই যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব্ব অলৌকিক সশরীরে স্বর্গাধিকারের প্রধান বিজয় রহস্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছেন। যথা—

"পূর্ব্বে আমি দ্বৈতবনে একবার তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঐ সময় তোমার ভ্রাতৃগণ জলান্বেষণার্থ গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তুমি ভীম ও অর্জ্জুনের জীবন প্রার্থনা না করিয়া মাদ্রীকে স্মরণ পূর্ব্বক নকুলের জীবন প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং এক্ষণেও কুক্কুরকে আশ্রিত বিবেচনা করিয়া দেবরথ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। আমি তোমার এই দুই কার্য্য দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ স্বর্গলোকে আর কেহই নাই, তুমি এই দেহেই স্বর্গারোহণ পূর্ব্বক অক্ষয়লোক লাভ করিতে পারিবে।" মহাভারত মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বাধ্যায় ৩য় অধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

যুধিষ্ঠিরের ন্যায় অচলা মাতৃভক্তি আমাদের জীবনের নিত্যব্রত হউক এবং তদ্ভাবভাবিত মাতৃ-নাম আমাদের নিত্য জপমন্ত্র হউক। ইহাতেই আমাদের জীবনের সফলতা, ইহাতেই আমাদের মুক্তির সাধনা।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দৈব ও পুরুষকার।

দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে দৈব শব্দে আমরা বুঝিয়া থাকি নিয়তি, ভাগ্যলিপি, অদৃষ্ট ইত্যাদি। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"করতল রেখাগ্রহ গত্যাদি সংসূচিত প্রাচীন কর্ম্ম-বিপাক-জনিত ফলং দৈবং", "পূর্ব্বজন্ম কৃতং কর্ম্ম তদ্দৈব মিতি কথ্যতে।" ইত্যাদি। দৈব শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ করিলে বুঝা যায়—যাহা দেবতার অধীন তাহাই দৈব। পুরুষকার শব্দে বুঝা যায়—যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় ইত্যাদি।

পরম কারুনিক কার্য্যকুশল বিশ্বপিতা এই বিশ্বরাজ্যের একমাত্র কর্ত্তা। তাঁহার সৃষ্ট এই বিশ্বরাজ্যে কত কারুকার্য্য-খচিত মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী বিরাজ করিতেছে। কোথাও রম্য কানন—কানন মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর বৃক্ষ, তাহাতে ফুল ফল—আবার তাহার আশ্রয়ে লতা। কাননাভ্যন্তরে বিবিধ শ্রেণীর পশু, কেহ শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, কেহ শৃঙ্গহীন। আবার তাহারই পার্শ্বে বা অতিদূরে গগনস্পর্শী উন্নতবক্ষ গিরি, তাহারই পার্শ্বে কলকল স্বরে ধীর-মন্থর-গতিতে প্রবহমান নদনদী—আবার কোথাও বা বিবিধ প্রকার পত্রপুষ্প সমাচ্ছাদিত মধুর পেয় সরোবর। কোথাও শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান বিচিত্র পক্ষী। আবার গগনে যথাস্থানন্যস্ত তারকাশ্রেণী—তারকাশ্রেণী পরিশোভিত স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ-কারী নিশাপতি চন্দ্র—তাঁহার আবার শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ ভেদে হ্রাস ও বৃদ্ধি—আবার হ্রাসের সঙ্গে আঁধারের মিশ্রণ ও বৃদ্ধির সঙ্গে আলোর সমাবেশ। চন্দ্রের পরেই সহস্র রশ্মি বিস্তার করিয়া তীক্ষ্ণমরীচিমালিনী সূর্য্যদেব গগনমার্গে স্বীয় আসন পাতিয়া বসেন।

এই চন্দ্র সূর্য্যও পৃথিবীর গতিতে গ্রীষ্মাদি ষড়ঋতু কালের আবর্ত্তনে ঘূর্ণিত হইয়া আসিতেছে ও যাইতেছে। কিন্তু ইহারা কেহই স্থির নহে কেন? যিনি, এই বিশ্ব-রাজ্যের ঈশ্বর তিনিও অচল—তাঁহার ত চাঞ্চল্য নাই—তবে সেই নিশ্চলের এই সর্ব্বশোভা-বিমণ্ডিত বিশ্ব-রাজ্যে কিছুই স্থির নহে কেন? ব্যোমপথে অমৃতসিক্ত চন্দ্রদেব প্রফুল্লমুখে উদিত হইয়া স্নিগ্ধ কিরণ-জালে জগতকে বিধৌত করিয়া প্রাণি-হৃদয়ে অমৃতধারা প্রবাহিত করিতে না করিতেই আঁখির পলকে জগতকে গাঢ় তিমিরে আবৃত করিয়া কোথায় অন্ধ তিমিরে প্রবেশ করেন, সূর্য্যদেব শশাঙ্কের দুর্গতি দেখিয়া সহস্র কিরণ জালে অন্ধকার দূর করিয়া আপন গৌরব চিরপ্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে গগনে আরূঢ় হন কিন্তু তিনিও দেখিতে দেখিতে পতনোন্মুখ হইতেছেন দেখিয়া লজ্জায় যেন 'মরমে মরিয়া' কোথায় এক অজানা দেশে চলিয়া যান।

আবার মানব কেহ রাজা কেহ প্রজা—কেহ দুঃখী কেহ সুখী—কেহ স্বর্ণথালায় আহার করে, কাহারও পত্র পাত্রও সংগৃহিত হয় না—কেহ আর দশজনকে বিলাইয়া দেয়—কাহারও ভিক্ষান্নে উদর পুরে না—কেহ চির-রোগী—কেহ অরোগী—কেহ দীর্ঘজীবী—কেহ অল্পায়ু—আবার রাজা ভিখারী—ভিখারী রাজা হইতেছে। যেখানে একদিন রম্যকানন ছিল, সেখানে দুদিন পর ভীষণ মরুভূমি অথবা ভীষণা কলকলনাদিনী খরস্রোতা প্রবাহিতা দেখিতে

পাই—এই বিশ্ব-রাজ্যের এত অস্থিরতা কেন? এই বৈষম্য কে ঘটায়? ইহার মীমাংসা করিতে যাইয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—দৈব ইহার মূলীভূত কারণ।

দৈব কাহাকেও সুখী কাহাকেও দুঃখী করিয়া থাকে এবং এই দৈবকেই ত্রিকালদর্শী মুনিগণ কর্ম্মফল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইহারই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া জীব জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ করিতেছে; চন্দ্র-সূর্য্য উদয়াস্ত-গ্রস্ত ও রাহুগ্রস্ত হইতেছেন; ইহ ত সামান্য কথা। যাঁহারা আমাদের সর্ব্বদা উপাস্য, যাঁহাদের ইচ্ছায় এই বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি হইতেছে, তাঁহারাও ইহার কবলে কবলিত; তাঁহারাও ইহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে চালিত হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পুরাণে বর্ণিত আছে। সিদ্ধিদাতা আশুতোষ পুত্র গণপতি হস্তিগ্রীব। সর্ব্বদহনক্ষম অগ্নিদেবের মন্দাগ্নি। তারকাসুর কর্তৃক ইন্দ্রাদি দেবগণের স্বর্গরাজ্যভ্রষ্ট হওয়া। শুধু তাহাও নয়, তারক-ভয়-ত্রাসিত দেবগণের মর্ত্ত্যলোকে নরদেহধারণ, সেখানেও স্বস্তি না পাইয়া পশুযোনি গ্রহণ, মুক্তিদাতা হরির শয্যাস্থান মহাবিষধর অনন্তনাগের উপর। এই সকল নিয়তির কার্য্য বই আর কি হইতে পারে?

দৈব কর্ম্মফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কর্ম্মফল কি তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি না? সম্ভবতঃ নাই, কারণ কর্ম্মফল ক্রিয়া দ্বারা অনুমেয়। সে তিমিরে গা ঢাকা দিয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে চিনিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। দৈবের অপর নাম অদৃষ্ট। অদৃষ্ট বা দৈব নির্ধনকে রাজা—রাজাকে নির্ধন—সুখীকে দুঃখী—দুঃখীকে সুখী করিতে পারে—এই জন্যই দৈব বা অদৃষ্ট শুভ ও অশুভ ভেদে শুভাদৃষ্ট ও দুরদৃষ্ট বলিয়া কথিত আছে।

কর্ম্মকুশল ভগবানের ন্যায়-রাজ্যে জীব কি অদৃষ্টের সেবা করিবে? 'যাহার অদৃষ্টে যা আছে, তাহাই হইবে' এই ভাবিয়া কি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া জীব নিশ্চেষ্ট থাকিবে? তাহা হইলে সে জীবের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। দৈব সম্মুখে আহারীয় দিয়াছে, সম্মুখস্থিত আহারীয়ে ত আর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না। দৈবের উপর নির্ভর করিলে জঠর-জ্বালায় দুই দিনেই যে এই পৃথিবী জীবশূন্য হইবে। দৈবকে অনুকূলে আনিবার উপায় কি তবে নাই? নিরপেক্ষ ভগবান তাঁহার নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার জন্য অথবা দৈবকে অনুকূলে আনিবার জন্য প্রত্যেক প্রাণীকে পুরুষকার বা চেষ্টাগুণে ভূষিত করিয়াছেন। সেই পুরুষকার এই জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া মহৎ হইতে মহত্তর যে কোন কার্য্যই হউক না কেন সিদ্ধ করিয়া প্রাণি-মাত্রের হৃদয়ে অতুল আনন্দ দান করিয়া থাকে এবং এইজন্যই কর্ত্তারা বলিয়া থাকেন 'উদ্যোগী ব্যক্তিদিগের হৃদয় বিজয়লক্ষ্মীর লীলা-নিকেতন।'

পুরুষকার ঈশ্বরদত্ত সর্ব্ববিশেষ। জীব জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উৎপত্তি হয়। জীবের অধীনতায় ইহার বিকাশ হয় বলিয়া ইহা পুরুষকার নামে অভিহিত। জীব ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার চৈতন্যশক্তি জড় থাকে এই হেতু প্রথমতঃ জীবের ভিতর পুরুষকারের অস্তিত্ব

প্রতিভাত হয় না। যখন সন্তান প্রথম হাঁটিবার উদ্যোগ করে, তখন একবার দুইবার বা ততোধিক বার আছাড় খাইয়া পড়ে কিন্তু সন্তান তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অধ্যবসায়-বশে ক্রমশঃ হাঁটিতে সক্ষম হয়। এখন হইতে বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ পূর্ণ বিকশিত হইয়া পুরুষকার মানবকে অসাধ্য সাধন করিবার ক্ষমতা দেয়। মানব পুরুষকারের সহায়তায় জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারে। "যেখানে চেষ্টা সেখানে সফলতা" ইহা মহাজন বাক্য। এই মহাজন-বাক্যের অনুসরণ করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে আপনার করিয়া হৃত স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

কবিকুল চূড়ামণি স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বৃত্র-সংহারে লিখিয়াছেন—

"নিয়তি স্বতঃ কি কভু অনুকূল কারে
দেব-দানব কিংবা মানব-কিন্নরে ?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল
নিয়তি কিঙ্কর তার শুন দেবগণ।

পিপীলিকাগণ শীত ঋতুতে গর্ত্তের বাহির হইতে পারে না ; শীতে তাহাদের 'অল্পপ্রাণ' জীবনকে নষ্ট করিয়া ফেলে। তাহারা অপরিসীম পুরুষকার বলে গ্রীষ্মাদি ঋতুতে শীতের আহারীয় সংগ্রহ করিয়া আপনাপন বিবর পূর্ণ করিয়া রাখে এবং তাহাতে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

এইরূপ পরস্পর বিশ্লেষণ করিলে দৈব ও পুরুষকারের প্রত্যেকেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

অদৃষ্টবাদী ও পুরুষকারবাদীরা বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলে অদৃষ্টবাদীরা বলিয়া থাকেন— 'ইহার মূলে আমার কথিত দৈব অনুকূল আছে নতুবা পুরুষকারের এমন কি শক্তি আছে যে এ কার্য্য সাধন করে।' আবার পুরুষকারবাদীরা বলিয়া থাকেন—'যদি দৈব ফল দান করিতে সমর্থ হয় তবে সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করিল কেন ? এইরূপ বিতর্ক বহুদিন যাবত চলিয়া আসিতেছে—সুমীমাংসা হওয়া বড়ই কঠিন। পুরুষকারবাদীদের মত—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্ম শক্ত্যা—
যত্নেকৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ।

আমরা অদৃষ্ট ও পুরুষকার-বাদী। আমাদের মতে অদৃষ্ট ও পুরুষকার উভয়ই তুল্য ফলপ্রদ, অতএব উভয়েরই প্রয়োজন। যেমন শুধু রৌদ্রে শস্যাদি বিনষ্ট হয়, তেমন শুধু বৃষ্টিতেও শস্যাদি বিনষ্ট হয়। অতএব শস্যের জীবনরক্ষার জন্য যেমন রৌদ্র ও বৃষ্টি উভয়েরই প্রয়োজন—যেরূপ পক্ষীকে ব্যোমপথে বিচরণ করিতে উভয় পক্ষই সাহায্য করে, সেইরূপ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই প্রাণীমাত্রের ফললাভের সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাদের তুল্যতা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য-দেশস্থিত সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ পুত্র বীরবর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট দরিদ্রের সন্তান হইয়াও পুরুষকারের সাহায্যে বিজয়লক্ষ্মীকে আপনার অঙ্কগত করিয়া, বিজয়পতাকা দিক্‌দিগন্তে উড়াইয়া ছিলেন। আবার দৈব প্রতিকূল হওয়াতে সেই নেপোলিয়ান ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া, ইংরেজের কারাগারে বন্দী অবস্থায়

কয়েকদিন অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া মৃত্যুর করাল গ্রাসে কবলিত হইয়াছিলেন।

মহারাণা প্রতাপ পুরুষকারকে সম্মুখে রাখিয়া ভ্রষ্ট রাজ্য লাভ করিবার জন্য উত্তাল তরঙ্গায়িত কলকলায়মান সমুদ্র-বক্ষে ঝম্পপ্রদানের ন্যায় মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া 'দীন' 'দীন' শব্দে ধাবমান দিল্লীশ্বর আকবরের বিপুল বাহিনী মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন এবং পুরুষকারের পুরস্কার স্বরূপ মহারাণা কতক রাজ্য লাভও করিয়াছিলেন; কিন্তু দৈব প্রতিকূল হওয়ায় চিতোর রাজ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

দৈব ও পুরুষকার উভয়েই একত্রিত হইয়া শুভফল প্রদান করিয়া থাকে এইজন্যই বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন—

যথাহ্যেকেন চক্রেন রথস্য ন গতির্ভবেৎ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধ্যতি॥

শ্রীকামিনী কুমার ভট্টাচার্য্য।

মসনদ আলি দেওয়ান
আলীমদাদ খাঁ বাহাদুর।

সে বহুদিনের কথা; তখন দিল্লীতে আকবর সাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। এবং মানসিংহ প্রধান সেনাপতির পদে বৃত। সেই সময়েই পূর্ব্ববঙ্গের দুর্দ্ধর্ষ ক্ষমতাশালী প্রবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী ঈশাখাঁর রাজধানী ময়মনসিংহ জেলার জঙ্গলবাড়ীতে অবস্থিত ছিল। যে ঈশাখাঁর প্রতাপে এক সময়ে পূর্ব্ববাঙ্গালা টলটলায়মান ছিল, যে ঈশাখাঁ কোনও কারণ বশতঃ এক সময়ে সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ সিংহকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যে ঈশাখাঁ ময়মনসিংহ জেলায়—এগার সিন্ধুর দুর্গ সন্নিকটে মানসিংহকে ভীষণ সংগ্রামে পদদলিত করিয়াছিলেন, যে ঈশাখাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া দিল্লীর সম্রাট "মসনদ আলী" উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন—সেই ঈশাখাঁর সুযোগ্য-বংশধর মসনদ আলী দেওয়ান আলীমদাদখাঁ বাহাদুর। "আলোচনার" সখা ও সাথীগণের নিকট তাঁহার পবিত্র চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিবার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

দেওয়ান আলীমদাদ খাঁন বাহাদুর বর্ত্তমান সময় হযবৎ নগরস্থিত সুরম্য নয়নানন্দকর অট্টালিকায় বসবাস করিতেছেন। তিনি রীতিমত বিদ্যাবত্ব অর্জ্জন করতঃ পুত্রবাৎসল্য স্নেহে প্রজাপুঞ্জ পালন করিতেছেন। দেওয়ান আলীমদাদ বহু সদ্‌গুণ রাশিতে বিভূষিত। দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে,—বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, নিরন্নকে অন্নদানে এবং দুর্ব্বল ও অসহায় লোকের সহায়রূপে আলীমদাদ খাঁন বাহাদুর অনেক সময় লোকলোচন-পথে পতিত হন। তিনি অনন্যসাধারণ গুণে গুণবান বলিয়াই আজ তিনি ভাগ্যবান—কীর্ত্তিমান ও যশস্বী। দেওয়ান আলীমদাদ বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক। তিনি যেরূপ সাহিত্যানুরাগী, স্বদেশহিতৈষী ও সহৃদয়,—আবার তদনুরূপ প্রজারঞ্জক, দানশীল ও ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল কামনায় স্বধর্ম্ম প্রতিপালক। তাঁহার পবিত্র হৃদয় সদাই মঙ্গলময় কার্য্যে

নিযুক্ত। তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েরই সমান কৃপার পাত্র সত্য, কিন্তু বিলাসস্পৃহায় একেবারে নিস্পৃহ। অতুল ধনৈশ্বর্য্যের পূর্ণাধিকারী হইয়াও তিনি ভোগবিলাসে অনাশক্ত। তাঁহার স্বীয় বৃত্তির মাসিক টাকাগুলি দান ক্রিয়াতেই নিঃশেষিত হয়। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।" বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম একোনচত্বারিংশৎ বর্ষের কম নহে; কিন্তু বাল্যভোগে তাঁহার দেহ সংবর্দ্ধিত হইলেও তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। জ্ঞানপিপাসুদিগের মধ্যেও তিনি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। আজিও তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা এতই অধিক যে, প্রতি ঘণ্টায় কোন পুস্তকের গদ্য পদ্য প্রায় ২।৩ পৃষ্ঠা কণ্ঠস্থ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রমবোধ করেন না। কি আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি!

তিনি কিশোরগঞ্জ টাউন হলে "আলীমদাদ পাবলিক লাইব্রেরী" নামে একটী বৃহৎ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের এক মহৎ উপকার সংসাধন করিয়াছেন। বিগত ভাদ্র মাসে আমি কিশোরগঞ্জ গিয়াছিলাম। তখন একদিন তাঁহার নিজ লাইব্রেরী দর্শনকামী হইয়া তদালয়ে গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম—লাইব্রেরীতে অসংখ্য পুস্তক স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। বিচিত্র কাচ সংযোজিত আলমারীগুলি লাইব্রেরী গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এত বড় লাইব্রেরী এদিকে আরও দুই একটী আছে কি না বলিতে পারি না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ ও আলোচনায় বাস্তবিকই আমি বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও আসক্তির পরিচয় পাইয়াছি। বাস্তবিকই তিনি মোস্লেম জগতের জ্ঞান-গৌরব রবি। মুসলমান ভূমাধিকারীগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র, মিতব্যয়ী ও অমায়িক লোক আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার অমৃতস্রাবী বাক্যগুলি বাস্তবিকই হৃদয় সরস করিয়া তুলে। এখনও যেন তাঁহার অমৃতায়মান কথাগুলি আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমার সঙ্গে মাত্র ঘণ্টাখানেকের আলাপ—তাহাতেই বুঝিয়াছি যে, তিনি অসাধারণ জ্ঞানশালী। তাঁহার সঙ্গে আমার যে সময়টুকু আলাপ হইয়াছিল—তাঁহার একটী কথাতেও আত্মাভিমানসূচক কোনও বাক্য আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই। জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী লোক বাস্তবিকই বিনম্র। তাঁহার হৃদয় করুণাস্রোতে পরিপ্লাবিত, তাঁহার সাহায্য লাভে অনেক দরিদ্র গ্রন্থকার কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। অনেক পত্রিকার উন্নতিকল্পে বহু টাকা প্রদান করিয়া বাস্তবিকই তিনি মহদন্তঃকরণ ও উচ্চনীতি তৎপরায়ণতার পরিচয় দিতেছেন। বর্ত্তমান সময়েও তিনি মাসিক—সাপ্তাহিক প্রায় ৮।১০ খানা পত্রিকা লইয়া থাকেন। রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিতেই দিবা অবসান হয়, রজনীর অর্দ্ধাংশও তাঁহার পত্রিকা পাঠে অতিবাহিত হয়। এইরূপ জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তি খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। আমি জানিতাম তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও নানাবিধ মাসিক পত্রের লেখক। আমি তাঁহার দুই একটী লেখা দেখিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে তিনি নিজকে গোপন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আমি

সাহিত্য মহার্ণবের ভাসমান একটী তৃণও করায়ত্ব করিতে পারি নাই। আমি সাহিত্যের কি জানি। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র; এই সব বিষয়ে মোটেই আমার পারদর্শিতা নাই; অনর্থক লজ্জা দিলেন মাত্র।" কিন্তু আমি কোনও মতেই ছাড়িতেছি না দেখিয়া—আমি পাছে অসন্তুষ্ট হই, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া, আমার ঐকান্তিক আগ্রহেই তাঁহার নিজের লেখা রাশিকৃত কবিতা ও গান পরে দেখাইয়া ছিলেন। আমার সময় অল্প ছিল; আমি তাঁহার সব কবিতার রসাস্বাদন করিতে পারি নাই। অল্প সময়ের মধ্যে যে কয়েকটা কবিতা ও গানের ভাব আমার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিল, আজ তাহাই "আলোচনার" পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

সুরট—মল্লার রাগিনী।

আমার—সাধের স্বপন, ভাঙ্‌ল এখন,
যাইবে রঙ্গ মূলে—
প্রভো! ভবপারাবারে—
আমার—তুমি বিনে গতি, না আছে শকতি,
তব পদে মতি রেখো
প্রভো! ভুলায়ো না মোরে।
আমি—পড়িয়া বিঘোরে, ডাকিনু তোমারে,
তরাও মোরে—
শিক্ষা-দীক্ষা-ভিক্ষা মাগি তব পায়।
আমি—অধম সন্তানে, রাখিও চরণে,
যেন যাচি মনে
অন্য কিছু না চাই তোমা বিনে।

রাগিণী ভৈরবী।

নির্ম্মল সলিলে নদীর কুলে,
ভাসছে কণক-কান্তি,
বসন্ত-বিরহ প্রশান্ত প্রবাহ
যাইছে আকুলে।
নাচছে খঞ্জন, চাতক শিঞ্জন—
ভ্রমর গুঞ্জন কোকিল-কুহে,
বিরহিনীর বিরহে বিষম দহে—
এ যন্ত্রণামোহে কখন না সহে॥
পলকে পুলকে ত্রিলোকে ভূলোকে
গোলকে মরম ভ্রান্তি—
মুই হেন দুঃখী সদা দুঃখদায়ী
ভ্রমর-সমর খঞ্জন-গঞ্জন
এই কি মম শান্তি?

তাঁহার প্রত্যেক কবিতাগুলিরই একটু বেশ ঝঙ্কার আছে। তাঁহার "উদ্দেশে" "আত্ম-বিসর্জ্জনে" "প্রার্থনা" "বন্ধুবিচ্ছেদে" "নাথ" কবিতাগুলি বাস্তবিকই মন-মাতানো, কি যেন এক অপূর্ব্ব সুষমায়ে তৈরি করা। বারংবারই পড়িতে ইচ্ছা হয়।

উদ্দেশে।

যাঁরি আশে চিরদিন,　　জীবন করিনু লীন,
তাঁরে যদি হারালেম;
কি কাজ পরাণে আর,　　বিরহ যন্ত্রণা-ভার,
সহি আমি অনুদিন
তাঁরি তরে জীবলীলা,　　সাঙ্গ হবে শেষ খেলা,
হউক সব অন্ধকার।
তবেত হইবে সুখ,　　দেখিব সে প্রিয়মুখ,
ভাসিবে জীবন-ভেলা॥

কাণ্ডারী হইবে তুমি, কত সুখ পাব আমি,
ফুরাবে সকল দুঃখ।
সেই আশা লক্ষ্য তীরে, জীবন-সিন্ধুর নীরে,
দেখিব সে প্রিয়মুখ॥

আত্ম-বিসর্জ্জনে।

আপনি যাচিয়া যেই করে বিসর্জ্জন,
তাহাতেই লভে সুখ নিশ্চয় কথন।
পতঙ্গ পড়িছে যথা অনল-শিখায়,
কত সুখে সুখী হ'য়ে জীবন বিকায়।
সারূপ্য সাজুজ্য মিলে সারল্য তাহার,
মিলে সুখ মিটে আশা আশা-প্রেমিকার॥

প্রার্থনা।

মানস-মন্দিরে (আজি) ধরিও মূরতি,
উদ্দেশে পূজিব (আহা!) কতদিন আর।
কতদিনে আশা (মম) হবে ফলবতী,
মানস-তিমির (কবে) ঘুচিবে আমার।

বন্ধু-বিচ্ছেদে।

(১)

সুখের অন্তরে যদি রহিত না দুঃখ,
সদা সুখে সুখী যদি হইত হৃদয়।
রহিত না যদি হৃদে উষ্ণ বহ্নি শোক,
কেন তবে বলি হেন সংসার নির্দ্দয়?

(২)

মিলনের পরে এক বিরহের অসি,
গড়িলেন বিধি তারে তীক্ষ্ণ খরশান।
কালের কুচক্রে চক্র হৃদয়েতে পশি,
অকালে ঘটায় তাহে বিচ্ছেদের বাণ্॥

(৩)

সেই বাণে বিদ্ধ হয়ে হৃদয়-কোমল—
অশেষ যাতনা দেয় হৃদে দু'জনার।
কেন হেন সুখে দুঃখ! অমৃতে গরল!
হৃদয়েতে বহে উষ্ণ শোণিত জোয়ার?

(৪)

নাহি কি মোদের ভাগ্যে শান্তির সুবাস?
কতকাল সহি আর যন্ত্রণা অপার।
ঘটাও মিলন বিভো! নাশিয়ে হুতাশ—
আলীম মাগিছে ভিক্ষা চরণে তোমার॥

নাথ!

নাথ, কি আর, কহিব তোমায়,
জপি নিশিদিন তনু হ'ল ক্ষীণ
বিকাস্তু এ জীবন পায়।
দয়ার আশে—মম জীবন-পাথারে
নিলাম পাড়ি আমি,ফেল নাকো মোরে,
ভবসাগরের পারে তরাও আমায়।
নাথ, দয়া ত হ'লনা দেখা ত দিলেনা,
কত সব যাতনা বুঝি প্রাণ যায়।
নাহি জানি আমি সাধনা ভজনা,
তবু আশা মনে দেখিতে বাসনা,
জীবন গেলে-তাহে নাহিক ভাবনা
অন্তিমে অধমে নেও চরণে-মিশায়ে॥

তিনি আর্য্য-গৌরব প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। তিনি কেবল বঙ্গ-সাহিত্যেরই অকৃত্রিম সেবক, তাহা নহে। পার্শী-ভাষাতেও সুপণ্ডিত। ইংরাজী ভাষাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। আমি যখন বহুদিন পূর্ব্বে একবার পার্শী-ভাষার আলোচনা করিয়াছিলাম—তখন পার্শী-সাহিত্যের একস্থানে দেখিয়াছিলাম—

(১)

"রুহে জান্‌ছে থাক্ লায়েক্বে,
আপ্‌নে কাবা জুদা বানায়েক্বে।

(২)

আর—

"ছিয়া চুড়িতাবদন্তে আনেগারে নায়্নি দিদাম।
ব-শাখে-ছান্দালি পে-চাদামারে আম্বারি-
দিদাম ॥"

কিন্তু আমি তখন এই দুইটীর ভাবার্থ সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তিনি এই দুইটীর বঙ্গ-ভাষায় যে পদ্য লিখিয়াছেন, তাহা সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

প্রথমটীর অর্থ—

"শ্রীকণ্ঠে মুক্তার হার মাধুরী সর্ব্বাঙ্গ
দারু-চন্দনে যেন বেষ্টিত ভুজঙ্গ।"

দ্বিতীয়টীর অর্থ--

গাহিব গহনে, মনের বিপিনে,
মাতিব একলা মনে।
ভাসিয়ে চলিব, মাতিয়ে গাহিব,
আমাকে পাইব (আমি) গোপনে ॥"

এই মহাত্মার মধুর ব্যবহার, উন্নত-হৃদয় ও সচ্চরিত্রতা আমাদের দেশের সকলেরই অনু৹করণীয়। শ্রীপূর্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য।

ভারতীয় আর্য্যগণের গোচর্য্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'সাহিত্য-প্রকাশ প্রথমভাগ' পুস্তকে সংগৃহীত বহু ভাষপত্র আছে। তাহা আজকালকার নগণ্য অপভাষ পত্রাপেক্ষা যে বহু মূল্যবান, তাহা নিরপেক্ষ বিদ্বৎ সমাজ কদাচ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বাওয়ালির মণ্ডল বংশাবতংশ বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল প্রমুখ ব্যক্তিগণ আজকাল পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ এবং হিতবাদীতে প্রকাশিত ভাষপত্রের অনুরূপ অপভাষপত্র সংগৃহীত করিয়া সমগ্র বিশাল সাহিত্য-সমাজকে ভুলাইতে ব্রতী হইয়াছেন। ইহা কদাচ সামাজিক ও সমাজতত্ত্বজ্ঞ লোকের কাজ নহে।

এখন ত্রৈলোক্য বাবুর প্রচারিত "প্রশ্নোত্তর মালা" সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। আমার ভুল প্রদর্শিত হইলে বিশেষ সুখী হইব, নচেৎ যাঁহারা সমাজকে অপপথগামী করেন, তাঁহারা স্বীয় ভুল সংশোধন করুন। প্রশ্নোত্তরমালার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অপর ২।১ কথার অবতারণা করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ—বৃহৎ ব্যাসসংহিতায় কৈবর্ত্তঘটিত যে শ্লোকের বিষয় ত্রৈলোক্য বাবু তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার জানা কর্ত্তব্য যে, ঐ সংহিতায় ঐ শ্লোকগুলি স্বকপোলকল্পিত এবং প্রখ্যাত। তাহা হাবাশপুরের সেই খ্যাতনামা পণ্ডিত বাবু সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস এবং আমি আজ ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সংবাদপত্রে বিশেষ আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি। তাহার অদ্যাবধি কোন প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই। অধিকন্তু, বৃহৎ ব্যাসসংহিতা, যাহা আমরা মহীশূর, কাশী, গয়া, কলিকাতা, সংস্কৃতকলেজ, ইম্পিরিয়াল পুস্তকালয়, এসিয়াটিক সোসাইটী, বিলাতের সোসাইটী-অব-আর্টের পুস্তকাগার, লণ্ডন-নগরের বৃটিশ-মিউজিয়াম হইতে দেখিয়াছি এবং নিদর্শন আনাইয়া অবগত হইয়াছি। তাহাতে ব্যাসন্থিজের পাণ্ডিত্য কোনখানেই দৃষ্ট হয় না। জলি, ওয়েভেনবর্গ, টনী, বেন্ফি, প্রভৃতি

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের দ্বারা এই বিষয় অনুসন্ধান করাইয়া আমরা 'সময়', 'হিতবাদী', 'বসুমতী', 'এডুকেশন গেজেট', ইত্যাদি পত্রিকাসমূহে এই সত্য সভ্যজগৎ-সমক্ষে প্রচারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। দ্বিতীয়তঃ—"ব্যাস" দ্বিজ এবং "ব্যাসোক্ত ব্রাহ্মণ" এক নহে। ত্রৈলোক্যবাবুর পুস্তকে "ব্যাসসোক্তের"ছড়াছড়িতে তিতিবিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ব্যাসদেব "ব্যাসোক্ত"-ব্রাহ্মণ কবে সৃষ্টি করিলেন, তাহা শাস্ত্রগ্রন্থের কোনখানেই পাইলাম না। ব্যাসদেব পুরাণই রচনা করিয়াছেন জানি। "ব্যাসোক্ত" ব্রাহ্মণ কবে রচনা করিলেন, তাহা কোথায়ও পাইলাম না। পরশুরাম কন্‌কনস্থ চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা পদ্মপুরাণ ও সহ্যাদ্রিখণ্ড পাঠে জানা যায়। ব্যাসের ব্রাহ্মণ উৎপাদন কোনখানেই পাই নাই। এই সব মীমাংসা ভ্রান্তি-বিজয় এবং মৎকৃত মাহিষ্যপ্রকাশ দ্বিতীয় ভাগে সবিশেষ আলোচিত আছে, তাহা ত্রৈলোক্যবাবু দেখিবেন কি? শিবপুরাণ, আদিপর্ব্ব-মহাভারত, স্কন্দপুরাণ-সহ্যাদ্রিখণ্ড, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, শুদ্ধিতত্ত্বধৃত, বচনগুলিধৃত শ্লোকে ব্যাসদ্বিজেরই কথা বলা হইয়াছে। ব্যাসোক্ত দ্বিজের কথা কোনখানেই বলা হয় নাই। এই সব বিষয়ের মীমাংসা জন্ত মৎকৃত মাহিষ্য প্রকাশ প্রথমভাগ পঠনীয় এবং ঐ পুস্তকে সংগৃহীত"ব্যবস্থা সংগ্রহাধ্যায়" বিশেষ যত্নসহকারে দ্রষ্টব্য। ঐ সকল ব্যবস্থা ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রথিতনামা ও প্রখ্যাত প্রাচীন ও নব্য পণ্ডিত ও দ্বিজগণের প্রদত্ত। তাঁহারা কি শ্রীক্ষেত্রনাথ, যাদবচন্দ্র, শ্যামাকান্ত, বামাচরণ, জয়কৃষ্ণদেব, গণেশচন্দ্র, যাদবেশ্বর প্রভৃতি অপেক্ষা কোনক্রমে হীন ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। স্বীয় পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় ত্রৈলোক্য বাবু "ব্যাসোক্ত" ব্রাহ্মণের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, "ব্যাসক্ত" এবং "ব্যাসোক্ত" এক নহে। ভ্রান্তিবিজয়কার তাঁহার পুস্তকে ইহার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। ত্রৈলোক্য বাবু রাগ করিবেন না। তিনি বৃহস্পতির বচনটা স্মরণ রাখিবেন। "যুক্তিহীনোবিচারেতু ধর্ম্মহানিপ্রজায়তে।"

ত্রৈলোক্যবাবু বঙ্গীয় কৃষি-কৈবর্ত্তগণকে তাঁহার পুস্তকে "অনুপবীত মাহিষ্য" আখ্যায় বার বার আপ্যায়িত করিয়াছেন কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই জাতির সম্বন্ধে মনু হইতে পরাশর পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বিশেষরূপে স্ব স্ব স্মৃতিগ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর এই জাতি সম্বন্ধে কোনরূপ স্বতন্ত্র করিয়া লিখিবার আবশ্যক না থাকায় অপর কোন নিবন্ধকার সে বিষয়ে পরে আর আলোচনা করেন নাই। মাহিষ্যগণ হিন্দু এবং হিন্দুর অনুমোদিত ধর্ম্মকর্ম্ম ব্যবসা অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জন্ত কি আর পৃথক্ করিয়া কোন কিছু লিখিবার কখন প্রয়োজন হইয়াছে? বল্লাল সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। তিনি সমগ্র বঙ্গে নিজ মত অক্ষুণ্ণভাবে প্রচারিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। দ্বেষ ও রাগে পড়িয়া তেজী মাহিষ্য জাতিকে সমাজে নিপীড়িত করিয়া গেলেন, এই পর্য্যন্ত। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য মাহিষ্য প্রকাশে দেখিতে পাইবেন। সুতরাং হরিশ বাবু কেন, কেহই মাহিষ্য-জাতির

সম্বন্ধে পৃথক্ অশৌচ-বিধি লিখিয়া যাইবার প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই। ত্রৈলোক্য-বাবুর বইর ৭ পৃষ্ঠার শেষ প্রশ্নটী অত্যন্ত আপত্তি জনক এবং জাতীয় মর্য্যাদা হ্রাসকারী। ত্রৈলোক্য বাবু নিজ জাতিকে সমাজে এত হীন-ভাবে প্রদর্শিত করিতে প্রয়াসী হইবেন না। যে আপনাকে সম্মান করিতে জানে না, সে পরের নিকট হইতে সম্মান আশা করিতে পারে কিরূপে? মাহিষ্যজাতি যে নাই, এ কথা ত্রৈলোক্য বাবু কোন্ শাস্ত্রে পাইলেন। ইহা তিনি যেন স্মরণ রাখেন যে, তাঁহার উদ্ধৃত বৃহৎ ব্যাসসংহিতায় যাবতীয় শ্লোকগুলি স্বকপোল-কল্পিত। তিনি বঙ্গের কোন বৃহৎ ব্যাস-সংহিতায় ঐ শ্লোকগুলি দেখাইতে পারেন কি? সিদ্ধান্ত সমুদ্রধৃত শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভূঁঞার গৃহে রক্ষিত বৃহৎ ব্যাসসংহিতার বিষয় ৺ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাঁহার কৃত সিদ্ধান্ত-সমুদ্র পুস্তকের ১২৫ পৃষ্ঠায় যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ত্রৈলোক্য বাবুর উদ্ধৃত ঐ সব প্রখ্যাত শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়। ঐ গুলিকে আমরা কদাচ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ত্রৈলোক্য বাবু "গৌড়াদ্য-বৈদিক" না বলিয়া "দ্রাবিড়-বৈদিক" বলিলে ভাল হইত।• (সাহিত্য-সংবাদ পত্রিকা, ১৩১৯ সালের, পৌষ সংখ্যার ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

স্বীয় পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় ত্রৈলোক্যবাবু বলেন যে, কৈবর্ত্তদ্বীপে বাস হেতু মাহিষ্যগণ কৈবর্ত্ত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেশ কথা। বলি, ত্রৈলোক্যবাবু এই "ভাদ্দুরে" গল্প কোন পুস্তকে, ইতিহাসে, স্মৃতিগ্রন্থে বা বেদে বা রিপোর্টে পাইলেন তাহা বলিয়া দিতে পারেন কি? অনেক আষাঢ়ে গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু এইরূপ ভাদ্দুরে গল্প ত্রৈলোক্যবাবুর বই ছাড়া অপর কোন খানে দেখি নাই। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তাহার পর পরাশরীয় স্মৃতিগ্রন্থের রচনা হয়। ত্রৈলোক্যবাবুর জানা উচিত ছিল যে, বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব এই সব স্মৃতিগ্রন্থ রচনার পরে হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দেশী এবং বিলাতী অনেক পুস্তক আছে। তাহা পাঠ করিয়া তবে ত্রৈলোক্যবাবুর "ব্রাহ্মণ-সৃষ্টি-বিবরণ" বিষয়ে "বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইয়া লেখা কর্ত্তব্য ছিল। ১৪ পৃষ্ঠার শেষ প্রশ্নটি বড়ই মজার। ত্রৈলোক্যবাবু বলেন, "যুগপরিবর্ত্তনে রূপান্তর হয় নাই। ত্রৈলোক্যবাবু খবর রাখেন কি যে পশ্চিম দেশের "মাহেশ্রী" জাতি যাহা হইতে "বঙ্গীয় মাহিষ্য জাতি" হইয়াছে, তাহাদের অশৌচ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ দিন অবলোকিত হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্যবাবু বলিয়া দিতে পারেন কি যে, এই দুই জাতির মধ্যে কেন অশৌচ পার্থক্য দৃষ্ট হয়? ত্রৈলোক্য বাবুর কথিত "কৈবর্ত্তদ্বীপ" কোথায় তাহা ভূগোলে খুঁজিয়া পাইলাম না। ত্রৈলোক্য বাবু তাহার অস্তিত্ব বলিয়া দিতে পারেন কি? তিনি উহার অস্তিত্ব কি গ্রন্থ, স্মৃতি বা বেদ হইতে প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব। ত্রৈলোক্যবাবু মনুর ১০ম অঃ ২০শ শ্লোক "তান্ সাবিত্রী...কণ্ঠকঃ।" উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, মাহিষ্যগণ ব্রাত্য দোষে দোষী। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য যে মাহিষ্যের ব্রাত্য দোষ কদাচ ঘটেনা। মাহিষ্য-প্রকাশ প্রথম ভাগের অন্তর্গত দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিত

"মাহিষ্য দিধিতি" পাঠ করিলে ত্রৈলোক্য বাবুর সব সন্দেহ দূরীভূত হইবে। মাহিষ্য-প্রকাশ আমার নিকট ১৲ মূল্যে পাওয়া যায়। ব্রাত্য সম্বন্ধে আমার আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। উত্তর প্রশ্নমালায় "১৬ পৃষ্ঠার প্রশ্ন এবং তাহার উত্তরটী বড়ই মজার। প্রঃ—মাসাশৌচ কেন, পক্ষাশৌচ গ্রহণে দোষ কি? উঃ—হাঁ দোষ আছে বৈকি; যাহাদিগের দশ কোটী পুরুষ পরম্পরায় শূদ্রাচারী হইয়া মাসাশৌচ—তাহা আর পারেন না।" মাহিষ্য জাতি সমাজমধ্যে প্রচ্ছন্নই হউক বা প্রকাশিতই থাকুক, তাহাদিগের আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা চিনিয়া লইবে (মনু ১০ অঃ ৪০ শ্লোক) কৃষি কৈবর্ত্ত এবং মাহিষ্য যে এক জাতি তাহা সিদ্ধান্ত সমুদ্র, ভ্রান্তি বিজয়, মাহিষ্য তত্ত্ব-বারিধি, মাহিষ্য প্রকাশ প্রভৃতি পুস্তক পাঠে জানা যাইবে। মাহিষ্যের পক্ষাশৌচ গ্রহণ সম্বন্ধে উপরোক্ত মাহিষ্য দিধিতি পাঠ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। ত্রৈলোক্য বাবু স্বীয় পুস্তকে বলিয়াছেন যে মাহিষ্যের পক্ষাশৌচ হইতে পারে না। ইহা অপরূপ আজগবি কথা। মাহিষ্য হইব অথচ পক্ষাশৌচ লইব না, ইহার সামঞ্জস্য তিনি কিরূপ করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে বাধিত হইব। ত্রৈলোক্য বাবু স্বীয় পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় বৃদ্ধ-হারীত সংহিতার শ্লোকের অতীব বিচিত্র এবং অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ যথাযথ অনুবাদ কোথাও দেখি নাই। শিব গড়িতে বাঁদর গড়া হইয়াছে। আর যে সমস্ত অসার কথা এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে, তাহা না ঐতিহাসিক, না শাস্ত্রীয়। পুস্তক সম্বন্ধে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই। মুদ্রাকর প্রমাদ পুস্তকটিকে অধিকতর জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য করিয়াছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য বাবুকে অনুরোধ করি, যেন তিনি সত্য কথা প্রকাশে রাগ না করেন, বরং মাহিষ্যতত্ত্ব বারিধি এবং অপরাপর মাহিষ্য পুস্তক বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতিগৃহ হইতে আনাইয়া যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া তবে পুস্তক প্রণয়নে রত হন। সভ্যজগত সমক্ষে ভাল যুক্তিপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত করা বড় দায়িযুক্ত ব্যাপার। এ সমুদ্রের পার সকলেই যাইতে পারে না।

"যন্ন বেদধ্বনিধ্বান্তং ন চ গোভিরলঙ্কৃতং,
যন্ন বালৈ পরিবৃতং শ্মশান মিব তদ্‌গৃহম্।"

এই সার্ব্বভৌম ঋষিবাক্য আজ আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। সে বেদমন্ত্র উচ্চারিত, হাম্বারব মুখরিত, হৃষ্টপুষ্ট বালকবৃন্দ লীলায়িত ভারতবর্ষ আর নাই। বাস্তবিকই আমরা শ্মশানভূমিতে বাস করিতেছি।

আর নাই সেই গোবিন্দদাসের সেই সুমধুর পদাবলীর সার্থকতা :—

গোখুর ধূলি, উছলি ভরু অম্বর,
ঘন হুঁ হাম্বারব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিষাণ, নিশান সমাকুল,
সঙ্গে সঙ্গে সব সহচর ধাব॥
গোঠে প্রবেশ, করায়ল গোগণ
সখাগণ নিজ নিজ মন্দির গেল,
বৎসক বান্ধি, ছান্দি ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেল।

হায় এমন ব্রজভূমি, এমন বৃন্দাবন আজ যে ভারতবর্ষে গোগণের বধ্যভূমি হইবে, তাহা কি

আমরা জানিতাম ? বেদ-পুরাণ গোগণের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন,শ্রুতি ইহার মর্য্যাদা জানিতেন, তাই সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মাতারুদ্রাণাং দুহিতাবসুনাং স্ব সাদিত্যা
নামামৃতস্য নাভিঃ।
প্রনু বোচং চিকি তুষে জনায় মাগামনা
গামদিতিং বধিষ্ট ॥

যে গোজাতি রুদ্রগণের জননী, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগ্নী,অমৃতরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দুগ্ধের খনি, তোমরা তাদৃশ অনপরাধা অবধ্যা গাভীকে বধ করিও না।

গোহত্যার পাতক আমাদিগের অল্প-বিস্তর সকলেরই হইয়াছে। যাহার গৃহে গরু নাই, গরু থাকিয়াও গরুর যত্ন নাই, সে গৃহস্বামী যে গোহত্যা করিয়াছে বা করিতেছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? গোপালক কমিয়াছে বলিয়াই গোখাদক বাড়িয়াছে। গোজাতির প্রতি অবহেলাই যে মহাপাপ, তাহা এখন আর আমরা বুঝি না।

যস্যৈকাপি গৃহে নাস্তি ধেনুবৎসানুসারিণী,
মঙ্গলানি কুতস্তস্য কুতস্তস্য তমঃ ক্ষয়ঃ ॥

যাহার গৃহে সবৎসা গাভী নাই, তাহার মঙ্গল হইবে কিরূপে ?—তমঃ ক্ষয়েরই বা সম্ভাবনা কোথায় ? গো শব্দে কিরণ ! সেই কিরণ যে কুটীরে প্রবেশ করে নাই, তাহার পাপ দুঃখাদিরও অন্ত নাই।

গাভী সর্ব্ব দেবতার বাসস্থান। একমাত্র গাভীর সেবা করিলে সর্ব্ব দেবতা পূজিত হন। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন,—

যত্র গাবো জগত্তত্র দেবদেবো সুরোগমা।
যত্র গাবো তত্র লক্ষ্মীঃ সাংখ্য ধর্ম্মশ্চ শাশ্বতঃ ॥
সর্ব্বরূপে যুতা গাবস্তিষ্ঠন্তিাভিমতাঃ সদা।
গাবঃ পবিত্রা মঙ্গল্যা দেবনামপি দেবতাঃ ॥

আর্য্যগণের সেই মন্ত্রবল—আধ্যাত্মিক বল—এবং তাহাদিগের ন্যায় সর্ব্ব কার্য্যে আন্তরিকতা আমাদিগের নাই। বাক্যের সে শক্তি নাই, কার্য্যের সে সমস্ত ভাব নাই।

রামের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজ দিলীপ সুরভিকে নমস্কার করিতে ভুলিয়া যাওয়ায় বহুদিন অপুত্রক ছিলেন ; পরে বশিষ্ঠ পূজিত গাভীসেবা করিয়া রঘুর ন্যায় সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত সন্তানরত্ন প্রাপ্ত হ'ন। মহাভারতে দেখিতে পাইবেন, মন্ত্র-বিহীন রাজভোগে পূজিত বিরাটরাজের গাভী সকল আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিল। এই দুইটি দৃষ্টান্ত এখন হাস্যকর বিষয় হইলেও পুরাকালে সামান্য ক্রটীতে অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইত। মনের ও বাক্যের দৃঢ়তাই তাহার একমাত্র কারণ। এখন মন্ত্র তন্ত্র কথার কথা হইয়া পড়িয়াছে।

এক গাভী লইয়া পুরাকালে কি মহা সংঘর্ষই না উপস্থিত হইত ? বশিষ্ঠের নন্দিনীই ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষি হইবার প্রধান কারণ। এক গাভীর প্রভাবে মহর্ষি ভরদ্বাজ অসংখ্য বানরসেনা ও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অতিথিসৎকার করিয়াছিলেন। একমাত্র গো-ভক্তিই আর্য্যগণের এতাদৃশ উন্নতির প্রধান কারণ। তাঁহারা এমনি আদর্শে গো-জাতিকে ভক্তি করিতেন যে গরু দেখিতে পাইলেই "নমো গোভ্যঃ"বলিয়া করযোড় করিতেন,কোন কারণে গো-সেবায় ত্রুটি হইলে 'ক্ষমো মাতঃ' বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, না করিলে

প্রত্যবায় হইত। পদ্মপুরাণেও এ কথা উল্লেখ আছে।

তেনান্বয়ে৷ হতাঃ সম্যক পিতৃবর্গে ন তর্পিতাঃ।
দেবাশ্চ পূজিতাঃ সর্ব্বে য দদাতি গবাহ্নিকং॥

গোজাতির প্রতি আর আমাদিগের সে ভক্তি নাই—সে মন্ত্র উচ্চারণ নাই কসাইয়ের মাত্তত ভাই গোয়ালার হাতে ভার দিয়া বা বাজার হইতে অস্বাস্থ্যকর দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত। তাই গোদুগ্ধের দ্রব্যগুণ ফল-হীন মন্ত্রের ন্যায় হীন-বীর্য্য ও আস্বাদ-হীন হইয়া পড়িয়াছে, গব্য ঘৃতের সে সৌরভ আর নাই—গাভার সৌরভেয়ী নাম এখন ব্যর্থ হইয়াছে।

অগ্রে আর্য্যগণ বলিতেন—ঘৃতমায়ুঃ, এখন ঘৃত বলিতে চর্ব্বি বুঝায়। এই চর্ব্বিদ্বারা এখন দেবসেবা হয়। গোদুগ্ধের অপেক্ষা এখন গোমাংস এবং গোচর্ব্বিরই প্রসার প্রতিপত্তি দেখিতে পাইতেছি।

ব্রহ্মপুরাণ বলিয়াছেন—

"গবেঃ কৃশাতুরা পাল্যা শ্রদ্ধয়া পিতৃমাতৃবৎ"

আর এখন পিতামাতাই শ্রদ্ধা পান না ত গাভী যত্ন পাইবে কেমন করিয়া। গোয়ালঘর গুলির পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা নিরীক্ষণ করিলেই আমরা একালের গো-ভক্তি কেমন তাহা বুঝিতে পারি।

আমরা আর্য্যগণের গো-ভক্তির এককণ আভাস দিলাম। যাঁহারা আরও বিশেষ অনু-সন্ধান করিতে চান, তাঁহারা দেবী-পুরাণ, ব্রহ্ম-পুরাণ, বৃহৎ-সংহিতা ও বিষ্ণু-পুরাণাদি পাঠ করিবেন। শাস্ত্রে গো-মাহাত্ম্যের অন্ত নাই। তত্তুলনায় আমাদের উদ্ধৃত আহরণ সমষ্টি গোষ্পদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কলিকাতা ও তদাসন্ন উপনগর-সমূহে কলিকাতার নিষ্ঠুর ও নিশংস গোয়ালাগণ কিরূপভাবে গো-পালন ও রক্ষা করে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ গোশালার প্রতিষ্ঠাতা বাবু হাসানন্দ বর্ম্মা ও কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের সহ-সম্পাদক সেদিন মাননীয় বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুমতী সম্পাদক ও ডেলী নিউজ সম্পাদক মিঃ গ্রেহাম ও কলিকাতা কর্পোরেসনের চেয়ারম্যান্ মাননীয় মিঃ পেইন সাহেবকে লইয়া গিয়া দেখাইয়াছিলেন। তাহাতে কর্পোরেশনের পক্ষে বিশেষ কড়াকড়ি হওয়ায় এবং গোয়ালার লাইসেন্স দানে কার্পণ্য প্রদর্শিত হওয়ায়—জোড়াসাঁকো প্রভৃতি স্থানের গোয়ালাদের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন ও ক্ষুব্ধতা লক্ষিত হইতেছে। অধিকন্তু সেদিন অমৃত-বাজার পত্রিকার একটি পত্রপ্রেরক "সবজান্তা" নাম সই করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাহার জবাবও আমি ঐ কাগজ-স্তম্ভে প্রকাশ জন্য সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করি,কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা অদ্যাবধ প্রকাশিত হইল না। কলিকাতা মহানগরীতে আগামী ডিসেম্বর মাসে এক গো-কনফারেন্স হইবে। তাহাতে এই সকল বিষয় সম্যকরূপে আলোচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ক্রশ ষ্ট্রীটের বাবু বংশীধর জলন ইহার প্রধান পাণ্ডা। বিলাতে মিঃ জাসাওয়ালা বসিয়া এজন্য বিশেষ কাজ করিতেছেন।

আমাদের দেশের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এখন

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নবনটবর কৈশোর্ত্তক কেশব, শ্রীমতী মনমোহন জলধরবরণ শ্যামসুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গো-ভক্তি, গো-সেবা, গো-পরিচর্য্যা, গো-উৎপাদনের কথা সকলেই অবগত আছেন। ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই কৃষ্ণ-ভাবটিকে বিশেষভাবে হিন্দু-জগতে উন্মেষ ও প্রকটিত করিয়া যাইলেন। সেই ভগবান কৃষ্ণ বলরামের গো-সেবা ও কৃষি-বিস্তার প্রতি আমরা কিরূপ আস্থা দেখাই, তাহা আজকালকার কাহারও নিকট অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে আলোচনা, বসুমতী, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত মৎপ্রণীতও প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে আমি প্রত্যেক হিন্দু বাঙ্গালী ও ভারতবাসীকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। মৎপ্রণীত "গোপাল-বান্ধব" পুস্তকেও আমি এই সকল অত্যাব-শ্যকীয় বিষয়গুলি বিশদরূপে আলোচনা করি-য়াছি। আমাদের গৃহে যে প্রত্যহ শত সহস্র গাভী হত্যা হইতেছে, তাহার দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই কিন্তু বৃন্দাবনের শিকারবন্ধের জন্য আমাদের যত তীব্র চেষ্টা!!! সেন্টিমেন্টালিটি-টাই আমাদের দেশটাকে অধঃপাতের দিকে শনৈঃ শনৈঃ লইয়া যাইতেছে, তাহা আমরা দেখি না।*

কন্যাদায় ও বরপণ সম্বন্ধে দেশে কত শত সভা-সমিতি না হইল ও না হইতেছে, কত যেন কাগজ সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রিকার লেখকগণ নষ্ট না করিলেন, কিন্তু দেশের মধ্যে প্রকৃত কাজ কি হইয়াছে, তাহা আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? আমরা এসকল কাজে কত যে পিছেই এবং উদাসীন তাহা বলা যায় না; বস্তুতই আমরা মরণোন্মুখ জাতি এবং আমরা নিজের পায়ের উপর প্রকৃতপক্ষে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারি না। ইহার প্রধান কারণ আমাদের পেটে অন্ন নাই। অথচ আমরা অন্ন উৎপাদনে উদাসীন, তাহা শিক্ষা করিতে বা সেই শিক্ষাদেশে প্রচার করিতেও আমরা বীত-শ্রদ্ধ। এ হেন জাতির কি কখন উদ্ধার আছে?

এইবার আমরা আর্য্য-ঋষিগণের কৃষি-ভক্তি দেখাইব।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, ষটকর্ম্মান্বিত গৃহী, ব্রাহ্মণ-গণ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

'সীতে সৌম্যে কুমারিত্বং দেবি দেবার্চ্চিতে প্রিয়ে।
সৎ কৃত্বাহি যথা সিদ্ধা তথা মে বরদা ভব॥'

এই মন্ত্রের দ্বারা সীতা কে নমস্কার করিয়া ষট্ কর্ম্মা ব্রাহ্মণকেই কৃষিকার্য্যে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন। কৃষি কেবল চাষার কার্য্য নহে—আর্য্য মাত্রেরই, মানব মাত্রেরই কৃষিকার্য্য অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য।

কৃষি-পরাশর বলিতেছেন,

কণ্ঠে হস্তে চ কর্ণে চ সুবর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাস স্তথাপিস্যাদন্নাভাবেন দেহিনাম্॥

অর্থাৎ কণ্ঠে হস্তে কর্ণে সুবর্ণ বিদ্যমান থাকিলেও অন্নাভাবে দেহধারীকে উপবাসী থাকিতে হয়।

আবার বলিতেছেন,

অন্নং প্রাণা বলঃ চান্নংমন্নং, সর্ব্বার্থ সাধকং।
দেবাসুর মনুষ্যাশ্চ সর্ব্বে চান্নোপজীবিনং॥
অন্নন্তু ধান্য সম্ভূতং ধান্যং কৃষ্যা বিনা নরঃ
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিংযত্নেন কারয়েৎ॥

আমাদিগের অন্নময় কোষ এবং দেশের দারুণ অন্নাভাব যে আশু কৃষিকার্য্য ব্যতিরেকে পূরণ হইবে না এবং সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যে এক্ষণে কৃষিকার্য্যে ব্রতী হওয়া উচিত, তাহা আমি একাধিক বার সংবাদ পত্রসমূহে আলোচনা করিয়াছি কিন্তু দেশের আভিজাত্যগর্ব্বী মাথাওয়ালাগণ জানিন। তাহাতে কিরূপ কর্ণপাত করিয়াছেন ? গো। সেবা যেমন আমরা গোয়ালার হাতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত, তেমনি সর্ব্বকার্য্যের সার কৃষিকার্য্যও আমরা নিরক্ষর দরিদ্র ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট চাষার হাতে অর্পণ করিয়া সুখে কলিকাতায় বসিয়া বাইজীর নৃত্য দেখিতেছি ! হায় ! এদেশের কেমন করিয়া উন্নতির আশা করা যাইতে পারে ? এদেশে এই অতি আবশ্যকীয় কৃষি-কার্য্যের সম্মান যত দিন না বৃদ্ধি পাইতেছে, ততদিন আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি সব স্বপ্ন ও কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইবে। দেশের প্রকৃত সেবা রাজনীতির ক্ষেত্রে নহে—বক্তৃতায় হইবে না—প্রকৃত দেশভক্তি—গো-ভক্তি এবং কৃষি-ভক্তি।

দ্বাপরে এত উন্নতি হইয়াছিল কেন ?—তাহার কারণ গোপাল এবং হলধর স্বয়ং গোপালন ও হলকর্ষণে ব্রতী হইয়াছিলেন—রাখাল রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন—গোষ্ঠ গোধনে পূর্ণ হইয়াছিল—ব্রজপুরী গোপ ও রাখালের বিহার ভূমি হইয়াছিল। স্বয়ং সঙ্কর্ষণ-রূপী শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণের মন বংশী দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন—তাই ধর্ম্মে কর্ম্মে বৃন্দাবন এমনি শান্তিধাম হইয়াছিল। সেই শ্রীকৃষ্ণ বলরামের আদর্শচ্যুত হইয়া—সেই বিষ্ণু-ধর্ম্মের আদর্শচ্যুত হইয়া আজ আমরা এরূপ অবৈষ্ণব পাষণ্ড পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সমগ্র ভারতভূমিই তখন ব্রজভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুরীতে বৃন্দাবনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সাধকগণের নিকট এই গুলি সত্য, প্রহেলিকা নহে !!!

ত্রেতাতেও কৃষির কম উন্নতি হয় নাই—বশিষ্ঠ, জনক, সীতা ও রাম নাম উচ্চারণ করিলেই তদানীন্তন কৃষিকার্য্যের কথা মনে পড়ে—অযোধ্যা ও মিথিলার ধন ধান্য ও শ্রীসম্পদের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই রাজধর্ম্ম, সেই পিতৃভক্তি, সেই সৌভ্রাত্র ও সতীত্বের আদর্শ চিত্র গুলি—মনে পড়ে জনকের সেই গৃহী অথচ বৈরাগীর ভাব ! মনে পড়ে সীতার সতীত্ব, অগ্নি-পরীক্ষার কষ্ট-সহিষ্ণুতা, সীতাহরণ ও সীতার পাতাল-প্রবেশ। মনে পড়ে রাম কর্ত্তৃক অহল্যা উদ্ধার। রূপকের চশমাতেই দেখ, কার দিব্য চক্ষেই দেখ, দেখিবে ভারতের অতীত গৌরব কি এক অপূর্ব্ব মহিমায়, কি এক অভাবনীয় সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল !

আমরা ত্রেতার সব ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া কেবল রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অহল্যা উদ্ধারের ব্যাপার রূপকের চক্ষে দেখিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শস্য বিশেষের উৎপাদিকা শক্তির নাম হল্যা। তাহার অভাব-যুক্ত ভূমির নাম অহল্যা অর্থাৎ যাহাতে হল কর্ষণ করা যায় না। গো শব্দে কিরণ ও তম শব্দে নাশ। রশ্মির দ্বারা শস্যোৎপাদিকা শক্তি যিনি নাশ করেন,

তাঁহার নাম গোতম। সূর্য্যের সন্নিকট বলিয়া সেই উচ্চ দেশস্থ ভূমি অহল্যাতে মেঘের অভাবে বৃষ্টি হইত না, অহল্যা সূর্যতাপে অনুর্ব্বরা হইয়াছিল। একদা অতি প্রাতঃকালে অহল্যাকে ত্যাগ করিয়া গোতম (সূর্য্য) উদয়ার্থে দেশান্তরে গত হইলে তত্রস্থ হিমকণাকে আকর্ষণ করিয়া মেঘ বাহক বায়ু বিশেষ ইন্দ্র প্রভাত বায়ুর সাহায্যে অহল্যার সমীপস্থ হইয়া, বৃষ্টি-বীর্য্যপাত করিতে লাগিলেন। অনাবৃষ্টি-দেশে বৃষ্টিপাত হেতু ইন্দ্র অহল্যার উপপতি তুল্য হইলেন। তাহার পর সায়ংকালে স্থানান্তর হইতে গোতম প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অহল্যাকে সরস। দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,আমার রক্ষিতা পত্নীতে কে এরূপ অন্যায় বীর্য্য নিক্ষেপ করিল? এই বলিয়া চারিধারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন দেবরাজ ইন্দ্র বাহন-শূন্য হইয়া অতিকষ্টে অল্পে অল্পে গমন করিতেছে। ইহা দেখিয়া ক্রোধান্ধ গোতম ইন্দ্রকে এই বলিয়া শাপ দিলেন—ওরে ঋষিপত্নীগ সহস্র ভগচিহ্নোভব। (কস্যচিৎ মতে ত্বং নিষ্কোষো ভব ইতি শশাপ) এদিকে গোতম শাপে অহল্যাও পাষাণ তুল্য হইল। কিন্তু অহল্যার স্তবে গোতম তুষ্ট হইয়া বলিলেন,ত্রেতা যুগে রামপদ স্পর্শে তুমি মানবী হইবে অর্থাৎ মানবের হিতার্থে শস্য যুক্তা হইবে। শ্রীরামচন্দ্রের পদ রজের উর্ব্বরত্ব হেতু অহল্যার পাষাণজনক শক্তির নাশ হইল। এইরূপে শাস্ত্রের রূপক ভেদ করিতে না পারিলে আমরা ঋষিগণের নিগূঢ় তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম কখনই বুঝিতে পারিব না এবং তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধিকে আমাদিগের মূর্খতার দ্বারাই আচ্ছন্ন রাখিব। আমাদিগের শাস্ত্র সম্পদের কোথায় কি আছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে,এ সম্বন্ধে সুন্দর প্রবন্ধ সে দিন প্রবাসী পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

অভিমানিনী।

কুলধন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন। কিন্তু তিনি মনে মনে সর্ব্বদাই এই আপশোষ করিতেন যে কি কুক্ষণেই তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণীর শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। কারণ প্রথম বয়সে কতক ঐ ব্রাহ্মণীর প্রেমে, এবং দ্বিতীয় বয়সে কতকটা তাঁহারই (অর্থাৎ সহধর্ম্মিনীর) ভয়ে তাঁহার চিরকালীন মৌলিক পেশা রদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সমস্ত কারণে ব্রাহ্মণের সাংসারিক কাজ অতি কষ্টে চলিত। ইহলোকে তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে অযাচিত সহস্র আশীর্ব্বাদ এবং কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি। ইহা হইতে যাহা জুটিত তাহাতে শ্রীমতীর সহিত প্রায়ই বাধাবাধি হইত। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণী প্রায়ই ভক্তপ্রবরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—নায়েবী, গোমস্তাগিরি এবং অন্য কোন কাজ ত জুটিতে পারে। না হয় মানুষে একটু চেষ্টাও করে। বামুনের ঘরের গরু চিরকাল বসিয়া খাইবেন।

কিন্তু বাপের আদরের আদরিণী কন্যা মাধুরী বলিত—না বাবা! তুমি কোথাও যেও না। আমরা এক সন্ধ্যা খেয়ে থাকব, না হয় ভিক্ষে করে খাব।

গৃহিণীর রাগ করিবার আরও এক কারণ ছিল। তাঁহার ত গহনা ছিল না। কেবলমাত্র একজোড়া শাঁখা আয়তি রক্ষা করিত। আর এদিকে তাঁহার আদরিণী কন্যাও বাড়ীতে চলিয়াছে, অথচ ব্রাহ্মণ কোন তত্ত্ব লইতেছেন না। এই সমস্ত তাঁহার রাগের প্রধান কারণ। কিন্তু কুলধনের এক বিষম পণ ছিল। তিনি অঘরে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। এতদুপলক্ষে দম্পতির মধ্যে বচসা হইত। সময়ে সময়ে বচসা অপেক্ষা বেশী হইয়াও যাইত। কিন্তু দোষের মধ্যে কুলধন ভীত মনুষ্য। কাজেই তিনি মানময়ীকে শান্ত করিয়া অপর জায়গায় যাইয়া বলিতেন,—দূর হোক্ গে! শেষকালে ব্রাহ্মণীর সহিত বিবাদ করিয়া ফৌজদারী বাধাইব। তাঁহার এই ব্রাহ্মণীর নাম ছিল—ভুবনমোহিনী। কিন্তু তিনি ভুবনমোহিনী না হইলেও তিনি এই নামে অভিহিত হইতেন।

দ্বিপ্রহরাবধি পয়সার প্রত্যাশায় চারিদিকে বৃথা ধাক্কা করিয়া অবশেষে যখন কুলধন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে খাতকের চৌদ্দ পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেন। তখন তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িত—একটী ক্ষুদ্র অভুক্ত বালিকা একখানি স্নেহময় হস্তে তাঁহারই প্রতীক্ষায় পাখা লইয়া দাবায় এতক্ষণ বসিয়াছে এবং তাঁহার নিকটে সর্ব্বদুঃখাবনাশন এক ছিলিম তামাক সাজা রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ যখন মা মাধু! বলিয়া গৃহে ঢুকিতেন, তখন তাঁহার স্নেহসিক্ত কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিত।

সে সময় জৈষ্ঠ মাস। নিদারুণ গ্রীষ্মে সূর্য্য দেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, সেই সময়ে এক দিন গঙ্গাতীরস্থ প্রকাণ্ড বটবৃক্ষোপরি কেবল একটী মাত্র বিহঙ্গম পরম করুণান্তরে দীন ও আর্ত্তস্বরে ডাকিতেছিল—ফটিক জল! ফটিক জল! সেই রৌদ্র-মধ্যাহ্নে প্রকৃতির সর্ব্বত্র নিষ্প্রভ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল ঐ এক বিহঙ্গমের তীব্র কণ্ঠস্বর ধরণীর ক্লান্ত হৃৎপিণ্ডে একটী সূক্ষ্ম চঞ্চল আশার ন্যায় একমাত্র ক্ষীণ কম্পান্বিত রক্তধারা প্রেরণ করিতেছিল। কোথা হইতে সে সময়ে সেখানে একখানি পান্‌সি ভাসিতে ভাসিতে আসিল। যেখানে পান্‌সীখানি ভিড়িয়াছিল, তথা হইতে কুলধনের বাটী বেশী দূর নহে। সেই নৌকার একমাত্র আরোহী শশাঙ্কশেখর রায়। তিনি কলিকাতার কোন ধনী লোকের সন্তান। প্রিয়তমা পত্নী হারাইবার পর শোকহরণ মানসে তিনি নৌকা ভাসাইয়াছেন। তাঁহার আশা ছিল—কল্লোলিনীর অচ্ছিন্ন অক্লান্ত কলতানে বৈতরণী পারের কোন ক্ষীণায়মান কণ্ঠস্বর অশ্রুত হইয়া যাইবে। তরণীর গবাক্ষ পথে তিনি অনন্যমনে চাহিয়াছিলেন এবং বোধ হয় সেই নিশ্চল মধ্যাহ্নে এবং তাহার বিভক্ত মনের মধ্যে কোন একটা অব্যক্ত অজ্ঞাত সহানুভূতি ছিল।

বৈকালবেলা মাধুরী ও তাহার মা গা ধুইতে আসিয়া দেখেন, একখানি সুন্দর পান্‌সি ও তাহার মধ্যে একটা বাবু তীরের দিকে চাহিয়া আছেন। মুখখানি নাতিদীর্ঘ শ্মশ্রু গুম্ফে মণ্ডিত এবং সুন্দর বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু মা তত লক্ষ্য করেন নাই। মেয়ে দেখিতে পাইয়াছিল যে, তাহার মধ্যে বিলাস প্রতিপালিত ঔদ্ধত্যের একটী রেখা

অঙ্কিত আছে। যাহোক্ তাঁহারা যত সত্বর গা ধুইয়া চলিয়া গেলেন।

পথে মা মেয়েকে বলিল—"ছোড়াটার গতিক ভাল নয়। আমরা যতক্ষণ গা ধুইতেছিলাম, ততক্ষণ আমাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, উহার চাহনীতে আমার গা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।

ব্যাপার শুনিয়া কুলধন চটিয়া লাল। দুর্ব্বাসার বংশধর কি না। রুক্ষ হস্তে বক্র নেত্রে ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইচ্ছা ছিল, বাবুই হউন আর যিনিই হউন, -"তুমি কেমন লোক হ্যা।" বলিয়া দু এক কথা শুনাইয়া দিবেন। কিন্তু পানসীর সাজসজ্জা দেখিয়া আর কিছু বলিতে সাহস হইল না। মনের রাগ মনেই নিবিয়া গেল।

শশাঙ্কশেখর বাবুর বহুদিনের একটা ইচ্ছা, কোন নিভৃত স্থানে একটী ফুলের বাগান তৈয়ার করেন। কিন্তু সেরূপ স্থান না পাওয়ায় তাহ হইয়া উঠে নাই। সেদিন অপরাহ্নে গঙ্গা তীরস্থ ১৭।১৮ বিঘা জমির উপর দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হঠাৎ মনে হইল এ জমিটা ত বেশ—আমি ইহা নিশ্চয়ই লইয়া একটী ফুলের বাগান করিব এবং উৎপন্ন ফুলসকল বিক্রয় করিলে লাভ হইবে—এইরূপ ভাবিতেছিলেন।

মায়েবী এবং মোসাহেব ভোলানাথ দাস মহাশয় উক্ত জমির মালিকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। মালিক মহাশয় সময় বুঝিয়া জমিটা ছাড়িয়া দিলেন। কেবল সেই দুর্ব্বাসা মুনির বংশধর নিজের জমিটুকু ছাড়িতে অসম্মত হইলেন। বামুনের বজ্জাতি দেখিয়া শেখর বাবুর অত্যন্ত রাগ হইল। কিন্তু কি করেন সহসা কিছু বলিতে পারেন না, মনে মনে বলিলেন বামুনকে এখান হইতে কোন রকমে উঠাইয়া দিতে হইবে। তখন তিনি ভোলানাথকে বলিলেন "থাক্ বামুন বেটাদের বাড়ী, ওর বাড়ীর চারিদিকে আমার ফুলের বাগান বসিবে। তুমি আচ্ছা করিয়া চারিদিকে বেড়া দিয়া জায়গাটা ঘেরিয়া ফেল। ভোলানাথ বলিল "যে আজ্ঞে" ভোলানাথ এসব কাজে খুব পটু।

পূর্ব্বে যেখানে আগাছা উলু খড় প্রভৃতির বাগান পরিবেষ্টিত ছিল, এখন সেখানে তাহার পরিবর্ত্তে সুশোভিত ফুলের বাগান শোভা পাইতেছে। সেখানে প্রতিদিন কুসুমকামিনী, স্বর্ণমুখীরা আপনাদিগের প্রণয়স্ফীত বক্ষঃস্থল সমীরণ স্পর্শে রোমাঞ্চিত করিত, প্রভাতে আরক্ত সলজ্জ দৃষ্টিতে স্ব স্ব প্রণয়ের তপস্যা করিয়া জীবনকে ধন্য জ্ঞান করিত।

শশাঙ্কশেখর বাবুর ফুলের বাগানের কথা গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছিল। ঐ বাগানের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কয়েকজন মালিও নিযুক্ত ছিল। শেখরবাবু পানসীতে বাস করিতেন, মাঝে মাঝে কলিকাতায় যাইয়া ফুলের বীজ ও কলম সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। তিনি একজন বড় বাবু। তাঁহার অনেক টাকা গ্রামবাসীরা সকলেই জানিত। এবং ব্যাপারী পসারীরা তাহাকে ঠকাইয়া লইত। কিন্তু সকলের চেয়ে একটা বেশী ক্ষোভ ছিল যে, এ হেন বাবুর প্রকৃত ঐশ্বর্যটাকে কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিতে পাইত না। কারণ দরিদ্রের পক্ষে ঐশ্বর্য্যের

একটা তীব্র আকর্ষণকারী মদগন্ধ ছিল, তাহাতে লুব্ধ হইলে আর রক্ষা আছে কি ?

তাঁহার বাগানের পার্শ্বে কুলধনের বাস। কখনও কখনও মাধুরী সন্ধ্যাবেলা আঁচলটী কাঁধে ফেলিয়া আপনাদের কুটিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইত, সেই সময় হঠাৎ দক্ষিণ সমীরণ সদ্য-প্রস্ফুটিত বেলফুলের গন্ধে একেবারে যেন মত্ত হইয়া আসিয়া তাহার ললাটে ও স্কন্ধে সৌরভের একটা ঝাপটা দিয়া যাইত। সেই ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শরীর কাঁপিয়া উঠিত। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিত, তাহাদের তুচ্ছ দারিদ্র্যকে উপহাস করিয়া অযুত কুসুমের অনন্ত বৈভব বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। সে সময় পিতা বাড়ীর মধ্য হইতে ডাকিতেন "মা মাধু !" একটী সঙ্কীর্ণ স্নেহ-পল্বল মাধুরীর হৃদয়ে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিত। তাহাতে তাহার ব্যথিত কল্পনা হইতে রহস্যময় মোহকর ছায়া অপসৃত হইয়া যাইত।

গঙ্গার ঘোলাজল কুলে কুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল,প্রবাহিনীর আর পলক ফেলিবার অবকাশ ছিল না,কেবল একটানে সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। মনুষ্যেরাও এইরূপ দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া এক সুদূরের অনির্দ্দিষ্ট সাগরে ছুটিয়া যায়। সে সময় ভারি বাদল। এপার ওপার জুড়িয়া মেঘ করিয়াছে। গঙ্গার ঘাট ত খুব পিছল। এমন সময় সহসা শব্দ হইল ঝুপ্ দড়াম (অর্থাৎ শশাঙ্কশেখর বাবু যেমন উপর হইতে নৌকায় উঠিতে যাইবেন অমনি পপাত ধরণীতলে।)

এই সময় ঘাটের অপর পার্শ্বে মাধুরী ও তাহার মা বাসন মাজিতেছিল। পড়িতে দেখিয়াই মা দৌড়াইয়া গেলেন ও বলিলেন—সাট্ সাট্, ওঠ বাপ্ ওঠ, পড়ে গেছ বাপ্ ওঠ, আহা মরে যাই, শেখরবাবু উঠিলেন ও কোমরে যে ব্যাথা লাগিয়াছিল তাহা উহ্য রাখিয়া বলিলেন, না আমায় বেশী লাগে নাই। এই সময়ে তিনি একবার চকিতে চাহিয়া দেখিলেন এক নবীনা কিশোরীর রক্তিম মুখমণ্ডল রুদ্ধ হাস্যরসে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন প্রত্যূষে বাবু নৌকা হইতে নামিয়া আসিলে মাধুরীর মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ বাবা ঠিক বলত কোথাও ব্যাথা লাগেনি। ব্রাহ্মণীর সহিত বাবু কখনও কথা কহেন নাই।

কিন্তু আজ এই অযাচিত যত্নে কথঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিলেন—"না গো মা আমার কোথাও লাগে নাই।" কথা শুনিয়া মাধুরীর মা খুব খুসী হইলেন, কারণ তাঁহার বহুদিনের অভাব আজ পূরণ হইল,সেটা কিছু নহে—তবে, এত বড় একটা বাবু তাঁহাকে "মা" বলিলেন (এই তাঁহার আহ্লাদ !!)

হায়রে দারিদ্র্য ! তোমার ক্ষমতা অসীম, সে সময়ে এক পক্ষিরূপিনী বঙ্গবধূ, কবে কোন নিদারুণ শাশুড়ী—তপ্তলোহে তাঁহার নয়নদ্বয় নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সে পুরাতন শোক আজ তাঁহার মনে পড়িল। তাই তিনি গাছের উপর হোতে কাঁদিয়া উঠিলেন। চোখ গেল ! চোখ গেল !

বাজারে কুলধন পদধূলি বিতরণ পূর্ব্বক স্বহস্তে একটি বেগুণ কাঁও লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন ব্যাপারী বলিল—"কেন ঠাকুর !

আমাকে ভোগাও, কোল্‌কেতার বাবু যিনি আছেন তিনি তোমার বেটা, তোমার গিন্নীকে মা বলেছেন, তোমার আবার দুঃখু! বলা বাহুল্য, এ কথা সেইদিনই বাতাসের মত গ্রামের ভিতর রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু ব্রাহ্মণ এ কথা জানিতেন না। বাপান্ত পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, কি বল্‌লি আমার গিন্নীকে মা বলেছে, আর তোকেই বা এ কথা কে বল্লে? রাগে গর গর করিতে করিতে ব্রাহ্মণ বাটীতে ফিরিলেন। আসিয়াই অগ্রে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণী শোন, সেই ছুঁচো বেটা নাকি তোকে মা বলেছে, এ কথা কি সত্য?" ব্রাহ্মণীও চটিয়া লাল্‌। বলিলেন—সেই বাছা হল ওর ছুঁচো বেটা! আহা সেই বাছার কথা শুনিলে পাষাণ গলে যায়। ফের যদি তুমি ও কথা মুখে আন তাহা হইলে স্বামীরূপ অভাগ্য—শত্রুকে তিনি একরূপ ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দকারী পদার্থ দ্বারা পারিবারিক শাস্তি দিবেন। ব্রাহ্মণ হার মানিলেন। বলিলেন—আজ ও কি রাঁধিতেছ। ব্রাহ্মণী বলিলেন—ও পুলিপিঠা। আজ তোমার ধর্ম্মপুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি তাই রাঁধিতেছি। ব্রাহ্মণী ইতিমধ্যে ধর্ম্মপুত্র পাতাইয়া ফেলিয়াছেন। যথাসময়ে বাবু নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন। ব্রাহ্মণ মনের রাগ মনে চাপিয়া রাখিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিতে দিলেন। বাবু চুরোট ফুঁকিতে ফুঁকিতে কুলধনের সাংসারিক কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কুলধনের তাহা ভাল লাগিল না, রাগে তাহার আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল, ইচ্ছা উত্তম-মধ্যম দিয়া তাহার চৈতন্য-সঞ্চার করিয়া দেন কিন্তু এদিকে ব্রাহ্মণীর ভীতি, অপর দিকে ফৌজদারীর ভয় তাহার সে ইচ্ছার অন্তরায় হইয়াছিল। সুতরাং ঘাড় ভাঙ্গেন কি করিয়া? যাহোক্‌ কালে সব হইল। কুলধন একটু নরম হইলেন। বাবুও ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ভাব ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে রাগের বকেয়াটুকু কিছুতেই গেল না।

এদিকে ব্রাহ্মণীর চির-সঞ্চিত আশাও পূর্ণ হইতে লাগিল। শেখরবাবু তাঁহাকে দিতে থুতে আরম্ভ করিলেন। এক একদিন নানা রকম উপঢৌকন আসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দারিদ্রের কুটীরের চারিদিকে অট্টালিকার বেণোজল থৈ থৈ করিতে থাকিল।

কিন্তু সেই সুখ ঐশ্বর্য্যের কোলে ভাসিতে ভাসিতে একখানি মুখ দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। সে মানুনীর। বাবুর প্রদত্ত উপঢৌকনগুলি যখন বাটীর ভিতর আসিত, তখনই তাহার বুকের ভিতর কে যেন একখানি তীক্ষ্ণ-ধার ছুরী বসাইয়া দিত। প্রকৃতপক্ষে তাহার চোখে এ সব সহিত না। সে ভাবিত হে ঠাকুর! আমি মাদুরে বসিয়া যখন বাবার মাথায় পাকা চুল তুলিয়া দিতাম, তখন আমার যে সুখ ছিল, কতদিনে তাহা আবার ফিরিয়া আসিবে! এরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার দেহলতা দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

যে বৎসর ফাল্গুন মাসে গ্রামে এক মরণের বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। ওলাউঠায় ঘর ঘর মরিতে লাগিল। কুলধনের বাটীতেও সে বন্যা ঢুকিল—সব ভাসিয়া গেল—পুত্রের স্নেহ

গেল, কন্যার আদর গেল, পিতার যত্ন গেল, ভগ্নির ভালবাসা গেল—কেবল অনন্ত হাহাকারের ধ্বনি দুটী মনে জাগরূক রহিল। হায়! দুনিয়ার কারিকরের কি মর্জ্জি। আমরা বহু কষ্ট বুকে করিয়া ইট কাঠ বহিয়া তিলে তিলে সংসার গড়িয়া তুলি, বানের জলে একদিনে তাহা কোন অনন্ত সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

এ অবস্থায় দুটী প্রাণী মাত্র মরিতে বাকী। মাধুরী ও তাহার মা। দু'জনের স্মৃতি শ্মশানবৎ। তাহাতে স্বামী পুত্র কন্যা ও পিতা, ভ্রাতা ভগ্নির চিতা ধূ ধূ জ্বলিতেছিল। আর অদূরে বাবুর বাগানে নব বসন্ত সমাগমে মত্ত মধুপের নবীন মেলা জাগিয়া উঠিয়াছিল। হায়, ভগবানের কি অদ্ভুত মহিমা।

শশাঙ্কশেখর বাবু পলাতক। গ্রামে প্রথম চিতা জ্বলিতে না জ্বলিতে তাঁহার পান্‌সী গঙ্গার বাঁক পার হইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

আবার সেই বর্ষাকাল। আবার ঘাট বড় পিছল। কিন্তু কর্ণোপরি যজ্ঞসূত্র সংস্থাপন পূর্ব্বক যে সাবধানী ব্রাহ্মণ পা টিপিয়া গাড়ু হস্তে বাড়ী ফিরিতেন, তিনি আর নাই। যাহারা হাস্যরবে গঙ্গার তীর মুখরিত করে খেলে বেড়াত, তাহারাও চলে গেছে। হায় পরিণাম! কালের কুটীল গতি বুঝাই ভার!

বাগানের মালীরা ৪।৫ মাসের মাহিনা না পাইয়া, এবং সে মালিকের কোন সন্ধান না পাইয়া, স্ব স্ব জাবায় মালিক নামোচ্চারণ পূর্ব্বক বাগানের গাছগুলি বিক্রয় করিয়া আপনাদের পথ দেখিল। আবার যে উলুখড় সেই উলুখড় বাতাসে উড়িতে লাগিল।

অবশেষে একদিন শশাঙ্কশেখর বাবু আসিলেন এবং মাধুরীর বাটীতে গেলেন। মাধুরীর মা পিঁড়িতে বসিতে দিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন বাবু বলিলেন—মা আমি সব শুনিয়াছি,। মা তুমি চুপ কর। সব বুঝিতেছি। আমার বাগানে আর সখ নাই, আমি আর এখানে থাকিব না। তুমি ও তোমার মেয়ে আমার সঙ্গে কলিকাতায় চল। সেখানে বাসায় থাকিবে, যত্নের কোন ত্রুটী হবে না। মা তখনই স্বীকার! মেয়েও কি জানি কি ভাবিয়া স্বীকার হইল।

মাঝ-গাঙে পান্‌সীতে তিন জন মাত্র আরোহী। মাতা, কন্যা ও শশাঙ্কশেখর বাবু। এ সময়ে সয়তান্ আসিয়া শশাঙ্কশেখর বাবুর কানে কানে বলিল—"বাঃ মেয়েটী ত বেশ!" বাবু তাহার জবাব দিলেন—"মাধুরী কাছে আয় না—সরে আয়।

কিছুক্ষণ পরে একটা শব্দ হইল—"বাবা গো কোথায় তুমি!" এবং উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত রক্তিমাভ জলরাশির মধ্যে বিধাতার স্বরচিত নাটিকার সমাপ্ত হইল।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

ঈর্ষা।

পর সুখে ধিক্ ধিক্ পোড়ে যার বুক,
ফেটে যায় যার বুক,
দেখিলে পরের সুখ,
বিষে যেন দগ্ধ হয়ে থাকায় নয়ন,
মানুষের হায় ইকা কি পোড়া জীবন।

বাহিরে বিরস হাসি,
ভিতরে গরল রাশি,
পরাণের মাঝে সদা তুষের দহন,
ললাটে এ সুখ বিধি লিখ না কখন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

নারায়ণ।

ন-মঃ নমঃ নারায়ণ শ্রীমধুসূদন।
ম-নোরঞ্জন মাধব মদনমোহন॥
ন-ব নটবর নীল নীরদবরণ।
ম-ধুর মুরারী মোহন-বংশীবাদন॥
না-গরবর নারীনাথ গোপীজীবন।
রা-সবিহারী রসিক রাধিকারমণ॥
অ-বনীশ্বর অবনী সৃজন কারণ।
ন-রেশ্বর নরসিংহ নরনারায়ণ॥
শ্রী-শ শ্রীকৃষ্ণ হরি শ্রীধর শ্রীভূষণ।
ম-ধুকেশী মুকুন্দ-কেশী কংসনাশন॥
ধু-র্জটী-ঈশ যোগী যোগেশ জনার্দ্দন।
সু-ন্দর সুধীর সদাশয় সুদর্শন॥
দ-র্প খর্ব্বকারী দীন-অনাথশরণ।
ন-মে মিহিরদাস দাও শ্রীচরণ॥

শ্রীমিহিরজ্যোতী দাস, বি-এ।

অহল্যা।

আঁধারে ভিতরে দেখি—স্খলিত-চরণা
কামনার মূর্ত্তি ধরি' অহল্যা পাষাণী
কত যুগ জড়বৎ বিগত চেতনা
ছিল পড়ি'। তুমি নাথ! কবে গো নাজানি
সহসা আসিয়া তার শিলাময় শিরে
যুক্ত কোকনদ সম শ্রীচরণ দুটি
রাখিলে করুণা করি'! ধীরে ধীরে ধীরে
শ্রীপদ-পরশে তার সে জড়তা টুটি'
অঙ্গে অঙ্গে প্রবাহিতে অপূর্ব্ব স্পন্দন;
মর্ম্ম-গূঢ় ভকতির স্থগিত নির্ঝর
উথলি' ঝরিছে নেত্রে; পুলক-কম্পন
বহিছে বিজলি-বেগে দেহের ভিতর;
প্রেমের চিন্ময় তনু লভিয়ে কামনা
হয় বুঝি আনন্দের সমাধি-মগনা।

মলিনা।

ক্ষমা।

সহজ সৌন্দর্য্য যার,
সংসার-সুষমা সার,
কেমন বা মন তার বিধির সৃজন;
বুঝিতে হৃদয় আকিঞ্চন;
খ্যাত সর্ব্বলোকময়
শশাঙ্কে কলঙ্কী কয়
সুধাকর তবু করে সুধা বরিষণ।
কঠোর কুঠার ঘায়,
কর্ত্তিত চন্দন কায়,
তরুবর তবু করে গন্ধ বিতরণ,
অনল শোধন পরে
মলিনতা পরিহরে
ধরে হেম বিশুদ্ধ কিরণ;
স্বভাবতঃ দোষালয় মানবের মন;
দেবধর্ম্ম ক্ষমা, দয়া, দেবত্ব ভূষণ;
হেন ক্ষমা যার প্রাণ
অকাতরে করে দান
দেবত্ব হৃদয়ে সত্য ধরে সেই জন।
হে মানব! বুঝ মনে মন,
মানব-প্রকৃতি পটে ক্ষমাই ভূষণ।

কুমারী প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী।

প্রাণের বোঝা।

ছোট বটে প্রাণটুকু মোর
কিন্তু আশা বিপর্যয়।
ক্ষুদ্র হিয়ার মাঝখানেতে,
উঠছে [illegible] বয়ে যায় ॥
কর্ম্মপ্রসার একটু খানি,
ভাব ছড়ান জগৎময়।
আশার গাঙে বান ডেকে গো,
ছাপিয়ে দেছে পরাণ তায় ॥
বইতে যাহা পারব না'ক,
কেমন মজার মায়ার ফাঁদ।
কুড়িয়ে নিতে তেমনি বোঝা,
অজ্ঞ মনের সদাই সাধ ॥
কর্ম্মফলের দারুণ সাজা,
বইতে হবে তেমন ভার।
হবেনা'ক এদিক ওদিক
একটু নড়ন চড়ন তার ॥
দরদী এমন নাইক কেহ,
দয়া করে নেবে এসে।
নামিয়ে আমার তেমন বোঝা,
প্রাণটী দিয়ে ভালবেসে।
একা আমি কেমন করে,
সইব এত কষ্ট আর।
একা আমি কেমন করে,
বাখব ধরে দারুণ ভার ॥
সবাই আছে আশে পাশে,
দেখ্‌ছে হেসে কেমন মজা।
সবাই আছে উদাস ভাবে,
পাচ্চি কেবল আমিই সাজা ॥
আশায় আশায় নিলাম তুলে,
আশায় বেঁধে ক্ষুদ্র বুক।
দরদী বুঝি মিলবে কেহ,
নামিয়ে নিলে পাব সুখ।
বিশ্ব সারা ঘুরে ঘুরে,
কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বার।
পায়ে ধরে সাধনু এত,
নামিয়ে নিতে বোঝার ভার ॥
মিথ্যে আশা মিথ্যে সবই,
চাইলনা, কেউ বারেক ফিরে।
কেউ এলনা সবই ফাঁকি,
স্বার্থ কেবল জগত জুড়ে।

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

সতীত্ব।

স্পর্শমণির স্পর্শে কুন্তল-কৃষ্ণবর্ণ লৌহ-পাত্র ও মহামূল্য অতি উজ্জ্বল স্বর্ণভাণ্ডে পরিণত হয়। স্ত্রীলোকেরও সেইরূপ একটী অমূল্য স্পর্শমণি আছে। সেই স্পর্শমণির নাম, স্ত্রী-ধর্ম্ম—পবিত্রতা—সতীত্ব। এ "পরশ পাথর" যাঁহার আছে, তিনি ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণা কুরূপ-কুৎসিতা হইলেও বহুমূল্য মণি-কাঞ্চনের ন্যায় চির-সমাদৃতা। ভাগ্যবতী রমণী আজীবন কৃপণের ধনের ন্যায় প্রাণপণ যত্নে এ রত্ন রক্ষা করিয়া থাকেন। কর্ম্মদোষে দৈববশে হীনবুদ্ধি নারী একবার মুহূর্ত্তের জন্য এ "সাত রাজার ধন এক মাণিক"—এ মহামূল্য কোহিনুর রত্ন হারাইলে তাহার আর নিস্তার নাই। ভ্রষ্ট-চরিত্রা, অপবিত্রা মহিলা লোক সমাজে যারপরনাই ঘৃণিতা এবং ধর্ম্মের বিধানে চিরপতিতা।

রমণী মাত্রেই জগন্মাতা জগদম্বার অংশ-সম্ভূতা। সুতরাং নারীমূর্ত্তি সন্তানচক্ষে মাতৃ-মূর্ত্তির ন্যায় চিরপূজিতা, নিত্য সমাদৃতা, মহা পবিত্রা শান্তিময়ী দেবী। নিতান্ত নরাধম পাষণ্ড ব্যতীত কেহই এ পরম পবিত্র মাতৃ-মূর্ত্তির অবমাননা—দেবীস্থানীয়া রমণীর ব্যভিচার দর্শন স্পৃহা করে না। একমাত্র বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন জগতের রমণীমাত্রই আমার নিত্য প্রীতিভক্তির অধিকারিণী, স্নেহ-প্রীতিদায়িনী

জননী বা ভগিনী, এবং একমাত্র বিবাহ-কর্ত্তা পতি ব্যতীত বিশ্ববাসী নরমাত্রই আমার স্নেহাস্পদ পুত্র বা প্রিয়তম ভ্রাতা, জগতের নর-নারীর মনে এই পবিত্র ভাব বদ্ধমূল না থাকিলে মনুষ্য-সমাজের নৈতিক পবিত্রতা বা চরিত্র রক্ষা অসম্ভব। নর-নারী চরিত্রে নৈতিক বলের অভাবই রমণীর মুখে অবগুণ্ঠন প্রথা সৃষ্টির মূল। উন্নত চরিত্র, পবিত্র হৃদয় নর-নারীতে এ বিশ্ব পরিপূরিত হইলে আর রমণীর পবিত্র মুখে অবগুণ্ঠন-প্রাচীরের প্রয়োজন থাকিবে না।

স্মরণাতীত কালে—সত্যের সেই সুবর্ণযুগে পৃথিবীর নর-নারী শিশুর ন্যায় সরল—দেবতার ন্যায় পরম পবিত্র ও নির্ম্মল প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল, তখন নারী-মুখে অবগুণ্ঠনাবরণের আবশ্যক হয় নাই, ত্রেতা বা দ্বাপরেও নর-নারীর প্রকৃতি সত্যের সেই মধুর মলয় বাতাসেই অনেকটা পবিত্র ও স্নিগ্ধ ছিল—তখন মানুষের ভোগ-বিলাসিতা ও পাপ লালসা এত তীব্র ছিল না, সুতরাং তখনও অবগুণ্ঠনের তত আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় নাই। অবগুণ্ঠন পাপ-কলুষিত কলি যুগেরই অবশ্য প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব সৃষ্টি বা আধুনিক যুগের উন্নত চরিত্রের বিজয় পতাকা! ধন্য কলি-প্রভাব!

মনুষ্য সমাজের পবিত্রতা রক্ষা পরম মঙ্গল-জনক, নর-নারীর চরিত্র রক্ষা বড়ই প্রয়োজনীয়। ব্যভিচার মানবজীবনের পতনের মূল ব্যভিচার ঘোর নরকের পথ প্রদর্শক। এই ঘৃণিত ব্যভিচার প্রভাবে মানুষের ধর্ম্ম, নীতি, স্বাস্থ্য, সুখ, মানসিক উচ্চতা ও পবিত্র ভাবনিচয়, সামাজিক সুশৃঙ্খলা, জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ব্যভিচার অনন্ত অশান্তির নিদান। স্পর্শমণি ভ্রষ্ট ব্যভিচারিণী অসতী রমণী মণি-হারা ফণিণীর ন্যায় জীবন্মৃতা।

একমাত্র শারীরিক অপবিত্রতা—শুধু কায়িক ব্যভিচারই একমাত্র ব্যভিচার নহে। শারীরিক মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ উপায়েই রমণীর পবিত্রতা বা সতীধর্ম্ম বিনাশ হইতে পারে। সুতরাং সুচরিত্রা, বুদ্ধিমতী রমণী কায়িক, মানসিক ও বাচনিক কোনরূপেই ভ্রষ্ট চরিত্রা হইবেন না। সুন্দর ও সুবেশধারী পুরুষ দর্শনে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেই মন অপবিত্র হয়, মন অপবিত্র হইলেই মানসিক ব্যভিচার হইল; ইন্দ্রিয় উত্তেজক—আদি-রসাত্মক হাস্য কৌতুক, গল্প ও সঙ্গীতাদি রঙ্গরস দ্বারা মন চঞ্চল ও চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়াও স্বাভাবিক, সুতরাং এ শ্রেণীর আমোদ প্রমোদকে বাচনিক ব্যভিচার সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। এ সব ব্যভিচার কায়িক ব্যভিচারের ন্যায় প্রত্যক্ষভাবে সমাজের চক্ষে তেমন ঘৃণা-জনক কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও ইহার পরিণাম ফলও যে বিষময় এবং শারীরিক ব্যভিচারের পথ প্রদর্শক, সুতরাং ঘোর পাপ জনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাচনিক ব্যভিচারের উত্তেজক হলাহলে প্রথমতঃ মন অপবিত্র হয়, পরে মানসিক অপবিত্রতার তীব্র উত্তেজনায় শারীরিক ব্যভিচার সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নহে। এইজন্যই দূরদর্শী শাস্ত্রকারগণ রমণীদিগকে সুন্দর সুবেশধারী পুরুষ দর্শন, পর পুরুষের সহিত আলাপ এবং নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া

গিয়াছেন। পুরুষ অগ্নি এবং রমণী ঘৃত স্থানীয়া বলিয়া প্রবাদ আছে। অগ্নিস্পর্শে ঘৃত গলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং রমণীর এ সকল প্রলোভনীয় পদার্থ হইতে সতত দূরে অবস্থান করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দেবতার পবিত্র মন্দিরে ঘৃণিত কুক্কুর প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নহে। হোমের পবিত্র হবি কুক্কুরের চির অস্পৃশ্য। নারী-হৃদয় দেব মন্দির—সতীধর্ম্ম নিত্য পবিত্র দেববাঞ্ছিত যজ্ঞীয় হবি।

ঈশ্বর জগৎ পতি। স্বামী রমণীর প্রত্যক্ষী-ভূত মূর্ত্তিমান ঈশ্বর বা ঈশ্বরতুল্য ভক্তিভাজন মূর্ত্তিমান নরদেবতা। রমণী সর্ব্ববিধ প্রলো-ভনের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা পরমেশ্বরের ধ্যান বা পতিপদ চিন্তা করিলে ব্যভিচার চিন্তা—পরপুরুষ-আসক্তস্পৃহ-লিপ্সা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনকে অপবিত্র করিতে পারে না। চিত্তজয়কারিণী যোগনিরতা যোগিনীর প্রাণে কোনরূপ পাপাকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না—চিত্তশুদ্ধ নর-নারীর হৃদয়ে কোনরূপ পার্থিব কলুষ ভাব ক্ষণকালের জন্যও স্থান পায় না। দীর্ঘকালের কঠোর সাধনা ব্যতীত সেরূপ দেবোপম চিত্তশুদ্ধি অসম্ভব। শুধু চিত্তশুদ্ধির অভাবে অনেক দেব-দেবীকেও মুহূর্ত্তে পতিত হইতে হয়। প্রলোভনের সামগ্রী হইতে সতত দূরে থাকিয়া চিত্ত জয়, পবিত্রতা রক্ষা যত সহজ কার্য্য, সদা ভোগ-সুখের মহা প্রলোভনে ডুবিয়া থাকিয়া চিত্ত বিজয় তত বেশী কঠোর কর্ম্ম বা অনেকের পক্ষেই অনেক স্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমি চিত্ত জয়ী—প্রবৃত্তি বিজয়ী, এ কথা বলিলেই চিত্ত জয় বা প্রবৃত্তি দমন হয় না। কঠোর পরীক্ষা ব্যতীত মনুষ্যের মনকে বিশ্বাস করা যায় না—বিশ্বাস করিতেও নাই। অগ্নি শুষ্ক ইন্ধন পাইলেই জ্বলিয়া উঠে—ঘৃত সামান্য আতপ তাপে বা অগ্নি স্পর্শ করিতে না করি-তেই বিগলিত হইয়া যায়। সেইরূপ স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া না চলিলে, অতি অল্প কারণেই নর-নারীর চরিত্র কলুষিত হয়—প্রলোভনে পড়িয়া দেব-চরিত্র নর-নারীও মুহূর্ত্তে পাপের পঙ্কিল গর্ত্তে গড়াইয়া পড়ে, ক্ষণ-কাল মধ্যে তাহাদের চির পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ সাময়িক অসতর্কতার প্রলো-ভনে পড়িয়া কত দেবতুল্য নর চরিত্রভ্রষ্ট হই-য়াছে, কত দেবীসমা নারী আপনার বক্ষ-লুক্কায়িত অমূল্য স্পর্শমণি হারাইয়া অনন্তের অনন্ত কলঙ্ক-পশরা মাথায় বহিয়া বিশ্বনিয়ন্তা ও বিশ্ববাসীর চির-ঘৃণা-ভাজন হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

সতী হইতে হইলে পতিব্রতা হওয়া—পতি-ভক্তি-মতি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পতি-ভক্তিহীনা হইয়া সতী হইবার কথাটা 'সোনার মৃণ্ময় কলসীর' কথার ন্যায় অসম্ভব কৌতুক-কাহিনী মাত্র। পতি-ভক্তিপরায়ণতাই সতীত্ব রক্ষার প্রধান উপায় বা একমাত্র নিদান। কায়মনোবাক্যে সেবা-পরিচর্য্যা দ্বারা পতি-দেবতার মনোরঞ্জন করাই সতী-ধর্ম্ম। যে রমণী মূর্ত্তিমান দেবতা পতির তুষ্টি-সম্পাদনে অসমর্থ, অশরীরী স্বর্গীয় দেবতার সাধনায় সে কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? পার্থিব প্রত্যক্ষ দেবতা পতিকে পূজা-ভক্তি ও মিষ্ট কথায় তুষ্ট

করিতে না পারিলে, অজানা অজ্ঞাত দেশের অপ্রত্যক্ষ স্বর্গীয় দেবতার সন্তোষ-বিধান তাহার পক্ষে সুদূর-পরাহত। যিনি পতিভক্তিমতী তিনিই পরম সাধ্বীসতী। জগন্মাতা জগদম্বাও আদর্শ পতিভক্তিপরায়ণা বলিয়াই আদর্শ সতী। পতির জন্য আত্মবিসর্জ্জন না করিয়া তিনিও বিশ্বপূজ্যা বিশ্বনাথের মহিষী হইতে পারেন নাই।

একমাত্র পতি-পদ পূজা করিয়াই তাঁহার সন্তোষ-বিধান করা কি পতিব্রতা সতী হওয়া যায় না। পতিব্রতা সতী হইতে হইলে পতির প্রীতি-সম্পাদনার্থ তাঁহার পিতামাতা, ভাই-ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সকলকেই যথাযোগ্য সেবা-পরিচর্যা ও প্রীতিকর বাক্য দ্বারা আপনার জন করিয়া লইতে হয়। কেবল পতিকে লইয়াই পতিব্রতার সংসার নহে। স্বামীর আত্মীয়-স্বজন—এমন কি দাস দাসী ও গৃহ-পালিত পশু-পাখীটিকে পর্য্যন্ত লইয়াই পতিব্রতার সংসার। স্বামী-গৃহের সকলের সুখ-সুবিধার বিধান করিয়া—সকলের প্রীতি-সম্পাদনে পতির প্রাণে প্রীতির অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত করিয়া নিয়ত তাঁহার সুখ-শান্তি বর্দ্ধন করাই পতিব্রতা সতীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

অধুনা অনেক বড় ঘরের ললনারা—এমন কি, মধ্যবিত্ত ভদ্র ঘরের গৃহিণীগণও রন্ধন করাটা বড় ঘৃণাজনক কার্য্য বলিয়া মনে করেন। শ্বশুর-শাশুড়ী বা পতিসেবা, অন্যান্য গুরুজনের সেবা-শুশ্রূষা এবং পুরবাসীগণের পরিচর্য্যা এখন দাস-দাসীর কর্ত্তব্যকার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে দেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন মহা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজ-কুলবধূগণও এ সব কার্য্যে ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারাও সময়ে সময়ে স্বহস্তে দুই এক-খানি রসনা-তৃপ্তিকর ব্যঞ্জন বা মিষ্টান্ন প্রভৃতি রন্ধন পূর্ব্বক রাজভোগের সহিত প্রদান করিয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী ও দেবর-ভাশুর প্রভৃতি আপনার জনের মুখে তুলিয়া দিয়া আন্তরিক প্রীতি অনুভব করিতেন। পূর্ব্বকালের হিন্দু-মহিলাগণ শুধু পতির প্রতি ভক্তি-ভালবাসা প্রদর্শন করিয়াই আপনার বধূ-জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করিতেন না; তাঁহারা স্বামী-গৃহের সকলের প্রতি যথাযোগ্য মধুর ব্যবহারে প্রীতিসম্পাদন পূর্ব্বক বধূর কর্ত্তব্য পালন করিতেন।

জগন্মাতা অন্নপূর্ণার স্বহস্তে অন্ন-বিতরণ-সম্বন্ধীয় পূর্ব্ব বার্ত্তা, কর্ণ-রাজমহিষী পদ্মাবতী দেবীর অতিথির তৃপ্ত্যর্থে স্বহস্তে পুত্র-মুণ্ড রন্ধন কাহিনী দেবীর পুণ্য-প্রবাহ, পাণ্ডব-মাতা কুন্তী-দেবীর দুর্ব্বাসা মুনিকে স্বহস্ত-জাত মিষ্টান্ন (পায়সান্ন) ভোজন করাইবার সময় হস্ত পুড়িবার বিষয়, পাণ্ডব-রাজমহিষী দ্রুপদ-রাজনন্দিনীর স্বহস্তকৃত অন্ন-ব্যঞ্জনে ষষ্ঠী সহস্র শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা মুনির পরিতৃপ্ত ভোজনের অদ্ভুত-কাহিনী, রাজ-কন্যা সতী সাবিত্রীর দরিদ্র শ্বশুরভবনে স্বহস্তে যাবতীয় গৃহকার্য্য সম্পাদনবার্ত্তা এবং তাঁহার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামি-সেবার অপূর্ব্ব পুণ্য-কাহিনী পুরাণ-প্রসিদ্ধ মহাসত্য। রামায়ণে উক্ত আছে—শ্রীরামচন্দ্র বনগমন যাত্রার সময় যখন মাতার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ জন্য কৌশল্যা

দেবীর নিকট উপনীত হইলেন তখনও বধূ সীতা শ্বশ্রূমাতার দেবার্চ্চনার সহায়তার জন্য তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন; সুমিত্রা জননীও বীরবর লক্ষ্মণসহ দেবার শুশ্রূষার্থ তথায় উপবিষ্টা ছিলেন। কীর্ত্তিবাস প্রণীত রামায়ণে লিখিত আছে,—

"সীতাঠাকুরাণী গিয়া করিল রন্ধন।
চারিভাই এক ঠাই করিলা ভোজন॥
বানরেরে অন্ন দেন যতেক রমণী
হনুমানে অন্ন দেন সীতা ঠাকুরাণী॥

এই কবিতা পাঠে সীতাঠাকুরাণী যে স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন করিতেন, তাহা সুস্পষ্টই অনুমিত হয়। দেবাসুর যুদ্ধে ক্ষতাঙ্গ রাজা দশরথ রাজমাতৃষী কৈকেয়ীদেবীর ঐকান্তিক সেবা শুশ্রূষারই প্রাণে বাঁচিয়া ছিলেন। এসব কথা কবিকল্পিত নহে; ধ্রুব পৌরাণিক সত্য।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, তাওরাল রাজমহিষী স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুরের স্বর্গীয় জননী রাজ অন্তঃপুরস্থ পুষ্করিণী হইতে স্বহস্তে জল তুলিয়া স্বীয় শ্বশ্রূমাতার জন্য প্রত্যহ রন্ধন করিতেন। পুণ্যপবিত্রতাময়ী প্রাচীনা রাজমাতা সুদীর্ঘকাল পরহস্তজাত পক্কান্ন গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং পুত্রবধূ রাজমহিষাই শাশুড়ীঠাকুরাণীর জন্য রন্ধন করিতেন। এসকল পুণ্যবতী মহিলার কথা স্মরণ হইলে এখনও হিন্দু-গৃহ উচ্চ আদর্শশূন্য মরুভূমে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

"বধূ যে গৃহের সকলেরই সম্পত্তি কেবল পতির নহেন, এ সংস্কার এখনও এদেশে অনেক স্থলে আছে এবং এখনও অনেক স্থলে সমস্ত গৃহস্থের বধূ স্বরূপ কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। দশজনের সহিত কর্ত্তব্যে আবদ্ধ হইয়া দশজনের প্রীতি ও মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হইতে হইলে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীল হইতে হয়, স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপরতার অনুশীলন করিতে হয়, বিলাস-বিমুখ হইয়া সংযমী, মিতাচারী, জিতেন্দ্রিয় হইতে হয়। এই জন্যই স্বাধীন স্বতন্ত্র না থাকিয়া দশ জনের সেবক সেবিকা, শুভকারী শুভকারিণী হইয়া থাকিলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই স্বভাব বিশুদ্ধ, চরিত্র দেবতুল্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই দেশে এখনও অনেক দেবতুল্য নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়। নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, পূর্ব্বে আরও অনেক দেখা যাইত। এই বধূটী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, এই বধূটী অন্নপূর্ণা, এই বধূটী যেন দ্রৌপদী—বধূর এরূপ প্রশংসা এদেশে ভিন্ন অন্য কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। শুনিতে পাইবার উপায়ও নাই। যে বধূ কেবল পতিতে আবদ্ধ, হিন্দু-বধূর ন্যায় পতির মাতা, পিতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতিতে আবদ্ধ নহেন, এরূপ প্রশংসায় তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হয়। বধূ যেখানে দশজনের হইয়া দশজনের সেবায় প্রাণপাত করেন, দশজনের ভোগ-সুখেই আপনার ভোগ-সুখ অনুভব করেন, দশজনের শুভাশুভই আপন শুভাশুভ মনে করেন, কেবল সেইখানেই দশজনে 'বধূটী লক্ষ্মী', 'বধূটী দ্রৌপদী', 'বধূটী অন্নপূর্ণা' বলিয়া দশজনের কাছে দশ মুখে তাঁহার স্তুতিবাদ এবং খ্যাতি ঘোষণা করেন।"

ইহার পর এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব? —বলিবার প্রয়োজনই বা কি? আধুনিক বাঙ্গালী বধূগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের সুখ-স্বপ্ন পরিত্যাগ করিয়া সীতা-সাবিত্রী প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য-মহিলাগণের পদ-রেণু মস্তকে লইয়া তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিলে, এই দুঃখ-দারিদ্র্য-পূর্ণ বঙ্গ-গৃহই আবার স্বর্গীয় শান্তি নিকেতনে পরিণত হইয়া উঠিবে। প্রার্থনা—বঙ্গের প্রতিগৃহে আবার সীতা-সাবিত্রীর আবির্ভাব হউক, বঙ্গ-গৃহ আবার বধূর মধুর ব্যবহারে অনন্তকাল অমরাবতীর সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে থাকুক, ভাগ্য-দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদে আবার মরুভূমে স্বর্ণ-কমল প্রস্ফুটিত হউক, বঙ্গ-গৃহ হইতে শাশুড়ী-বধূতে মনোমালিন্য, দেবর দেবর-পত্নী ও ভাশুর-পত্নীগণের সহিত ঝগড়া-কলহ এবং ভগিনী-স্থানীয়া ননদিনীর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ চির বিদায় গ্রহণ করুক—বঙ্গগৃহ সুখ-শান্তির নিত্য আবাস-ভূমে পরিণত হউক।

আমরা এস্থলে সতী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পার্ব্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর উক্তি বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

একদিন দেবাদিদেব মহাদেব জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর নিকট "নারীধর্ম্ম" শ্রবণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলে ভগবতী পার্ব্বতীদেবী বলিয়াছিলেন,—

"পিতা-মাতা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনগণের নির্ব্বাচিত পাত্রে—তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী পরিণিতা হইয়া আজীবন সেই পতির প্রতি ভক্তিমতী থাকাই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তপস্যা ও স্বর্গ।"

রমণীর পতি-পদসেবা ব্যতীত আর পৃথক ব্রত, তপস্যা, ধর্ম্ম বা স্বর্গ নাই। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র পরমদেবতা, প্রাণাধিক বান্ধব এবং একমাত্র গতি; পতির স্নেহ-ভালবাসাই পত্নীর নিকট স্বর্গসুখ; রমণীর—স্বামীর ন্যায় সুখ-মোক্ষদাতা এমন পরম বন্ধু আর নাই। পতিই রমণীর একমাত্র দেবতা, বন্ধু ও জীবনসর্ব্বস্ব।

পতি কর্ত্তৃক অনাদৃতা অবহেলিতা স্ত্রীর স্বর্গ-লাভেও সুখ নাই - অনন্ত ঐশ্বর্য্যেও শান্তি নাই। সাধ্বীর নিকট পতি-প্রেম - পতির ভালবাসা স্বর্গাপেক্ষাও সমধিক আদরণীয় ও নিত্যস্পৃহনীয় স্বর্গীয় পদার্থ। পতি-প্রেমের তুলনায় কুবেরের রত্নভাণ্ডারও সতীর নিকট অতি তুচ্ছ।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকে! এখানে মুহূর্ত্তের জন্য একবার লঙ্কার রাবণের ন্যায় অনন্ত ঐশ্বর্য্য-ময় রাজাধিরাজের আদর্শ-সতী সীতার প্রতি মহাপ্রলোভন প্রদর্শনের কথাটা স্মরণ করুন।

পতি দরিদ্র, পীড়িত, জরাজীর্ণ, কুৎসিত কি ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত যাহাই কেন না হউন, তিনিই পত্নীর পরম দেবতা এবং সুখ-দুঃখ-প্রদাতা মূর্ত্তি-মান বিধাতা। পতিব্রতা নারী সদা সুপ্রসন্ন মনে, অকুণ্ঠিত প্রাণে, সেই পতিকেই জগৎপতি জ্ঞানে, নিয়ত অবনত-মস্তকে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিবে।

যে প্রিয়দর্শনা সুচরিত্রা রমণী প্রাণ গেলেও পতিকে একটি অপ্রিয়বাক্য—একটি কটু কথা বলে না, যে নারী সদা প্রীতি-মধুর অমিয় ব্যবহারে পতির প্রাণে প্রীতির অমৃতধারা প্রবাহিত করে, যে স্ত্রী পতির মুখ দর্শন করিয়াই স্বর্গসুখ অনুভব করে,—আপনার আহার-নিদ্রা বিস্মৃত

ইইয়া যে নারী সদা পতি-পদসেবা-রত থাকিতেই ভালবাসে, পতির ধর্ম্মই যাহার প্রাণের ধর্ম্ম, পতির ব্রতই যাহার একমাত্র ব্রতকর্ম্ম এবং পতি সেবাই যাহার একমাত্র সুখ-শান্তির নিদান —পতিই যাহার সর্ব্বস্ব ধন—এ সংসারে পূজা-ভক্তি ও ধ্যান-ধারণার একমাত্র পাত্র শ্রীনারায়ণ; স্ত্রীকুলে তিনিই ধন্যা—তাহারই নারীজন্ম সার্থক! আমি সেই পতিভক্তিপরায়ণা সতীনারীতে সর্ব্বদা অবস্থান করি।

একান্ত স্বামী-সেবা পরায়ণা পতিবশীভূতা রমণী—একমাত্র পতিসেবাতেই যিনি জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, পতি ক্রোধান্ধ হইয়া কটুবাক্য বলিলেও যে রমণী রাগ না করিয়া তাহার প্রতি নিয়ত প্রীতি-ভক্তি প্রকাশ করেন,যে স্ত্রী পরপুরুষের মুখাবলোকনেও একান্ত কুণ্ঠিতা, ঘৃণিত কুষ্ঠাদি জরাগ্রস্ত গলিতাঙ্গ বিপদগ্রস্ত পতিকেও যে রমণী কায়মনোবাক্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে সদা সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকে, যে নারী পুত্রবতী, কার্য্যদক্ষা, নিত্য পতিভক্তিপরায়ণা, যে রমণী ধন-ঐশ্বর্য্য ও বিলাসিতা হইতে দূরে অবস্থিত রহিয়া ও সদা স্বামীর প্রতি একান্ত যত্নবতী, যে স্ত্রী প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক গৃহ-মার্জ্জন, গোময় দ্বারা গৃহ-লেপন, পতিসহ যাগ-যজ্ঞ ও ব্রত নিয়মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, যে রমণী অনুগত দীন-দুঃখী জনের প্রতি কৃপা প্রদর্শন, অতিথিসেবা ও শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের সেবা শুশ্রূষাপরায়ণা,—সেই সতী-লক্ষ্মী গুণবতী মহিলার নিঃসন্দেহ স্বর্গলাভ হয়।

ইহা আদ্যাশক্তি সতীশিরোমণি জগজ্জননী ভগবতীর উক্তি। ইহার উপর আর টীকা টীপ্পনী অনাবশ্যক; দেববাক্য ধ্রুবসত্য।

একদা রুক্মিণীদেবী স্বর্গধামে লক্ষ্মীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাঁহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার সহিত মধুর আলাপে মগ্ন হইলেন। অমৃতভাষিণী দেবীদ্বয় নানারূপ প্রীতিকর আলোচনায় একে অন্যের প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বহু কথার পর, রুক্মিণীদেবী লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসিলেন,—"দেবি! তুমি কিরূপ মহিলাদের নিকট সর্ব্বদা অবস্থান কর?—আর কিরূপ আচরণ করিলেই বা রমণীগণ তোমার চিরপ্রিয় হইতে সমর্থ হয়? তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বল।"

রুক্মিণীর কথা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবী মৃদুমধুর হাসিয়া অমিয়মধুর-ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয় ভগিনি! একান্ত পতিভক্তিপরায়ণা সতী রমণীগণই আমার চিরপ্রিয়; আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করিতে ভালবাসি না। পতিভক্তিহীনা কামিনীগণ শতগুণবতী হইলেও আমি ঘৃণার সহিত তাহাদের সহবাস পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

যে সকল সতীনারী পতি ব্যতীত অপর পুরুষের মুখাবলোকনেও একান্ত কুণ্ঠিতা, সেই সব পতিব্রতা সতীর গৃহে আমি চির-অচলা—নিত্যবদ্ধা।

পতি, দেবতা ও ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তিমতী, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পতিসেবাপরায়ণা, মিষ্ট

সত্যভাষিণী ও প্রিয়বাদিনী, পতিশুশ্রূষাকারিণী চির-শুচিসম্পন্না, পুণ্য-পবিত্রতাময়ী সদা জিতে-ন্দ্রিয়া, ক্ষমাশীলা ও ব্রতপরায়ণা সরলা মহিলা-গণই আমার চিরপ্রিয় জীবনসঙ্গিনী, আমি সর্ব্বদা তাহাদের নিকট বাস করিয়াই প্রাণে পরম প্রীতিলাভ করি। আমি পতিব্রতা সতীর পুণ্য সংসর্গ ছাড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র অব-স্থান করি না। ফলতঃ এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"পতিব্রতা সতী যথা করে অবস্থান,
জানিবে লক্ষ্মীর তথা নিত্য অধিষ্ঠান।"

অতঃপর লক্ষ্মীদেবী স্বীয় অপ্রিয় মহিলাদের বিবরণ বলিতে লাগিলেন।

ছলনা-চাতুরী ও প্রতারণাময়ী, কুটিলস্বভাবা মিথ্যাবাদিনী, কর্কশভাষিণী, পতির অপ্রিয়-বাদিনী, পতি ব্যতীত পর-গৃহে বাসাভিলাষ-কারিণী, পতি হইতে অন্যকে অধিকতর স্নেহ-কারিণী, পর-পুরুষসহ আলাপকারিণী, দয়া-মায়া ও লজ্জাহীনা, মুখরা, কলহপ্রিয়া, নিদ্রা-পরায়ণা, সদা বিরক্ত চিত্ত, অশুচি, অপরিণাম-দর্শী, গৃহকার্য্যে শৃঙ্খলাবিহীনা, গৃহ-সামগ্রীসমূহ অযত্নে বিক্ষিপ্তকারিণী, উচ্ছৃঙ্খল ও অলস প্রকৃতির রমণীগণকে আমি নরকের কীটের ন্যায় আন্তরিক ঘৃণা করি এবং সর্ব্বদা তাহাদের ঘৃণিত সহবাস হইতে দূরে অবস্থান করি।

ইহা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর উক্তি। ফলতঃ পতিব্রতা সতীই যে বিশ্ববরণীয়া ও একমাত্র সর্ব্বত্র আদরণীয়া মহিয়সী-মহিলা, তাহাতে সন্দেহ নাই! পক্ষান্তরে নীচপ্রকৃতি পাপমতি অসতী রমণীকে শুধু বিশ্ববাসী নরনারী কেন, স্বর্গের দেব-দেবীরাও যারপরনাই ঘৃণা করিয়া থাকেন। অসতী-গৃহ চির লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মী-দেবী ভ্রমেও একবার সে পাপগৃহে পদার্পণ করেন না। সুতরাং চির দারিদ্র্য তাহার অনিবার্য্য, ঘোর দুর্গতি তাহার অদৃষ্ট-লিপি, অনন্তলাঞ্ছনা তাহার বিষময় কর্ম্মফল, বিশ্ববাসীর নিন্দা, ঘৃণা তাহার নিত্য আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্য এবং ক্রিমিকীটপূর্ণ পূরীষ-দুর্গন্ধময় নরকের দ্বার তাহার জন্য সদা উন্মুক্ত।

সতী—জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর অংশ—সতী মানবী বেশে মূর্ত্তিমতী ভগবতী—সতী স্বর্গের দেবী, তাই এ বিরাট বিশ্ব সতীপদে চির-প্রণত।

সতীর এত গৌরব বলিয়াই সতী লক্ষ্মীদেবীর এত আদরের ধন—সতী-গৃহ লক্ষ্মীদেবীর চির প্রিয় নিকেতন। ফলতঃ—

"সতীই জগৎ পূজ্যা দেবী ভগবতী,
যাঁর গৃহে চিরকাল লক্ষ্মীর বসতি।"

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

জাতিভেদ ও একাচার।

একাচার কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সাধারণ কথায় আহার সম্বন্ধে, মানব সমাজে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকার নাম—একাচার। আজকাল বঙ্গদেশের মানব মাত্রকেই একাচারী বলা যাইতে পারে। কারণ, পূর্ব্বাপর প্রথা প্রচলিত আছে যে, প্রভু যে প্রকারের আচার ব্যবহারের লোক হয়েন, চাকরও প্রভুর আচরণ

অনুসারে সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় প্রজাগণের প্রভু, ইংরাজগণ মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া শিক্ষিত সমাজে যে ভুলধারণা জন্মিয়াছে, তাহার ফলে, এই প্রকার জাতিভেদ রহিত বা একজাতিত্ব অথবা সাধারণ কথায় একাচারী হইবার পথ সকলকেই পরিষ্কার করিতে দেখা যাইতেছে। ইংরাজগণ সকলের অন্ন গ্রহণ করেন বলিয়া যে, তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, এ কথা ধারণা করা সঙ্গত নহে। দেশকালপাত্র বিশেষে সকল নিয়ম সকল স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ ইংলণ্ডে দেশকালপাত্র ভেদে আহার সম্বন্ধে কোন ভেদাভেদ না থাকিলেও জাতিভেদ-প্রথা অনেকদিন হইতে বর্ত্তমান আছে। এমন কি এখনও হইতেছে। 'স্পেন্সার' তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

"Some men become manufacturers, others have remained cultivators of soil. In Lancashire, millions have devoted themselves to the making of cotton fabrics. In Yorkshire, another million lives by producing woollens; and pottery of Sheffeld, the hardware of Birmingham severally occupy their hundreds of thousands These are large facts in the structure of English Society; but we can ascribe them neither to miracle, nor to legislation.

(Essays Vol. 1. p. 385.)

এইরূপে ইজিপ্ট, পারস্য, গ্রীক ও রোম প্রায় সকল দেশেই জাতিভেদের অস্তিত্ব প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই প্রকার বঙ্গদেশেরও দেশকাল-পাত্র অনুসারে জাতিভেদ-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আহার সম্বন্ধেও বাঁধাবাঁধি নিয়মের প্রথা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে এবং ঐ প্রথা জাতিভেদের একটী প্রধান অঙ্গস্বরূপ, চিরদিনই সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও ছিল, কিন্তু এখন ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ সকল আর্য্যঋষি-প্রণোদিত প্রথাসকল একেবারে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে।

আজকালকার শিক্ষিত সমাজে আরও এক আশ্চর্য্য মনের বিশ্বাস দেখিতে পাইতেছি, সংস্কৃত কিংবা বাঙ্গালায় যদি কোন কঠিন তত্ত্বের আলোচনা থাকে, তবে সেই সকল বিষয়ের মীমাংসার জন্য শিক্ষিত মহোদয়গণ মস্তিষ্কের কিছুমাত্র আলোড়ন না করিয়াই সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ সমস্ত তত্ত্বগুলি ভ্রমাত্মক। কিন্তু ঐ বিষয় আবার যদি কোন ইংরাজী পুস্তকে বাহির হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কৃতবিদ্য মহাশয়েরা তৎক্ষণাৎ উহার সমর্থনের জন্য স্বর্গ-মর্ত্ত্য বিচলিত করিয়া ফেলেন। কিন্তু তাঁহাদের অবশ্য ইহা ধারণা করা উচিত যে, ইংরাজী-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা ভাষায় সে তত্ত্বগুলিও বুঝিবার জন্য তদপেক্ষা বেশী অথবা সেইরূপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু শিক্ষিত মহোদয়গণ তাহা কিছুমাত্র না বুঝিয়াই উহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিয়া বসেন। ইহার একমাত্র কারণ,—একাচার বা একজাতিত্ব। আবার অনেকেই এক্ষ

জাতিভেদের কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁহারা বলেন—"জাতিভেদ কি? জাতিভেদ ত ব্রাহ্মণের সৃষ্ট। পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণগণ সমাজে প্রধান ছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া যাহা করিতেন, তাহাই অক্ষুণ্ণ থাকিত। অতএব জাতিভেদ কিছুই নহে।" কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণাও যে একান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার কারণ, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা নির্দ্দিষ্ট কালে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অথবা স্বয়ং ভগবানও জাতিভেদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। অর্থাৎ এমন কোন সময় হয় নাই, যখন সমস্ত হিন্দুগণ একত্রিত হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ, কতকগুলি ক্ষত্রিয়, কতকগুলি বৈশ্য এবং কতকগুলি শূদ্র ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিম্বা উক্ত প্রকার শ্রেণীবিভাগ ভগবান করিয়াছিলেন। তবে হিন্দুসমাজে বা হিন্দুদের মধ্যে যে ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত আছে বা ছিল, সেই শক্তির প্রভাবেই কালসহকারে সমাজমধ্যে চারিটী বর্ণের সৃষ্টি হয়। অতএব স্বয়ং ভগবান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জাতিভেদের কর্ত্তা না হইলেও প্রকারান্তরে তিনিই যে এই শ্রেণীবিভাগের কর্ত্তা, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। পরন্তু "ব্রাহ্মণেরাই জাতিভেদের কর্ত্তা" প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এ সম্বন্ধে এ স্থলে স্পেন্সার হইতে দুই চারিটী কথা উদ্ধৃত হইল, ইহাতেই সকলে অনুভব করিতে পারিবেন।

"You need but to look at the changes going on around, or observe social organisation in its leading peculiarities to see that these are neither supernatural, nor are determined by the wills of individual men as by impliction historians commonly teach; but are consequent on general natural causes. The one case of the division of labour suffices to show this."

Spencer's Essays Vol. 1. p. 385.

ফলতঃ ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছে, একথা বলিলে এক অতি অসম্ভব কথা বলা হয় না কি? আর যদি তাহাই স্বীকার করা হয়, তবে একবার মানস-চক্ষে ভাবিয়া দেখিলেই সমগ্র বুঝা যাইতে পারে। যেদিন ব্রাহ্মণেরা ঐ প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, মনে করুন, সেই দিন সমস্ত জনমণ্ডলী এক বিস্তীর্ণ মাঠে একত্রিত হইল। এখন ব্রাহ্মণ বা রাজা ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করিবেন। রাজা বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা কর, তাহারা আমার ডান দিকে উপবেশন কর।" ইহাতে কয়জন লোক ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ না করিবে? তাহার পর রাজা বলিলেন—"যে শূদ্র হইতে ইচ্ছা কর, সে আমার বামদিকে আইস।" ইহাতেই বা কয়জন উচ্চশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া নিম্নশ্রেণীতে পরিণত হইবে? এই গেল এক কথা; পরন্তু যদি রাজসিক শক্তিতে বলপূর্ব্বক কাহাকে ব্রাহ্মণ ও কাহাকে শূদ্র করা হয়, তাহা হইলে সেই স্বকীয় বিভাগ কয়দিন সমাজে বজায়

থাকিবে? এ সম্বন্ধেও স্পেন্সার যাহা বলেন, তাহাও বলিতেছি,—

"The failure of Cromwell, permanently to establish a new social condition, and the rapid revival of suppressed institutions and prectices after his death, show how powerless is a monarch to change the type of the society which ge governs. He may retard he may disturb, or he may aid the netural process of organisation,bnt the general course of this process is bevond his control.

Spencer's Essays Vol. 1.

p. 387—388.

শুনা যায়,—রোমে 'সেন্সার' নিযুক্ত করিয়া প্রজাদের শ্রেণীবিভাগ বা জাতি নির্দেশ করা হইত। 'সেন্সারের' কথায় এক ব্যক্তি নিজ শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত বা অবনীত হইতে পারিত। কিন্তু সে প্রথা সত্য হইলেও তাহা যে কত ভয়ানক, একবার চিন্তা করিলেই অনুমিত হয়। আর যদি তাহা স্বীকারও করা হয়, তথাপি 'সেনসাররা' জাতিভেদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। রোমের পঞ্চম রাজা 'সার্বিয়স্ টলিয়সের' সময় 'সেনসার' পদের প্রথম সৃষ্টি হয়। যদি 'সেন্সাররা' জাতিভেদের স্রষ্টা হইতেন, তাহা হইলে, 'রমূলসের' সময় হইতেই উঁহাদের অস্তিত্ব দেখা যাইত। তদ্ভিন্ন 'সেনসারের' কার্য্যপ্রণালী দেখিলেও তাঁহাদিগকে শ্রেণীবিভাগের স্রষ্টা বলিয়া বোধ হয় না। 'সেন্সারগণ' রোমের অধিবাসীদিগকে তাহাদের নাম জাতি, ব্যবসায়, সম্পত্তি, গোত্র, প্রভৃতির বিষয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহারা নিজেই যদি শ্রেণীবিভাগের কর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে এরূপ প্রশ্ন কখনই জিজ্ঞাসা করিতেন না। ফলতঃ পূর্ব্ব হইতেই সামাজিক নিয়মের বলে রোমের সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। 'সেন্সাররা' ঐ সমস্ত শ্রেণী বিধিবদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিয়া রাখিতেন। অন্যান্য সমাজেও ঐরূপে ক্রমে আপনা হইতেই শ্রেণীবিভাগ সংগঠিত হয়; পরে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও শ্রেণী বা ব্যবসায়গত অসুবিধা দূরীকরণার্থে ঐ শ্রেণীগুলি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে লিখিত ও বিধিবদ্ধ করিতে হয়। হিন্দু-সমাজেও কাল-সহকারে সামাজিক নিয়মবলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সংগঠিত হইয়াছিল। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি পুস্তকে সেইগুলি সুশৃঙ্খলরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইংরেজেরা এ দেশের বিন্দুবিসর্গও সংবাদ না রাখিয়াই ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাহাতে তাঁহাদের ইতিহাস ভ্রমাত্মক হইবারই কথা; কিন্তু সর্ব্বত্রই সংস্কৃত-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মা অর্থাৎ জগদীশ্বর অথবা সমাজের অধিষ্ঠাতা দেবতাই জাতিভেদের সৃষ্টি করেন। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ময়াসৃষ্টং", ফলতঃ, ব্রাহ্মণেরা জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন শাস্ত্রেই এই অদ্ভুত মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবেই বুঝিতে হইবে যে, স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দু-সমাজে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অতএব স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্ত্তন

করিয়া কোন প্রথাই নূতন করিয়া সৃষ্টি করা কাহারও উচিত নহে অথবা পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা উচিত নহে। যাহাতে বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ-প্রথা চিরদিনের মত বদ্ধমূল থাকে, আজকাল সকলেরই তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

আলোচনার "আত্মকথা"।

"আলোচনার" আত্মকথা ধ্বনিত করিবার লোভ সংবরণ করা আমাদের অসাধ্য। অন্যান্য পত্রিকা যতটা সাহিত্যের ভার বহন করে, ততটা সত্যের ভার বহন করে না। তাহাদের মর্ক্কা হইল—ভাল কাগজ, বিবিধ ছবি, ভাল ছাপা এবং নির্ভুল মুদ্রণ। এগুলি প্রশংসনীয়—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু এইগুলির ঠিক আসন কোথায়, তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজন ও প্রসাধন—ইহাদের কোনটি নিষ্পাস্ত তাহা পত্রিকা পরিচালকগণের অবধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা এই বিষয় চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়াছি যে, আমরা যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে খাঁটি মাল পাতার ঠোঙ্গায় এবং মৃৎপাত্রেই বাজার দরের কমে বিক্রয় করিব; লেবেলের এবং প্যাকিংএর বাহার দিয়া গ্রাহক আকর্ষণ করিব না। আমাদের উদ্দেশ্য এই দেশী কাগজকে আমরা দেশী ঢংয়েই চালাইব। পর্ণকুটিরেই এবং নিরাবৃতগাত্রেই প্রাণের কথার এবং মনের ব্যথার বেচা-কেনা করিব। আমরা বুঝিয়াছি—আমাদের আটচালার রন্ধনশালা উঠিয়া যাওয়াতেই অন্নপূর্ণা অন্তর্ধান করিয়াছেন এবং হর্ম্ম্যের পাকশালায় বাবুর্চ্চি বসিয়া দৈন্যকে নিত্যই নিমন্ত্রণ করিয়া পুষ্ট করিতেছে। সুখের বিষয় ছিল তখন, যখন কবিরাজের ঔষধালয় আলমারির মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া বনের এবং জঙ্গলের মধ্যে বিস্তৃত ছিল, তাই তখন রোগ অল্প খরচে সারিত এবং মানবকে আক্রমণ করিবার লোভও তাহার অল্প ছিল। এই সকল কারণে "আলোচনার" সাহিত্যের মধ্যে মুখরোচক পদার্থ যত থাকুক আর নাই থাকুক, পুষ্টিকর পদার্থের অভাব হয় না। ইহাতে মায়ের ঘরের অন্ন-ব্যঞ্জন কলার পাতেই বণ্টন করা হয়। আমরাও আশা করি—পাঠকগণ নগ্নমাত্রেই প্রাণের ক্ষুধায় এই সকল পাঠ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। সত্য কথা বলিতে কি?—আমরা পাঠক চাহি না—সাধক চাই; গ্রাহক চাহি না—প্রচারক চাই। "আলোচনার" প্রচারক নহে, দেশে আলোচনা প্রবুদ্ধ করিবার।

সাহিত্য বলিলে আমরা ভাষার চমৎকারিত্ব বুঝি; সেই জন্য সাহিত্যসেবকদের মধ্যে ভাষার সৌখীনই অধিক দেখিতে পাই। তাহাদের চিন্তা সেই জন্য ভাষার জাঁকজমকে পোষাক পরিয়াই বাহির হয় কিন্তু তাহাতে মানুষের জন্য দরদ ব্যক্ত থাকে না। আমাদের আলোচনার ভাষা এদেশীয় সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্ব্বত্যাগী কিন্তু সন্ন্যাসীর মতই বিশ্বগ্রাসী। বঙ্গদেশে কিসে কর্ম্মিষ্ঠ, বলিষ্ঠ এবং চিন্তাশীল লোকের আধিক্য হয়, কিসে ধর্ম্মের কমল হয়, ত্যাগের মাহাত্ম্য বাড়ে—এই সমস্তই "আলো-

চনার” সমস্ত চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কিসে আমাদের স্কুল ছেলেগুলি জগতের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং বরণীয় হয়; কিসে ভাত-কাপড়ের বাহিরে গিয়া তাহারা মানুষ হইতে পারে, তাহাই আমাদের অবধার্য্য। আমরা রংতামাসার পক্ষপাতী নহি। আমরা নবযুগের প্রাচীন পুরোহিত—আশার মন্ত্র প্রচার করিবার জন্যই আমাদের জন্ম। ইহা আত্ম-প্রশংসা নহে; আত্ম-ঘোষণা, লোককে জাগরিত করিতে হইলে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণার প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের গুরুভারমোট বহন করিতে “আলোচনা” দীনভাবে সর্ব্বদাই সম্মত। সম্পাদক।

সমালোচনা।

শান্তি-গীতা।—সানুবাদ (পদ্যে)। শ্রীনকড়ি রায় গুপ্ত কর্ত্তৃক অনূদিত এবং কালাঘাট শিবশক্তি-প্রদায়িনী সভা হইতে প্রচারিত। মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র। “শান্তি-গীতা” হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তক; ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা আমাদের ন্যায় লোকের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। ইহার সমালোচনা করাও বড় সহজ নহে—একখান পুঁথি লিখিতে হয়, তাহাও আবার শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বিদ্যা-চর্চ্চা করিয়া করা কিয়ৎপরিমাণে হইতে পারে। সে প্রকার আমাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব, সেই জন্য আমরা এই বিষয়ে নীরব থাকিব। পাঠক মনে রাখিবেন সাহিত্যের দিক হইতে আমরা এই পুস্তকের বিচার করিতেছি। পুস্তকখানির পদ্যানুবাদ একবার মাত্র পাঠ করিলেই অনুবাদকের ক্ষমতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। অনুবাদগুলি সত্যসত্যই মূলানুযায়ী হইয়াও “কৃত্তিবাসের রামায়ণের” ন্যায় মৌলিক বলিয়া মনে হয়। অনুবাদে দেবভাষার পবিত্রতা কোথাও কিছুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে। মাতৃ-দুগ্ধ যেমন স্বর্গীয় সুধার সহিত অনায়াসেই তুলিত হইতে পারে, এই পুস্তকের অনূদিত পদ্যগুলিও আমাদের মাতৃ-ভাষায় হইলেও দেব-ভাষার সহিত তুলিত হইবার যোগ্য। পুস্তকখানি শ্রীমদ্ বিপিনবিহারী দেবশর্ম্মা বেদান্তভূষণ মহাশয়ের উপদেশ ও নির্দ্দেশ মত প্রচারিত হইয়াছে, ইহাতে ইহার গৌরব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ তৃপ্তিজনক।

Sanskrit Translation and Composition—আমরা শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ প্রণীত উক্ত পুস্তক উপহার পাইয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় বহুদিন হইতে ইংরাজী স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি বালকগণকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও অনুবাদ করিবার জন্য যে সকল সরল ও সহজ পন্থা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে বালকগণ অনায়াসেই সংস্কৃত শিক্ষা ও অনুবাদে পরিপক্ক হইতে পারিবে। আমাদের বিবেচনায় টেক্‌ষ্টবুক কমিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ এই পুস্তকখানিকে ইংরাজী বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিলে ভাল হয়। মূল্য ॥০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—কর্ম্মযোগ প্রেস, হাওড়া।

শিবরাত্রির ব্রতকথা। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ।০ আনা গুরুদাস লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। “শিবরাত্রির ব্রতকথার” ভাল পুস্তক তেমন পাওয়া যায় না। অথচ শিবরাত্রিব্রত হিন্দুর অবশ্য প্রতিপাল্য। আলোচ্য ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। পয়ারাদি ছন্দে গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে বেশ মুখরোচক করিয়াছেন; স্ত্রীলোকেও ইহা পাঠ করিয়া শিবপূজা ও শিবরাত্রিব্রত পালন করিতে পারে। ছাপা ও কাগজ ভাল। হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেই ইহার আদর বাঞ্ছনীয়।

——:০:——

বাক্‌দেবী স্তুতি।

বিরচিতে বাঞ্ছা বটে, বিদ্যা-বিধায়িণী,
বিচিত্র বারতা! বিনা বর বরষণে,
বামন বাসনা ব্যোমে বিধুর বন্ধন।
বীণাপাণি বিতরিয়া বিশ্বে বিশ্বদারা
বিমানে বিতলে বসি, বাক্‌সিদ্ধি বাণ;
বসুন্ধরা বাসি (যাহে) বীর বিশ্বমাঝে।
বন্দিতে বাসনা বীণা বজ্রপাণি বামে,
বিতরণে বারি-বিন্দু বাক্য-বাক্‌বাদিনী,
বধির বামনে বাঁধ (মাগো) বীণাপাণি।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম তত্ত্ব।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা উত্থাপন করিলেই নব্য সম্প্রদায়ের সভ্যেরা নাসিকাগ্র আকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। আজকাল জাতিভেদ সমর্থন চেষ্টা ইংরাজী শিক্ষাভিমানী হিন্দুর নিকট ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদবিহিত বর্ণধর্ম্ম [illegible] পরিহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] ইংরাজ আমাদের শিক্ষক, তাই আমরা ইংরাজের দোহাই দিয়া সকল কথার মীমাংসা করিয়া থাকি। বর্ণাশ্রমের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার নিমিত্ত ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভিন্নধর্ম্মী, পানাহার-প্রমত্ত ইংরাজ ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব কি বুঝিবে?

ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব রায় মহাশয়ের

বংশদণ্ড বিপনীই উপজীবিকা। কিন্তু পংক্তি ভোজনকালে তিনি তাঁহার বংশমর্য্যাদা রক্ষণে অতিশয় পটু। লক্ষপতি বস্তুজাই হউন, আর বেদান্তজ্ঞ দত্তজাই আসুন, সাধ্য কি যে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কেহ সপিষ্টক কদলীপত্র অধিকার করেন। অর্থ বা বিদ্যার বলে বংশদণ্ড প্রহার বেদনার অতীত হওয়া যায় না। আহা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কি প্রভাব।

স্থূলকায় হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণের প্রসাদভক্ষণে বর্ণধর্ম্ম সম্মানিত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু গৌর তনু শুভ্রনাসা খৃষ্টিয়ান ইংরাজের সহিত এক শ্যামপর্ণিরস (চা) পান করিলেই সমাজভ্রষ্ট হইতে হয়।

এই ত তোমার বর্ণধর্ম্ম। ধিক্ হিন্দুত্বকে, যাহা এই বিষমবাদ পোষণ করে।

সাম্যবাদী সম্প্রদায়ের এইরূপ নিন্দাবাদ সাদরে স্বীকার করি। স্বীকার করি বলিয়াই সাহেবের সহিত ঘোষণা করিতে পারি যে, বংশদণ্ড ব্যবসায়ী রায় মহাশয় ও হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণবর ও নব্য হিন্দুসন্তান—তিনজনে মিলিয়া মিশিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নাশে বদ্ধপরিকর হওয়াতে ভারতের পুনরভ্যুত্থান এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

একনিষ্ঠতাই হিন্দুত্বের ভিত্তি। সমষ্টির ভিতর দিয়া ব্যষ্টিকে দেখা—একের গর্ভে বহুত্বের সমাধান করাই একনিষ্ঠতা। কিন্তু কি প্রকারে এই একনিষ্ঠতা বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপে প্রকটিত হইয়া হিন্দুজাতিকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

শূদ্রজাতি বিদ্বেষী বলিয়া যে বর্ণধর্ম্মের নিন্দা আছে, তাহা অমূলক। পুরাকালের কৃষ্ণকায় কাষ্ঠপ্রস্তর ভূতপ্রেতাদিপূজক অনার্য্যেরাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইত। তাহারা আর্য্যতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহাদের সহিত সংমিশ্রণে পাছে আর্য্যরক্ত দূষিত হয় ও সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয় ও বেদধর্ম্মের বিঘ্ন হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে দূরে দূরে রাখিতে হইয়াছিল। কোন উচ্চ জাতির সহিত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীচজাতির সহিত সম্মিলনে ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। গরীয়ান অংশ লঘু হইয়া পড়ে ও গরীয়ানেরও স্বাভাবিক তেজ অবসন্ন হইয়া যায়। আমাদের দেশের ফিরিঙ্গিরা বিষম সংযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। সঙ্কর সৃষ্টি বিভ্রাট নিবারণের জন্যই সংহিতাকারেরা শূদ্র জাতি সংসৃষ্ট অন্নপানীয় পর্য্যন্ত পরিহর্ত্তব্য বলিয়া বিধি দিয়াছেন। আমাদের স্বভাব এই যে, যাহাদের সহিত আমাদের আহার পানীয়, তাহাদের সহিত আমাদের আদান প্রদান হইয়া থাকে। আমাদের নিকট আহার-সংসর্গ সামাজিক সমভাব পরিচায়ক। এই প্রাচ্য সহৃদয়ভাব বেগ বিধি নিষেধাদি দ্বারা সুনিয়ত হওয়াতে আর্য্যজাতির বর্ণ ও ধর্ম্ম ও শুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছিল। যদি দূরদর্শী শাস্ত্রকারেরা শূদ্রের সহিত আচার ব্যবহার সুদৃঢ়রূপে বিধিবদ্ধ না করিতেন তাহা হইলে আমাদের যেটুকু আর্য্যত্ব অবশিষ্ট আছে, তাহাও থাকিত না। বীরপ্রসূ রাজপুতানা আজ পরিস্তৃত—নাসিকা আর পিঙ্গলাক্ষিতে ভরিয়া যাইত। অনন্তমাধুরীজড়িতা কমলমুখী হিন্দুরমণীর স্থানে চিপ্পুকপালী ও উন্নমুখীরা কারাকানন শোভিত

করিতেন। ইহুদি বিধি প্রবর্ত্তক মুশা অনীশ্বরোপাসক ইতরজাতিগণকে যত কঠোররূপে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়াছেন, মন্বাদি সংহিতাকারগণ বোধ হয় তত কঠোরতার পরিচয় দেন নাই। সাধারণ তন্ত্র সভ্য মার্কিনদেশে শ্বেতচর্ম্ম ও কৃষ্ণচর্ম্মে এখনও যে কঠিন ব্যবধান আছে, পূর্ব্বকালে আর্য্য ও অনার্য্যে তত প্রভেদ ছিল কি না সন্দেহ। এরূপ সামাজিক ব্যবধান ত অনেক সময়ে মঙ্গলপ্রদ। মেলন প্রভৃতি যদি স্বৈরিণী হয়, আর কোন প্রকার বিধি না মানে তাহা হইলে ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা চলিয়া যায়। বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি ভয়েই এই আর্য্যানার্য্যের মধ্যে আহার পানাদি সম্বন্ধীয় ব্যবহারগত ভেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরমার্থহানিরও ভয় ছিল। কেন না, অনার্য্যেরা সংস্কারহীন প্রবৃত্তি প্রণোদিত মার্গের উপাসক ছিল। যেমন আধুনিক মার্জ্জিত মতাবলম্বীরা কুসংস্কার বশতাপন্ন পরিবারে কন্যাদান করিতে কুণ্ঠিত হন, তদ্রূপ আর্য্যেরাও পারলৌকিক ইষ্ট হানির ভয়ে শূদ্রগণের সহিত আদান প্রদান করিতেন না। কিন্তু এই ভেদ জন্য কঠোরতা ক্রমশঃ শ্লথ হইয়াছিল। যেমন অনার্য্যেরা আর্য্য সহবাসে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে লাগিল তেমনি তাহাদের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে উদারতা বাড়িতে লাগিল। মনুর বিধি অনুসারে—যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাসকর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে তাহাদের অন্ন ভোজন করা যায়। (মনুসংহিতা ৪, ২৫৩) পরাশর সংহিতাতেও একাদশ অধ্যায়ে শূদ্রের অন্ন ভোজ্য এইরূপ বিধি আছে।

আরও দেখা যায় যে, এই আহার পান নিষেধ আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মুসলমানের জল পর্য্যন্ত ছুঁইতে নাই—এইরূপ কঠোর বিধি যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটা জাতি বিভ্রাট ঘটিয়া যাইত। শনি যেমন স্নানের জলের ছুতা করিয়া শ্রীবৎস রাজাকে পাইয়া বসিয়াছিল, তেমনি মুসলমানেরা পানীয় জলের ছুতা করিয়া তাহাদের হিন্দুরমণী পরিণয়লিপ্সা চরিতার্থ করিয়া ফেলিত। অগ্রেই বলা হইয়াছে যে, অন্নভোজন আমাদের কাছে সামাজিক নৈকট্য অথবা মিলনের প্রবর্ত্তক ও পরিচায়ক, সাহেবদের নিকট তাহা নহে। তাহারা তাহাদের জুতাবরদারের হাতে খাইতে পারে এবং জুতাও মারিতে পারে। আমাদের নেতারা তাই গোড়া মারিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসলমানের সব লওয়া হইল—পোষাক, ব্যবহার, বিদ্যা, রীতিনীতি, কিন্তু জলটা বন্ধ। এই কঠোরতা আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এই ত গেল আর্য্যানার্য্যের ভেদ বৃত্তান্ত। মিলনের উন্নতি হয়, কিন্তু মিলন ঘটিবার পূর্ব্বে মেলনীয় বস্তুর কতকটা পরিপুষ্টি আবশ্যক। সেই পরিপুষ্টির জন্য ভেদ ব্যবধানের প্রয়োজন হয়। এ কথাটা সত্য বটে। কিন্তু বংশদণ্ড ব্যবসায়ী রায় মহাশয়কে বা হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণ সন্তানকে যে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা দেওয়া হয়, তাহা কি ঘোর অন্যায় নহে? ব্রাহ্মণ সন্তান

হইলেই হইল। তাহার কর্ম্ম দেখিবার আবশ্যক নাই, জন্ম দেখিলেই হইবে। ইহা কে অস্বীকার করিবে যে, জন্মগত মর্য্যাদাই বর্ণ ভেদের মূল? এই অসঙ্গত অন্যায্য প্রথা যে মানব সমাজে কখন চলিয়াছে বা চলিতে পারে, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইরূপ বর্ণভেদ বিধি কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দিলে ভাল হয় না?

স্থিরোভব।

সকল সংহিতার বিধি এই যে, কর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই বর্ণমর্য্যাদা নষ্ট হয়। মনু বলিয়াছেন—চোর, নাস্তিক, বেদাধ্যয়ন শূন্য প্রতিমা-পরিচারক দেবল, মাংস বিক্রয়ী, বাণিজ্যজীবী, রাজভৃত্য, কুসীদজীবী, পশুপালক, মিথ্যাসাক্ষীর সৃষ্টিকর্ত্তা, নিষ্ঠুরভাষী, সোমলতা বিক্রয়ী ও মদ্যপায়ী প্রভৃতি আচারহীন ও উন্মার্গগামী ব্রাহ্মণগণকে দেব্য ও পৈত্র্য উভয় কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবে। পরাশর সংহিতানুসারে উপাসনা-বর্জ্জিত, বেদাধ্যয়ন রহিত ব্রাহ্মণকে বৃষল বলেন। আর্য্য সন্তানদিগের নিকট কুলগত কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা অধিকতর কাপুরুষতা আর কিছুই ছিল না। কোন দ্বিজ যদি কৌলিক ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া উপায়ান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে যাইত, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার আর সীমা থাকিত না। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ—এই বাক্য শ্রবণ করিলে কোন্ হিন্দুর শোণিত প্রবাহ খরতর না বহিতে থাকে? বর্ণধর্ম্ম কর্ম্মকে অবহেলা করিয়া মর্য্যাদাকে কেবল কুলেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। আর্য্যদিগের প্রতিষ্ঠা কেবল কুলগত ছিল, ধর্ম্মগত ছিল না, এরূপ মত ঘোর প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি কর্ম্ম ছাড়িয়া প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদা হইতে পারে না, তবে কেবল গুণ বা প্রবৃত্তি বা নৈসর্গিক পটুতা দেখিয়া কর্ম্ম বিভাগ কেন করা হয় নাই? কর্ম্মকে কেন কুলানুযায়ী করা হইয়াছিল? কুলের গুণ দড়ি গুণকে বাধিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? এই বাধাবাধিতেই আর্য্যদিগের প্রতিভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কুলগত কর্ম্ম রক্ষাতেই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। এই অপবাদ সত্য নহে। বেগবতী স্বৈরগতি কর্ম্মনদীকে কুল দিয়া বাঁধিয়া রাখাতে ভারত ডুবিয়া যায় নাই, বরং সমৃদ্ধিশালীই হইয়াছিল! বরং কূলের বাঁধ ভাঙিয়া দেওয়াতে ভারতের শ্রী ভাসিয়া গিয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে কর্ম্মকে কোন কুলগত করা হইয়াছিল, তাহার বিশেষ কারণ আছে।

হিন্দুত্বের ভিত্তি একনিষ্ঠতা। হিন্দুর চিন্তা প্রণালী, হিন্দুর দর্শন, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ—সমস্তই একমুখীন। বস্তু একই দুই নহে। একই বহুরূপে প্রতিভাত হয়—ইহাই হিন্দুদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমগ্র বেদগাথায় একেরই মহিমা বর্ণিত আছে। অগ্নির দেবতা অগ্নি, বায়ুর দেবতা বায়ু, সূর্য্যের দেবতা সূর্য্য। কর্ত্তাই কার্য্যরূপে প্রতিবিম্বিত, স্রষ্টাই সৃষ্টিরূপে প্রতিফলিত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ, দাতা, গ্রহীতা ও দান—এই তিনের পারমার্থিক একত্ব বেদমন্ত্রে আভাসিত হইয়াছিল, আর বেদান্তের আনন্দ-জ্যোতিতে বিলীন হইয়া ব্যবহারিক বিভিন্নতা

খণ্ডঘটিত একত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

আজকাল বিলাতী বিদ্যা শিখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কাজ করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া হিন্দুর পরম আদর্শ। প্রতিষ্ঠা, স্থিতি, টিকিয়া থাকাই, অস্তির স্বরূপ। প্রতিষ্ঠার অভাবে,—স্থিতির অপূর্ণতা পূরণে,—টিকিয়া থাকার বিঘ্ন অপসারণে,— কর্ম্ম বা চেষ্টা বা সাধনার উদ্ভব হয়। কার্য্য অভাব-সূচক, অপূর্ণতার পরিচায়ক। যেখানে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা,—যেখানে আত্মস্থিতি, সেখানে কার্য্য তিষ্টিতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন —অস্তিত্ব কি তবে স্বার্থেই পূর্ণতা লাভ করে? প্রেমহীনতায় কি অস্তিত্বের চরম বিকাশ? যদি প্রেম ছুট্‌ফট্‌ করাতেই হয়,—শান্তিতে না হয়, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে হয়— মিলনের পর্য্যাপ্তিতে না হয়, তবে প্রেমের অভাবই অস্তিত্বের সার। আর যদি ভিন্নতাকে একতার মধ্যে সমাহিত করিয়া স্থিতির নাম প্রেম হয়, তাহা হইলে অস্তিত্ব প্রেমময়, শিবময়, আনন্দময়। বাসনার বহ্নিতে প্রশমিত করিয়া চেষ্টাকে পূর্ণ স্থিতিতে পরিণত করিয়া, দ্বৈতকে নিঃশেষ করিয়া, অদ্বৈতানন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর্য্যদিগের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু সাধনা নহিলে সিদ্ধি হয় না। অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে গেলে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করা প্রয়োজন। সকাম কর্ম্ম করিলে দ্বৈতচক্রে নিষ্পিষ্ট হইতে হয়, আর নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়,—আত্মস্থিতির দ্বার উন্মুক্ত হয়,— অদ্বৈত ব্রহ্মপদ নিকট হয়। তজ্জন্যই গীতায় বারে বারে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর্য্য সমাজকে ধীরে ধীরে এই আদর্শমুখীন করা আশ্রমধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত চতুরাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছিল। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-সাধনে ভোগ-বাসনা সুসংযত হইত, দৈন্য-ভার বহন করিয়াও কুলধর্ম্ম রক্ষণে জিগীষা-প্রবৃত্তি সুশাসিত হইত, বার্দ্ধক্যে পুত্র কলত্র বর্জ্জন করিয়া, কষ্ট-সাধ্য বিত্তৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনপ্রয়াণে কামনার গ্রন্থি ছিন্ন হইত, স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ হইত, ভূমানন্দে ডুবিবার আয়োজন হইত। বাণ-প্রস্থাশ্রমের কথা স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিয়া, হর্ষশোকের তরঙ্গে আলোড়িত হইয়া, মানবমানের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রপীড়িত হইয়া, জয়পরাজয়ের সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, যাই ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইল, অমনি সকল সুখ-ভোগে বিরক্ত হইয়া আর্য্য-গৃহস্থেরা বনে প্রস্থান করিতেন। তাঁহারা কর্ম্মের অধি-কারী ছিলেন—ফলের অধিকারী ছিলেন না। গীতার উপদেশ—"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" এই গীতা নির্দ্দিষ্ট আদর্শে সমস্ত আর্য্য-জীবন সুনিয়মিত ছিল। বর্ণা-শ্রমেও এই কর্ম্মফলত্যাগব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছিল।

সমাজ ব্যক্তিগণের সমষ্টি। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ব্যক্তি মরণশীল, সমাজ অমর। যদি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা মরণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর অধিকারে আসিত, তাহা হইলে আমাদের স্থায়িত্ব নষ্ট হইয়া যাইত। ব্যক্তি মরে, কিন্তু তাহার যদি কোন প্রতিষ্ঠা বা

সঞ্চয় থাকে; তাহা মরে না।* তাহার উত্তরাধিকারীরা তাহা পায়। এই সামাজিক নিয়ম বিশ্বজনীন।

আর্য্যগৃহস্থ যখন বন প্রযাণকালে তাঁহার উত্তরাধিকারীকে কর্ম্মোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য দিয়া যাইতেন, তখন তাহার জলন্ত—জীবন্ত ত্যাগের উদাহরণ সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেন যে, কর্ম্মেতেই প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদা অবস্থিত, কর্ম্মফলভোগে নয়। এই বানপ্রস্থাশ্রমবিহিত ঐশ্বর্য্যত্যাগে কর্ম্মের প্রতি এক মঙ্গলময় অভিমান জনিত হইত। যে সে কর্ম্মে অভিমান জন্মে না। যে কর্ম্মের দ্বারা আমার পিতৃ-পুরুষেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইযাছিলেন, যে কর্ম্মপালনে সমস্ত ঐশ্বর্য্য বর্জ্জন করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। ধন যায়, প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তত্রাপি কৌলিক কর্ম্ম ছাড়িব না। যদি কর্ম্মকে ফললিপ্সাসঙ্গদোষবিবর্জ্জিত করিয়া কুলগৌরবে গৌরবান না করা হইত, তাহা হইলে সমগ্র সমাজকে নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠ করা অসম্ভব হইত। মর্য্যাদার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে পরমার্থে লইয়া যাইতে হয়। আত্মমর্য্যাদা না হইলে পরমার্থ দৃষ্টি ফুটে না। ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ উপদেশ দিয়া সাধারণ লোককে সুপথে লওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। তজ্জন্যই দূরদর্শী ঋষিরা কুলমর্য্যাদা ও জাতিগত প্রতিষ্ঠার তেজোময় অভিমান-বলে আর্য্য-সমাজকে চালিত করিযাছিলেন। এই ঘোর দুর্দ্দিনেও সেই কর্ম্মাভিমান বহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। ভারতবর্ষে আজও শত শত ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা দৈন্যভাবগ্রস্ত—উদর জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অপক্ক সত্তার উপদ্রব এড়াইয়া ক্ষীরসর-নবনীত-ভোজনে পরিতুষ্ট হইতে পারেন, তথাপি পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। গৃহে ব্যঞ্জন নাই; গৃহিণী তিন্তিড়ীপর্ণ রন্ধন করিয়া দেন; আপনারা তাহা আনন্দের সহিত ভোজন করেন ও শিষ্যদিগকে ভোজন করান। মরিয়া যাইবেন, সেও ভাল, তবু বিত্তগ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা করিবেন না। আসুন, সকলে মিলিয়া চোগা-চাপকানধারী পরধর্ম্মী ব্রাহ্মণদিগকে দূর হইতে সম্মান দিয়া, সেই কুলধর্ম্মোপাসক পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণের পদধূলি গ্রহণ করি। তাঁহারা দীন বটেন, কিন্তু হীন নন। তাঁহাদিগের সম্মানে, তাঁহাদিগের গৌরবে, আর্য্যঋষিদিগের সম্মান ও গৌরব হয়। আজও শত সহস্র ক্ষত্রিয় দেখা যায় যাঁহারা অন্নের জন্য লালায়িত, কিন্তু তরবারি ছাড়িয়া জীবীকার্থে লেখনী ধারণ করিতে ঘৃণা করেন। আর আজ যদি আমাদের বণিকেরা কুলধর্ম্ম ছাড়িয়া দু-চার পাতা ইংরেজি উল্টাইয়া উকিল-ডেপুটী হইতেন, তাহা হইলে ভারতের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িত। এখনও কুলগত ধর্ম্মাভিমান হিন্দু-জাতির গৌরবকে যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছে, ভারতকে অশেষ দৈন্য হইতে বাঁচাইয়াছে।

ফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্মকে ভালবাসা, নিষ্কাম-ধর্ম্ম সাধনে কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন করাই হিন্দুর হিন্দুত্ব। যাঁহারা নিষ্ক্রিয়, পূর্ণ অদ্বৈতানন্দে ডুবিতে চান, তাঁহারাই এই উচ্চ আদর্শের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীরমানাথ পালিত।

শৈবালিনী।

পতি তরে করি সতী আত্মবিসর্জ্জন,
অবহেলে গেলা চলি বৈকুণ্ঠ-ভবন।

সতী শৈবালিনী বিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিক্ষিতা কায়স্থ রমণী। তিনি কলিকাতা মহানগরীনিবাসী বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের সহধর্ম্মিণী, সুসম্ভ্রান্ত বিহারীলাল মিত্রের নন্দিনী এবং সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয়ী।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ কলিকাতা পোর্টকমিশনারের অডিট আফিসে কার্য্য করিতেন। তিনি দ্বাবিংশত বর্ষ বয়স্ক শিক্ষিত যুবক। বিগত ১২৮৬ সালে বালিয়াবাধ চড়কডাঙ্গা রাজপথ-পার্শ্বস্থিত ভবনে তাঁহার জন্ম হয়। সুরেন্দ্র পত্নী-সহ উক্ত ভবনে নিজ শান্তিনিকেতনে পরম সুখে বাস করিতে ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট দীর্ঘকাল সে সুখ সহিল না। সহসা তিনি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বহু চিকিৎসায়ও তাঁহার কাল ব্যাধি দূর হইল না। কর্ম্মবশে, অদৃষ্ট দোষে রোগ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

বিগত ১৩১৮ সালের ৭ই বৈশাখ সুরেন্দ্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগীকে দেখিয়া হতাশ হইলেন,—শীঘ্র বিপদপাতের সম্ভাবনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। চিকিৎসকের কঠোর ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজনেরা আকস্মিক বিপদের আতঙ্কে আকুল হইয়া উঠিলেন।

শৈবালিনী পঞ্চবিংশতি বর্ষিয়া পতিব্রতা সাধ্বী সতী বুদ্ধিমতী রমণী এবং একমাত্র শিশু পুত্রের স্নেহময়ী জননী।" চিকিৎসকের নিষ্ঠুর ভবিষ্যৎবাণী শ্রবণ এবং আত্মীয় স্বজনের বিষাদ ম্লান মুখশ্রী দর্শন করিয়া সতী বুঝিলেন যে, চিকিৎসকের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট অনতিক্রমণীয় অদৃষ্ট-লিপির নিকট মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি পরাভূত হইয়াছে, তাঁহার সুখ-দুঃখের একমাত্র মূর্ত্তিমান বিধাতা এবং চিরারাধ্য প্রাণদেবতা সুরেন্দ্রনাথের ঐহিক লীলা অবসানের—তাঁহার শেষ নিশ্বাসটি ফুরাইয়া যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। পতির এই ভয়াবহ চরম অবস্থার শোচনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া সতীর হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার সকলপ্রকার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আহ্লাদ-আমোদ, সম্মান-গৌরব ও সুখ-শান্তি জন্মের মত অন্তর্হিত হইতে চলিল। বুদ্ধিমতী স্ত্রী হা হুতাশ কিম্বা করুণ-কণ্ঠে চীৎকার বিলাপ করিল না। সেই আসন্নমৃত্যু পতির প্রাণে অশান্তির সঞ্চার কিংবা শোকাকুল পরিবারের শোকতরঙ্গ বৃদ্ধি করিলেন না। তিনি কি জানি কেন, সহসা সেই আসন্নমৃত্যু স্বামীর শয্যা পার্শ্ব হইতে উঠিয়া গেলেন।

বাটীতে ঘন পত্র-পল্লবাচ্ছাদিত পাদপরাজি পরিবেষ্টিত ত্রিতলভবনের যেখানে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পবিত্র মূর্ত্তি বিরাজিত, সতী দ্রুত পদবিক্ষেপে তথায় উপনীত হইলেন। তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া যার পর নাই আন্তরিক আকুলতার সহিত মৃতকল্প পতির মঙ্গলার্থ দেব পদে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কে জানে সতীর কাতর প্রার্থনা জগৎপতির কাণে পঁহুছিল কি না।

অনন্তর সতী স্বীয় শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ

করিলেন। 'গৃহ প্রবেশ'পথে তাঁহার একমাত্র স্নেহের ধন শিশু পুত্রটী "মা-মা" বলিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তিনি সস্নেহে মৃদুভর্ৎসনা করিয়া স্নেহাস্পদ পুত্ররত্নকে অশ্রু-পূর্ণ লোচনে চির বিদায়ের চরম আশীর্ব্বাদ করিলেন। মাতৃআদরে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র শিশু অশ্রু-পরিপ্লুত বদনে একদিকে-সরিয়া গেল। হায়! অবোধ শিশু চির দিনের জন্য মাতৃস্নেহের অমিয়-মধুর স্বাদে বঞ্চিত হইতে চলিল।

সাধ্বীসতী শৈবালিনী শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সুশোভন বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা ও আর্য্যনারীর চির স্পৃহনীয় সিন্দুরভূষণে ভূষিতা হইয়া এবং স্বীয় কোমল পদদ্বয় অলক্তরাগে সুরঞ্জিত করিয়া স্বর্গীয় দেববালার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পতি সোহাগিনী সতী কি জানি কোন এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুণ্যতীর্থের মহা-যাত্রিক হইবার জন্য এ মোহিনী বেশে সজ্জিতা হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ-যৌবন মাধুরী প্রতি মুহূর্ত্তে যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। এই অপ্সরাবিনিন্দিত মনোহর বেশে সতী চির-বসন্ত—চিরমিলন পূর্ণ, চির-সুখময় জরামরণ ভয় বিচ্ছেদ-বিহীন দেবতার দেশে মহা উল্লাসে মহা যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সতী সেই অপূর্ব্ব মধুর মোহিনী বেশে মূর্ত্তি-মতি দেবীর ন্যায় পতির পদপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। অনন্তর তিনি মুহূর্ত্তের জন্য একবার মাত্র স্থির-দৃষ্টিতে স্বামীকে শেষ দর্শন করিয়া—অন্যের অলক্ষিত ভাবে পতিপদে প্রণাম পূর্ব্বক জন্মের মত সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

অনন্তর সতী স্বীয় কেশদাম, পরিধেয় বস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গে তৈলসিক্ত করিয়া আপনার নিত্যপাঠ্য পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা হস্তে লইয়া সেই সোণার অঙ্গে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিলেন। তৈলসিক্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত পবিত্র অঙ্গে উন্নত শিখা বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সতীর সর্ব্ব শরীর জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হইতেছে; তথাপি তিনি পবিত্র গীতা হস্তে লইয়া করপুটে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কি জানি কাহার দিকে চাহিয়া দ্রুত-গতিতে দৌড়িতেছেন। এরূপ অবস্থায় সতী অগ্নিময়ী দেবী প্রতিমার ন্যায় পতির গৃহদ্বারে যাইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। মুহূর্ত্তে সতীর পবিত্র আত্মা অমরধামে প্রস্থান করিল। পতির অভ্য-র্থনার জন্য সতী প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি করে লইয়া স্বর্গের দ্বারে দাঁড়াইলেন।

পত্নীর মহাপ্রস্থানের পনর মিনিট পরে পতি তাঁহার অনুগমন করিলেন। সমাগত জনগণ অশ্রুপ্লুত বিষাদ ম্লান মুখে "জয়—জয়" শব্দে সতীর এ অপূর্ব্ব কাহিনী ঘোষণা করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তে সে পবিত্র কাহিনী চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল। শত শত নর-নারী সে পুণ্য-পবিত্রতাময়ী সতী মূর্ত্তি দর্শন এবং তাঁহার ললাটস্থ সুরক্তিম পবিত্র সিন্দুর বিন্দু গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল।

অনন্তর সেই দেবদম্পতির পবিত্র দেহ পুণ্যদা ভাগীরথী তটে—সুপ্রসিদ্ধ কাশীমিত্রের শ্মশান ঘাটে সুগন্ধি চন্দন ও পবিত্র হবিসংযোগে প্রজ্জ্বলিত অনলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। চিতায় আগুণ প্রবল বেগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

"ইরম্মদরূপে অগ্নি খাইলা ভূতলে
সহসা জ্বলিল চিতা, সচকিতে সবে

দেখিল আগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন আজি সূর্য্যধ্বজ বীর
সুরেন্দ্র, বাম ভাগে সুন্দরী শৈবালিনী
অনন্ত যৌবন কান্তি শোভে তনুদেশে
চির সুখ—হাসি রাশি মধুর অধরে॥

পতিসহ সতীর সোণার প্রতিমা শ্মশানের অনলে ভস্মীভূত হইল। শত শত কুল-মহিলা অশ্রুসিক্ত-নয়নে সযত্নে সে শ্মশানভস্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সতীর পবিত্র শ্মশান মহাতীর্থে পরিণত হইল। *

কবিরাজ শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ বর্ম্ম কবিরত্ন।

বিদেশিনীর প্রতি রাধিকা।

গৈরিক পিধানে কাহে সোই।
হৃদয় নাথ মম্
নবনীল অঙ্গন্
রাধা পিয়ারে সব নীল কোই,
পেথ নীল সাড়ী হম্ তনুয়া বেঢ়রি,
নীলমণি কাঁকণ পর,
নীল আঁখিয়া পাতে নীলাঞ্জন নেপরি
নাসা পাশে নীল বেসর,
ভক্ত মাধুরী শ্যাম্ সুন্দর অনুপম
হামার মতি উন মনা।
নীল গগণ তলে আও দৌহে প্রেমরি
নিরখি নীল যমুনা।

শ্রীমতী গিরিন্দ্র মোহিনী দাসী।

উদয়গিরির প্রতি।

(ভুবনেশ্বরের পথে)

উন্নত প্রশান্ত বক্ষে
দাঁড়ায়ে কাহার আশে,
দাঁড়ায়ে যাহার তরে
সে কি তোরে ভালবাসে?
বাসে না বাসে না ভাল
তুমি ভালবাস তারে,
প্রণয়ের স্মৃতিগুলি
রেখেছ হৃদয়াগারে।
বিভুপদ ধোয়াইতে
ঝরিছে ঝরণাবারি,
নিজ অঙ্গে দেহ ঠাঁই
তৃণ পুষ্প সারি সারি।
দিবে কি সাজায়ে অর্ঘ্য
হরশঙ্কর শ্রীপদে
বপুরে নৈবেদ্য গড়ি
উৎসর্গিছ অবাধে।
শীতাতপে সমভাবে
অম্লান বদনে রহ,
রয়েছ কি মহাভাবে
যোগমগ্ন অহরহঃ?
শোভার ভাণ্ডার তুই
জনম হইতে ধরা,
নাহি হেথা বেলা জুই
শোভা মুনি মনোহরা।
পথিক তোরেরে হেরে
চির মুগ্ধ আত্মহারা,
বল ওরে তুই কে রে
বন মাঝে চিত্তচোরা।
শ্যামল বিটপিদল
ঘিরে আছে দেহ সদা,
যোগীর আশ্রম স্থল
গিরিগুহা নির্জ্জনতা।
প্রণামি গহ্বরে বাসা
জনক জননী সম,
পুরাও তাহার আশা
সিদ্ধি মুক্তি সিদ্ধাশ্রম।"
জ্বলে না জঠরানল
কখন কি ওরে গিরি?
যাবি না কি কোন কল
দিলেও প্রচুর ধরি?

---

* এইরূপ অগ্নোৎসর্গ বা সহমরণ চেষ্টা আধুনিক আইন ও সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ সুতরাং অকর্ত্তব্য। যাঁহারা পতির পবিত্র মূর্ত্তির রসায়ন চিত্র সযত্নে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে ও তাঁহারই চরণ ধ্যানে যোগিনীর ন্যায় জীবন যাপন করেন, তাঁহারাও সতী বলিয়া আর্য্য সমাজে গৌরবের আসন পাইয়া থাকেন।

লেখক।

তুষারে করিলি প্রয়
কোন্ পুণ্যবলে বীর ?
অচল সচল নয়
দিবস সর্ব্বরী স্থির।
চন্দ্রমাশালিনী রাতে
প্রফুল্ল করে না তোরে,
অমার আঁধার সাথে
বিষাদ নাহিক শিরে।
শোক রোগ কারে বলে
নাহি জ্ঞান ধরামাঝে,
শুভ কোন কর্ম্মফলে
দুঃখ নাহি আগে পাছে।
জগতে নাহি কি কেহ
বলিতে আপন জনা ?
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী
অনুভবে যায় জানা।
তুইও কাহারো তরে
না ভাবিস্ মনে মনে,
কেবল বিমানে চেয়ে
ভাবে তোর ঈশ ধ্যানে।
সৃজিয়াছে তোরে ধাতা,
মুক্ত করে শোক রোগ,
বলে দেরে সে বারতা
কাটে যাহে কর্ম্মভোগ।
আমরা শিখিব তাহ
দীক্ষিত হইব তায়,
বলে মা হৃদয়ে যা'হ
জুড়াবে তাপিত কায়।
মোরা দগ্ধ প্রাণে হেথা,
এসেছি জুড়াব আশে,
দিনে ফিরায়ে ওরে
পুত্রহীন সে আবাসে।
শান্তি আসান কর
এ ঘোর যাতনা হতে
দেখ' ধ্রুব শশধর
তোর পুণ্য চারিভিতে।
উঠিয়াছি তোমা শিরে
মম দোষ ওহে তাত,
জুড়িয়া যুগল করে
করিতেছি প্রণিপাত।
প্রথমে শিখির কোলে
উঠিলাম যেই দিন,
হেরিলাম বিশ্বখানি
আঁকা চিত্র মাঝে লীন।
সেজেছে প্রকৃত রাণী,
বিনা বাস কি ভূষণ,
তবুও শোভার খনি
জগজন হরে মন।
রবির আলোক পেয়ে
পুলকিত নর নারী,
স্নান করি সরোবরে
করে জপে শ্রী শ্রীহরি।
তুলে ফুল গাঁথে মালা
এলোচুলে ললনায়,
পূজিবে পাগল-ভোলা
বিল্বদল ধুতুরায়।
গড়িয়াছে মনোমত
লিঙ্গরূপ ভগবান,
নিবিড় একাগ্র চিতে
মাগে মুক্তি পথ দান।
পূজা সমাপন করি
যায় সবে নিজ বাসে,
মাঠে যেতে দেখে ফিরি
পীত ধান্য ভরা শীষে।
জীবন জীবের যাহে,
রহে অনুক্ষণ জীয়ে,
পবন পরশি তায়
কভু দিতেছে ছড়ায়ে।
শৈল শির হতে হেরি
যেন ছড়ান কাঞ্চন,
মরি মরি কি মাধুরী
অপরূপ দরশন।
নব দূর্ব্বাদল পরে
শিশিরের বিন্দু গুলি,
মুক্তাসম শোভা ধরে
তপন কিরণ পড়ি।
ধেনু গুলি পায় পায়
আপন বৎস লয়ে,
যথা তৃণ তথা ধায়
হরষে অধীর হয়ে।
পেয়েছে নবীন ঘাস
উদর পুরিয়া খায়,
ছাড়ি হাপ মনোল্লাসে
নব বৎস ঐ ধায়।
কোন গাভী পুচ্ছ তুলি
ক্ষেত্রে ছোটে ধান খেয়ে,

চাষীদল যাচ্ছে জুটি
খেলাছে পাঁচনী হাতে।
হেরে বেলা গোপবালা
যায় বড় তাড়াতাড়ি,
খাবে দুধ ছানা গুলা
খোলা পেলে বাঁধারছি
পাঠে যায় শিশুদলে
নাই তার জুতা পায়,
কা'র গেছে জামা খুলে
কালী মাথা কা'র তায়।
কেহ ভূমে গড়াগড়ি
আহ্লাদেতে আর খান,
উঠে বলে তাড়াতাড়ি
গেল কোথা বই খানা।
এখনি আস্‌বে গুরু
আর কাজ নাই খেলা,
তাকাবে সিট্‌কে ভুরু
মারবে কাঠের ঢেলা।
পুলকে বালক মাঝে
উপনীত যোগীবর,
বলিলেন বৃথা কাযে
কেন রত নিরন্তর।
বিদ্যাবলে লাভ হবে
পরমেশ পরব্রহ্ম,
অজ্ঞান আঁধার যবে
টুটিবে বুঝিবি মর্ম্ম।
বিদ্যা যে কেমন নিধি
এ বিশ্ব অখিল পরে
শুষ্ক ভাবে ফল্গু নদী
বহে সদা হৃদিপরে
জ্ঞানের উদয় হ'লে
মিলে ব্রহ্ম দরশন
জানিয়া বালক দল
লবে কর অধ্যয়ন।

ধ্রুবলালের মাতা।

রাজা নীলাম্বর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ মন্ত্রণা।

রজনী দ্বিতীয় প্রহর। অন্ধকার রাত্রি কিছুই দেখা যাইতেছে না। অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে ছায়ার ন্যায় দেখাইতেছে। আকাশের একপার্শ্বে মেঘ দেখা যাইতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে বৃক্ষপত্রের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিয়া একরূপ ধ্বনি করিতেছে। রাজান্তঃপুরের উদ্যানে কোন লোকজনের সমাগম নাই, কিন্তু একটি আসনে বসিয়া কে কি ভাবিতেছে? এত রাত্রে ভুবনেশ্বরী উদ্যানে আসিয়াছে, সে এক একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিতেছে, এক একবার উচ্চ প্রাচীরের দিকে তাকাইতেছে। হঠাৎ কি একটা শব্দ হইল, ভুবনেশ্বরী একটি বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল। দেখিল কে একজন উচ্চ প্রাচীর হইতে লম্ফপ্রদানে মৃত্তিকায় পতিত হইল। ভুবনেশ্বরী অগ্রসর হইল, সে লোকটিও নিকটে আসিল। ভুবনেশ্বরী বলিল—"তুমি এসেছ? আমি এতক্ষণ বসেছিলেম।" লোকটি মৃদুস্বরে বলিল—"এখানে অতি সাবধানে আস্‌তে হয়। বাহিরের প্রহরীরা তোমার দত্ত অঙ্গুরী দৃষ্টে তবে আমাকে আস্‌তে দিল। এখন কি সংবাদ বল?" লোকটি ক্রমেই ভুবনেশ্বরীর নিকটবর্ত্তী হইল, ভুবনেশ্বরী বলিল—"আর অগ্রসর হয়ো না, ঐ স্থানে দাঁড়াও। তোমাকে প্রাণ-মন সমর্পণ করবো বলেছি, এখনও করি নাই। যেদিন কার্য্যোদ্ধার হবে, সেই দিন আমি তোমার হব, তৎপূর্ব্বে আমাকে স্পর্শ করতে সাহসী হইও না, বিপদ ঘট্‌বে।" লোকটি ভয়ে পশ্চাৎপদ হইল। ভুবনেশ্বরী হাসিয়া বলিল—"ভয় পাইও না, আমি মানুষ, ভূত নই।" লোকটি "রাম, রাম" করিয়া উঠিল। ভুবনেশ্বরী বলিল—"এখন এসব বাঁদ্‌রাম চল্‌বে

না। আমার কথা শুন। তোমার পিতা কি বল্লেন ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল—"তিনি ইহার মধ্যে নাই,কিন্তু তাঁহার আপত্তিও নাই।"

ভু। তা হ'লেই হ'ল। দেবদাস! তুমি রাজা হবে, তোমার বৃদ্ধ পিতাকে বনে তপস্যার জন্য পাঠাবো। আমি তোমার রাণী হ'ব, কেমন ?

দেব। এমন দিন কি হবে ?

ভু। তোমার বুদ্ধি ও তেজ থাক্‌লেই হবে, কেন হবে না ?

দেব। একবার তোমার পিতার জন্য বহু চেষ্টা করেছি, পূর্ব্বে গিয়া সব খবর দিলেম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস কর্‌লেন না। যদি বিশ্বাস কর্‌তেন, তবে তাঁর রাজ্য এ ভাবে যেত না, তাঁর কন্যারও এ দুর্দ্দশা হ'ত না। এখন আবার তোমার জন্যই আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছি। সেবার অর্থের জন্য আমাদের রাজার বিরুদ্ধে তোমার পিতাকে বলেছি, এবার তোমার জন্য রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি। তুমি কিন্তু শেষ-কালে ফাঁকি দিও না। জান ত, প্রাণটি হাতে করে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছি।

ভু। তোমার যদি ভয় হয়, এখনও ফিরে যেতে পার, আমি তোমাকে প্রাণ দিতে বলি নাই। কাপুরুষের হস্তে আমি প্রাণ সমর্পণ করিব না। ভুবনেশ্বরী কাঁদিয়া উঠিল, দেবদাসের ইচ্ছা হইল, সে অশ্রু স্বহস্তে মোচন করে, কিন্তু সাহসী হইল না। দেবদাস বলিল—"কেঁদো না, আমাকে যা আদেশ কর্‌বে,আমি তাই কর্‌বো। তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করেছি, এমন কি বৃদ্ধ পিতাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত।

ভু। আমার জন্য কাহাকেও ত্যাগ কর্‌তে হবে না, তুমি ফিরে যাও। আমি জনম-দুঃখিনী, এই ভাবেই জীবন কাটাব।

দেব। তা হবে না, তোমার জন্য আমি সব কর্‌তে পারি। বল, কি কর্‌তে হবে ?

ভু। পার্‌বে ?

দেব। পার্‌বো।

ভু। পার্‌বে ?

দেব। পার্‌বো।

ভু। পার্‌বে ?

দেব। পার্‌বো।

ভু। বেশ, এতক্ষণে বিশ্বাস হ'ল, তুমি একজন বীরপুরুষ; তুমি আমার জন্য সব কর্‌তে পার্‌বে।

দেব। একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ।

ভু। পরীক্ষার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই। আগামী মাসের ১৬ই তারিখ মৃগয়া জান ত ?

দেব। শুনেছি।

ভু। সেই দিন।

দেব। সেই দিন কি ক'র্‌তে হবে ?

ভু। এমন হাবা ত কখনও দেখি নাই। সহজে কি রত্ন লাভ করা যায় ?

দেব। না।

ভু। তবে আমাকে লাভ কর্‌বে কেমন করে ? আমি পিতৃ-মাতৃহারা রাজ্যভ্রষ্ট। কাহার জন্য এ রকম হ'য়েছি ?

দেব। রাজার জন্য।

ভু। তবে ত সব বুঝেছ। আর আমায় বল্‌তে হবে কেন ? মৃগয়ার পরদিন রাত্রে এমনি সময়ে এখানে এস, আমি তোমার হ'ব।

এখন সব বুঝ্‌লে ?

দেব। বুঝেছি?

ভু। আর স্পষ্ট ক'রে বলার দরকার নাই। জানত আমরা কামরূপের মেয়ে, আমাদের তেজ সহজে যায় না। তবে তোমাকে দেখে অবধি আমি সব ভুলেছি।

দেব। সে ত আমার সৌভাগ্য। আমি সব বুঝেছি, আর বলিতে হইবে না।

ভু। তবে এখন যাও, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া ভুবনেশ্বরী অন্ধকারে কোথায় লুকাইল, দেবদাস কি ভাবিতে ভাবিতে প্রাচীরের নিকট গেল। একখানি মই একটি ঝোপের মধ্যে ছিল, সেখানি অবলম্বনে প্রাচীরে উঠিল ও মইখানি ধরিয়া পুনরায় সেই ঝোপে নিক্ষেপ করিল। কে যেন প্রাচীরের বাহিরে "হো" "হো" করিয়া হাসিয়া উঠিল, দেবদাস ভূত মনে করিয়া ভয়ে প্রাচীর হইতে পড়িয়া, একেবারে অচেতন হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

রংপুর জেলা হিন্দু রাজাদিগের কীর্ত্তিভূমি—এ স্থানে অনেক রাজাই রাজত্ব করিয়া কালক্রমে লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের কীর্ত্তি প্রকাশ করিবার জন্য এখনও দুর্গ ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এই জেলার স্থানে স্থানে রহিয়াছে। রংপুর আসামের সংলগ্ন ভূমি, সেই জন্য বিদেশীয় রাজারা ইহার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করেন নাই—এতদূর অগ্রসর হইতে তাঁহারা ইচ্ছুক ছিলেন না। প্রথমতঃ পৃথু রাজা রংপুরে অনেক দিন রাজত্ব করেন, তৎপর পালবংশীয় রাজারা এই জেলার অধীশ্বর ছিলেন। এখনও বন্দোরে রাজা ভবচন্দ্রের কীর্ত্তি যথেষ্ট আছে।* পালবংশ ধ্বংস হইলে রাজা নীলধ্বজ রংপুর অধিকার করেন। তিনি কামাটপুর স্থাপিত করেন, এবং এখনও কুচবেহার রাজ্যে অনেক ধ্বংসাবশেষ এই রাজার রাজত্বের প্রমাণ দিতেছে। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র রাজা চক্রধ্বজ অনেক দিন রাজত্ব করেন এবং পুত্র নীলাম্বরকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এই বংশের মধ্যে রাজা নীলাম্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। রাজা নীলাম্বর অল্প বয়সে পিতৃহীন হন, এবং এত বড় রাজ্যভার হঠাৎ প্রাপ্ত হইয়া সুশৃঙ্খলতার সহিত রাজত্ব পরিচালনা করিতে থাকেন।

এই সময়ে কামরূপের রাজা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, এবং তিনি রংপুর নিজ রাজ্যভুক্ত করিতে ইচ্ছুক হন। তিনি রাজা নীলাম্বরের বীরত্ব অবগত ছিলেন, অতএব মন্ত্রীকে ও মন্ত্রীপুত্রকে হস্তগত করিতে প্রথমতঃ চেষ্টা করেন। মন্ত্রী শচীপাত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিনি রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হইলেন না বা সাহসী হইলেন না; কিন্তু তাঁহার পুত্র এ বিষয়ে অগ্রসর হইল। সে উচ্চাভিলাষ পোষণ করতঃ মনে করিল, কামরূপের রাজাকে সাহায্য করিলে তিনি এই রংপুর রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন, এবং

---

* মৎপ্রণীত "রাজা ভবচন্দ্র", "উপাসনা" মাসিক-পত্রে ১৩১৮ সনের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে তাহাকে বসাইবেন। এই পদে বসিলে একরূপ রাজা বলিলেই হইল—সময়ে হয়ত সে স্বাধীন হইতে পারিবে। সেই জন্য সে গোপনে কামরূপে গিয়া রাজার নিকট রংপুর জেলার গুপ্ত কাহিনী সব প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা নীলাম্বর অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি গুপ্তচরের মুখে শুনিলেন-কামরূপের রাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবে। তিনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া, স্বয়ং বহু সৈন্যসহ কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং অধিকাংশ কামরূপ-রাজ্য তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল। দেবদাস দেখিল—তাহার মন্ত্রণা টিকিল না, সে তখন রাজা নীলাম্বরের বিরুদ্ধে অন্যরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

রাজা নীলাম্বর নব উৎসাহে সব দেশ জয় করিতে লাগিলেন, তিনি রংপুর জেলার দক্ষিণস্থ ঘোড়াঘাট জয় করিলেন ও তথায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার বিশ্বাসী ও পুরাতন একজন কর্ম্মচারীকে তথায় প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের পাঠান রাজারা দিল্লীর সম্রাটদিগের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় রাজা নীলাম্বরের দিকে দৃষ্টি করিতে অবসর পান নাই, অতএব রাজা নীলাম্বর নির্ব্বিবাদে রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক সৎকার্য্যেও মনোযোগী হইলেন। কামাটপুর হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত তিনি সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, এবং একদিন ছদ্মবেশে একজন মাত্র বিশ্বাসী লোক সঙ্গে লইয়া এই রাস্তা অবলম্বনে ঘোড়াঘাট দুর্গ দেখিয়া আসিলেন।

রাজা নীলাম্বর স্থানে স্থানে অনেক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, এখনও এই সব দুর্গ রাজা নীলাম্বরের কাহিনী প্রচার করিতেছে।

আফগান রাজা হোসেন সাহা ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে রাজত্ব আরম্ভ করেন, রাজা নীলাম্বর এই সময়ে রংপুরের অধীশ্বর হন। হোসেন সাহা দিল্লীর অধীনতা ছিন্ন করিতে বহু প্রয়াস পান, সেই জন্যই তিনি রাজা নীলাম্বরকে দমন করিতে পারেন নাই। কিন্তু মন্ত্রীপুত্র দেবদাস যখন দেখিল—কামরূপের রাজা কিছু করিতে পারিলেন না, তখন সে মুসলমান রাজাদের নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। মন্ত্রী শচীপাত্র এ বিষয় অবগত ছিলেন, তিনি প্রকাশ্য-ভাবে এ বিষয়ে যোগদান করিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মৃগয়া।

মাঘ মাস। ভয়ানক শীতের প্রকোপ। বেলা এক প্রহর। সূর্য্যদেব কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু শীতের নিকট সে উত্তাপ বেশী লাগিতেছে না। রাজা নীলাম্বর লোকজনসহ অদ্য মৃগয়ায় চলিলেন। নিকটেই একটি বৃহৎ বন, সেই বনে নানারূপ বন্যজন্তু বাস করে। রাজা সেই বনে মৃগয়া করিবেন; তাঁহার বিশ্বাসী সৈনিক-কর্ম্মচারী হংসেশ্বর রায়, (যিনি দুর্গানাথ রায় নামে রাজার সঙ্গে ঘোড়াঘাট গিয়াছিলেন।) রাজার দেহরক্ষক রূপে সঙ্গে চলিলেন। বৃদ্ধমন্ত্রী বাটীতে রহিলেন। উচ্চপদাভিষিক্ত কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই কেহ অশ্বারোহণে, কেহ বা হস্তী আরোহণে চলিয়া-

ছেন, অন্যান্য লোক পদব্রজে রওনা হইল। রাজা ও হংসেশ্বর রায় দুইজনে দুইটী সুদৃশ্য শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন। সঙ্গের সৈন্য-সামন্ত সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সকলেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন, এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করণান্তর দলে দলে সকলেই বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজা, হংসেশ্বর রায় ও কতিপয় সৈন্য এক দলাবদ্ধ হইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় বড় বড় বৃক্ষের নিম্নে জন্তুগণ সুখে নিদ্রা যাইতেছিল, হঠাৎ সৈন্যের কোলাহল শুনিয়া জন্তুগণ ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। রাজা নানাস্থানে শীকারান্বেষণে ঘুরিতে লাগিলেন। হংসেশ্বরও ছায়ার ন্যায় রাজার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি যূথভ্রষ্ট বন্যবরাহ রাজার নয়নপথে পতিত হইল, রাজা বর্শা উত্তোলন করিবামাত্র বরাহ প্রাণভয়ে পলাইল, রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব ছুটাইলেন। বরাহ এত দ্রুতবেগে ধাবমান হইল যে, এক একবার রাজার নয়নপথ অতিক্রম করিতে লাগিল, কিন্তু রাজার অশ্বচালনার গুণে আবার তখনি দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। হংসেশ্বর কিছুক্ষণ রাজার অনুগমন করিলে পর, হঠাৎ একটী বৃক্ষ-শিকড়ে অশ্বের পদ লাগিয়া অশ্ব পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ধরাশায়ী হইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং অশ্বকে উঠাইলেন, তৎপর অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দ্বিগুণ বেগে ছুটাইলেন কিন্তু রাজাকে আর দেখিতে পাইলেন না। রাজা যে কোন্ দিকে গিয়াছেন তাহাও নির্ণয় করা কঠিন হইল, তিনি অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া চলিলেন এবং কিছুদূর যাইতে না যাইতেই পদচিহ্নও লোপ পাইল। তখন তিনি অনুমানে একদিকে অশ্ব ছুটাইলেন।

এ দিকে রাজা নীলাম্বর উন্মত্তের ন্যায় বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াও তাহাকে মারিতে পারিলেন না, হঠাৎ বরাহটি কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল। বরাহকে আর না দেখিতে পাইয়া তিনি এক বৃক্ষের নিম্নে অশ্ব থামাইলেন, ঠিক সেই সময়ে স্বন্ স্বন্ শব্দে কোথা হইতে একটী তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইল কিন্তু রাজার বক্ষঃস্থল লৌহবর্ম্মে আবৃত থাকায় তীরটী বর্ম্মে ঠেকিয়া ভূতলে পতিত হইল এবং দেখিতে না দেখিতে আর একটী তীর আসিয়া তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইল, তিনি অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

ক্রমে বেলা অবসান হইল, সৈন্যগণ দেখিল, হংসেশ্বর ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু রাজা ফিরিলেন না, তখন সকলেই রাজার বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর করিতে পারিলেন না। তখন সকলেই বড় ব্যস্ত হইল, সমস্ত বন অন্বেষণ করিতে লাগিল, কোথাও রাজার অনুসন্ধান পাইল না। কি করিবে—হংসেশ্বর রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি রাজাকে হারাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। রাত্রি হইল, চারিদিকে মশাল জ্বলিল, আলোক লইয়া পুনরায় সকলে অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু সব বৃথা হইল। সে রজনী তাহারা সকলে সেই বনেই বাস করিল, তৎপর দিবস প্রত্যুষে সকলে

আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বন খুঁজিতে লাগিল,সর্বত্র নিষ্ফল হইল। তখন সকলে মনে করিল—কোন ব্যাঘ্র হয়ত রাজাকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাজার অশ্বটি বনের মধ্যে পাওয়া গেল, কিন্তু রাজাকে তথায় পাওয়া গেল না। হংসেশ্বর উঁহাদিগকে রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়া নিজে সেই স্থানে থাকিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উদ্যানে।

অদ্য মৃগয়ার পরদিন। রাজধানীতে সৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। রাজা ফিরেন নাই। অতএব রাজধানীতে ভয়ানক গোলমাল। রাণী শুনিলেন—রাজার কোন খবর পাওয়া যায় নাই, তিনি তখন শয্যাশায়ী হইলেন এবং আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। ভুবনেশ্বরী আসিয়া অনেক সান্ত্বনা করিতে লাগিল—কোন ভয় নাই, নিশ্চয়ই কোন স্থানে আছেন, দুই এক দিন পরেই আসিবেন, এখন এ অবস্থায় শোক করিতে নাই। রাণী মলয়াবতী অদ্য আর প্রবোধ মানিতেছেন না, তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করিলেন না। অবশেষে ভুবনেশ্বরী বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল, যাইতে যাইতে বলিল তোমার সুখ ফুরায়েছে, আর কতকাল এ ভাবে যাবে?" রাজার অমাত্যগণ সকলেই চিন্তিত, চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী পাঠাইতে লাগিল। মন্ত্রী শচীপাত্র বড় বিমর্ষ ও ব্যস্ত তিনি স্বয়ং অন্বেষণে বাহির হইবেন বলিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়া সকলে তাহাকে যাইতে বারণ করিল। তথাপি তিনি চেষ্টার ক্রটি করিলেন না, নিজ পুত্রকে যাইতে আদেশ করিলেন। সকলেই বিমর্ষ, সকলেই চিন্তিত, রাজধানীতে আর যেন উৎসাহ নাই।

রজনী দ্বিপ্রহর চন্দ্র হাসিয়া জগৎকে হাসাইতেছে তবে,শীতের প্রকোপ বেশী,তাই চন্দ্ররশ্মি তত মিষ্ট বোধ হইতেছে না। এমন সময়ে পুনরায় দেবদাস ও ভুবনেশ্বরী সেই উদ্যানে মিলিত হইল। দেবদাস বলিল" তোমার আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে।" ভুবনেশ্বরী প্রাণ খুলিয়া হাসিল, তার পর বলিল "দেবদাস! এত দিনে আমার প্রতিহিংসা সাধিত হ'ল। কি অবস্থায় দেখ্‌লে বলত?" দেবদাস বলিল" আমি সুযোগ খুঁজতে লাগ্‌লেম, দেখি সেই দুষ্ট ছোঁড়া হংসেশ্বর সর্ব্বদা সঙ্গে আছে। দৈবক্রমে এক বরাহের পিছনে ছুটিল, ছোঁড়াটা যেতে পাল্লে না, রাজা বরাহটা মারতে পারলে না, এক গাছতলায় দাঁড়াল, আর অমনি আমি একটি ঝোপের মধ্য হ'তে দুটি তীর মারলেম, রাজা ভূমিতে পড়ে গেল। আমি নিকটে গেলেম, দেখি একেবারে অচেতন, ও কাপড় রক্তে রঞ্জিত। সে স্থানে আর অপেক্ষা করতে সাহস হ'লনা। আমার বিশ্বাস সেই রাজাটাকে ঐ অবস্থায় ব্যাঘ্রে খেয়েছে, অতএব তোমার ও আমার শত্রু নিপাত হ'ল। এখন কিছুদিন এইভাবে যাক, তার পর রাজা নিযুক্ত হবে, তখন সব বুঝা যাবে। ভুবনেশ্বরী বলিল—"যদি রাজা না ম'রে থাকে, যদি কিছু দিন পরে ফিরে আসে?" ব্রাহ্মণপুত্র হাসিয়া বলিল,—"তা' হ'তে পারে না। রাজা নীলাম্বর এবার নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে।

এখন আমার পুরস্কার কি ? যে জন্য এত কষ্ট করলেম, যে জন্য রাজাকে বধ করলেম, পাপী হলেম,আমার মনের সে আশা পূর্ণ হওয়া চাই ।” ভুবনেশ্বরী একটু সরিয়া দাঁড়াইল, দেবদাস বলিল —“এখন এ বিষয়ের উত্তর দেও ।” ভুবনেশ্বরীর মুখ গম্ভীর হইল, সে উত্তর করিল—“দেবদাস ! শুধু আমার জন্য তুমি এসব কর নাই তোমার নিজের প্রতিহিংসাও এই সঙ্গে সাধিত হইল । যাহ'ক আমি যাহা বলেছি, তাহা করবো, সেজন্য কিছু ভেবো না। আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে রাজা মরেছে, আবার হয়ত ফিরে আসতে পারে । আমি একমাস সময় নিলেম, যদি এক মাস মধ্যে রাজা ফিরে না আসে, তবে আমি তোমার হ'ব। এখন যাও, কেহ দেখবে ।” এই বলিয়া ভুবনেশ্বরী বৃক্ষের অন্তরালে পলাইল। দেবদাস পূর্ব্বের ন্যায় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে গেল । ইহার পূর্ব্বের দিন হঠাৎ পতিত হইয়া অচেতন হইয়াছিল, এবার তদ্রূপ না হয়, তাহার প্রতিবিধান পূর্ব্বেই করিয়াছিল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

কুটীরে ।

যখন রাজা নীলাম্বরের চৈতন্য হইল, তিনি দেখিলেন—এক কুটীরে শয়ন করিয়া আছেন । একজন অপূর্ব্বসুন্দরী স্ত্রীলোক তাঁহার সুশ্রূষা করিতেছে । তিনি কোথায় স্থির করিতে পারিলেন না, মনে মনে ভাবিলেন,—এই সুন্দরী স্ত্রীলোকটি কে ? তিনি কথা কহিতে যাইতে ছিলেন, স্ত্রীলোকটি নিষেধ করিল, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ঐ স্ত্রীলোকটির দিকে রহিল ; স্ত্রীলোকটী তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না । রাজা দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি অপ্সরাতুল্য সুন্দরী, কিন্তু বয়ঃক্রম কত ঠিক করিবার উপায় নাই । একবার বোধ হয় বিংশ হইবে, আবার মনে হইল, একটু অধিক বয়স হইয়াছে । গাত্রে কোন অলঙ্কার নাই, পরিধানে একখানি গৈরিক বসন মাত্র । মস্তকে কেশ জটাকারে পরিণত হইয়াছে । তখন রাজার মনে হইল,বোধ হয়,কোন যোগিনী হইবেন, অথবা কোন দেবকন্যা তাঁহার প্রতি সদয়া হইয়া মর্ত্তে অবতরণ করিয়াছেন । এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার নিদ্রাকর্ষণ হইল ।

পর দিবস রাজা বলিলেন—“আপনি কে ? আমি কোথায় ?” স্ত্রীলোকটী মৃদুমন্দ হাসিয়া উত্তর করিলেন—“আপনার এত ব্যস্ত হইবার কারণ কি ? দুই এক দিন পরে সব জানতে পারবেন ।” রাজার কৌতূহল নিবৃত্ত হইল না, তিনি আবার বলিলেন—“আমি এখানে কেন ?” অপরিচিতা উত্তর করিলেন - “আপনি অশ্ব থেকে পড়ে গিয়াছিলেন স্মরণ আছে ? তার পর আমি আপনাকে সঙ্গে আনি ।” রাজার সব কথা স্মরণ হইল,তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন— “তবে আপনার কৃপাতেই আমি প্রাণ পেয়েছি ! সে আর কোন কথা বলিল না । একটা ঔষধ আনিয়া রাজাকে সেবন করাইল, তাহাতে তিনি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন । আবার তিনি প্রশ্ন করিলেন—“আমার বাড়িতে কি কোন খবর দিয়াছেন ?” অপরিচিতা বলিলেন—

"না, আমার এখানে আর কে আছে ? আপনার বাড়ীতে কেহ আছে কি ?" রাজা বলিলেন—"হাঁ, আমার স্ত্রী আছে।" তখন স্ত্রীলোকটী তথা হইতে উঠিয়া গেলেন।

এই ভাবে এক সপ্তাহ গত হইলে অঙ্গের ঘা শুকাইল, রাজাও সবল বোধ করিতে লাগিলেন, তিনি প্রত্যহ স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আলাপ করিতেন এবং নিজের ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। এক সপ্তাহ পরে তিনি বলিলেন—"ভগ্নি। আমি তবে আজ বিদায় হ'তে চাই, বাড়ীতে বোধ হয় বড় গোলমাল উপস্থিত হয়েছে।" স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিলেন—"বাড়ীর দিকে বুঝি মন খুব টান্‌ছে, আর আমাদের ভাল লাগছে না ?" রাজা বলিলেন—"তোমাকে এজীবনে ভুল্‌তে পার্‌বো না। যখনই আমি অবসর পাব, তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বো। তোমার জন্যই এজীবন রক্ষা পেয়েছে। তুমি দেবী, দেবীর কার্য্য করেছ।" দেবী "হি হি" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, রাজা তাহাতে অপ্রতিভ হইলেন। একবার মনে করিলেন—উন্মাদিনী, আবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সে ভাব দূর হইল। তিনি আবার বলিলেন—"তবে আমি যাই ?" স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল—"আমার অনুমতি হইলেই কি যেতে পারেন ?" রাজা বলিলেন—"আপনার নিকট আমি ঋণী, সেই জন্য আপনার অনুমতি না পেলে যেতে পারি না।" এই সময়ে দেখিলেন, এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়াই সব বুঝিতে পারিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন—"এ সব কি খেলা প্রভু ! আমাকে রক্ষা করবার জন্য কি এ দিনে গুরুদেবের আগমন হ'ল। আমি শ্রীচরণে কি অপরাধ করেছি যে চরণ দর্শন পর্য্যন্ত ঘটে নাই।" গুরুদেব বলিলেন—"নীলাম্বর ! তোমার বাল্যকালের কথা স্মরণ আছে ? আমি যখন তোমাকে দীক্ষিত করি, তখন বলেছিলেম, বিপদে পতিত হ'লেই আমি তোমার নিকট আস্‌বো। এবার তোমার প্রাণ রক্ষা হল, আর তোমার পরীক্ষাও হ'ল। তুমি দেশে যাও, রাজত্ব কর। সম্মুখে ভীষণ বিপদ উপস্থিত, সেই দিন আমাকে স্মরণ করিও। ভগবানে বিশ্বাস ও মতি গতি যেন থাকে, তিনি ব্যতীত আর রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই।" রাজা সন্ন্যাসীর পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"প্রভো ! আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন, আর আমার রাজ্যস্পৃহা নাই।" গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন—"রাজ্যস্পৃহা নাই, কামিনীস্পৃহা এখনও আছে। তুমি কি মলয়াবতীকে ভুল্‌তে পারবে ? এখনও তোমার সময় হয় নাই, সময় শীঘ্রই আস্‌বে, তুমি সে জন্য ব্যস্ত হইও না। ভগবানের কার্য্য ভগবান করেন, তুমি ও আমি উপলক্ষ মাত্র। আমি তোমার বিপদের বিষয় জান্‌তে পেরে এসেছিলেম, এখন আবার চল্‌লেম। আবার একবার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।" রাজা, রাণী মলয়াবতীর কথা শুনিয়া মস্তক হেট করিলেন, তিনি বুঝিলেন—রাণীকে তিনি ভুলিতে পারিবেন না। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—"যিনি আমায় প্রাণদান করেছেন, ইনি কে ?" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—"পরে জান্‌তে পারবে।" রাজা আর সে বিষয় প্রশ্ন করিলেন না। তিনি ভক্তিভরে প্রণাম

করিলেন, গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"একটি বিষয় তোমাকে সাবধান ক'রে দেই। তোমার মন্ত্রী ও মন্ত্রীপুত্র উভয়েই অবিশ্বাসী, উভয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বে। তাহারা অবশ্য তোমার আপাততঃ কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু শেষকালে তাহারাই তোমার সর্ব্বনাশ করবে। সাবধান! আর কাহারও কথা আমি বল্‌বো না, স্বয়ং সব দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌বে—যেমন বাহিরে তেমন অন্তরে—সমানভাবে লক্ষ্য রাখ্‌বে। আমি চল্‌লেম।" সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন—"মা! আমার সঙ্গে এস, তোমার ত কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে।" স্ত্রীলোকটি একবার রাজার দিকে দৃষ্টি করিল, তারপর সন্ন্যাসীর অনুগমন করিল। রাজা নীলাম্বর কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখেন, একটি অশ্ব বৃক্ষে বাঁধা আছে। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন, এবং রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

স্বদেশ ভক্তি।

আমাদের স্বদেশ-ভক্তি, পাকা রকমের ভক্তি নয়। দেশকে ভালবাসা—মানবত্ব-লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা যদি আমাদের দেশকে সত্য সত্যই এত ভালবাসি, তাহা হইলে আমরা মানবত্বের এবং মনুষ্যশক্তি লাভের দিকে খুব অধিক দূর অগ্রসর হই নাই কেন? আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি সত্য, কিন্তু তাহা কেবল কেহ আমাদের আচার-ব্যবহার, সাহিত্য ও সভ্যতা বা আমাদের দেশকে নিন্দা করিলে তাহার উত্তর-দানের ব্যগ্রতার মধ্যেই দেখা দেয়। আসল ভক্তি—ভক্তি-ভাজনের নিন্দার উত্তর দিবার জন্য ব্যগ্র নহে; সে এমন অবস্থায় দেশকে উন্নত করিতে চাহে যে অবস্থাই সকল প্রকার নিন্দার প্রকৃষ্ট প্রত্যুত্তর। কোনও বস্তুকে খারাপ বলিলে তাহার নিন্দা করা হইল বটে, কিন্তু সেই বস্তুকে ভালবাসার অর্থ ইহা নয়—যে যদি কেহ তাহাকে নিন্দা করে, তাহা হইলে নিন্দুকের ধাপান্ত করিয়া তবে জলগ্রহণ করা। যদি সেই বস্তুকে সত্যসত্যই ভালবাসিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে যত্ন এবং কষ্টপূর্ব্বক নিখুঁত এবং প্রয়োজনীয় করিয়া তোলাই একান্ত আবশ্যক। ইহার পরেও যদি কেহ তাহার নিন্দা করে, তাহা হইলে সে আপনাকেই গালি দেয় এবং তাহার নিজের বুদ্ধিনাশের প্রমাণই জাহির করে। এমন বুদ্ধিভ্রষ্ট লোকের সহিত কলহ করা বৃথা। আমরা যদি আমাদের দেশকে ভালবাসি, তাহা হইলে দেশের মুখ আলোকিত এবং তৎসঙ্গেই আমাদের মুখ উজ্জ্বল হয় নাই কেন? দেশকে ভালবাসিলে—ভালবাসার এমনই গুণ—ভারত-জননী ফলে, ফুলে, ফসলে, জ্ঞানে, ধ্যানে, গরিমায়, উৎসবে, অনুষ্ঠানে এবং যজ্ঞে পূর্ণ হইয়া উঠিত। দেশ সেই প্রকার হইয়াছে কি? যতদিন না দেশের প্রত্যেক সন্তান আপনার সাধনা ও সিদ্ধি, জ্ঞান ও জ্ঞানা-

লোক, উপাসনা ও আরাধনা দেশকে দিবে, ততদিন দেশকে ভালবাসা মিথ্যা কথা। দেশকে ভালবাসিতে হইলে আত্মাকে বিভূষিত ও উদ্বোধিত করিতে হয়—আপনার ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য নহে; দেশের চিরস্থায়ী গৌরবের জন্য। যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা আমাদিগকে অর্জ্জন করিতে হইবে। আপনার বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে; আপনার অহঙ্কার-বহ্নিতে আহুতি দিবার জন্য নহে—স্বদেশ-জননীর চরণ-পদ্মে পূজোপচার যোগাইবার জন্য। ধন অর্জ্জন কর, ধনার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার কর, ধনী হইবার জন্য নহে; দেশকে ধন-শালিনী করিবার জন্য। বিদ্যার্জ্জন কর; বিদ্যা শিক্ষা দাও, পণ্ডিত-আখ্যা লাভ করিবার জন্য নহে, যাহাতে দেশব্যাপী জ্ঞানের স্ফুরণ হয়—তাহারই জন্য। ধর্ম্মশিক্ষা কর, ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, ব্রহ্ম লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবার জন্য নহে, বরং যাহাতে সমগ্র দেশ ব্রহ্মলাভ করিয়া উন্নত, দৃঢ় এবং পবিত্র হইয়া, মানুষের মত ধরা-পৃষ্ঠে বিচরণ করে। যে গৌরবের টিকা প্রাপ্ত হয়, সে ত ধন্য, কিন্তু ততোধিক ধন্য সে যে সমগ্র দেশকে গৌরবের টিকা পরাইতে পারে। দারিদ্র্য মলিন বটে, কিন্তু ইহার মধ্যেই যদি জ্ঞানালোক হাতে করিয়া এবং ধর্ম্মের যষ্টি ধারণ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে এই কুৎসিত দারিদ্র্যই যে কি মহিমায় মণ্ডিত হয়, তাহা কালীর অক্ষরে লিখিয়া বুঝান যায় না। আমাদের আচার-ব্যবহার বিদেশীর হাস্যোদ্দীপন করে সত্য কিন্তু তাহার কারণ ইহা নয়—যে আমাদের আচার-ব্যবহার হাস্যজনক, তাহার প্রকৃত কারণ আমরাই স্বয়ং। আমরা যদি কুঁড়েঘরে থাকিয়াই হৃদয়ের বল লাভ করিতে পারি, এবং মানবত্বে অধিকার প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমাদের নগ্ন গাত্র এবং হীন কুটীরই লোকের ভক্তিতে এবং প্রশংসায় ভরিয়া উঠিবে—পুষ্প, পত্র এবং আভরণে সাজাইতে হইবে না। আমাদের দেখিয়া যে লোকে হাসে তাহার কারণ আমরা "ঘর করিয়াছি বাহির, বাহির করিয়াছি ঘর", ফলে আপন পর হইয়াছে সত্য, কিন্তু পরও পর্য্যন্ত আপন হয় নাই। পরকে আপন করে এবং আপনকে পর করে যে সে কুলটা। আমাদের অবস্থাও এখন তাই। কাজে কাজেই ঘরেরও আমরা জঞ্জাল, পরেরও আপদ। আমরা মুখে বলি, আমরা দেশকে ভালবাসি, অথচ দেশের 'সনাতন বিলাসপরিহার' পালন করি না। আমরা দেশী হইবার চেষ্টা করি না, পর-দেশী হইবার সাধ পোষণ করি; কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমরা না হই ঘরের, না হই ঘাটের, ধোপার কুকুরের মত ঠাঁই-হারা হইয়া কোথাও একটু আদর এবং কোথাও বিষম প্রহার খাইয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াই।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রের পরিণাম।

অনেক কষ্টে লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া সঙ্গিনীদের আগ্রহাতিশয্যে কিশোরী উষা তাহার স্বামীকে পত্র লিখিল।—"প্রিয়তম! তুমি কেমন আছ? আমি ভাল আছি; তুমি কবে

আসিবে।" ইত্যাদি। যদিও অনেকে তাহাকে নানাপ্রকারে ভালবাসা জানাইয়া পত্র লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু উষা বিবাহের এক বৎসর পরে আজ প্রথম পত্র লিখিতেছে, এবং স্বামীকে পত্র লেখা, পত্রে ভালবাসা জানান যে নব-পরিণীতার পক্ষে বড় লজ্জার কথা; এই সকল ভাবিয়া সে বড়ই গোলমালে পড়িয়াছিল, কিন্তু কি করে, বাল্য-সঙ্গিনীদের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আজ তাহাকে পত্র লিখিতে হইল।

স্বামী অরুণকুমার সুদূর প্রবাসে চাকরী করিতেন। পরের দাসত্ব বজায় রাখিয়া তাহার নব-পরিণীতা ভার্য্যার সহিত দু-দিনের প্রেম-আলাপনও তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। যুবক আকুল হইয়া তাহার প্রিয়তমার পত্রোল্লিখিত প্রিয় সম্বোধনের জন্য, কোমল-মধুর দু-একটী বাক্যের জন্য অপেক্ষা করিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আজ পর্য্যন্ত কোনও পত্র পায় নাই। যদিও অনেক নাটক নভেল হইতে ছাঁকা ছাঁকা ভালবাসার উচ্ছ্বাসগুলি উদ্ধৃত করিয়া অরুণকুমার ডাকযোগে তাহার প্রেয়সীর উদ্দেশে প্রেরণ করিতে বিস্মৃত হইত না; এবং যদিও প্রত্যেক পত্রের উত্তর দেবার জন্য "মাথার দিব্য" দেওয়া থাকিত, তথাপি সে সকলের একটীরও জবাব আসে নাই। অনেক দিন পরে যখন সে "প্রিয়তম" সম্বোধন-সমন্বিত একখানি পত্র পাইল, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। একে "প্রিয়তম" তাহার উপর আবার কবে আসিবে। মুগ্ধ যুবক এ আবাহনের অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, সে অনেক চেষ্টায় কিছুদিনের ছুটী লইয়া বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটীতে মা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতির প্রাণভরা আদর পাইয়াও, যে একটী সুন্দর মুখের সে অনুসন্ধান করিতেছিল, উষা তখন পিত্রালয়ে থাকায় তাহার ভাগ্যে সে সুখ ঘটিয়া উঠিল না, কাজেই কাল-বিলম্ব না করিয়া অরুণকুমার শ্বশুর বাটী গমন করিল।

অরুণ অনেক নাটক নভেল পড়িয়াছিল। সে আহারাদির পর রাত্রে একেলা শুইয়া শুইয়া কি প্রকারে তাহার প্রিয়তমার সহিত প্রেম-সম্ভাষণ করিতে হইবে, মনে মনে তাহারই একটা মহড়া দিয়া লইতেছিল; এমন সময়ে হঠাৎ কাহার আগমনে তাহারই সুখ কল্পনায় ব্যাঘাত ঘটিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে, প্রাণে এক বোঝা আশা লইয়া সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু হায়! কই সে ত এলনা? যার জন্য কতদূর থেকে তাহার আগমন, সে কই? একটা দারুণ বিরক্তি. একটা বিপরীত অভিমান তাহার মনে উদয় হইল। যে আসিল, সে তাহার বড় শ্যালিকা। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসিটুকু লইয়া শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী বলিলেন—"ভাই, তোমার উষার আজ বড় অসুখ করিয়াছে, তাই সে মায়ের কাছে আছে, তুমি আজ দয়া করে একটু একলা থাক, শীঘ্রই অরুণের কোলে উষার উদয় হইবে। মা তোমায় একবার তাঁর কাছে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন,তুমি তাঁহার সহিত দেখা করিবে এস।" প্রত্যুত্তরে অরুণ বলিল—"আপনি চলুন, আমি যাইতেছি।"

অরুণ মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু উৎকণ্ঠিত যুবক এই দারুণ নিরাশায় আক্রমণে

একেবারে মরমে মরিয়া গেল ; রাগ, অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি একককালীন তাহার মনের ভিতর আসিয়া উদয় হইল। সে মনে মনে ভাবিল যে—"অসুখ করিয়াছে ?" এমন কি অসুখ যে একবারও আমার সহিত দেখা করিল না ? আমি আসিয়াছি শুনিয়াই কি তাহার অসুখ করিল ! এতদিন ত আমি নাই, কই অসুখের কথাও ত কখনও শুনি নাই ? আজ আমি আসাতেই কি পৃথিবীর যত ব্যাধি তাহার দেহে আসিয়া বাসা করিল ? আমার আগমন সে কি পছন্দ করে না তবে পত্রে আমায় আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল কেন ? না, তা' কখনও নয়; সে নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসিলে যেমন করিয়া হউক একবার দেখা দিতই দিত, একবার আসিতই আসিত ! আমি কত দেশ-দেশান্তর হইতে কেবল তাহার পত্র পাইয়া আসিলাম, সে কি তাহা মনে মনে বুঝিতে পারে নাই ? নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে, তবে যে আসিল না, ইহা তাহার চাতুরী, সে আমায় একটুও ভালবাসে না. পত্র লেখা কেবল কপটতা, শুধু আমাকে বানরের মত নাচাইবার জন্য।" এইরূপ ভাবিয়া মনের কষ্টে অসুস্থা স্ত্রীকে দেখিবার ইচ্ছাও তাহার হইল না, ভ্রান্ত, অভিমান-পীড়িত, অরুণকুমার সকলের অজ্ঞাতে সেই রাত্রেই শ্বশুর বাটী ত্যাগ করিল এবং স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া একেবারে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল।

প্রভাতে সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, অরুণকুমার বাটীতে নাই, অনেক খোঁজ করিয়াও তাহার কোনও সন্ধান মিলিল না।

অসুস্থা ঊষা জানিত যে তাহার অসুখ হইয়াছে শুনিয়া স্বামী অরুণকুমার বড় ব্যথা পাইবে এবং নিশ্চয়ই ছুটিয়া তাহাকে দেখিতে আসিবে ; কিন্তু দেখা ত দূরের কথা, কোথাও তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না ; অবশেষে যখন সংবাদ আসিল যে, অরুণকুমার কর্ম্মস্থানে গিয়া নিয়মিত চাকরী করিতেছে, তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু সরলা ঊষার প্রাণে তাহা বড় বাজিল। "এমন স্বামী, আমার অসুখ হইয়াছে শুনিয়া একটী বার খোঁজ পর্য্যন্ত লইল না, আমাকে কিছু না বলিয়া সে চলিয়া গেল ! প্রত্যেক পত্রে যে আমাকে কতমতে কত কথা লিখিত, সে আজ আমার এত কাছে আসিয়াও আমার সহিত দেখা করিল না !" ঊষা এই সমস্ত ভাবিয়া মনে মনে স্থির করিল যে, স্বামী তাহাকে মৌখিক ভালবাসা দেখায় মাত্র; প্রকৃত ভালবাসা সে তাহার নিকট হইতে পায় নাই।

এইরূপে উভয়ে এক ভ্রান্ত ধারণা লইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। দিনের পর দিন যায়, বাটীতে পত্র আসে, কিন্তু ঊষার নামে আর একখানিও পত্র আসে না। মান, অভিমান ক্রমে দুঃখে, বিরহে পরিণত হইল, স্বামী যার বিরূপ, সে রমণীর সুখ কোথায় ? কি করিবে, কি করিলে আবার স্বামীর দেখা পাইবে, ভাবিয়া ভাবিয়া ঊষা এক উপায় স্থির করিল। বাটীর পাশে বামা চাকরাণী বাস করিত, তাহার এক পুত্র ছিল, তাহার নাম রামহরি। ব্যথিতপ্রাণা, স্বামী-সুখ-বঞ্চিতা অভাগিনী ঊষা তাহার হস্তের স্বর্ণবলয় বিক্রয় করিয়া সেই দাসী-পুত্রের সহিত গোপনে স্বামীর

উদ্দেশে যাত্রা করিল। কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, নীরবে নিভৃতে নিশীথের কাল কোলে ঢাকিয়া রামহরি ও ঊষা বাটী পরিত্যাগ করিল।

রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে, অরুণকুমার তাহার বাসাবাটিতে একটী কৌচের উপর শুইয়া আকুল প্রাণে, বুকফাটা দুঃখে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল—"হে ঈশ্বর, হে অনাথনাথ! কেন এমন করিলে! দয়াময়! এত ভালবাসার এই পরিণাম! কত পায়ে হাতে ধরিয়া, ছুটী লইয়া আমি কেবল তাহার জন্ত বাটী গেলাম, সে কিনা একবার চোখের দেখাও দিতে পারিল না! একবারও আমার কাছে আসিতে পারিল না! আমিই শুধু ভালবাসিব, সে কি তার একটুও প্রতিদানে দিবে না? আজ কতদিন হইল, আমি চলিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রাণ কাঁদিলে সে নিশ্চয়ই যেমন করিয়া হউক, আমার কাছে ছুটিয়া আসিত! কিন্তু কই সে ত এল না! আসা দূরের কথা, একখানা পত্র দিয়াও সংবাদ লইল না। জানিনা ঈশ্বর,কি উপাদানে তাহার হৃদয় গঠিত। মানুষে মানুষের উপর এত নির্দ্দয় হইতে পারে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।" এমন সময় বাহিরে কাহার গলার আওয়াজ শ্রুত হইল। অরুণ দ্বার খুলিয়া দেখিল, সর্ব্বাগ্রে একজন অপরিচিত ব্যক্তি ও পশ্চাতে তাহার ঊষা। সেই অপরিচিতের সহিত ঊষাকে দেখিয়া তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল, চোখ মুখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের মধ্যে এক বিষম আলোড়ন উপস্থিত হইল। দুঃখিনী ঊষা যখন দেখিল, স্বামী সম্মুখে, সে তখন অশ্রুভারাক্রান্ত-নয়নে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পা-দুখানি জড়াইয়া ধরিল—বাষ্পগদ্গদ্ কণ্ঠে বলিল—"স্বামীন্! প্রভু! আমার ইহপরকালের দেবতা! আমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমায় চরণে স্থান দাও।" অরুণ নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, রাগে, ঘৃণায় তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সে ঊষাকে সজোরে পদাঘাত করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রভাতে উঠিয়া সকলে দেখিল যে অরুণকুমার তাহার স্ত্রীর মৃতদেহ কোলে করিয়া পাগলের মত কাঁদিতেছে।

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

শিব চতুর্দ্দশী।

বসন্তে বাসনা তীক্ষ্ণজ্বালা প্রশমনে,
কাম কামনা সাধনে সিদ্ধ হইবারে,
তাই এ শিব-চতুর্দ্দশী-ব্রত কঠোরে;
যোগী যথা রত কঠোর সাধনা-সাধনে।
তাই ত্যাগী অথচ ভোগী শিব-শঙ্করে,
পূজিবারে শাস্ত্রে বিধি বিহিত বিধানে—
নিরম্বোপবাসে সবে জাগি' নিশিদিনে,
পূজে শিবে দীপদানে, প্রহরে প্রহরে।
শঙ্কর শঙ্করী বামে লয়ে হরষিত,
চৌদিকে ঐ হর বম্ রব বিধুনিত,
জয় শিব শম্ভু শিবানী মুখে নিয়ত,
কাম কামনা রিপু তাহে গো বিমোহিত।
জয় হে শিব-শঙ্কর শঙ্করী-মোহন,
বিনীত প্রণত পদে দেহ শ্রীচরণ।

শ্রীমিহিরজ্যোতি দাস।

জ্ঞান ও কর্ম্ম।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভির্ণারানাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

সংসারে মানুষ ও পশুতে এত প্রভেদ কেন? আমরা মানুষ, শ্রেষ্ঠ জীব, আমরা ঈশ্বর সৃষ্ট। আর পশু নিকৃষ্ট জীব তাহারাও তো পরম কারুণিক জগদীশ্বরেরই সৃষ্ট। আমরা আহার করি, নিদ্রা যাই, পশুরাও তো তাহাই করে। ভয় ও বিহারাদি তো উভয় শ্রেণীর মধ্যেই সমান। তবে এত তারতম্য কেন? তাহারা জগতে এত ঘৃণ্য আর মানব এত উচ্চ কেন? এ পার্থক্যের মূলীভূত কারণ কোথায়? আমরা মানব নামে অহঙ্কার করিতে পারি, মানব আখ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে পারি এবং তাহাতে গৌরবান্বিত হইতে পারি। এ ক্ষমতার অধিকারী আমরা কিরূপে হইলাম। তাই ঋষি বলিতেছেন—

"ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষ।"

ধর্ম্মই ইহাদের একমাত্র পার্থক্যের বিষয়। যখনই আমরা ধর্ম্ম-বিহীন হইব, তখনই এ পার্থক্যটুকু, এবং তখনই এ মানবত্বটুকু অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। তখন মানুষ আর পশুতে একটা বিশেষ পার্থক্য ভাব থাকিবে না। সব সমত্বে পরিণত হইয়া যাইবে। প্রকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্র Logic মতে যদিও প্রজ্ঞাই Rationality এই পার্থক্যের মূলীভূত কারণ তথাপি ধর্ম্ম প্রজ্ঞা সমন্বিত বলিয়া ঋষি ধর্ম্মকেই সেই স্থান প্রদান করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে যে, এই ধর্ম কি? যে ধর্ম্ম মানুষকে পশু হইতে পৃথক করিয়া দেয়, যে ধর্ম্ম মানবের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব নিদান, সেই ধর্ম্ম কি? সে ধর্ম্ম লাভ করিবার উপায় কি? এবং সেই ধর্ম্ম কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত? আমি এস্থলে কোন ধর্ম্ম বিশেষের কথা বলিব না, যে ধর্ম্ম পালন করিলে মানুষ "মানব" আখ্যার উপযুক্ত হয়, না করিলে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, আমি সেই ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিতেছি। এক্ষণে দেখা যাউক সে ধর্ম্মের ভিত্তি কি। ভিত্তি অনেক, তন্মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্মই প্রধান, জ্ঞান ও কর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ধর্ম্ম মন্দিরে প্রবেশ করিবার এই দুইটী প্রধান দ্বার। এই দুইটী দ্বার উন্মুক্ত করিতে না পারিলে ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। বাহ্য শক্তি প্রয়োগে এ মন্দির-দ্বার একটুও বিচলিত হয় না। বিজ্ঞানের শত আয়ুধ দ্বারা এ মন্দিরের রন্ধ্র উৎপাদন করিতে অসমর্থ। এ দ্বার নগণ্য লৌহনির্ম্মিত নহে—এ দ্বার জ্ঞান ও কর্ম্ম নির্ম্মিত। আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যতীত ইহা উন্মুক্ত হইবে না। এক্ষণে সেই জ্ঞান ও কর্ম্মই আমার আলোচ্য বিষয়। এবং তাহাদের আপেক্ষিক মূল্য Relative worth ই বা কি, তাহাই আমার বক্তব্য বিষয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষা মাদিত্য বপজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥

চক্ষু আমাদের সব সময়েই থাকে। কি দিবা, কি রজনী, কি অমাবস্যা, কি পূর্ণিমা আমাদের নয়ন-যুগল সব সময়েই বিদ্যমান। তবে কোন সময়ে দেখিতে পাই আর কোন

সময়ে দেখিতে পাই না? নিশীথান্ধকারে শত চেষ্টা সত্বেও কোন বস্তু দেখিতে পাই না, আর দিবাভাগে সূর্য্যালোকে শুধু চক্ষুরুন্মীলন করিয়া থাকিলে বস্তু-নিচয় দেখিতে পারি। সবই এক থাকে; সেই চক্ষু, সেই বস্তু, সবই ঠিক থাকে। তবে এ বিভিন্ন ভাব ঘটে কেন? আলোক অভাবই এ বিভিন্নতার কারণ। সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকার যতদিন দূর না হয়, ততদিন জগতের পদার্থ অবগত হইতে পারি না, সে পর্য্যন্ত চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কিন্তু যখন জ্ঞানালোকে মনান্ধকার দূরীকৃত হয়, তখন বুঝিতে পারি, জগতের প্রকৃত বস্তু কি? তখন আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের সত্য কি? আমাদের ধর্ম্ম কি?

"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তি মচিরেনাধিগচ্ছতি॥"

হে মানব, যদি ঘাত-প্রতিঘাতময় পৃথিবীমাঝারে সুখ ও শান্তির শীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া সুখভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি ধর্ম্ম-জনিত বিমল সুখে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি জগতের মূলীভূত সেই পরম কারণ পরমাত্মাকে জানিবার ইচ্ছা হয়, তবে জ্ঞানোপার্জ্জন কর। জ্ঞান ব্যতীত সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। এখন সেই জ্ঞান কিরূপে পাইতে হইবে এবং কিরূপ ব্যক্তিই বা তাহা পাইবার উপযুক্ত পাত্র? তাই ভগবান বলিয়াছেন,—

"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়।"

অর্থাৎ যিনি শ্রদ্ধাবান, সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত, কিন্তু এই শ্রদ্ধা ও জিতেন্দ্রিয়তা স্বতঃই মানব-হৃদয়ে উপস্থিত হয় না। শ্রদ্ধাদি দ্বারা জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করিতে হইবে। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই বটে, কিন্তু কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান লাভেরও কোন পন্থা নাই। অগ্রে কর্ম্ম-রাজদণ্ড প্রভাবে দুর্জ্জয় প্রবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে না পারিলে জ্ঞান লাভের আশা ভেলকের সাহায্যে প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ জলধি অতিক্রমের ন্যায় হাস্যোদ্দীপক বলিয়া বোধ হইবে।

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্র মিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগ সংসিদ্ধ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"

এই বিশ্ব-মাঝারে জ্ঞান-যজ্ঞের তুল্য কোন যজ্ঞ নাই। জ্ঞান-যজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন কেবল মাত্র সূর্য্যদেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আলো প্রদান করেন, এবং জলই একমাত্র তৃষ্ণা নিবারিণী, সেইরূপ জ্ঞানই কেবল মাত্র সিদ্ধি-প্রদায়িণী। সকলেই এ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"তৎস্বয়ং *যোগসংসিদ্ধঃ কালনাত্মনি বিন্দতি।*" অর্থাৎ যিনি কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আত্মবিষয়ের জ্ঞানলাভ যথাকালে করিতে পারিবেন; কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত সে জ্ঞান লাভ হইবে না।

"ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথা দর্শোমলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম॥"

অগ্নির এত দাহিকাশক্তি, এত প্রতাপ, সেও ধূমের নিকট পরাজিত, স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, সুনির্ম্মল মুকুরনিচয় কত সুন্দর। কত উজ্জ্বল! কত চিত্তাকর্ষক। তাহা মলাবৃত হইলে বস্তু প্রতিফলনের ক্ষমতা দূরীকৃত হয়। শিশু কত প্রীতিপ্রদ, কত

আনন্দের জিনিষ, কত মনোমুগ্ধকর, কিন্তু হায়! মাতৃগর্ভে যখন জরায়ুদ্বারা আবৃত থাকে, তখন কোনই আমোদ প্রদান করিতে পারে না। তদ্রূপ জ্ঞান কত প্রভাবিত, কত শক্তিশালী, কত শান্তিদাতা কিন্তু হায়! যখন কামাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, যখন কামরিপু আসিয়া জ্ঞানের উপর একাধিপত্য বিস্তার করে, তখন জ্ঞানের প্রভাব কিছুই থাকে না। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তি-বর্গ জ্ঞানকেই সর্ব্বস্ব মনে করে। কিন্তু কেহ ভাবিয়া দেখে না যে, তাহাদের জ্ঞানের ভিত্তি কোথায়? একটু গবেষণা পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, সেই সুরম্য জ্ঞান-মন্দির কর্ম্মভিত্তির উপর স্থাপিত। কর্ম্ম চাই, জ্ঞানোদয় ঘটিবে; নতুবা নহে।

এখন এইমাত্র বুঝিতে পারা গেল যে, কর্ম্ম অবশ্য করণীয়, তবে তাহা সকাম, কি নিষ্কাম? স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"তস্মাদসক্ত সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তোচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, তুমি ফলাশক্তি পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। যেহেতু অনাসক্ত পুরুষ সিদ্ধপুরুষরূপে পরিগণিত হয়।

ইহা অতি উচ্চ, এতদপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম হইতে পারে না সত্য, কিন্তু নিষ্কাম-ধর্ম্ম প্রাথমিক জীবনে সম্ভবপর নহে। প্রথমেই মানব উচ্চ-ধারণা লইয়া জীবনযাপন করিতে পারে না। আমার ধারনা এই, মানুষ সকাম ধর্ম্মদ্বারা যতই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, নিষ্কাম-কর্ম্ম ততই মনো-মধ্যে জাগরিত হইয়া উঠে। যখন বিষ্ণু স্বয়ং বর দিবার জন্য সমাগত, তখন ধ্রুবের মনোগতি অনেক উচ্চে উঠিয়াছিল। তখন তাহার সকাম-ভাব ছিল না। নিষ্কাম-ভাব আপনাপনি উপস্থিত হইয়াছিল, তাই ধ্রুব বলিয়াছিল—"হে প্রভো। আমি পদাভিলাষী তপস্যা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু হে দেব। কত যোগীঋষি তপশ্চর্য্যা-পরায়ণ হইয়া যাহার দর্শন পায় না, আমি তাহা পাইলাম। কাচ অন্বেষণ করিতে গিয়া রত্নলাভ হইল। কৃতার্থ হইলাম, আর বর চাই না। এই ভাবটী কি সুন্দর, কি রমণীয়, কি স্বর্গীয়, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল ভাব অন্তর্হিত হইল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বাসনাগ্নি-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল। সংসারে প্রত্যেক সাধু লোকেরই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

পবিত্র কামরাশী নিষ্কামতায় পারণত হয়। মন ক্রমেই উচ্চগামী হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়; তখন আর সকাম ভাব থাকে না।

"ন পারমেষ্ঠং ন মহেন্দ্র বিষ্ণং,
ন সার্ব্বভৌমঃ ন রসাধিপত্যং।
ন যোগ সিদ্ধির পুনর্ভবং বা,
ময্যাপিতাত্মেচ্ছতি মদিনাণ্যং॥"

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যিনি আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি কি ব্রহ্মপদ, কি ইন্দ্র-পদ, কি সার্ব্বভৌমপদ, কি পাতালের আধিপত্য, এমন কি যোগসিদ্ধি বা মোক্ষ পর্য্যন্ত চাহে না। আমি ভিন্ন তাহার আর কোন বস্তুতে আসক্তি থাকে না।' একেই বলে প্রকৃত নিষ্কামতা। আমরা আমাদিগকে যতই ভুলিতে পারিব, ততই নিষ্কামতার ভাব আসিবে। নতুবা নহে। কামাত্মা হওয়া প্রশংসার বিষয় নহে। আবার

কামনার অতীত হইয়া সংসারে কাহাকেও থাকিতে দেখা যায় না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কামনা স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

কামনার বস্তু যতই উচ্চ হইবে, আমাদের মনও ততই ঊর্দ্ধগামী হইবে, আর যতই নিকৃষ্ট ও অপবিত্র হইবে, আমাদের মনও তত অধোগামী ও নিরয়গামী হইবে। সংসারে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, এই পৃথিবীতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, প্রকৃত সুনির্ম্মল সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে, কর্ম্ম করিতে হইবে, নতুবা সিদ্ধিলাভের উপায় নাই। জ্ঞান-বহ্নি দ্বারা কামকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে, তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

শ্রীহৃদয়নাথ বাগচী।

তরু।

(১)

কেন এ কঠোর ব্রত, উন্মাদের প্রায়,
কি চিন্তায় তরুবর ঊর্দ্ধশিরে নিরন্তর,
শূণ্যপানে চেয়ে থাক কাহার আশায়!
কে তোমার প্রিয়জন, কার ত'রে আকিঞ্চন,
বল বল বল তরু বল হে আমায়।
এ দারুণ পণ তুমি শিখেছ কোথায়?

(২)

প্রখর তপন তাপে তনু জর জর,
প্রান্তরে একেশ্বর, নাহি ক্ষোভ নাহি ডর,
কেবল তোমার আঁখি ঊর্দ্ধে নিরন্তর।
মিলিয়া অনিল সনে, হেলে দুলে এক মনে,
কার গুণ গাও সদা বল তরুবর,
কি তত্ত্বে তন্ময় হয়ে হেরিছ অম্বর?

(৩)

যে তোমারে কৃপা করে দিয়াছে এমন,
ত্রিভুজ সুন্দর কায়, ফল ফুল শোভা পায়,
আছে কি পরাণে তব তাহার আনন!
তাঁর তরে প্রাণমন করিয়াছ সমর্পণ,
তাঁহার প্রেমেতে বুঝি অচল এমন,
পাবে কি অন্তিমকালে তাঁর দরশন?

(৪)

ভীষণ অশনিনাদে অটল জীবন,
নিদারুণ বরিষায়, কঠোর করকা ঘায়,
কাতর না হও শুধু চিন্তায় মগন!
সুধালে না কথা কও, মাথা পাতি বজ্র লও,
প্রতিদিন উষাকালে ঝরে কি কারণ,
আঁখি ধারা ঝর ঝর তুহিন পতন?

(৫)

কত শত হেমঅঙ্গ বিহঙ্গনিচয়,
সুখে তব অঙ্গপরে, যামিনী যাপন করে,
শ্রান্ত পান্থ রক্ষা পায় তোমার ছায়ায়।
ভাবুক প্রধান তুমি, অবোধ বালিকা আমি,
সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে দুখের নিশায়।
আমাসম অভাগীরে দেবে কি আশ্রয়?

শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী মিত্র সরস্বতী।

জাতীয় দায়ীত্ববোধ সম্বন্ধে
দুই একটী কথা।

দায়ীত্ববোধ থাকিলে ভাবনাও আসে। যাহার দায়ীত্ববোধ নাই, সে সংযতভাবে ভাবে না। আমরা যে আজকাল 'সাহেব' হইতে বসিয়াছি, তাহার কারণ,দেশীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের দায়ীত্বজ্ঞান লোপ পাইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পরিণামস্বরূপ, চুলছাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া পা ঢাকা পর্য্যন্ত 'সাহেবিয়ানা' ক্রমে ক্রমে,আমাদিগকে অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। এই প্রকার অঘটন প্রতিরোধ করিতে হইলে, দেশীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে যে আমাদের যথেষ্ট দায়ীত্ব আছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা মনে রাখা

উচিত যে, আমরা যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের হাবভাব পরিহার করিতাম, তাহা হইলে, এমন উৎকট 'সাহেবিয়ানা' আমাদিগকে পাইয়া বসিত না। আমরা যখন কোন দেশী চালচলন ছাড়িয়া দিই, তখন যদি একটু তলাইয়া দেখি যে, সেই চালচলন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কতটা আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতা, আরাম ও সুযোগ এবং স্বাধীনতা ও মনের বল বাদ দিতেছি, তাহা হইলে, এখন আমরা যতটা শীঘ্র সেগুলি ছাড়িয়া দিতেছি, উক্তমরূপ চিন্তার পর ততটা শীঘ্র পারিতাম না। বিলাতী হাবভাব অনুকরণ করার মধ্যে "ভাবনার" লেশ নাই; ইহার মধ্যে কেবল একপ্রকার সংক্রামকতা আছে। দুর্ব্বল লোককে যেমন ব্যাধিতে শীঘ্র আক্রান্ত করিয়া ফেলিতে পারে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তিও তেমনি দেশের দুর্ব্বলচিত্ত লোকদিগকে দখল করিয়া ফেলিতেছে। ইহা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ নহে। যাহাতে শীঘ্র ইহার গতিরোধ হয়, তাহার পন্থা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আমি এমন কথা বলি না যে, আমাদিগকে চিরকাল একটা প্রচলিত ধারার অনুযায়ী বিনা বিচারে চলিতে হইবে। মানুষের উপর এমন অত্যাচারের কল্পনা আমি করি না। আমি কেবল বলি,—শুধু মজার জন্য এবং চোখের ধাঁধাঁয় পড়িয়া আপনার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শক্তি-সম্বল, আরাম ও সুখ নষ্ট করিও না। আমি লোককে ইহাই মনে করাইয়া দিতে চাহি। রুটি-বিস্কুট প্রভৃতি খাওয়ার মধ্যে বুদ্ধির তৃষা কিছুমাত্রও নাই, কেবল রসনার লোলুপতা নির্লজ্জভাবে প্রকট আছে। আমাদের দেশের যে অনাড়ম্বর আহার বিহার প্রচলিত আছে, তাহাই জীবনধারণ এবং জীবনের কর্ত্তব্যপালনের পক্ষে যথেষ্ট। দেশী বলিয়া আমি পোলাও-কোপ্তারও পক্ষপাতী নহি। যে খাদ্যে অল্পখরচে দেহ পুষ্ট, পবিত্র এবং নিরাময় থাকে, তাহাই সেব্য। পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সরঞ্জাম এবং বাসভবন ইত্যাদি এই সকলের সম্বন্ধেও এই কথাই চলে। অল্পখরচে প্রকৃষ্টভাবে থাকাই হইল—থাকার মতন থাকা। যে ভাবে থাকিলে শরীর নষ্ট হয় না, বুদ্ধি কলুষিত হয় না, চরিত্র মলিন হয় না—তাহাই প্রকৃষ্টভাবে থাকা। ভারতবর্ষে এইপ্রকার থাকাই ছিল এবং এইপ্রকার থাকার এখনও আদর হওয়া উচিত। অবশ্যই সকল বিষয়ের বুদ্ধিপূর্ব্বক সংস্কার হইতে পারে, তাহা দেশ এবং দেশবাসী উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর, এই কথাই মনে করিয়া আমরা সংস্কারের পক্ষপাতী। কিন্তু সংস্কারের অর্থ শোধন করা, নষ্ট করা নহে। সিদ্ধ করিয়াই অন্ন প্রস্তুত হয় এবং সেই প্রকার করিলে তাহা উপাদেয় হয়, কিন্তু অযথা দগ্ধ করিলে হয় না, সামাজিক নিয়মাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়াই সংস্কার নহে। তাহাদিগকে শোধন করিয়া সকলের পক্ষে সম্যক্ উপকারী করিয়া তোলাই সংস্কার। অবশ্য যাহা নিয়মের নামে অনিয়ম তাহা ছাঁটিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। অন্নের সহিত কাঁকর থাকে বলিয়া তাহা ভোগ্য হইতে পারে না। দেশের প্রথা বলিয়া আধুনিক বাসরঘরের দশমুখে প্রশংসা করা চলে না। বাসরের আনন্দ ও উৎসব আমরা বাদ দিতে বলি না। বাসরের বেহায়াপনা কিন্তু সর্ব্বথা

পরিহার্য্য। শ্যালিকার সহিত ভগ্নীপতির এখন যে প্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহা আরও একটু পবিত্র করা কর্ত্তব্য এবং বাধাহীন হাস্য-পরিহাস হ্রাস এবং নৈতিক দিক্ হইতে স্বাস্থ্যকর হওয়া উচিত। এই সকল প্রথা দেশী হইলেও আমাদের বিবেচনায় দেশী নহে। এই প্রকার আরও কত প্রকার প্রথা আছে, যে গুলির পক্ষেও আমাদের এই একই মন্তব্য। দেশী হওয়ার অর্থ এমন নয়, যে দেশের কর্দ্দম মাখিয়া বলিতে হইবে, মাযের বিভূতি ধারণ করিয়াছি। এই প্রকারের ব্যবহারের মধ্যে দায়ীত্ববোধ ও ভাবনা কোথায়? ইহা বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতার মতই একপ্রকার স্বদেশী পাগলামী। চা-পানি বিলাতী আচার বলিয়া পরিহার করিয়া, স্বদেশে উৎপন্ন বলিয়া কি আফীং খাইতে হইবে? এই প্রকার বুদ্ধির অবশ্যই কেহ প্রশংসা করিবে না। আমরা বলিতে চাহি—মুড়ি-ভাত খাইয়াও, চেটায় শুইয়াও, কুঁড়েঘরে থাকিয়াও ও ছেঁড়াকাঁথা পরিয়াও বাঙ্গলার অতি কদাকার কৃষ্ণ ছেলেটিও মানুষের মত মানুষ, এমন কি দেবতা পর্য্যন্ত হইতে পারে। ইহা ত অসম্ভব নহে। দুঃখ কষ্ট, দৈন্য ও অন্নাভাবের মধ্য দিয়াই মানুষ তৈয়ারী হয়। সুখের মধ্যে থাকিয়া ঠিক মানুষ হয় না, ইন্দ্রিয়পরিচালিত একপ্রকার যন্ত্র হয়, কেন না সে প্রকার লোকের মধ্যে মন বলিয়া কিছু পাওয়া যায় না, তাহাদের মন একটি স্পঞ্জের মত, যত ভাব পায় সবই শুষিয়া লয়, কিন্তু ভালমন্দ আলাহিদা করিতে পারে না।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মিত্র।

"আহুতি"

(ক্ষুদ্র গল্প)

১।

পদ্মা নদীর উপকূলে বিষ্ণুপুর নামক গ্রামটি সর্ব্বদা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে গৌরবান্বিত, এই গ্রামের এক প্রান্তে কেনারাম হালদারের দ্বিতল অট্টালিকাটী সুশোভিত।

সংসারে তাঁহার দুইটি কন্যা, গৃহিণী ও একমাত্র পুত্র রমেশ ভিন্ন আর কেহই ছিল না, তবে ভৃত্য ও পরিচারিকা অবশ্যই ছিল।

কেনারামবাবুর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। তিনি গ্রাম্য জমিদার হরমোহনবাবুর প্রধান আমলা, কেনারামবাবুর পুত্র রমানাথ, কলিকাতার একটি স্কুলে প্রবেশিকা পাশ করিয়া আপাততঃ সরস্বতীদেবীকে বিদায় দিয়াছিলেন। এখন বাড়ীতে বসিযা কবিতাদেবীর চরণ-সেবা-পূর্ব্বক অনন্ত সাহিত্য-জগতে আত্ম-প্রচারের জন্য,আপনার নামটি হেম, কবি, মধু, বঙ্কিম প্রভৃতি নামের তালিকাভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত আছেন। তবে পারেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কেনারামবাবুর কন্যাদ্বয়ের নাম বিমলা ও সরলা, বিমলা বিবাহিতা আর সরলার এখনও বিবাহ হয় নাই। ইহাতে তাহার মাতার মনে এক সন্দেহের ছায়া অঙ্কিত ছিল। সরলার বয়স হইতেছে দেখিয়াও কর্ত্তা বিবাহ দিবার নিমিত্ত কোন উদ্যোগী হইতেছেন না, ইহার কারণ কি?

একদিন সন্ধ্যার সময়ে যখন কেনারাম কাছারী হইতে বাটী আসিলেন, তখন গৃহিণী রোষ-বিরক্তি কণ্ঠে বলিলেন—"বলি —

বিবাহ দিতে হবে না—এর পরে, স্বয়ম্বরা হবে যে।" কেনারাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"মায়ের গুণ রাখতে চায় ত।" গৃহিনী তীব্র স্বরে বলিলেন—"কেন, আমি কি তোমার রূপ দেখে ভুলেছিলেম।" কেনারামবাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আহাহা তা ভুলতে গেলে কেন, তোমার বাবা আমার টাকার রূপ দেখে ভুলেছিলেন বুঝতে পেরেছ ?" গৃহিনী তখন নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন। কর্ত্তার কাছে গৃহিনী যখন মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করিতেন, কর্ত্তা তখনই তাঁহাকে যা তা এক কথা বলিয়া তাড়াইতেন।

বাস্তবিকই সরলার বিবাহের নিমিত্ত কর্ত্তার কোন উদ্যোগ ছিল না। তাঁহার হৃদয় কুঞ্জে একটি ক্ষুদ্র আশালতিকা প্রচ্ছন্নভাবে অঙ্কুরিত হইয়া উঁকি মারিতেছিল, তাহা আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

সরলা শুক্ল শশধরের ন্যায় ক্রমশঃ কলা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার হৃদয়েও সময়োচিত আকাঙ্ক্ষা,আগ্রহ,ভালবাসা. ইত্যাদি বয়সোচিত লালসা-বৃত্তিগুলির বিকাশ পাইল।

একদিন বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ রজনীতে, প্রফুল্ল চন্দ্রকর বিকশিত প্রসূনপুঞ্জ সুশোভিত একটি বিস্তৃত মলয়ানিল-বিধৌত পুষ্পোদ্যানে দুইটি বালিকা বসিয়াছিল। কি যেন এক নিরাশার ছায়া উহাদের অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে প্রতিভাত। আকাশে পূর্ণচন্দ্র তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-রাশি বালিকাদ্বয়ের কুন্তল-গুচ্ছে এক অস্ফুট সৌন্দর্য্যাভা ঢালিয়া দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মৃদুল পবন-হিল্লোলে রজনীগন্ধার সুমিষ্ট গন্ধ অতি দূরে দিগন্তরে ভাসিয়া যাইতেছিল। বালিকাদ্বয় আর কেহই নহেন, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা বিমলা ও তাহার কনিষ্ঠা সরলা, তাহারা যেস্থানে বসিয়াছিল, তাহা নদীর অতি নিকটে।

সেই সময় স্বচ্ছ-সলিলা পদ্মা-বক্ষে একখানি নৌকা তর্ তর্ বেগে ভাসিয়া আসিতেছে। নৌকাখানিতে সুশীলকুমার ও তাঁহার বন্ধু বিমলকুমার জলক্রীড়ার্থে বহির্গত হইয়াছেন; বিষ্ণুপুর সংলগ্ন কোন গ্রামে ইঁহাদের বাসস্থান। বিমলার হস্তধারণ করিয়া একাগ্র-চিত্তে নৌকাখানির প্রতি সরলা চাহিতেছিল।

হঠাৎ আকাশে একখানি মেঘ দেখা দিল। গম্ভীর শব্দে ঝড় উঠিল। মেঘের সহিত মুহুর্মুহু বিদ্যুদ্দাম-চমকিত ও বজ্র-নিনাদিত হইতেছিল। বালিকাদ্বয় তথাপি নিশ্চেষ্টভাবে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। নদীবক্ষস্থিত নৌকাখানি ভীম-প্রভঞ্জন সংস্পর্শে অস্থির ও অসামাল হইয়া উঠিল, তোবে আর কি ? সরল-হৃদয়া সরলা কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—দিদি ডুবে গেল যে, দিদিও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—কে আছ রক্ষা কর—ডুবে গেল। কে উত্তর দিবে ? সেই কোমল-কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রতিধ্বনি কেবল পদ্মার বক্ষে ভাসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বাত্যাতাড়িত নৌকাখানি কাঁপিতে কাঁপিতে জলমগ্ন হইল। সরলা ভয়-বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিতা হইল। বিমলা তাড়াতাড়ি হস্ত দ্বারা বারি-সিঞ্চন করিয়া সরলার কুন্তল-দাম ভিজাইয়া ফেলিল। সন্তরণ-পটু বন্ধুদ্বয় বেগে সন্তরণ করিয়া তীরে আসিলেন। সরলা ভয়-ব্যাকুল-

ভাবে তাড়াতাড়ি সুশীলকুমারের হস্তখানি ধরিয়া ফেলিল।

কে এ ? বর্ষাবারিশিক্ত প্রফুল্ল-প্রভাত নলিনীবৎ উন্মুক্ত কবরী আলুথালুবেশা কে এ বালিকা !

কিছুক্ষণ পরে সুশীলকুমার সুস্থ হইলে, বিমলকুমার বলিলেন—এখন কোথায় যাওয়া যায়। সরলা বলিল—নিকটেই আমাদের বাড়ী, আমাদের বাড়ীতেই আসুন। এই বলিয়া সরলা তাহার দিদির হস্তধারণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। বন্ধুদ্বয় তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিলেন।

আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, আর কোথাও মেঘ নাই ; উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ সঞ্চালিত চন্দ্রমা-রশ্মি সুশীলকুমারের মুখের উপর খেলা করিতেছে। পার্শ্বে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু বিমলকুমার বসিয়া আছেন। উভয়ের মুখে কৌতুহলের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে দুইখানি খাবার-পূর্ণ রেকাব আনিয়া সরলা মেজের উপর রাখিয়া চকিতা হরিণীর ন্যায় সুশীলকুমারের মুখের দিকে চাহিল। ঈঙ্গিতানুসারে উভয়ে কিছু জলযোগ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে সূর্য্য-কিরণে মেদিনী-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বেই বন্ধুদ্বয় সরলার পরিচয়াদি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনার পরে সরলা যেন কি রকম হইয়া গেল। তাহার সে হাস্যোচ্ছ্বাস প্রফুল্লতা ও আনন্দ-উৎস কোথায় উড়িয়া গেল। সে সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে চেষ্টা করিত। নিরাশায়, দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার কক্ষটি মুখরিত হইত। বিমলা কত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত, তাহাকে ভুলাইবার জন্য কত কি বলিত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। এক কথা—সরলা আতপ তাপ-তপ্ত প্রসূনবৎ যেন জীবন্মৃতা হইয়া পড়িল।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন সুশীলকুমারের বাড়ী হইতে একজন ঘটক আসিল। কিন্তু কেনারামবাবুর অমত হইল। তিনি বলিলেন—"কার সহিত মেয়ের বিবাহ দিব ? যার ঘর নেই দরজা নেই, দাঁড়াবার জায়গা নেই—এরূপ লোকের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ হইতেই পারে না।" এই বলিয়া তিনি ঘটককে বিদায় করিলেন। ঘটক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা,একবার পূর্ব্বোল্লিখিত কেনারামবাবুর হৃদয়াঙ্কুরিত আশালতিকাটির বিষয় মনে করুন -তাহার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। তাহা না হইলে আমার গল্প শেষ হয় না। কেনারামবাবুর মনিব শ্রীযুক্ত হরমোহনবাবুর বিগত দুই বৎসর হইল—স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। বাবুর বয়স এখন অশীতি পার হয় হয়। তাঁহার ইতিপূর্ব্বে তিনটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহ করিলেই তাঁহার স্ত্রী বাঁচে না। তাঁহার ইচ্ছা, সংসারাশ্রমে বাস করিয়া বাসন্তী-চন্দ্রমার কমলোজ্জ্বল রজনীতে নবীনা-যুবতী ভার্য্যার মলয়-হিল্লোলবৎ দুই একটি সরস কবিতার মধুময় ঝঙ্কারে যদি হৃদয় পরিতৃপ্ত না হইল, তবে এ ধনৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি ? তাই তিনি আবার বিবাহ করিয়া নূতনভাবে সংসার করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

একদিন সন্ধ্যার পর কেনারামবাবু বিবাহের কথা উপস্থিত করিল। তৃষিত ব্যক্তির সম্মুখে স্বচ্ছ সরোবর দর্শন করিলে যেরূপ আনন্দ হয়, হরমোহন তদপেক্ষাও আনন্দিত হইলেন। প্রভাত-নলিনীবৎ সরলার প্রস্ফুটনোন্মুখ আননখানি তাঁহাকে লৌহ-চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেনারাম বুঝিল—ঔষধ ধরিয়াছে, তামাক টানিতে টানিতে নাকিস্বরে একবার ঘা দিয়া বলিলেন—পাঁচ হাজার টাকা দর রহিল। পরে নানা কথা লইয়া ছয় হাজার টাকা স্থিরীকৃত হইয়া বিবাহের দিনস্থির হইল। অবশ্য কেনারামের ইহাতে চাকরার সুবিধা হইবারও খুব আশা রহিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইয়া গেল—কেনারাম টাকা লইল। সরলা পতি-ভবনে চলিয়া গেল। হায় অর্থ, ধন্য তোর মহিমা, তুই অনায়াসে একটী জ্ঞানহীনা বালিকার সকল সুখ চিরতরে হরণ করিয়া লইলি।

এ বিবাহে সরলার অজস্র চক্ষু জল বহিল, হৃদয় ফাটিয়া একটী মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা বহির্গত হইয়া তন্দ্রারা তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পিতার অমানুষিক ব্যবহারে সরলার দুর্দ্দশার একশেষ হইল। বিবাহের পর একবৎসর অতীত হইতে না হইতেই সরলা বিধবা হইল। সকলে এই কথাই বলিতে লাগিল, সরলা কিন্তু জানে, তাহার বিবাহ এখনও হয় নাই, সে অনূঢ়া।

উক্ত ঘটনার প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। একদিন প্রভাত সময়ে মহাকাল নামক একটী শ্মশানে কতকগুলি বাহকের হরি হরি ধ্বনি শুনা গেল। বালসূর্য্যের সুবর্ণ আলোকে জগৎ হাসিতেছে। অদূরে শ্যামল বৃক্ষ লুক্কায়িত একটী পাপিয়ার নির্ম্মম কণ্ঠগীত পবনহিল্লোলে ভাসিয়া আসিয়া অতি দূরে দিগন্তে লীন হইতেছে। এই সময় আবার ভীষণ শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া সেই হরি হরি শব্দ পুনরুত্থিত হইল।

একটী অল্পবয়স্ক যুবকের মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া কতকগুলি লোক শ্মশানে উপনীত হইল। পরে একটী চিতা সজ্জিত করিয়া মনুষ্য দেহটী চিতার উপর দিয়া আগুন দিল। হু হু শব্দে চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া একটী ভুবনমোহিনী যুবতী উন্মাদিনী সেইখানে আসিয়া বলিল—"সুশীলকুমার এইবার তোমায় পাইয়াছি। এতদিন মনে মনে তোমার পূজা করিয়াছি, আজ আমার সেই পূজার বিজয়া-দশমী, আজ এই পবিত্র শ্মশানক্ষেত্রে আমি সিদ্ধিলাভ করিব, আজ আমার আরাধ্য-দেবতার উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন আহুতি প্রদান করিব। দাঁড়াও—দাসী যাইতেছে, এ স্বার্থপর জগতের অপর পারে দাঁড়াইয়া তোমায় আমায় পুনরায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইব।" এই বলিয়া উন্মাদিনী ক্ষিপ্রপদে সেই প্রজ্জ্বলিত চিতায় আসিয়া ঝম্ফ দিল। শ্মশান-যাত্রীগণ হতবুদ্ধি হইয়া বলিল,—"হরি হরি বোল।"

দেখিতে দেখিতে সর্ব্বভুক্ দুইটী নিরাশ হৃদয় নর-নারীকে এক করিয়া ফেলিলেন। আহুতির পবিত্র ধূম স্বর্গে উঠিল দেবতার অর্ঘ্য বিলীন হইল।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

আলোচনা, ১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২১।

রামায়ণের এক পৃষ্ঠা।

খরদূষণের সহিত যুদ্ধে শ্রীরাম যে অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র রাক্ষসকুল বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তাহারা রণস্থলে কোন মানবেরই এরূপ প্রচণ্ড বীরত্ব দেখে নাই। খরদূষণের মৃত্যুতে জনস্থান একপ্রকার রাক্ষসশূন্য হইল; যাহারা জীবিত রহিল, নির্জ্জন গিরিগহনে অথবা নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল; অনেকে আবার সাগর পার হইয়া লঙ্কায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। যে সকল রাক্ষস লঙ্কায় পলায়ন করিয়াছিল, অকম্পন তাহাদের অন্যতম। সে ব্যক্তি রাবণের কর্ম্মচারী সুতরাং প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া খরাদির নিধন-বার্ত্তা নিবেদন করিল। দশানন তখন শ্রীরামের বিক্রম বিষয়ে কিছুই জানিত না। একজন মানবের হস্তে ভীমবিক্রান্ত খরদূষণ নিহত হইয়াছে, একথা শ্রবণ করিয়া তাহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। সে ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে যেন তেজঃ দ্বারা জগৎ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া ভীমগম্ভীর স্বরে বলিল—"জগতে এমন কোন্ মহাবীর আছে যে, আমার সৈন্যদিগকে যুদ্ধে সংহার করিতে পারে? আমি যমের যম, মৃত্যুর ও মৃত্যু; পাবককেও আমি তেজোবহ্নিদ্বারা দগ্ধ করিতে পারি; পবনকেও দ্রুতগতি দ্বারা বধ করিতে পারি।" অকম্পন স্বচক্ষে শ্রীরামের বিক্রম দেখিয়াছিল; এবং রাবণেরও বলবিক্রম তাহার অবিদিত ছিল না। তথাপি রাবণ অপেক্ষা রামকে অধিকতর বলবান্ মনে করিয়া বলিল—"রাজন্! রামের অসীম বিক্রমের কথা কি বলিব? তিনি ইচ্ছা করিলে সৌব জগৎ সমেত সমস্ত নভোমণ্ডলকে উৎপাটিত করিতে পারেন, উচ্ছ্বসিত বা উদ্বেল সমুদ্রের গতি রোধ করিতে সমর্থ। আপনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবেন না; আপনি কি, সমস্ত সুরাসুর একত্রিত হইলেও যুদ্ধে তাঁহার সমকক্ষ হইবে না। অতএব যে উপায়ে তাঁহাকে বধ করিতে পারিবেন, তাহাই বলিতেছি। সীতা নামে পরম রূপলাবণ্যবতী বনিতা তাঁহার সঙ্গে আছে; রাম সীতাগতপ্রাণ। আপনি যদি কৌশলক্রমে সেই সীতাকে হরণ করিয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলেই রাম আর জীবিত থাকিবে না; সুতরাং বিনা যুদ্ধেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, পরন্তু আপনি এক অলোকসামান্য ললনারত্ন লাভ করিতে পারিবেন।" অকম্পনের পরামর্শ রাবণের পক্ষে অতীব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। সে সীতাহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরম মায়াবী মারীচের নিকট উপস্থিত হইল। যে মারীচ বালক শ্রীরামের প্রচণ্ড শরাঘাতে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে শত যোজন দূরবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যে সাগরসংপ্লবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, আজি

দশানন সীতাহরণে তাহারই সাহায্য পাইবার অভিপ্রায়ে তদীয় আশ্রমে আগমন করিল। মারীচ তথায় তাপস-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় কালযাপন করিতেছিল, শ্রীরামের হস্তে তাহার জননী নিহত এবং নিজে পরাস্ত হইয়া অবধি সে রাক্ষসব্যাপার ত্যাগ করিয়াছিল। রাবণ তাহারই নিকট উপস্থিত হইয়া সীতা-হরণে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, এবং শূর্পনখার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও খরদূষণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া বলিল—"ভুবনমোহিনী সীতা রামের ভার্য্যা; তুমি আমার সহায়তা করিলে আমি তাহার সেই প্রণয়বল্লভা বনিতাকে হরণ করিতে পারি। তুমি মায়ামৃগ হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া যাইবে এবং সেই সুযোগে আমি সীতাকে হরণ করিব।" ভয়ে মারীচের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হইল, হৃদয় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। রামের হস্ত হইতে পূর্ব্বে সে অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে বুঝিল এবার আর তাহার রক্ষা নাই। মারীচ রাবণকে অনেক ভয় দেখাইল; বলিল—"রামের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইলে ত্রিভুবন দগ্ধ হইয়া যায়। আপনি তাঁহার প্রতি বৈরতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন।" মারীচের উপদেশবাক্য কিছুতেই রাবণের প্রীতিকর হইল না; সে অবশেষে ভয়প্রদর্শন করিয়া বলিল—"আমার কথা না শুনিলে তোমাকে আর বাঁচিতে হইবে না।" দশাননের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল; রোষে ও অভিমানে মারীচের অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাবণের হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা রামের শরে মরণ বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া সে অবশেষে দশাননের বাক্যে সম্মত হইল। রাবণ না বুঝিয়া নিজ মৃত্যুস্বরূপ সীতাকে হরণ করিয়া আপনার সর্ব্বনাশের পথ আপনিই পরিষ্কার করিল।

রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ শ্রীরামের জীবনে দ্বিতীয় প্রচণ্ড বিপ্লব স্বরূপ। এই বিপ্লবে তাঁহার জীবন-প্রবাহ সম্পূর্ণ উদ্দাম তেজে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। ধর্ম্ম, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবে যেমন এক একটা প্রচ্ছন্ন বল সম্পূর্ণ স্ফুরিত বা বিধ্বস্ত হয়; অন্তর্বিপ্লবে সেইরূপ মানসিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি পায়, নতুবা বিলুপ্ত হইয়া যায়। যাঁহাদের মানসিক শক্তি স্ফুরিত হইয়া উঠে, অন্তর্বিপ্লব তাঁহাদেরই পক্ষে অসীম মঙ্গলের নিদান হইয়া থাকে। বিপ্লব ঘোরতর প্রচণ্ড হইলেও, তাঁহাদের দুর্জ্জয় মানসিক শক্তিকে দমিত করিতে পারে না; বরং সেই শক্তির নিকটেই দমিত হইয়া অবশেষে তাঁহাদিগেরই বিলাসলীলায় পরিণত হয়। বাহ্য বা অন্তর্বিপ্লবকে যাঁহারা আপনাদের কার্য্যসিদ্ধির প্রধান সাধন করিয়া লইতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়াকন্দুক। এরূপ মহাপুরুষগণের জীবন জগতে চিরকাল আদর্শ হইয়া থাকিবে। এই কারণেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীবন আজিও কোটী কোটী আর্য্যসন্তানের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া রহিয়াছে। বিপদের প্রগাঢ়তার সহিত ইহাঁদের ধৈর্য্য ও সাহসের প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অবশেষে বিপদ ইহাঁদের উন্নতির পথ রোধ করা দূরে থাকুক, অধিকন্তু পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। শ্রীরামের হৃদয়-মধ্যে

রাক্ষসকুলের যে বিদ্বেষ-বহ্নি এতদিন অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল, রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণে তাহা দিগ-দাহী প্রাখর্য্যের সহিত সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে। তিনি রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া সীতা উদ্ধার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া যখন তিনি সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার ধূমায়মান ক্রোধানল সহসা ভীষণ তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি শরাগ্নি দ্বারা ত্রিভুবন দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ড শরাসনে বাণ যোজনা করিয়া বলিলেন—"জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধির অপ্রতিহত গতিকে যেমন কেহই রোধ করিতে পারে না, আমার ক্রোধের বিশ্বদাহী তেজ সেইরূপ কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। যদি আমার সীতাকে অদ্যই না পাই, তাহা হইলে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য, পন্নগ, সাগর, শৈল ও অরণ্য সমেত সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিব।" লক্ষ্মণ শ্রীরামের এরূপ ভীষণ ক্রোধ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই; ইতিপূর্ব্বে যাহার রোষের সামান্য লক্ষণও প্রকাশ পায় নাই, আজি তাঁহাকে প্রলয়কালীন রুদ্র ও সাম্বর্ত্তক অনলসদৃশ প্রচণ্ডরূপে ক্রুদ্ধ দেখিয়া লক্ষ্মণ অতীব ভীত হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল পরিশুষ্ক হইল, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্র বচনে বলিলেন—"আর্য্য! ইতিপূর্ব্বে আপনি মৃদু, দান্ত, ও সর্ব্বভূতের হিতে রত ছিলেন; আজি এরূপ ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজ প্রকৃতি পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে। চন্দ্রের রমণীয়তা, সূর্য্যের তেজ, বায়ুর গতি এবং পৃথিবীর ক্ষমা আপনাতে একাধারে নিয়ত বিদ্যমান। আপনি সর্ব্বভূতের শরণীয় ও পরমাগতি স্বরূপ; অতএব একজনের অপরাধে সমগ্র লোক সংহার করা আপনার উচিত নহে। আপনার বুদ্ধি দেবতাদিগেরও অগম্য; সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও আপনাকে শিক্ষা দিতে সক্ষম নহেন; উপস্থিত বিপদে প্রাকৃত লোকের ন্যায় আপনার অভিভূত হওয়া উচিত নহে। যদি জানকী জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত জগৎসংসার সংহার করিলে তাঁহারও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।" ধীরবুদ্ধি লক্ষ্মণ অনেক সান্ত্বনা করিলেন; পৌরাণিক দৃষ্টান্ত প্রকটিত করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; সারগ্রাহী রাঘব তাঁহার বাক্যের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া প্রবৃদ্ধ রোষানল নিগৃহীত করিলেন এবং প্রচণ্ড ধনু অবষ্টম্ভিত করিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"বৎস লক্ষ্মণ! বল এখন আমরা কি করিব? কোথায় যাইব? কি উপায়েই বা সীতাকে দেখিতে পাইব, এক্ষণে তাহাই চিন্তা কর।" লক্ষ্মণ সবিনয়ে উত্তর করিলেন—"এই জনস্থান অতীব বিস্তৃত; ইহাতে নানা গিরিদুর্গ, নির্ঝর, কন্দর, গুহা এবং যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণের অগণ্য বাসভবন রহিয়াছে। সেই সকল স্থানেই আমরা আর্য্যার অনুসন্ধান করিব।" এইরূপে তাঁহারা সেই গিরিকাননাকীর্ণ সুবিশাল জনস্থানে সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। অচিরে পতগেন্দ্র জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহার নিকট তাঁহারা রাবণ ও সীতা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ অবগত হইলেন, পরে পিতৃসখা

বিহঙ্গরাজের অন্ত্যেষ্টি সৎকার সম্পাদন করিয়া প্রথমে পশ্চিম ও তৎপরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। এই পথে তাঁহারা যত গমন করিতে লাগিলেন, ততই জানকী সম্বন্ধে নানা অভিজ্ঞান ও বিবরণ তাঁহাদের দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। প্রথমে ক্রৌঞ্চারণ্য ও মতঙ্গাশ্রম অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যে ঋষ্যমূখ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানেই কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত শ্রীরামের মৈত্রী হয়। * সুগ্রীব জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই পর্ব্বতে নিতান্ত দীনমনে বাস করিতেছিল। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে দেখিয়া প্রথমে সে ভীত হইল, কিন্তু অচিরে তাঁহার অপ্রতিম গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইল। পরস্পরে পরস্পরের উপকারসাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীরাম ও সুগ্রীবের সৌহার্দ্দবন্ধনের পরিণামফল পত্নী-উদ্ধার। উভয়েরই বনিতা পরহস্তগতা; সুতরাং উভয়ের ভাগ্য সমসূত্রে গ্রথিত। শ্রীরামের চেষ্টায় স্বীয় ভার্য্যা রুমাকে পুনর্লাভ করিয়া সুগ্রীব জানকীর উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইল। রুমার উদ্ধারে শ্রীরামের একটী কলঙ্ককাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকীয় ও আধ্যাত্মরামায়ণে বর্ণিত আছে যে, শ্রীরাম্ সুগ্রীবের অনুরোধে বৈরতা-অপ্রবৃত্ত বালীকে গুপ্তভাবে বধ করিয়াছিলেন। শ্রীরামের ন্যায় মহাপুরুষের চরিত্রে এরূপ দোষারোপ নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। কথিত আছে, বালী ত্রিভুবনবিজয়ী দশাননকেও স্বীয় বীর্যবিক্রমে পরাস্ত করিয়াছিল। বালীকে বধ করিবার পূর্ব্বে শ্রীরাম সুগ্রীবের নিকট এই সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। তবে কি ইহাতে শ্রীরামের ভয় হইয়াছিল এবং সেই জন্যই কি তিনি,তাহার সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত না হইয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন? শ্রীরামের সংহার-অস্ত্রে মর্ম্মস্থলে আহত হইয়া মুমূর্ষু বালী শ্রীরামকে "ভীরু, কাপুরুষ, শঠ, নৈকৃতিক, মিথ্যাচারী" প্রভৃতি নানা পরুষবচনে তিরস্কার করিয়া তাঁহার সেরূপ অন্যায় ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীরাম আত্মকার্য্য সমর্থন করিয়া যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা কূট রাজনীতির অনুমোদিত হইলেও শ্রীরামের সুবিমল চরিত্রে কেমন অসংলগ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীরাম বলিয়াছিলেন যে, বালী ভ্রাতৃবধূ হরণ করিয়া জঘন্য পাপাচরণ করাতেই তাহার প্রাণ-বধ করিয়া দণ্ডিত করিয়াছিলেন। * এস্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, শ্রীরাম কোন্ অধিকারানুসারে বালীকে বধ করিয়াছিলেন?

* মহীশূরের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক কর্ণেল উইল্কস্ দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তিনি বলেন, তুঙ্গভদ্রাতীরে বিজয়নগর ও অন্নগুণ্ডীর চতুঃপার্শ্বস্থ গিরিগহনে অতি প্রাচীন ভগ্নাবশেষের ক্ষীণ নিদর্শন্ পাওয়া যায়। তত্রত্য অধিবাসিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুগ্রীব হনুমান প্রভৃতি কপি বীরগণ সেই সকল স্থানেই বাস করিতেন।

History of Mysore, Vol I. p. 9.

* তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ।
ভ্রাতুর্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্।
অস্য ত্ব ধরমানস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্ম্মকৃৎ।
তৎ ব্যতীতস্য তে ধর্ম্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর।
ভ্রাতৃভার্য্যাভিমর্শেঽস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদিতঃ।
কিষ্কি—কাণ্ড, ১৮শ সর্গ।

তিনি যখন রাজ্যত্যাগ করিয়া বনবাসী ; তখন তাঁহাকে রাজা বলা যাইতে পারে না। আর যদি রাজাই হইতেন, তাহা হইলেও বালীকে উক্তরূপে পশুবৎ দূর হইতে বধ করিয়াও কি কলঙ্ককালিমা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন ? শ্রীরাম নিজেই বলিয়াছেন যে, শৈলমেখলা,কাননকুন্তলা ও সাগরাম্বরা সমগ্র ভারতভূমি ইক্ষাকুদিগের রাজ্য ; ধর্ম্মাত্মা ভরত ইহার রাজা ; তাঁহারই রাজ্যে ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত আমরা অধর্ম্মের সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" * অনন্তর তাহাকে গুপ্তভাবে কেন হত্যা করা হইল, তদুত্তরে শ্রীরাম বলিতেছেন—"ধর্ম্মকোবিদ রাজর্ষিগণ মৃগয়ায় গমন করিয়া বিবিধ উপায়ে বিমুখ পশু সকলকে বধ করিয়া থাকেন। তুমি বানর, সুতরাং পশু ; তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, তোমাকে পশু বলিয়া অনায়াসে পশুবৎ বধ করিতে পারি এবং সেই জন্যই করিয়াছি।" অনন্তর মনুষ্য ও রাজগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও দেবত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বলিলেন—"রাজগণ দুর্লভ ধর্ম্ম ও জীবনের প্রদাতা ; তাঁহারা মানুষ হইলেও দেবতা ; সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু করেন তাঁহাই ধর্ম্মসম্মত।" এই সকল কথা স্বার্থপরতামূলক কুটিল রাজনীতির অনুমোদিত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহার জীবন স্বার্থশূন্য, পরস্বার্থের পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই নিষ্কাম যোগী পরম ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্রের মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না। যিনি স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন বা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তিনি যে বিনা দোষে বালীকে বধ করিলেন, একথা ভাবিতে গেলে হৃদয় ক্ষুব্ধ এবং মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া উঠে। শ্রীরামচরিত্রের এইখানে বিষম সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। এ সমস্যা কবিগুরু বাল্মীকী মীমাংসা না করিতে পারিলেও, মহাকবি ভবভূতি কর্ত্তৃক অতি সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়াছে। মহাবীরচরিত নাটকে তিনি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "পরিণতপ্রাজ্ঞ" মহাকবি ভবভূতি বলেন, শ্রীরামের বধার্থ দশানন বালীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বালীর ইচ্ছা না থাকিলেও সে বন্ধুর অনুরোধে সেই জঘন্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শ্রীরাম যখন মতঙ্গমুনির আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময় মহাবীর বালী রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিল। "বালী রামকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই সেই অভিরামচরিত, ধর্ম্মৈকবীর, পুরুষপ্রকাণ্ড রামচন্দ্র ! জানিতেছি, ইহাঁর নিজেরই পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যকলাপকে অতিক্রম করিয়া চরিত্রের কি অদ্ভুত ক্রমোৎকর্ষ সম্পাদন করিতেছে ! অনন্তর প্রকাশ্যভাবে কহিলেন—'রাম ! আমি তোমাকে কি আনন্দের নিমিত্ত—কি বিস্ময়ের নিমিত্ত—কি দুঃখের নিমিত্ত—দেখিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ! তোমাকে দেখিয়া আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত হইতেছে না, কিন্তু তোমার সহিত আমার সঙ্গতিসুখের আশা নাই। অধিক কথায় কাজ নাই—যে হস্তে বিশ্রুত জামদগ্ন্যকে বিজিত করিয়াছ, সেই হস্তে ধনুগ্রহণ

* কিষ্কি—কাণ্ড—১৮শ সর্গ।

রাম কহিলেন—'আপনার ন্যায় মহাবীরকে যুদ্ধার্থ প্রাপ্ত হওয়া সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু শস্ত্রবিহীনের প্রতি রাম কিরূপে শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে? বালী উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন—"হে মহাক্ষত্রিয়! তুমি আমার প্রতিও যে অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছ? ভাল।—ভাল। কার্য্যদ্বারা আমাকে জগতের সকলেই জানে; কথায় প্রয়োজন নাই; তুমি সসজ্জ হও; বুঝিলাম তুমি সত্যপ্রিয, তোমাদিগকে শস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে হয় না। আর যদিই আমার শস্ত্রগ্রহণের জন্য তোমার এত নির্ব্বন্ধ হয় তবে শৈল ও তরু সকল সুখে থাকুক আমরা সেই সকলের দ্বারাই শস্ত্রী। অতএব আইস – সমরোপযোগী স্থলে যাওয়া যাউক।" লক্ষ্মণ কহিলেন—"আর্য্য! মহাভাগ যাহা কহিলেন, তাহা সত্য, যুদ্ধধর্ম্ম নিজ নিজ জাতীয় প্রথারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। রাম ও বালী—উভয়েই উভয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—এ ব্যক্তির সহিত বীরকার্য্য সম্পাদন মহোৎসবস্বরূপ ও পরম শ্লাঘনীয়, কিন্তু ইঁহার কোন অত্যাহিত হইলেই বসুন্ধরা অবীরা হইবেন।

"অনন্তর উভয়েই সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন! রাম ধনুকে টঙ্কার প্রদান করিলেই বালী কুপিত হইয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে স্ফীত ও কম্পিত হইতে লাগিল; কণ্ঠস্বর ও দন্তের বিকট ঘর্ষণ শব্দ প্রচণ্ড বজ্রঘোষের ন্যায় সমস্ত জীবকে বধির করিয়া তুলিল; মুখবিবর এত বিস্তৃত হইল যে, বোধ হইল যেন, ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবার উদ্যম হইতেছে। রামও শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক প্রলয়জলধরের ন্যায় গভীরধ্বনি উৎপাদন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন—উভয়ের তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।" * বলা বাহুল্য, বালী শ্রীরামের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল।

মহাকবি ভবভূতির এই সুন্দর মত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, শ্রীরামচন্দ্র, চোর বা দস্যুর ন্যায় গুপ্তভাবে বালীকে হত্যা করেন নাই, বরং শ্রীরামকেই হত্যা করিবার নিমিত্ত রাবণ কর্ত্তৃক বালী নিযুক্ত হইয়াছিল। এই মত প্রকৃত মত কিনা, জানিবার উপায় নাই, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। শ্রীরাম অজেয় হইয়াও যে, বালীকে বধ করিতে পারিতেন না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। বালী রাবণকে পরাস্ত করিয়াছিল বলিয়া কি শ্রীরামকে পরাস্ত করিতে পারিত? পরিণতপ্রাজ্ঞ ভবভূতি এই বিষম প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বালীর সহিত শ্রীরামের যুদ্ধ বাধাইয়া তিনি উভয়ের বলাবল প্রত্যক্ষরূপে জগতের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। এখন আমরা দেখিতেছি, শ্রীরাম রাবণবিজয়ী বালীরও বিজেতা। লঙ্কাধিপতি দশানন বালী কর্ত্তৃক পরাজিত ও অবমানিত হইয়াও অবশেষে সেই কপিরাজেরই সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিল। রাবণের সৈন্য-সামন্ত সমেত খরদূষণ প্রভৃতিকে

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাকবি ভবভূতি প্রণীত মহাবীর চরিতের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া "রামচরিত" আখ্যা দিয়াছেন। অনুবাদ অবিকল ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। এজন্য তৎকর্ত্তৃক সঙ্কলিত রামচরিতের ৭৩,৭৪ পৃষ্ঠা হইতে একটুকু উদ্ধৃত হইল।

পরাস্ত করিয়া শ্রীরাম সমস্ত দণ্ডকারণ্য ও জনস্থান অধিকার করিলে রাবণের মনে নানা চিন্তার উদয় হয়;—রাবণ এতদিন নিষ্কণ্টকে যে সুবিশাল রাজ্য সম্ভোগ করিতেছিল, এইবার বুঝি তাহাতে বাধা পড়ে। এই প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্রমে গৃহের নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়াই রাবণ তাঁহার সংহারের নিমিত্ত বালীকে নিযুক্ত করিয়াছিল। মহাকবি ভবভূতির এই মত স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে শ্রীরাম, বালী ও রাবণ—সকলেরই উপযুক্ত সম্মান-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শ্রীরামের বিমল চরিত্র হইতে একটা অস্বাভাবিক, অযৌক্তিক, অন্যায় কলঙ্ক অপনীত হইয়া যায়।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তি ও অশান্তি।

সংসারে শান্তি ও অশান্তি নাম্নী দুইটী রমণীর অপ্রতিহত প্রভাব, ইহারা মানবগণের হৃদয়রাজ্যে বিরাজিত থাকিয়া নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করতঃ মানবগণকে সুখ-দুঃখের ভোগী করিয়া থাকে। শান্তি—সুখ বা আনন্দের কারণ, আর অশান্তি—দুঃখ-প্রসবিণী। প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় স্পন্দনরাহিত্য হেতু ব্রহ্মানন্দপদ অপরিণামী শান্তির আধার। যেখানে সাম্য সেই স্থানেই জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ; আবার যেখানে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ সেই স্থানেই পরমানন্দের চির-অধিকার। এই জন্যই নির্ব্বিকার, নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, পূর্ণজ্ঞানময়, সচ্চিদানন্দই সংসারে একমাত্র আনন্দদায়ক। তাঁহার সেই আনন্দসত্বা জগৎব্যাপী। রবিশশী এই সত্বা প্রভাবেই জগৎ হসাইতেছেন। বসুমতী এই আনন্দ প্রভাবেই দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছেন। গুণ-বৈষম্য সৃষ্টির কারণ হওয়ায় ত্রিগুণ বিকাশের পর তথ্যানুসারে আনন্দের তারতম্য হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধগামিনী প্রকৃতি জড় হইতে চৈতন্যের দিকে যত অগ্রসর হন, ততই আনন্দের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। সেই জন্যই জড়-রাজ্যের জীব অপেক্ষা চেতন-রাজ্যের জীব— মানবে, আনন্দের বিকাশ অধিক। তাহার প্রমাণ (আনন্দ-লক্ষণ) হাস্য, মানবেই প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু আনন্দের ব্যাপকতা অল্প বিস্তর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মাণ্ডে যে আনন্দ-সত্বা, পিণ্ডেও সেই আনন্দ-সত্বা। সেই জন্যই ব্রহ্মাণ্ডে পারম্পরিক প্রেম স্বভাব সিদ্ধ। পশুর মধ্যে যে প্রকার আনন্দ বিদ্যমান আছে, তাহারা সেই ভাবই ভালবাসে। মানবের মধ্যে যেরূপ আনন্দের বিকাশ, মানব সেই ভাবেই জগদানন্দ উপলব্ধি করে, সেই ভাবেই জগৎ তাহার নিকট আনন্দের আকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের এই পূর্ণানন্দ সত্বা জগৎব্যাপিনী হওয়াতেই চৈতন্যাভিমুখিনী প্রকৃতি লীলার অঙ্গ-স্বরূপ সমস্ত জীবেই স্বাভাবিকী সুখেচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ এই পরম সুখের জন্য লালায়িত। ক্ষুদ্র পিপিলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, উন্নত পশু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবের প্রাকৃতিক চেষ্টার মূলে এই পরম সুখ নিহিত রহিয়াছে।

সেই অনন্ত সুখ প্রাপ্তির বাসনাতেই মনীষিগণ সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া বনবাসী হই-

তেন। এই সুখেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই চেতন রাজ্যের জীবগণ অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। মাত্র অবিদ্যার প্রভাবে শান্তিময় সাচ্চদানন্দ সাগরে মাঝে মাঝে জীবরূপী তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। অবিদ্যাই স্বতন্ত্র জীবকেন্দ্র স্থাপনের কারণ হইয়া সত্ত্বঃ রজঃ ও তম গুণের চাঞ্চল্যে সৃষ্টির বিস্তার করিয়া থাকে। যেখানে চাঞ্চল্য, সেইখানেই পরিণাম। (এইজন্য প্রকৃতি সদাই পরিবর্ত্তনশালিনী) যেখানে পরিণাম, সেই স্থানেই অশান্তি, (প্রকৃত সুখের অভাব)। এই জন্যই প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থায় প্রকৃত সুখের অভাব হইয়া পড়ে। যখন জীব অবিদ্যাগ্রস্থ হয়, তখন প্রকৃতির চাঞ্চল্য হেতু ক্ষণভঙ্গুর সুখকেই ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া সংসারে বদ্ধ হয়। এই প্রমাদ প্রকৃতি প্রবাহের অনুকূলগামী হওয়ায় জড়রাজ্যের জীবের কোন অনিষ্টকারক হইতে পারে না। কিন্তু কর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট পাপ পুণ্যাধিকারী মানবের পক্ষে এরূপ প্রমাদ ঘোর অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় অহঙ্কার জনিত ঘোর প্রমাদগ্রস্ত মানব পরিনামী প্রকৃতিতে সমস্ত ক্ষণস্থায়িত্ব এবং দুঃখ মূলকও উপলব্ধি করিতে পারে না! কিন্তু ভগবানের কৃপায় যাঁহাদের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, সেই শান্তিময় যোগীগণই সাংসারিক সমস্ত সুখকে দুঃখ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। তাহার কারণ—প্রকৃতিগত তমাদি গুণ বৃত্তি বিরোধ এবং সুখানুগামী পরিণাম, তাপ ও সংস্কার নামক ত্রিবিধ দুঃখ। * অজ্ঞানান্ধ, বিষয় বিলাসী জীবের অনন্ত কর্ম্মের মূলে রাগ, দ্বেষ, এবং মোহ নামক ত্রিবিধ বৃত্তি বিদ্যমান থাকে। স্থিরসাগরে উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মানব-হৃদয়ের চাঞ্চল্য এই তিন বৃত্তি দ্বারাই উপস্থিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সুখানুসরণ পূর্ব্বক উহাতে যে আসক্তি জন্মে, তাহার নাম রাগ। † স্মৃতিরূপে চিত্তে নিহিত দুঃখ, ভাবনা দ্বারা তৎপ্রদ বিষয়ে দুঃখ ভীতি হেতু যে তীব্র অনিচ্ছা, উহাই দ্বেষ নামে অভিহিত। ‡ তমসাবৃত্ত অন্তঃকরণে রাগ দ্বেষের অভাবে তৎসংস্কার জনিত মোহাবৃত যে একপ্রকার বৃত্তির উদয় হয়, উহার নাম মোহ। ¶ মায়ামুগ্ধ জীব এই ত্রিবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করে; অতএব তৎকৃত সংসারের সমুস্ত অনুষ্ঠানই রাগজ দ্বেষজ, অথবা মোহজ কর্ম্ম নামে উক্ত হইয়া থাকে এবং ঐ কর্ম্মই বৈষয়িক সুখ অথবা দুঃখ-রূপী ফল প্রসব করিয়া থাকে। বৃত্তি সমূহ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের কারণ হওয়ায়, যে কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের শান্তি হয় তাহা সুখপ্রদ এবং যাহা-দ্বারা ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দূর হয় না, তাহাই দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। কিন্তু মনোবিকার সম্ভূত এইরূপ সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বভাব বিষয় সুখের ক্ষণভঙ্গুরত্ব হেতু দুঃখ দায়কই হইয়া থাকে। যখন ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্যারাহিত্য সুখের কারণ, তখন ইন্দ্রিয় সমূহ বিষয়ভোগ দ্বারা যখন শান্ত হইয়া যাইবে § ভোগজনিত অসংখ্য শান্তিসুখ লাভ হইবে। কিন্তু

---

* "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" (যোগদর্শন)

† "সুখানুশয়ী রাগ।" ইত্যাদি (যোগদর্শণ)

‡ "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ইত্যাদি (যোগদর্শন)

¶ "রাগদ্বেষ ভাবাৎ মোহঃ" ইত্যাদি (যোগদর্শন)

§ "এ বিষয় দেহাত্মবাদী মাত্রেই অবগত আছেন, বিশেষ বলা নিষ্প্রয়োজন।

এরূপ হওয়া অসম্ভব। কারণ যদি প্রকৃতি পরিণামিনী না হইয়া একই ভাবাধার হইত, তাহা হইলে এরূপ শান্তির সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং অস্থিরা হওয়ায় অবস্থা পরিবর্তন স্বতঃসিদ্ধ। এই পরিবর্তনই ইন্দ্রিয়গণের পক্ষে ঘোর অশান্তি ও দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। কামিনী-কাঞ্চনাশক্ত ভ্রমান্ধ জীব, ভোগ্য-পদার্থ অপার সুখজনক মনে করিয়া, সুখের অথবা শান্তির বিনিময়ে, অশান্তি বা অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

কামান্ধ মানবের ইন্দ্রিয় ভোগাবসানে ক্ষণকাল শান্তভাব ধারণ করে, তাহার কারণ তমোগুণ; কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরক্ষণেই তমোগুণের পরিবর্তে রজোগুণের আবির্ভাব হওয়াতে ভোগাশা শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে। ঘৃতাহুত প্রাপ্ত বহ্নি যেমন ঘৃত নিক্ষেপ মাত্র ক্ষণকাল শান্ত হইয়া পুনঃ দ্বিগুণ শিখা বিস্তার করিয়া বর্দ্ধিত হয়, ভোগকাসনাও সেইরূপ গুণ পরিণাম হেতু পুনঃপুনঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া অনন্ত দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। ঐইরূপ কাঞ্চনাশক্ত ব্যক্তি যত ধনই প্রাপ্ত হউক না কেন,সুখী না হইয়া তৃষ্ণাবিষ দহনে সতত দগ্ধ হইয়া থাকে।

মরীচিকা ভ্রমে সুখান্বেষী মানব তৃষ্ণাবশে উপরোক্তরূপে অনন্ত দুঃখভোগ করিয়া থাকে। অজ্ঞান সম্ভূত এই তৃষ্ণা আত্মতত্ত্ব উদ্ভাবন পক্ষে অন্ধকার রজনী, রাগ-দ্বেষাদি পেচকবৃন্দ এই রজনীতেই জীব-গগনে বিহার করিয়া থাকে। এই তৃষ্ণার আগমনে মানবের হৃদয়াকাশ হইতে বিবেক-জ্যোতিঃ একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

জ্বলন্ত বহ্নি সুখাধার মনে করিয়া পতঙ্গ যেমন তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, কুরঙ্গী ব্যাধকৃত বীণাধ্বনিতে উন্মাদিনী হইয়া যেমন বাণবিদ্ধ হয়, তৃষ্ণা পিশাচীর কুহকে মুগ্ধ মানবও সেইরূপ সংসারাবদ্ধ হইয়া অপার যাতনা ভোগ করে। সামান্য অসি পরদেহ ছেদনেই সমর্থ, কিন্তু তৃষ্ণারূপিণী অসি মলিনা, দীর্ঘা ও আপাত-শীতলা হইলেও, পরিণামে দুঃখকরী বলিয়া সতত স্বদেহকে কর্তন করিয়া থাকে। সংসারে যত কিছু ভয়ানক দুঃখ দেখা যায়, সে সমুদয় এই তৃষ্ণালতারই ফল মাত্র। এই তৃষ্ণারূপিণী আরণ্য-কুক্কুরী মনুষ্যের মনোময় গর্ত্তে থাকিয়া, অদৃশ্য হইয়াই দেহ হইতে মাংস, অস্থি ও রুধির ভক্ষণ করে। প্রাবৃট তরঙ্গিনীর ন্যায় এই তৃষ্ণা ক্ষণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মুহূর্ত মধ্যে আবার কিছুই থাকে না এবং কখনও বা ভীষণ স্থানে প্রতিঘাত পাইয়া ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, তৃষ্ণা সূত্রাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় স্বয়ং ঘূর্ণিত হয় এবং মানবকেও ঘূর্ণিত করতঃ অনন্ত-দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করে। এই তৃষ্ণার কুহকে ভুলিয়াই সৌভরি মুনি আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। এই তৃষ্ণা পিশাচীই যযাতি নৃপতির সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী ভোগ ও দুঃখের কারণ হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়গণের ভোগজনিত সুখ, প্রকৃতি চাঞ্চল্য হেতু নবীন ভোগ-তৃষ্ণা উৎপন্ন করিয়া যেরূপে সুখকে ঘোর দুঃখের কারণ করিয়া ফেলে, বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্ব সেইরূপ অনন্ত দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। দৃশ্যমান চরাচর জগৎ সমস্তই স্বপ্ন সমাগম সদৃশ অস্থায়ী। যাহা অম্লানতামণ্ডিত; পুষ্পগুচ্ছ

শোভিত প্রমোদের নন্দন কানন রূপে প্রকাশমান, কল্য তাহা ঘোর শ্মশান-প্রতিম বিষাদ-প্রেতের নৃত্যভূমি। চপলার চমক, দ্বিগুণ অন্ধকার বিস্তারের জন্য। বাত্যাবিকলিত দিবসের ক্ষণশান্তি দ্বিগুণ ঝটিকা প্রবাহের জন্য। বাল্যকালের নির্ম্মল আনন্দ যৌবনের পাপচিন্তার সূচনা করে। যৌবনের প্রমোদ বার্দ্ধ্যক্যের ব্যাধি-দুঃখরূপে পরিণত হয়। জীবনের এক মুহূর্ত্তের সুখ—দ্বিতীয় মুহূর্ত্তের দুঃখের কারণ। অবোধ মানব ক্ষণভঙ্গুর জগতে ক্ষণিক সুখকে চিরস্থায়ী সুখ মনে করিয়া তাহাতে আশক্ত হয়, কিন্তু পরিণামে ঘোর দুঃখে পড়িয়া হাহাকার করিয়া থাকে। এই হেতু পরিণামিনী প্রকৃতি-জাত সমস্ত সুখই বিবেকীগণ দুঃখ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন। আপাতমধুর রাজসিক-সুখ তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। নির্ম্মল সাত্ত্বিক-সুখ—যাহার পূর্ণতায় সুখদুঃখ-রূপী দ্বন্দ্বাতীত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হয়—সেই সুখই তাঁহাদের আদরণীয় হইয়া থাকে। বৈষয়িক সুখের নিত্য সহায়—পরিণাম, তাপ এবং সংস্কার-দুঃখ নামক ত্রিবিধ দুঃখও মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন লীলা-নিকেতন করিয়া তোলে। তীব্র বাসনার বশে চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বাসনা পূরণার্থ ভোগরূপী ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, পরিণামে যে প্রতিক্রিয়া জনিত বিকলতা প্রাপ্ত হয়, উহাই দুঃখ। ভোগাবসানে এইরূপ বিকলতা ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সুখকে দুঃখে পর্য্যবসিত করিয়া থাকে। সুখাবস্থায় তুল্য সুখীদিগের প্রতি ঈর্ষা এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা চাঞ্চল্য উৎপন্ন হইয়া যে দুঃখের সৃষ্টি করে, তাহার নাম তাপ-দুঃখ। অবিদ্যা এ সমস্ত চেষ্টার কারণ হওয়ায় তদ্বশে প্রমাদগ্রস্থ জীব সুখাবস্থাতেও ঐ সকল চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া সুখ উপলব্ধি করিতে পারে না। বিষয়-ভোগে অক্ষম হইলে, ভোগাশার পূর্ণ বর্ত্তমানতা হেতু, বার্দ্ধক্যে পলিত-শরীর বৃদ্ধকে পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি যে কষ্ট দিয়া থাকে, উহাই সংস্কার-দুঃখ। গৃধ্র যেমন অতি দীর্ঘ, প্রাচীন বনস্পতিকে আশ্রয় করে, সেইরূপ লোভ আসিয়া জরাগ্রস্থ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, স্ত্রী-পুত্রাদির উপহসিত, নির্গুণ, পরাক্রমহীন, কাতর, জীর্ণ, বৃদ্ধ মানবকে অবলম্বন করিয়া থাকে; তখনও ভোগস্পৃহা তাহার পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু উপভোগ করার ক্ষমতা না থাকায় পূর্ব্বসুখ স্মরণ করিয়া বৃদ্ধ-হৃদয় দগ্ধ হয়। এইরূপে ক্ষণস্থায়ী সুখের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকায় বিবেকিগণ বিষয়সুখকে দুঃখ ভাবিয়া, সতত ত্যজ্য করিয়া থাকেন। শৃঙ্খল সুবর্ণ নির্ম্মিত হইলেও বন্ধন বিষয়ে কাঠিন্য শূন্য হয় না, বৈষয়িক-সুখ আপাতমধুর হইলেও ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি বিষয়ের ঘোর অন্তরায় হইয়া থাকে, ইহা সতত স্বীকার্য্য।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

দুইটী ছবি।

আজ আমরা দুইটী অরুন্তুদ করুণ চিত্র লইয়া "আলোচনার" সহৃদয় পাঠক পাঠিকা-গণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। এ শোকাবহ বিচিত্র আলেখ্য আমার স্বকপোল কল্পিত

গল্প নয়, সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। বহুদিন পূর্ব্বে এ কাহিনী দুইটি "সংক্ষিপ্ত-সংবাদ" আকারে কোন সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের সংবাদ-স্তম্ভে প্রকটিত হইয়াছিল। ঘটনা দু'টী ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই উহা একটু বিশদ মূর্ত্তিতে গল্পরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। কেন না শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের স্থায়িত্বকাল বাড়িলে, জগতের কল্যাণ সংসাধিত হয়। বিশ্ববাসীকে হিতোপদেশ দ্বারা মঙ্গলের সুপথে পরিচালিত করাই সৎসাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্য। মাসিক-পত্র প্রচার দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সিদ্ধ হয়। সাধনায় সিদ্ধিলাভ সকলেরই চরম লক্ষ্য—উহাই সাধক জীবনের ধ্রুব তারা।

ভগবতী।

ভগবতী দেবী পঞ্চনদ প্রদেশের এক নিবিড় পল্লীনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-পত্নী। ব্রাহ্মণ কুলীনও নহেন, কাঙ্গালও নহেন ; সম্ভ্রান্ত মধ্য-বিত্ত গৃহস্থ। যে গ্রামে তাঁহার বাড়ী, সেখানে জন বসতি অতি বিরল। বাটীর চতুর্দ্দিক অনেক গুলি আগাছা-আবর্জ্জনা ও ফল-ফুলের বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ; মধ্যস্থলে ছোট-বড় দুই চারিখানি ক্ষুদ্র কুটীর-গৃহ। এমনি ধরণের বসতবাটী গুলি দূরে দূরে অবস্থিত থাকিয়া গ্রামখানিকে পবিত্র তপোবনের শোভা বিস্তার করিতেছে।

ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ না হইলেও প্রৌঢ়ত্ব তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রাহ্মণীও যৌবনের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়ার আসন গ্রহণ করিবার জন্য কর প্রসারণ করিয়াছেন। দম্পতী একমাত্র পঞ্চবর্ষীয় শিশুপুত্র সহ তাঁহাদের বিলাস-শূন্য গার্হস্থ্য জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করিতেছেন।

একদিন একটা গুরুতর কার্য্যের অনুরোধে ব্রাহ্মণ অদূরবর্ত্তী জনৈক আত্মীয়-ভবনে গমন করিয়াছেন। বর্ষীয়সী পত্নী একমাত্র শিশু পুত্রটীকে লইয়া একাকিনী বাটীতে আছেন। ব্রাহ্মণের সে দিনই স্বগৃহে ফিরিবার কথা।

গ্রীষ্মকাল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়,প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজে চতুর্দ্দিকে যেন দাবানল জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণীর তখনও মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন হয় নাই। তিনি প্রাণাধিক পুত্রটীকে স্নানাহার করাইয়া সবে মধ্যাহ্নকালীন সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া উঠিয়াছেন। অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত ; মুহূর্ত্ত মধ্যে আহার করিতে বসিবেন। ঠিক এমনি সময় ব্রাহ্মণভবনে এক সন্ন্যাসী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণীর আর আহার করিতে বসা হইল না। তিনি সমাগত সন্ন্যাসীকে মুষ্টিভিক্ষা প্রদানার্থ গৃহান্তরে গমন করিলেন। ভিখারীকে ভিক্ষা প্রদত্ত হইল। ভিক্ষা গ্রহণান্তর সন্ন্যাসী আহারের আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। ধর্ম্মশীলা গৃহলক্ষ্মী আপনার অন্ন দিয়া গৃহস্থের সনাতন আতিথ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেন। গৃহে আর অধিক অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত ছিল না। ব্রাহ্মণী তণ্ডুলোদক মাত্র পান করিয়া সে বেলা অতিবাহিত করিলেন।

রমণী বয়োধর্ম্মে বর্ষিয়সী হইলেও পরম রূপসী। যৌবনের লাবণ্য এখনও ছাড়িয়া যায় নাই। যৌবনশ্রী তখনও প্রৌঢ়ার পবিত্র অঙ্গে জোড় করিয়া বসিয়া আছে। ভোগ-সুখ নিরত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী রমণীর সে রূপ দর্শনে মুগ্ধ

হইল। ক্ষুদ্র পতঙ্গ অনলে পড়িয়া পুড়িয়া মরিতে প্রস্তুত হইল। দুষ্ট মন্মথের কুহকে তাঁহার জ্ঞান-ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল। রমণীকে একাকিনী দর্শনে কামাশক্ত সন্ন্যাসী সে বাটী ত্যাগ করিয়া আর অন্যত্র গমন করিল না। পাপিষ্ঠ স্বীয় পাপ অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানসে দিবানিদ্রার ভাণ করিয়া অতিথিপরায়ণ গৃহস্থের অলিন্দে পড়িয়া থাকিল।

বেলা অবসান প্রায়। তথাপি সন্ন্যাসী অন্যত্র গমন করিল না। একটা অলীক উৎকট উদর বেদনার ছলনায় পাপাশয় সন্ন্যাসী শয্যায় পড়িয়া "আহা উহু" করিতে লাগিল। দয়াবতী ব্রাহ্মণী পুণ্যকার্য্য জ্ঞানে পবিত্র মনে আপনার সন্তানটীর ন্যায় মাতৃ-স্নেহের মধুর আবরণে যথাসাধ্য তাহার সেবা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। পাপাত্মা সন্ন্যাসী নানারূপ ইঙ্গিত-কৌশলে সরলা সতীকে স্বীয় পাপ অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কিন্তু বর্ষিয়সী সাধ্বী-সতী ভগবতী দেবী পাপাত্মার সে সব ইঙ্গিত বুঝিলেন না। তিনি গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে অতিথির সেবা-শুশ্রূষায় নিরত থাকিলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইল, তথাপি ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিলেন না। ব্রাহ্মণী পতির ও আপনার জন্য চিন্তিতা হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহাকে একাকিনী বাটীতে রাখিয়া ব্রাহ্মণ কখনই অন্যত্র নিশা যাপন করিবেন না; তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিশ্চয় বাটী ফিরিবেন। ক্রমে রাত্রি হইল, তথাপি ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী একাকিনী প্রতিবাসীগণের সাহায্য গ্রহণ জন্য যত্ন করিতেও অসমর্থ। দারুণ দুশ্চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

দুষ্ট সন্ন্যাসী তখনও সে গৃহের অলিন্দ জুড়িয়া পড়িয়া আছে। পাপাত্মা সুযোগ বুঝিয়া রমণীর নিকট আপনার কু-অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সুন্দররূপে বুঝাইতে লাগিল যে, এরূপ ভাবে অতিথির মনোরথ পূর্ণ করা গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম এবং যারপরনাই পুণ্যজনক অবশ্য কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। এই বলিয়া পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসী সতীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিতে প্রয়াস পাইল। ব্রাহ্মণী প্রমাদ গণিলেন; তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি যুগপৎ শত বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন সতী নিরুপায় হইয়া আপনার পবিত্র সতীধর্ম্ম রক্ষার্থ ব্যাধ-ভীত কুরঙ্গিনীর ন্যায় তীব্র গতিতে গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে দ্বার অবরুদ্ধ করিলেন। অনন্তর উপস্থিত বিপদ উদ্ধার মানসে কাতর প্রাণে শ্রীভগবানের রাতুল চরণে কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রটী তখনও গৃহের বাহিরে অলিন্দে পাষণ্ড ভণ্ডসাধুর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া আছে। সতী স্বীয় নারীধর্ম্ম নাশ ভয়ে প্রাণাধিক পুত্রের কথা ভুলিয়াই গৃহদ্বার রুদ্ধ করায় সুকুমার শিশুটী মাতার অদর্শনে বাহিরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি স্নেহময়ী জননী ধর্ম্মনাশ ভয়ে আর গৃহের বাহির হইয়া প্রাণাধিক পুত্র-রত্নকে গ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না। সতী-ধর্ম্মের নিকট অপত্য স্নেহ পরাভূত হইল।

আকাঙ্ক্ষিত রত্ন হস্তচ্যুত হওয়ায় মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত দ্বিপদ পশু দুর্দ্দান্ত সন্ন্যাসী ক্ষুভিত শার্দ্দূলের ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন ও আস্ফালন

করিতে লাগিল। পাপিষ্ঠ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পদাঘাতে রুদ্ধদ্বার ভগ্ন করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু কামাশক্ত সন্ন্যাসীর ক্ষীণ শক্তি সে দ্বার ভগ্ন করিতে সমর্থ হইল না। পাষণ্ড নিষ্ফল প্রযত্ন হইয়া সতীকে পুত্রহত্যার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না। সতী পবিত্র নারিধর্ম্মের নিকট প্রাণাধিক পুত্রের অমূল্য জীবনও অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিলেন। সুতরাং ধূর্ত্ত সন্ন্যাসীর শত তর্জ্জন-গর্জ্জন বা ভয় প্রদর্শনেও সতী দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন না।

তখন নিষ্ফল প্রযত্ন কামান্ধ সন্ন্যাসী ক্রোধান্ধ হইয়া ভীষণ দর্শন শোণিত পিপাসু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বধন একমাত্র পুত্ররত্নটিকে দ্বারস্থ সুবৃহৎ শীলাখণ্ডের উপর সবলে নিক্ষেপ করিয়া পাষাণ কঠোর নরভুক্ নিষ্ঠুর রাক্ষসের ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। পাপিষ্ঠের বিষম আঘাতে শিশুর কোমল মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। নিক্ষেপকালীন শিশুর চীৎকার ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। প্রাণপ্রতিম পুত্রের সেই করুণ-ক্রন্দন চীৎকারধ্বনি শ্রবণে ও শোচনীয় পরিণতি দর্শনে স্নেহময়ী জননী এক বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীর তখন কামোন্মাদ অবস্থা। পাপবাসনা পূর্ণ না হওয়ায় তাহার ক্ষিপ্ততা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। পাপিষ্ঠ ভণ্ডসাধু দুর্ব্বার পাপলালসার তীব্র প্রেরণায় ব্রাহ্মণের গৃহভিত্তি খুঁড়িয়া সিঁদ কাটিয়া গৃহপ্রবেশে যত্ন করিতে লাগিল। বহু প্রয়াসে সিঁদ কাটা হইল। তখন সেই কামুক কুক্কুর সিঁদপথে গৃহপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সন্ন্যাসীর গৃহপ্রবেশের আর অধিক বিলম্ব নাই। ঐ দেখ, গৃহের ক্ষীণ আলোকে পাপাত্মার মস্তকের জটাবদ্ধ কেশরাশি দৃষ্ট হইতেছে! ঐ বুঝি মস্তক উত্তোলন করিল!

ধর্ম্মের সূক্ষ্মবিধানে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সতীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই দেখিতে পাইলেন, পাপিষ্ঠ নরপশু সিঁদপথে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। হায়! তখন সতী ভয়-বিস্ময়-বিষাদে শিহরিয়া উঠিলেন। আত্মাশক্তি আদর্শ-সতী জগজ্জননী জগদম্বার কৃপায় মুহূর্ত্তে তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জন্মিল। তিনি সেই বিষম বিপদে স্বধর্ম্মরক্ষার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। ব্রাহ্মণের দেবীপূজার বলিপ্রদানের শাণিত খড়্গখানি গৃহপ্রান্তে ঝুলিতেছিল; সহসা কি জানি কাহার আদেশে রমণী রণরঙ্গিণী বেশে সেই উলঙ্গ অসি করে লইয়া দানবদলনী দশভূজার ন্যায় অসুরবধের নিমিত্ত সিঁদ পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন এবং সন্ন্যাসী গর্ত্তপথ হইতে মস্তকোত্তলন করিবামাত্র সেই খরধার অসির আঘাতে সন্ন্যাসীর শিরঃছেদন করিয়া মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূতলশায়িনী হইলেন। পাপিষ্ঠ সন্ন্যাসীর বিষম কামানল চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। পাপীর ইহাই চিরপরিণতি।

পরদিন প্রভাতে সকলে দেখিল, ব্রাহ্মণের গৃহদ্বার ভিতর দিক হইতে অবরুদ্ধ; অথচ দ্বারস্থ শিলাতলে তাঁহার পুত্রের শব পড়িয়া আছে, বাহিরে সিঁদ পথে ছিন্নমুণ্ড সন্ন্যাসীর শব এবং গৃহাভ্যন্তরে সেই সদ্য ছিন্ন মুণ্ডের পার্শ্বে ব্রাহ্মণী

ভূতলে মূর্চ্ছিতা। এই অতি শোচনীয় ভীষণ দৃশ্য দর্শনে সকলে বিস্ময়-বিষাদে অভিভূত হইল। প্রভাতে ব্রাহ্মণ বাড়ী পৌঁছিয়া এই লোমহর্ষণ ভীষণ দৃশ্য দর্শনে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। শোকে দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

যথাকালে রাজপুরুষেরা ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণী বিচারালয়ে নীত হইলেন। সতীমুখে সেই ভয়ঙ্করী যামিনীর বিস্ময়-বিষাদ পূর্ণ ভীষণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া সহৃদয় বিচারপতি যারপরনাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিশ্বাসযোগ্য স্বীকারোক্তি ও ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণে সদাশয় বিচারপতি তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী জ্ঞানে আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত মুক্তি প্রদান করিলেন। ধর্ম্মের জয়, সত্যের জয় ও সতীত্বের জয় হইল। একমাত্র প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ পুত্রের পবিত্র শোণিতপাতে রমণীর সনাতন সতী-ধর্ম্ম রক্ষা পাইল। সতীত্বেরই জয় হইল।

সুশীলা।

হরিপুর, ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। সতী সুশীলাসুন্দরী এই হরিপুরের ভূম্যাধিকারী মিত্র-পরিবারের কুলবধূ। হরিপুরের মিত্র-বংশ এক সময়ে ধনে-মানে ও কুলে-শীলে সে অঞ্চলে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কাল-প্রভাবে এখন আর হরিপুরের মিত্র-বংশের সে সৌভাগ্য-সম্পদ নাই। নিষ্ঠুর অদৃষ্টের কঠোর পীড়নে অনন্ত অভাবের তাড়নায় এখন তাঁহারা সম্বল-বিহীন পথের কাঙ্গাল।

বাবু বিনোদবিহারী মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, উপাধিধারী সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত যুবক। সুশীলার অপত্য-বৎসল জনক আপনার যথাসর্ব্বস্ব পণে প্রাণাধিকা দুহিতাকে বিনোদের করে সম্প্রদান করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাই সুশীলার পিতা জগদ্বিখ্যাত মকরন্দ ঘোষের বংশধর বৃদ্ধ হরিহর ঘোষ এখন দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে নিরত লাঞ্ছিত।

জামাতা বিনোদবিহারী মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টার। বিদেশে সস্ত্রীক বাস ও আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত, কর্ত্তব্যপরায়ণ বিনোদ তাহা হইতে নিঃস্ব শ্বশুরকে কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিতেন। আজ এক বৎসর হইল, একটি পুত্র ভূমিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার ব্যয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু আয় এক কপর্দ্দকও বৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং এখন আর তিনি নিরন্ন শ্বশুরকে কোনরূপ সাহায্য করিতে সমর্থ নহেন। বৃদ্ধ শ্বশুর এখন অদৃষ্টের নিদারুণ অভিশম্পাতে অন্ন-বস্ত্র হীন পরমুখাপেক্ষী ভিখারীরও অধম হইয়া পড়িয়াছেন।

নিয়তির নিষ্ঠুর তাড়নায় সহসা বিনোদ কঠোর যক্ষ্মারোগে শয্যাশায়ী হইলেন। দুই বৎসর ব্যাপী বহু চিকিৎসায়ও তাঁহার কঠিন পীড়া প্রশমিত হইল না। যথাসর্ব্বস্ব চিকিৎসকের পদে অঞ্জলি প্রদান করিয়া তিনি সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। অসময়ে চিকিৎসকগণ রোগীকে ছাড়িয়া গেলেন; কিন্তু রোগ সারিল না। নরশোণিত-লোভী-জলৌকা "শোণিতহীন মৃতদেহে দংশন করে না; অর্থের

সুমধুর ঝঙ্কার শ্রুত না হইলে, চিকিৎসক সে গৃহে পদার্পণ করেন না। হে অর্থ! ধন্য তোমার মোহিনী-শক্তি!

বিনোদের ক্ষুদ্র সংসার। একমাত্র সহধর্ম্মিনী এবং শিশুপুত্র ব্যতীত এখন সে গৃহে আর কেহ নাই। দু'দিন পূর্ব্বে আত্মীয়-কুটুম্বে গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। অসময়ে আত্মীয়েরা সব চলিয়া গিয়াছেন। যাইবার বাকী ছিল একমাত্র ঝি, সেও বেতন না পাইয়া—সেই অন্ন-বস্ত্রহীন নিরুপায় পরিবারের প্রতি শত অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিয়া আজ কয়দিন হইল চলিয়া গিয়াছে। রোগীর শুশ্রূষা, শিশুর পরিচর্য্যা এবং রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহ-কার্য্য এখন গৃহিণীকে একাকিনীই সব সম্পন্ন করিতে হয়। সুতরাং সাধ্বী সুশীলা রুগ্ন পতি ও শিশু-পুত্রটিকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। সতী নিত্য অভাবের তাড়নায় স্বয়ং অনশন ও অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও অতি ক্লেশে পতি-পুত্রের জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। অভাবের জ্বালায় তাঁহার মূল্যবান অলঙ্কারগুলি সব গিয়াছে, গৃহের তৈজসপত্র গুলিরও আর অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। দিন আর চলে না। রোগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে জীবনের আশা ফুরাইল। নিয়ত দুঃশ্চিন্তা, গুরু শ্রম ও অনশন-অনিদ্রায় তিনি কঙ্কাল সার হইয়া পড়িলেন। দুঃখ-দুর্ভাবনায় তাঁহার সুকোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

হরিপুর হইতে বহু দূরে—প্রায় বিশ মাইল অন্তরে বিনোদপুর গ্রামে এক অতি প্রসিদ্ধ কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। বিনোদপুরের সিদ্ধেশ্বরী প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহার পদে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে মানুষের অসাধ্য-সাধন হয়। দেবীর কৃপায় অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধনেরা ধন পায় এবং মুমূর্ষের দেহে জীবনী-শক্তি ফিরিয়া আসে; লোকের মনে এমনি দৃঢ় ধারণা! ভক্তি-বিশ্বাস নিস্ফল হয় না।

সতী সুশীলা মুমূর্ষ স্বামীর আরোগ্য কল্পনায় সিদ্ধেশ্বরীর দ্বারে "হত্যা" দেওয়ার সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্গিনী জুটিল। শনিবারে অতি প্রত্যুষে স্বামীর জন্য যথাসম্ভব অন্ন-জল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া পতি-পদে প্রণাম করিয়া অশ্রুমুখী সতী প্রতিবেশিনী রামার মা, শ্যামার পিসী প্রভৃতি দুই চারিজন নীচ-বংশোদ্ভবা রমণীর সহিত দেবী দর্শনে যাত্রা করিলেন। নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-টিকটিকি পশ্চাতে শব্দ করিল, "টিক্ - টিক্—টিক্!"

হরিপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে, কাঞ্চনপুর নামক একটি ক্ষুদ্র ষ্টেসন আছে। কাঞ্চনপুর হইতে রেলগাড়ীতে উঠিযা বিনোদপুর ষ্টেসনে দেবীর মন্দির-দ্বারে পৌঁছিতে হয়। শনি-মঙ্গলবারে বহু যাত্রী আপন আপন মানস-সিদ্ধির জন্য তথায় গমন করিয়া থাকে। সুতরাং ষ্টেসন ঘরে ও দেবীর মন্দির-দ্বারে সেদিন বড় ভিড় হয়।

সুশীলা শিশু-পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া সঙ্গিনীগণ সহ প্রায় ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছেন। আর একটুকু অগ্রসর হইলেই তাঁহারা ষ্টেসনে পৌঁছিতে পারেন। এমন সময় সহসা গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হওয়া গেল। সঙ্গিনীরা অতি দ্রুতগতিতে যাইয়া গাড়ী ধরিল। তাহারা তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া গাড়ী চাপিল—মুহূর্ত্তে শেষ বংশীধ্বনি করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া

গেল। শীর্ণকায়া ভদ্রমহিলা সুশীলা প্রাণপণে দৌড়িয়া যথাকালে ষ্টেসনে পৌছিতে সমর্থ হইলেন না। পথের কঙ্কর-কণ্টকাঘাতে তাঁহার সুকোমল পদদ্বয় হইতে রুধির-ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সতীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই; তিনি পতির জন্য "হত্যা" দিতে না পারিয়া শ্রান্ত-কলেবরে ষ্টেসনে বসিয়া মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্ষুদ্র ষ্টেসন। গাড়ী ছাড়িয়া গেলে ষ্টেসন-মাষ্টার ও তাঁহার দুই চারিটি অনুচর-সহচর ব্যতীত সে ষ্টেসনে আর অধিক লোকজন বড় কেহ থাকে না। একজন রেল-ভৃত্য আসিয়া অশ্রুমুখী রমণীকে বিশ্রামাগারে যাইয়া বিশ্রাম করিতে বলিল। সরলা রমণী তাহার কথায় একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সহসা বাহির হইতে সে প্রকোষ্ঠ-দ্বার অবরুদ্ধ হইল। রমণী বন্দিনী হইলেন।

রুদ্ধ-গৃহে পাষণ্ড ষ্টেসন-মাষ্টার তাঁহার সতী-ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। সতী প্রথমে কাল-ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। অবশেষে যখন পাশবিক অত্যাচার হইতে মুক্তি-লাভ অসম্ভব মনে করিলেন, শত কাকুতি-মিনতিতেও যখন কোনরূপ সুফলের সম্ভাবনা দেখিলেন না, যখন সতীর করুণ-ক্রন্দনে কিছুতেই পাষণ্ডের পাষাণ-কঠিন প্রাণ দ্রব হইল না —পাষণ্ড ষ্টেসনমাষ্টার যখন সতীর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বল পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বনাশ-সাধনে উদ্যত হইল, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তখন সতী, পাপাত্মার পাপ-প্রস্তাবে সম্মতির ভাণ করিয়া শৌচাগারে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। অগত্যা সতীর শিশু-পুত্রটিকে জামিন-স্বরূপ রাখিয়া দুরাত্মা ষ্টেসনমাষ্টার দুইজন অনুচরের তত্ত্বাবধানে সতীকে শৌচাগারে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সতী শৌচাগারে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অবিরত চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন পাষণ্ডেরা রমণীর ছলনা বুঝিল। পিশাচানুচরগণের শত পদাঘাতেও শৌচাগারের সে দৃঢ় দ্বার ভগ্ন হইল না। রমণী দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহাদের বৈশ্যতা স্বীকার না করিলে, তাঁহার শিশু-পুত্রটিকে সেখানে হত্যা করা হইবে বলিয়া পাষণ্ডেরা সতীকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি রমণী আত্মসমর্পণ করিলেন না— দ্বার উদ্ঘাটিত হইল না। অবশেষে কাম-ক্রোধোন্মত্ত পিশাচের দল সত্যসত্যই সেই শৌচ-গৃহদ্বারে নিরপরাধ কোমল শিশুকে হত্যা করিয়া—শিশুর পবিত্র শোণিতে আপনাদের কামানল নির্ব্বাপিত করিল। অহো! পিশাচের পূজা-গৃহদ্বারে দেব-শিশুর বলি প্রদান করা হইল। একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রের এরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে রমণী এক বিকট চীৎকার করিয়া সেই মল-মূত্র-ক্রিমি-কীট-পূর্ণ নরক-কুণ্ড মধ্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে রমণীর শেষ চীৎকার ধ্বনি শূন্যে বিলীন হইতে না হইতেই—ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একদল পুলিশ-কর্ম্মচারী দ্রুত-গতিতে তথায় উপস্থিত হইয়া অতি ক্ষিপ্র-কারিতার সহিত পাষণ্ডদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন। সতীর উদ্ধার হইল। প্রাণাধিক পুত্রের

অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া সতী আপনার পবিত্র নারীধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। সতীত্বেরই জয় হইল।

এ শোচনীয় ঘটনার পর পুত্রশোকাতুরা সতী যখন কুররী-কণ্ঠে উচ্চ বিলাপ-ধ্বনি করিতে করিতে পতি-পদ-প্রান্তে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সতীর অনুপস্থিত কালে—শূন্য-গৃহে তাঁহার প্রাণারাধ্য পতিদেবতা অনন্ত-ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। সেই হৃদয়-বিদারক শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে শোক-বিহ্বলা সতী উন্মাদিনীর ন্যায় এক বিকট চীৎকার করিয়া বাতাহতা স্বর্ণ-লতিকার ন্যায় তৎক্ষণাৎ পতি-পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন*। তাঁহার সে বিষম মোহ আর ভাঙ্গিল না। সতী পতি-পুত্র সহ স্বর্গবাসিনী হইলেন। সব ফুরাইল।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন।

বালবিধবা।

এখন বালিকা সে যে নাহি জানে হায়,
জগতের রীতিনীতি, বুঝিতে না পায়—
বিধবা সে, ভেঙ্গে গেছে কপাল তাহার,
অশ্রুধারা রোধিবার কেহ নাহি আর,
এখন শোভিছে তার কচি দু'টী হাতে
সোণার বলয় আর পরিধানে শাড়ী।
কে এমন দয়াহীন আছে এ জগতে
খুলে লবে হস্ত হ'তে সে চিহ্ন তাহার,
এইত ফুটনোন্মুখী কুসুম-কলিকা,
এই সবে যৌবনের প্রথম প্রভাত;
পুতুলের খেলা পেতে বসেছে বালিকা
এরি মাঝে সুখ স্বপ্ন ভেঙ্গে হ'ল চুর,
ঝঙ্কার না দিতে দিতে সপ্তবীণা তার
হা বিধাতঃ! কেড়ে নিলে বীণাটী তাহার?
ব'লে দাও ভগবান হে দীনরঞ্জন!
কেমনে বহিবে এই জীবন-তরণী
কাহার আশায় আর রাখিবে জীবন
স্বামীহারা কুলবধূ বঙ্গের রমণী।
কুটীল সংসার-রাজ্যে সে জানে না পথ
প্রাণভরে জানে না ত ডাকিতে তোমায়,
কে তাহারে হাত ধ'রে দেখা'বে জগৎ?
কে দেখাবে তব জ্যোতিঃ নিত্য প্রেমময়।
ভীষণ পরীক্ষা স্থলে ফেলেছ তাহায়,
দাও প্রাণে নববল বিশ্বাস ভকতি,
কোলে তুলে লও তব দীনা বালিকায়,
ভ'রে দাও ক্ষুদ্র হৃদে বিশ্ব-প্রেম-প্রীতি।
পতিহীনা বালিকা সে কেহ নাহি আর—
তুমিই মঙ্গলময়। আশ্রয় তাহার।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার কাব্যার্ণব।

অনুতাপের চিতায়।

"না, বিন্দু না, তুই অমন অলক্ষণে কথা গুলো বলিস্ কেন বল্ দেখি? কে তোকে বল্‌লে যে বিয়ে হ'লে আমি তোর পর হয়ে যাব?"

"বল্‌বে কে ভাই? বিয়ের কথা হবার পর থেকেই তোমায় যেন একটু অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি, আগে যেমন আমাকে সব কথা খুলে বল্‌তে,

---

* এ ঘটনার সহিত দুইটী সম্ভ্রান্ত পরিবার সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁহাদের সম্ভ্রম নষ্ট হইবার ভয়ে ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম-ধাম গোপন করা হইল। লেখক।

এখন তেমনি আমার কাছে সব কথা লুকিয়ে রাখ। কেন ভাই, আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি ?" এই বলিয়া বালিকা বিজলী তাহার সই চপলার মুখপানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

চপলা নিতান্ত বালিকা নহে। ঊষার পূর্ব্ব-রাগের মত তাহার দেহে যৌবনসুলভ স্নিগ্ধ লাবণ্যের শ্যাম-উজ্জ্বলতা সবে মাত্র উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। রঙ্গালয়ে যাইয়া দর্শকের আকুল দৃষ্টি যেমন যবনিকার অন্তরালে একটা আশ্চর্য্য কিছু দেখিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, চপলাও সেইরূপ বিবাহের পরে একটা অবশ্যম্ভাবী সুখের কল্পনায় মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই সে মাঝে মাঝে বিজলীর প্রতি উদাসীন থাকিত। বিজলী কিন্তু চপলাকে বড় বেশী ভালবাসিত; বালক যেমন রাঙা টুকটুকে খেলনার জন্য অবাধে তাহার মায়ের স্নেহ-কোমল কোলও তুচ্ছ করিতে পারে, এই ক্ষুদ্র বালিকাটী তাহার সই চপলার জন্যও নিজের সমস্ত সুখ, সকল আশা জলাঞ্জলী দিতে পারিত। চপলার সমস্ত ভালবাসাটুকু নিরুদ্বেগে ভোগ করিবার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পাগল করিয়াছিল। চপলার এই ভাবান্তর কেবল যে সে লক্ষ্য করিত—তাহা নহে, তাহার জন্য একটা ভয় ও দুঃখ বিজলীর সমস্ত হৃদয়খানিকে তোলপাড় করিয়া দিত। কিন্তু ভাবী-সুখমুগ্ধা চপলা রাঙাবরের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে নাই, সে ক্রমে ক্রমে বিজলীর নিকট হইতে এইরূপে, নিজের অজ্ঞাতসারে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ভবিতব্য কে খণ্ডন করিবে, যথাসময়ে চপলার বিবাহ হইয়া গেল।

অনেক কষ্টে রাঙা বরের হাতে পায়ে ধরে চপলা যখন ৬মাস পরে বাপের বাটী আসিল, তখন বিজলী শয্যাগত, সে চপলার বিবাহের দুই তিন মাস পর হইতে বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। চপলার বিবাহে সকলে সুখী হইলেও বিজলীর বুকখানা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে অনেক চেষ্টা করিয়াও চপলার বিবাহে সামান্য মৌখিক আনন্দের হাসিও হাসিতে পারে নাই, সুখের চেয়ে দুঃখ তাহার সমস্ত প্রাণখানিকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল এবং সেই দারুণ আঘাত বালিকা সহ্য করিতে পারে নাই।

চপলা অনেকবার বিজলীর অসুস্থ সংবাদ জানাইয়া তাহাকে দেখিতে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর বিমলকুমার তাহার সে উপরোধ রাখেন নাই বরং এই কারণে চপলা স্বামীর দ্বারা অনেক প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াছিল। বিমলবাবু স্ত্রৈণ ছিলেন না, স্ত্রীর কথা রাখা বা উপরোধ শোনা তাঁহার পছন্দের বাহিরে বলিয়া বোধ হইত। বাল্যকাল হইতে অভিভাবক হীন এই যুবক সংসারের সুখ অপেক্ষা বাহিরের বা বাজারের সুখই বেশী ভালবাসিতেন। চপলা স্বামীগৃহে যাইয়া এক মুহূর্ত্তের তরেও নিজেকে সুখী করিতে পারে নাই।

বার বার বিরক্ত হইয়া বিমলবাবু এবারে ১০।১৫ দিনের কড়ারে চপলাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন যে, যদি অঙ্গীকৃত সময়ের মধ্যে ফিরিয়া আসা না হয়, তবে তিনি আর তার মুখদর্শন করিবেন না।

এই প্রকার বন্ধন-ব্যথিতা হইয়া চপলা তার প্রাণের সইকে দেখিতে আসিল।

চপলার প্রাণঢালা যত্নে, অবিরত সেবায়, বিজলী ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল। তাহার মুখে একটু একটু করিয়া ক্রমে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; সে এইরূপে নিজেকে অনেকটা সামলাইয়া লইল।

বিমলবাবুর কড়া পত্র আসিয়াছে, চপলাকে কল্যই যাত্রা করিতে হইবে, কোনও ওজর আপত্তি খাটিবে না। যদি না আসা হয়, তাহা হইলে তিনি আর চপলাকে গ্রহণ করিবেন না। আকাশ পাতাল ভাবিয়া চপলা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। যাহার অমূল্য প্রাণটী কেবলমাত্র তাঁহারই এতটুকু স্নেহ-যত্নের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে, যাহার শীর্ণ-মলিন মুখখানিতে শুধু তাহারই আদরে একটু একটু করিয়া হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে, পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নী প্রভৃতির প্রাণপাত চেষ্টায় যাহার দারুণ ব্যাধির একটুও উপশম হয় নাই, চপলার আগমন মাত্রে যার সেই ব্যাধির অনেকটা উপশম হইয়া আসিতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেও তাহার প্রাণ চাহিতেছিল না, তাহাকে একলা রাখিয়া যাইতে তাহার মন কাঁদিয়া উঠিতেছিল। মরণ বাঁচনের কর্ত্রী হইয়া সে কিরূপে তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে? এই সমস্ত ভাবিয়া চপলা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এদিকে জোর তলব, যদি না আসা হয়, স্বামী তাহার এই অবাধ্যতার জন্য যে একটা ভয়ানক প্রতিশোধ লইবে, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না।

অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অপরাধীর দোষ স্বীকার করিবার মত চপলা যখন বিজলীকে চলিয়া যাইবার কথা বলিল, বিজলী তাহার কোনও প্রত্যুত্তর করিল না, সে জানিত যে চপলা স্বামী বিমলকুমারকে বড় ভয় করে, বিমলবাবু যাহাতে বিরক্ত হ'ন, তেমন কাজ চপলা করিতে পারিবে না। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, স্বামী আগে, তার পর বিজলী। এই সমস্ত ভাবিয়া সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না; তাহার বিষাদ মলিন মুখখানির উপর সুন্দর বড় বড় চোখ দু'টী কেবল ছল্ ছল্ করিতে লাগিল আর প্রাণের ভিতর কি যেন একটা গুরুভার চাপান হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে একদৃষ্টে চপলার মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া রুদ্ধ আবেগে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, চপলার কোলে মুখ লুকাইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। বুঝি এদিন আর তা'র আসিবে না, বুঝি জনমের মত তাহার এ সুখের দিন চলিয়া যাইতেছে, বুঝি এ জীবনে আর তা'র প্রাণের সঙ্গিনীটির কোলে মাথা রাখিয়া এমন আদর মাখা কান্না কাঁদিবার অবসর হইবে না। বালিকা নববধূ প্রথম শশুরবাটী যাইয়া সকলের আদর যত্নের মধ্যে যেমন একটা মহা শূন্যতা অনুভব করে, বিজলীর প্রাণেও সেইরূপ এক মহাশূন্যতা অনুভব হইতেছিল।

আর চপলা—তাহার এখন উভয় সঙ্কট। সে যে কি করিবে, কি বলিয়া প্রবোধ দিবে, কি সান্ত্বনায় বিজলীর প্রাণ শীতল হইবে—তাহা সে ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তাই সে মনে

মনে ঈশ্বরকে ডাকিল—"হে দয়াময়! উপায় বলে দাও, আমি বড় বিপন্না, আমায় রক্ষা কর!"

এইরূপে প্রত্যহ "যাচ্চি যাব" করিয়া চপলার স্বামীগৃহে পৌঁছিতে ২।৩ দিন বিলম্ব হইয়া গেল। প্রাণে একবোঝা দুঃখের ভার লইয়া সে অতি কষ্টে তাহার বিলম্বের কারণ বিমলকুমারের নিকট বিবৃত করিল। কিন্তু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিমলবাবু স্ত্রৈণ ছিলেন না। তিনি তাহার কোনও কৈফিয়ৎ শুনিলেন না এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য বাটী আশা বন্ধ করিলেন। সহরের উপকণ্ঠে এক বার-বণিতার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া স্বীয় পত্নীর অভাব কতকটা পূর্ণ করিয়া লইলেন।

মানুষের দেহে যখন ব্যাধি একবার তাহার পশার করিয়া লয়, তখন সে অশ্বত্থ গাছের শিকড়ের মত আপনার অধিকার বিস্তার করিতে থাকে। পীড়িতা বিজলী ক্রমে এত অধিক অসুস্থ হইয়া পড়িল যে, তাহার আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। স্নেহময়ী মা অনেক ঠাকুর দেবতার উদ্দেশে অনেক কাঁদিলেন, অনেক প্রকার মানত করিলেন, বুক চিরে রক্ত দিবার প্রতিজ্ঞা করিতেও ভুলিলেন না; কিন্তু কই কিছুতেই কিছু হইল না। একদিন সকলকে কাঁদাইয়া বালিকা তাহার দুঃখময় জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। স্নেহকুসুম নিয়তির কঠোর শাসনে অকালে ঝরিয়া পড়িল!

চপলার দুঃখের আর সীমা রহিল না। তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন,—একমাত্র সুখ—"বিজলী তাহাকে ভালবাসে।" এই স্মৃতি বুকে লইয়া, এই বিশ্বাসের সঞ্জীবনী-সুধা পান করিয়া সে তাহার স্বামীর অনাদর, লাঞ্ছনা, ঘৃণা, উপহাস সমস্ত মুখ বুজিয়া সহ্য করিত; কিন্তু যখন শুনিল যে, তাহার প্রাণের ক্ষুদ্র সঙ্গিনীটি তাহারই অনাদরে, তাহারই অসাবধানতায়, তাহারই অযত্নে, তাহারই উপেক্ষায় অকালে ইহজগত ছাড়িয়া গিয়াছে, তখন তাহার প্রাণে যে কি ভয়ানক যাতনা হইতে লাগিল বর্ণনা করা অসম্ভব। একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু যাতনা দেখিয়া মায়ের প্রাণ যেমন কাতর হয়, দুর্জ্জনের ষড়যন্ত্রে পতিত নির্দ্দোষী আসামীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে সে যেমন পলে পলে একটা ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করে, সেইরূপ চপলার প্রাণও প্রতি মুহূর্ত্তে এক দুঃসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। নিষ্ঠুর নিয়তি! ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষকে লইয়া তোমার এ কেমন খেলা মা?

সে দিন পূর্ণিমা। চপলা উন্মুক্ত আলোকে ছাদে বসিয়া কাঁদিতেছিল। সে-ই যে বিজলীর মৃত্যুর কারণ, এই কথা ভাবিয়া সে পলে পলে শিহরিয়া উঠিতেছিল ও প্রতিমুহূর্ত্তে সর্ব্বসন্তাপহারী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাহার আরাধনা করিতেছিল, এমন সময় মত্তাবস্থায় তাহার হতভাগ্য স্বামী বিমলকুমার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের কুৎসিত আমোদ চরিতার্থ করিবার জন্য টাকা চাহিলেন? ইতিপূর্ব্বে চপলা তাহার স্বামীকে তাহার সমস্ত অলঙ্কার গুলিই দিয়াছিল, তাহার নিকট তখন আর কিছুই ছিল না যে, তাহা তাহার স্বামীর মনস্তুষ্টি করে। কেবলমাত্র তাহার আদরের বিজলীর উপহার দেওয়া দুইটী ইয়ারিং

অবশিষ্ট ছিল। হতভাগ্য স্বামী তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলে সে তাহার পায়ে ধরিয়া বাটীতে থাকিবার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করিল, কেবল আজ রাত্রের জন্য বাটী থাকিলে সে এই অবশিষ্ট গহনা দুটিও দিবে, এ কথাও বলিল। কিন্তু বিমলকুমার তাহার কোনও কথা শুনিলেন না, জোর করিয়া তাহার কান হইতে ইয়ারিং দুইটী ছিঁড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। দুঃখে ও অপমানে চপলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

যখন চপলার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন চাঁদ মাথার উপর উঠিয়াছে। স্নিগ্ধোজ্জ্বল শুভ্রকিরণে স্নাত হইয়া প্রকৃতি দেবী বড় সুন্দর সাজিয়াছে। কিন্তু তখন তাঁহার এ সমস্ত দেখিবার অবসর ছিল না। হৃদয় যে সুখে ভোরপুর হইলে এ সমস্ত ভাল লাগে, চপলার সে সুখ আদৌ ছিল না। সে আস্তে আস্তে দুঃখভারাক্রান্ত ক্ষীণ দেহখানি লইয়া আলিসার নিকট হইতে ঝিকে ডাকিল, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পাইল না, ঝি তখন বাসনমাজা ইত্যাদি কাজ শেষ করিয়া বাটী চলিয়া গিয়াছে। বাহির বাটীতে ভৃত্য রামদিন তখন নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত। নিচে যাইয়া শুইতে চপলার ইচ্ছা হইল না। অথবা পারিল না। সে আলিসার উপর বসিয়া পড়িল; দু'হাতে মাথা টিপিয়া ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবী তাহার চক্ষে তখন অগ্নিময় গোলকের মত ঘুরিতেছিল। যখন তাহার একটু মাথা তুলিবার ক্ষমতা হইল, তখন সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল—বিজলীর ছায়ামূর্ত্তি। সেই কঙ্কালসার দেহ, ছাইয়ের মত সাদা মুখ, কোটরগত নিষ্প্রভ চক্ষু, তাহাতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল। বহুদিন পূর্ব্বে যখন সে পিতৃগৃহে গিয়াছিল, তখনকার স্মৃতি তাহার সম্মুখে যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উদয় হইয়াছে, বোধ হইতে লাগিল। চপলা অনিমেষ নয়নে সেই মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার আঁখির পলক পড়িতে ছিল না, সমস্ত দেহ বরফের মত শীতল হইয়া গিয়াছিল। সে দেখিল—বিজলীর সেই ছায়ামূর্ত্তি ক্রমশঃই তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, ক্রমে এত কাছে আসিল যে, সেই অপার্থিব মূর্ত্তির ক্ষীণ নিশ্বাসের তীব্র শীতলতা সে অনুভব করিতেছে বলিয়া বোধ হইল। তারপর—তারপর সেই মূর্ত্তি এক অমানুষিক সুরে বলিল,—"সই, এম্‌নি করে কি ফেলে আস্‌তে হয়?" চপলা আর স্থির থাকিতে পারিল না, চীৎকার করিয়া যেমন উঠিতে যাইবে, অমনি ছাদ হইতে নিম্নে পড়িয়া গেল। এতদিন পরে অভাগিনীর সব দুঃখের শান্তি হইল।

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

অবসান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-গৃহ।

রাম ও সন্ন্যাসীবেশে কালপুরুষ

(দ্বারে লক্ষ্মণ প্রহরীবেশে দণ্ডায়মান

রাম। দেবদূত!

এতক্ষণে চিনিনু তোমারে,

ছাড়ি স্বর্গপুরী, ছদ্মবেশ ধরি,

সন্ন্যাসী সেজেছ ভাল
বল এবে ত্রিদিব সংবাদ
কি ইচ্ছায় এসেছ অযোধ্যা-মাঝে ?
কা-পু। অপরাধ ক্ষমিবেন প্রভু !
মায়াময়ে ছলিতে মায়ায়
ধরেছি এ সন্ন্যাসীর বেশ,
আসিয়াছি দেবের আদেশে তব পাশে।
জাগাইয়ে দিতে মনে গোলকের কথা,
বহুদিন হইল বিগত
ছাড়ি নিজপুরী, নানা রূপ ধরি
নরলোকে করিলে বিহার,
বৃথা কেন আর নরলোকে অবস্থান।
রাম। শুন হে সন্ন্যাসী, মর্ত্ত্যধামে আসি,
ভালবাসিয়াছি নরকুলে,
এবে নরলোক দ্যুলোক হইতে
প্রিয়তর হয়েছে আমার।
মর্ত্ত্যধাম বটে যাতনার স্থান
কিন্তু হায় স্নেহ-মমতায়
সকল ভুলায়ে রাখে।
কা-পু। তাই প্রভু ভুলেছ কি গোলকের কথা,
দেখি তব আত্ম-বিস্মরণ,
দেবগণ ব্যাকুল অন্তর সবে,
ভক্তাধীন ভক্ত উদ্ধারিতে
নররূপে পশিলে ধরায়,
দুষ্ট দশাননে নাশি ঘোর রণে—
হরিলে ধরার ভার
হ'ল প্রিয় ভক্তের উদ্ধার
এবে সর্ব্বদেবের বাসনা
ত্যজ ত্বরা ধরার এ মায়া।
রাম। অনুরোধ রাখিব সবার
ধরায় না রব বহুদিন,
পদ্মযোনি, দেবেন্দ্র বাসব,
রবি, শশী, বরুণ, পবন,
কহ সবে আর কি কহিল।
কা-পু। আর কি কহিব দেব !
শুধু সবে বিবহে কতির অনুক্ষণ,
একাদশ সহস্র বৎসর
হ'ল এই মর্ত্ত্যধামে গত
আলো করি একাকিনী বৈকুণ্ঠ ভুবন
কমলা কমলাসনে বসি,
দিবানিশি ব্যাকুলা তোমার তরে।
সদা ঝরে অশ্রু দু'নয়নে।
রাম। সকলি তা' জানি দেবদূত !
নহে কিছু অবিদিত মোর ;
কালপূর্ণ যতদিন না হবে আমার
লীলা সাঙ্গ কেমনে করিব বল ?
কা-পু। কত দিনে কালপূর্ণ হবে রঘুনাথ ?
রাম। নহে বহুদিন আর,
বিদায়ের দিন সন্নিকট হ'ল প্রায়,
শুধু এই অযোধ্যার স্নেহের-বন্ধন
ছিঁড়িতে পরাণে লাগে ব্যথা।
এ অযোধ্যাবাসী মনপ্রাণ দিয়া
ভক্তিডোরে বেঁধেছে আমারে
লীলা সাঙ্গ করিব যখন
বিষম বেদন পাবে তারা।
কা-পু। হেন মায়া মুগ্ধ হওয়া উচিত কি তব ?
হে বিশ্বপালক হরি
নামে যার খণ্ডে মায়া-মোহ
তিনি এবে মায়ার অধীন
সকলি অদ্ভুত লীলা তব।
কা-পু। রাম অবতারে নাহিক সুখের লেশ
হ'ল শেষ কেঁদে রামলীলা।
রাম। বুঝিতে নারিলা দেবদূত ?
দুঃখ বলি কর যাহা অনুভব
সেই সব সুখের নিদান মম কাছে।
ভক্তে প্রেম চায়, ভক্তে গুণ গায়
উথলায় আনন্দ-সাগর মোর।
শোক-দুঃখে করি যে রোদন
শুধু লোক দেখাবার হেতু।
কা-পু। তব লীলা কেমনে বুঝিব লীলাময় !
ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র মম জ্ঞান,
এবে সর্ব্বদেব অনুরোধে

চেয়ে আছে সকল সংসার,
ঐ পাদপদ্ম পানে
ভুলি ত্রিভুবনে মুগ্ধ শুধু মর্ত্তের মায়ায়।
রাম। কিবা করি উপায় তাহার,
উপেক্ষিতে পারি ত্রিভুবন
ভক্তির বন্ধন সহসা ছিঁড়িতে নারি।
যে জন আমারে বাঁধে প্রেম-ডোরে
ভাবি তারে আপনার জন
আজ্ঞাবহ সতত তাহার পাশে আমি
নর-অবতারে,
এই সুখ নিয়ত আমার।
কর, দেব লীলা অবসান।
রাম। লীলা সাঙ্গ হবে যেই দিন
সেদিন নাহিক বহু দূরে
এবে যাও তুমি সে অমরাপুরে
কহ সুরদলে আমার গমন কথা।
কা-পু। শুনি দেব এ শুভ সংবাদ
দেবগণ আনন্দে বিভোর হবে
ভাসিবে ত্রিদিব ধাম আনন্দ-হিল্লোলে,
পারিজাত সার্থক ভাবিবে আপনারে
স্থান পেয়ে এ চরণ-যুগে।
রাম। বটে বড় শুভ-সম্মিলন,
তবে যাও বিলম্বে নাহিক কাজ
দেবরাজ পদ্মযোনি, বরুণ, পবন
যত দেবগণে কহ জনে জনে
লীলা সাঙ্গ অচিরাত হবে।
কা-পু। (স্বগতঃ)
আশা বুঝি হ'ল না পূরণ
হ'ল কৈ ঋষি আগমন ?
কৈ হ'ল লক্ষ্মণ বর্জ্জন,
হয়ত করিতে এই শোক অভিনয়
দুর্ব্বাসা সম্মত নহে বুঝি,
নহে হেন বিলম্ব কিসের লাগি ?
আমি সে ত্রিদেবে যেতে
পাইনু বিদায়।
হ'ল মোর উদ্দেশ্য জ্ঞাপন
বিলম্ব করিব আর কিবা ছল ধরি,
বৈজয়ন্ত পুরী যাইব কেমনে আমি
রক্ষিবারে দেবের আদেশ
ধরিনু যে সন্ন্যাসীর বেশ
অবশেষ বিফল সকলি হ'ল।
কেন নাহি এল ঋষিরাজ
কাল বিলম্ব কি লাগি করিছে ?
(দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া)
না না ভয় নাই
লক্ষ্মণের পাশে ঐ যে আসিছে মুনিবর
দোলাইয়া দীর্ঘ জটা-ভার
মূর্ত্তিমান ক্রোধের আধার
আসে যেন কালান্তক বেশে
অন্তর আমার, হও স্থির
কিবা ব্যাকুলতা বল কর্ত্তব্যসাধনে।

শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ পুরাতনের প্রচারক। কেহ নূতনের প্রচারক। আমরা কিন্তু এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা বলিতে চাহি। সাহিত্যের অর্থ অভিধানে যাহাই করিয়া থাকুক না কেন, সাহিত্যের প্রধান কর্ম্ম এবং উদ্দেশ্য মানব-জন-পুঞ্জের দুঃখ এবং দারিদ্র্যের, পাপ এবং পঙ্কিলতার, কষ্ট এবং কৃচ্ছ্রতার, মূঢ়তার এবং আলস্যের বিরাট-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি কোথায় লুকান আছে, তাহার সন্ধান বলিয়া দেওয়া। পুরাতন-বাঙ্গালা-সাহিত্য এ কার্য্য করে নাই—তাহার ধারা কেবল উন্নত এবং আদর্শ মনুষ্যের এবং দেবতার লীলাদি বহন করিয়া প্রধাবিত। বর্ত্তমান সাহিত্যও এ বিষয়ে বড়ই ফিকা—সাধারণ ইহাতে বিশেষ স্থান পায় নাই, কেবল বিশেষই বিশেষস্থান পাইয়া থাকে এবং পাইতেছে। ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ইহা সমগ্র সমাজের সমস্ত বুদ্ধিটি লইয়া দেখিলে যুক্তিসঙ্গত হয় না। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের গতিও

বদলান উচিত। পুরাতন সাহিত্য যে অবস্থায় বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের সার্থকতা থাকিতে পারে। যখন লোকের খাইবার-পরিবার স্বচ্ছলতা থাকে, তখন স্বর্গের এবং মহত্বের কথা লইয়া আলোচনা প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু যখন দুঃখ, কষ্ট, রোগ, অভাব, অত্যাচার, বিলাসিতাই লোকের নিত্য-সহচর, যখন নরকই নিকট এবং স্বর্গ বহুদূরে অপসৃত—তখন এই সকল নরকের কীটের কথাই সাহিত্যের মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকা আবশ্যক এবং নরকের কালিমাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া স্বর্গের জ্যোতিকে উজ্জ্বলতর করা সাহিত্যের উচিত হয় না। নরকের চিত্রকে স্পষ্ট করিয়া আঁকিয়া তাহার মধ্য দিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দূরস্থিত উন্নত জীবনের অস্পষ্ট আলোককে দেখানই বর্ত্তমান সাহিত্যের কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

সাহিত্য জনসাধারণের জীবনের গতিকে লক্ষ্য করিয়া, সত্যের ওজনে ওজন করিয়া, তাহা বাক্যে, ছন্দে, এবং ভাবে তুলিকার সুপটু আঘাতে একেবারে জীবন্ত করিয়া দেখাইবে—এবং মানবের সমস্ত দৌর্ব্বল্যের প্রতি অন্ধ হইয়া তাহাকে শুধু ভালবাসার আকর্ষণে তাহার পরিচিত নরক হইতে অপরিচিত স্বর্গের দিকে টানিয়া আনিবে। এই প্রকার যদি হয়, তাহা হইলে, আমরা বাঙ্গালা-ভাষায় প্রাণের সাহিত্য পাইব নতুবা কেবল সুরলোকের স্বপ্নের ক্ষীণ আভাষ মাঝে মাঝে পাইয়া চিরদিনের অভ্যস্ত জীবনের কোন পরিচয়ই পাইব না। যদি দেশের সাহিত্যিকেরা দেশের সমস্ত আবর্জ্জনা জড় করিয়া তাহার উপর তাঁহাদের কল্পনার পদ্ম ফুটাইতে পারেন তাহা হইলে তাহা সত্যকার পদ্ম হয়।

কেবল বড় বড় কথার, কাগজের পদ্মে মন তৃপ্ত হয় না। সত্যকার যুঁই ফুলেও কিন্তু মন প্রবোধ মানে। বাঙ্গলায় যে একটা বিশ্বপ্লাবি ক্রন্দন আবর্জ্জনার স্তূপভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, তাহার দ্বার উদ্ঘাটন এ পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই। নেশায় ঐ যার চক্ষু রক্তবর্ণ, জুয়াখেলায় ঐ যে ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত, পাপে এবং দুশ্চিন্তায় ঐ যাহার পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে, তাহার প্রাণের ক্রন্দন, তাহার হৃদয়ের কোন্ গুহায় পাথর চাপা রহিয়াছে—তাহার খোঁজ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সাহিত্যিকেরা লয়েন নাই। এই কারণেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের যতটা প্রভাব হওয়া উচিত, ততটা হয় নাই। যেখানে আবর্জ্জনা সঞ্চিত, সেখানে ধীরভাবে শান্তভাবে ঝাঁট দেওয়ার প্রয়োজন—আবর্জ্জনার প্রতি গালি প্রয়োগ কিম্বা উপেক্ষা ফলদায়ী নহে। তাচ্ছিল্য করিয়া ঝাঁট দেওয়া হয় না—যত্নের সহিত মার্জ্জনী সহকারে জঞ্জাল জড় করিতে হয়, ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিলে হয় না। আমরা যেখানে দুঃখ-কষ্টের কথা কহিয়াছি, সেখানে দুঃখ-কষ্টের কথা সঠিক ভাবে কহি নাই—অনেক মাজিয়া ঘষিয়া শোধন করিয়া কহিয়াছি, দুঃখ-কষ্টের প্রভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব অনেক স্থলেই খর্ব্ব এবং বিকলাঙ্গ হয়, তাহা আমরা দেখাইতে চাহি কিম্বা পারি নাই। যাহা প্রায়ই ঘটে না, ক্বচিৎ ঘটে, সেই দারিদ্র্যের মধ্যে সংযমের এবং সত্বের দেবচিত্রই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা কেবল পর্দ্দার ভিতরকার একটী অতি ক্ষুদ্র দিক্—এত ক্ষুদ্র যে, তাহা খুব চাহিয়া দেখিতে হয়—কিন্তু যে দিকটি খুব বিস্তৃত, সহজেই নজরে পড়ে, তাহাকে সর্ব্বদাই আমরা লুকাইবার জন্য ব্যস্ত। বাঙ্গালায় যাহারা রৌপ্য এবং রূপের কাছে হৃদয় বিক্রয় করিয়াছে, যাহারা পেটের দায়ে নারীত্বের বিনিময়ে জীবিকোপায় অর্জ্জন করিতে বাধ্য। যাহাদের প্রবলের অত্যাচারে আকাঙ্ক্ষা সত্বেও স্বর্গ ধরিবার শক্তি অপসৃত, যাহারা সুখলোলুপ সম্প্রদায়ের কৌশলে অজ্ঞান-তিমিরে ভস্মমান—যাহাদের মুষ্টিকে জোরে চাপিয়া রাখিয়া অত্যাচারীরা কার্য্য করিতে দিতেছে না,—তাহাদের কথা বলিবার যে অনেক বাকী আছে, তাহ সাহিত্যিকদের ভাবিয়া দেখা খুব প্রয়োজন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মিত্র।

কর্ত্তা ও কারয়িতা কে ?

গুরু-শিষ্য সংবাদ।

গুরুদেব শিষ্যালয়ে সমাসীন। তাঁহার সম্মুখে পার্শ্বে পদতলে বহু শিষ্য উপবিষ্ট। যাঁহার যাহা জিজ্ঞাস্য, তিনি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সদুত্তর পাইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। শিষ্যগণের মধ্যে কেহ উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও কেহই অশিক্ষিত নহেন। সকলেরই প্রাণের বাসনা আধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করা। মানবচিত্তে আধ্যাত্ম সম্বন্ধীয় নানা তর্কের উদয় স্বাভাবিক বলিলেই হয়। বলা বাহুল্য শিষ্যগণ পল্লীবাসী, কাজেই মাসিক পত্রের প্রবন্ধ, গীতার অনুবাদ বা সভাক্ষেত্রে বক্তৃতা দ্বারা যে পল্লবগ্রাহিতা জন্মে, তাহা তাঁহাদের জন্মে নাই। আধ্যাত্ম-তৃষ্ণা বলবতী, উপদেশ গ্রহণ যোগ্য বুদ্ধিশক্তি সামান্য, তাই আজ গুরুদেবকে পাইয়া সে তৃষ্ণা দূর হইবে, এই আশায় সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। গুরুদেব সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা সরলযুক্তির সাহায্যে দুরধিগম্য আধ্যাত্ম-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতেছেন। ক্ষুদ্র পল্লীর একটী প্রাঙ্গণ সত্য সত্যই বড় শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে।

একজন শিষ্য প্রশ্ন করিলেন—"গুরুদেব, আমরা যে সকল ভাল কার্য্য বা মন্দ কার্য্য করি, তাঁহার কর্ত্তা কে ?"

অপর শিষ্য বলিলেন—"তাহার দায়ী যখন আমরা, তখন আমরাই ত কর্ত্তা। তবে ভগবান্ করান, এই মাত্র। কেমন দাদা ঠিক নয় ?"

অন্য শিষ্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" তবে আমরা কৃতকর্ম্মের দায়ী কেন ? ভগবানই করান আমরা যন্ত্র মাত্র। তবে আমরা কে ?"

আর একটি শিষ্য ধীরে ধীরে কহিলেন—"বাঃ তোমরা ত বেশ, আপনাদের দোষ ভগবানের উপর নিক্ষেপ করিতেছ, নিজেরা পাপ করিবে, সুখভোগ করিবে, আর তজ্জন্য দায়ী হইবেন ভগবান্।"

ইহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমরা ত গুরুদেবকে জিজ্ঞাসাই করিতেছ। তাঁহার কথা মন দিয়া শুন, তবেত মীমাংসা হইবে।"

তখন সকলেই মৌন হইলেন। গুরুদেব ধীর-গম্ভীর অথচ মধুরভাষায় বলিলেন—"দেখ তোমাদের মধ্য হইতে একজনে আমাকে প্রশ্ন কর, নচেৎ সকলেই জিজ্ঞাসা করিলে মীমাংসার সুবিধা হইবে না।"

তখন একজন অগ্রগামী হইলেন। তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া গুরুদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন—"যে তোমরা আজি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই

তোমরাই কার্য্যের কর্ত্তা। ফলভোগ সেই তোমরাই করিবে। দায়ী হইতে সেই তোমরাই হইবে। যখন তোমরা মনে করিলে পুণ্য কার্য্য করিতে পার, পাপ নাও করিতে পার— তখন কর্ত্তা তোমরা ব্যতীত আর কে হইবে,পুণ্য বা পাপকার্য্য মাত্রেই কর্ত্তার অধীন। কর্ত্তার মনে করার উপর কার্য্য করা বা না করা যখন নির্ভর করে, তখন তাহা কর্ত্তারই অধীন। দার্শনিক ভাষায় "ক্রিয়া পুরুষ চিত্তব্যাপারাধীনা।" সময় থাকিতে, অর্থ থাকিতে, শক্তি থাকিতেও মানব ধর্ম্মকার্য্যে বিমুখ, গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্তির জন্য যথোচিত চেষ্টা করা দূরে থাক পরন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বকই তাহাতে মানব যত্নশীল। তাহা হইলে মানব ব্যতীত পাপ-পুণ্যের কর্ত্তা আর কে হইবে ?

শিষ্য। ভগবান্ ত করান ? তবে আমরা সম্পূর্ণ দায়ী কেন ? তিনি মনে করিলে আমাদিগকে পুণ্যবান করিতে পারেন, পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারেন, তবে আর আমরা কষ্ট পাই কেন ?

গুরু। "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন" এই শ্লোক একটি সজীব মন্ত্র। ঐ মন্ত্রের অভ্যাসে মানব কর্ম্মবিমুক্ত, এমন কি জীবন্মুক্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে। কেবল কথা কয়টি উচ্চারণ বা তাহার শব্দার্থ মানবের উপকারে আইসে না, বরং তোমাদের মত ব্যক্তির অপকারই উৎপাদন করে।

ভগবানই করান, তাই কর! বুকে হাত দিয়া বল দেখি, ঐটি প্রাণের কথা কি না ? শয়নে স্বপনে, সুখে দুঃখে, আহারে বিহারে, আমোদে, প্রমোদে মনে প্রাণে ইহা বিশ্বাস কর কি না ? ভগবানই করান, আমরা করি না— এ জ্ঞান যাঁহার বদ্ধমূল, এ বিশ্বাস যাঁহার অটুট, তিনি ত কর্ম্মবিমুক্ত, তিনি ত মহাজ্ঞানী। ভগবানই করান, এইরূপ বোধ থাকিলে পাপ-পুণ্য থাকে না, কৃতকার্য্যের কোন দায়িত্ব থাকে না। সেইরূপ ব্যক্তিকে সত্যই ভগবান্ করান। "আমরা কার্য্য করি না, ভগবান্ করান।" ইহা যিনি জানেন, তিনি তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য সুখী ও দুঃখী, উন্মত্ত ও অনুতপ্ত হয়েন না। তাঁহার পক্ষে লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, সাফল্য-বৈফল্য সবই সমান। "লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।" কর্ম্মবন্ধনের কারণ বটে কিন্তু যাঁহার বিশ্বাস—ভগবানই করান, তিনি বাস্তবিক কর্ত্তা নহেন। কর্তৃত্বের কারণ অহঙ্কার না থাকায় 'তিনি' কার্য্যের কর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা নহেন। "কর্ত্তাপি অকর্ত্তা সহি।"

বাহ্যদৃষ্টিতে কার্য্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে কর্ত্তা বলিতে পার, কিন্তু কর্তৃত্ব কারণ অহঙ্কার না থাকায়, বাসনা চালিত প্রবৃত্তি শূন্য বলিয়া তাঁহাকে সেই কার্য্যের ফলভোক্তা বলিতে পার না। ভগবান্ করান, এই দৃঢ়প্রত্যয়ে যিনি কার্য্য করেন, পাপ-পুণ্য পদ্ম-পত্রের জলের মত তাঁহাতে অবস্থিত করে না। যখন তিনি ভোক্তা হইলেন না, তখন তাঁহাকে কর্ত্তাই বা বল কিরূপে ?

শিষ্য। বিষয়টী একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস, বাসনাবশে প্রবৃত্তির তাড়নায় সুখ-দুঃখে আত্মহারা হইবে, প্রশংসা-নিন্দার দাস হইবে, তুচ্ছ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অকার্য্য করিতেও

বিন্দুমাত্র কাতর হইবে না—অথচ মুখে বলিবে, ভগবানই কারণ—এ কি সম্ভব ? একদিকে পূর্ণ অভিমান, অন্যদিকে একেবারে অভিমান শূন্যতা এই উভয়ের একত্র অবস্থান—আলোক অন্ধকারের মত কখনই সম্ভব হয় না। 'ভগবানই করান' এই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিলে আপনাকে আর কোন কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইবে না, অহঙ্কার বিনাশ পাইবে।

পিতার আজ্ঞায় পুত্র, গুরুর আজ্ঞায় শিষ্য যদি কোন কার্য্য করে, কার্য্যে নিজের যদি ইষ্ট বা অনিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে সে কার্য্য ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক, তাহাতে পুণ্য বা পাপ হইবে না। নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন না দিতে পারিলে পিতার আজ্ঞা, গুরুর আজ্ঞা বা পরমেশ্বরের আজ্ঞায় কার্য্য করিলেও সে কার্য্যের ফলাফল অনিবার্য্য। পিতার বা মাতার আজ্ঞা, কাজেই আমাকে পুত্র সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে হইল, গুরুর আজ্ঞা, এজন্য উপবাস না করিয়াও উপবাসই পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা রহিল না—ইহা বস্তুতঃ পিতা মাতা বা গুরুর আজ্ঞা পালন নহে। নিজের সুবিধার অনুরোধে ঐ আজ্ঞা পালন একটি ছল মাত্র। স্বার্থের ক্ষতি করিয়া, সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া নিজের লাভালাভ, ধর্ম্মাধর্ম্ম—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া আজ্ঞা হেতু যাহা করা যায়, তাহাই আজ্ঞা পালন। এ আজ্ঞা পালনে নিজের কোন চিন্তা, সঙ্কোচ, বিচার, ইষ্টানিষ্ট বোধ নাই। আমরা যন্ত্র মাত্র—এ দৃঢ় ধারণা চেতন জীবের হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও প্রায় অসম্ভব। ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ সকলেই ঐ ধারণার প্রতিবন্ধক।

'ভগবান্ করান' ইহা সত্য। কিন্তু ভগবান্ জীবেরই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই করান। জীব পূর্ব্বকৃত যে কর্ম্মফল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারই ফলাফল জীবকে পাইতে হয়। ভগবানই সেই কৃতকার্য্য অনুসারে ফলাফল নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তাঁহারই অলঙ্ঘ্য নিয়মবশে জীবকে কৃতকার্য্য অনুযায়ী ফলাফল ভোগ করিতে হয়। ইহাতে ভগবানের নিরপেক্ষ কর্ত্তৃত্ব নাই।

পুরুষকারের গৌরব আমরা লইব, যশ-মান প্রতিষ্ঠার অধিকার আমরা পাইব, আর কষ্ট পাইবার সময়, বৈফল্যকে বরণ করিবার সময় ভগবানের উপর তাহা চাপাইব—ইহা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারেরই পরিচায়ক। আমাদের নিজকৃত কর্ম্মফলে যে সমস্ত দোষ বা পাপের সৃষ্টি করিয়া থাকি, সেগুলি নিজেদের দোষ নহে—ইহা বলা দাম্ভিক মানবের স্বভাব। ইহকৃত কর্ম্মফল—পুরুষকার। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল—অদৃষ্ট। উভয়ই মানবের কর্ম্মফল। যাহা যে মানবের কর্ম্মফল, তাহা সেই মানবকেই পাইতে হইবে—ইহা ভগবানের সৃষ্টি-নিয়ম। জন্ম, প্রবৃত্তি, রুচি প্রভৃতি সমস্তই মানবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল অনুসারে ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। নচেৎ জন্মসময় এরূপ বৈষম্য, প্রবৃত্তির এরূপ তারতম্য, রুচির এমন বিভিন্নতা জন্মিবার কারণ থাকে না।

তবেই দেখা গেল, যাহারা "কে করে" ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহারাই কর্ত্তা। যাহারা কষ্ট পাইতেছে, তাহারাই সেই কষ্ট পাইবার কারণ।

বীজগত বৈষম্যই বিভিন্ন শস্যোৎপত্তির অসাধারণ কারণ, জল-বৃষ্টির সমতা ও কৃষকের অধ্যবসায়—সাধারণ কারণ। আমাদেরও এই সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎসম্বন্ধে অসাধারণ কারণ—আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল। ভগবান্ নিমিত্ত কারণ মাত্র। ভগবান্ জীবেরই ধর্ম্ম-কর্ম্মানুসারে এই বৈষম্যময়ী সৃষ্টি করিয়াছেন, বৈষম্যমূলক সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সমস্তই জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের হেতু, তবে ভগবানকে দায়ী কর কেন?

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু
র্ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যত।

সূর্য্য সকল লোক হইতে পৃথক, এবং বিশ্ববাসী সকল লোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়। সকল লোকের চক্ষু স্বরূপ হইয়াও সূর্য্য লোক-দুঃখের দ্বারা কখনই লিপ্ত হয়েন না। তদ্রূপ সর্ব্বভূতের, অন্তরাত্মা স্বরূপ পরমেশ্বর লোক-দুঃখের দ্বারা কখন লিপ্ত হয়েন না। অর্থাৎ জগতের দুঃখের সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারেন না। তবেই বোঝ—"ভগবানই করান" ইহার অর্থ কি? আমরা যাহা করি, তাহার ফলভোগ আমরাই করি। ভগবান্ নির্লিপ্তবৎ থাকিয়া তাহারই ব্যবস্থাপক মাত্র। ইহাতে তাঁহার মাত্র নির্লিপ্তত্বই প্রকাশ পায়।

শিষ্য। আমরা কে?

গুরু। যাহারা জিজ্ঞাসা করে, "আমরা কে?" তাহারাই "আমরা" পদবাচ্য। যে আমরা কষ্ট পাই, যে আমরা পাপ-পুণ্য করি, যে আমরা আমার আমার করিয়া মরি—তাহারাই আমরা। কখন দেহকে আমরা বলি, কখন মনকে আমরা বলি, কখন বুদ্ধিকে আমরা বলি, কখন জীবাত্মাকে আমরা বলি, কখন বা সকলগুলিকে ত্যাগ করিয়া মাত্র চৈতন্য-স্বরূপ প্রত্যাগাত্মাকে আমরা বলি। আমরা বলিতে—দেহ,মন, বুদ্ধি, প্রাণ, জীবাত্মা; আমরা বলিতে—অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জীব; আমরা বলিতে সোপাধিক চৈতন্য। যাহারা "আমরার" প্রকৃত স্বরূপ জানেন, দেহ, মন, বুদ্ধি, প্রাণ হইতে অতিরিক্ত চৈতন্য স্বভাব প্রত্যাগাত্মাকে জানেন, তাঁহারা আর আপনাদিগকে কর্ত্তা মনে করেন না, আমরা আমরা করেন না, বিমিশ্র "আমরা" বোধটি না থাকায় দেহ,মন.বুদ্ধি,প্রাণের কার্য্যের জন্য দায়ীও হয়েন না। কাজেই তাঁহারা আর দেহান্তঃকরণাদির কার্য্যকে প্রকৃত চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার কার্য্য ভাবেন না, অর্থফলাদির ভোক্তাও তাঁহাদিগকে হইতে হয় না। তাঁহরাই বলিতে পারেন—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"।

অবশেষে "তাঁহারা সদানন্দরূপ শিবোঽহং" এই মহামন্ত্রের সাধক হইয়া থাকেন। তাহা হইলে তোমরা এইটুকু বুঝিয়া রাখ, প্রকৃত "আমরা" অকর্ত্তা অভোক্তা, আর এই আমরাই এক অদ্বিতীয়। ইহাই একতত্ত্ব সর্ব্বভূতাত্মা পরমেশ্বর বা পরমাত্মা। আর ভ্রমবশে অবিবেকবশে যে "আমরা" বলিয়া থাকি, সেই আমরাই কর্ত্তা ভোক্তা, আর ইহাই "আমরা" ইহাই বহু। ইহাই প্রতি শরীর ভেদে তত্তৎশরীর গত অবিদ্যাচ্ছন্ন অন্তঃকরণ ভেদে অসংখ্য জীবাত্মা। এই পার্থক্যটুকু যদি মনে প্রাণে বুঝিতে পার, আবার

হইবে বল—এই বিমিশ্র পৃথগ্‌ভূত অবিচিন্ত্য আমরাই নিযুক্ত হই, নিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করি মাত্র। প্রকৃত অবিমিশ্র, অপৃথগ্‌ভূত, বিচিন্ত্য সৎস্বরূপ চৈতন্যময় আত্মা বা আমি নিযুক্ত হই না, কর্ম্মও করি না, ফলও ভোগ করি না। সেই আমিই "সদানন্দরূপ শিবোহহং" কেবল অক্ষর-বিদ্যা লাভ করিয়া "ত্বয়া হৃষীকেশ" বলা শুক-পক্ষীর অর্থশূন্য উচ্চারণের মত নিষ্ফল। তবে ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অভিমান যদি কথঞ্চিৎ কাটে, অহঙ্কার কিছু বিদূরিত হয়, তাহাই পরম লাভ। সেই পরমলাভের বিন্দু পরিমাণের আশাও যদি এইরূপ আধ্যাত্মতত্ত্ব পরিশীলনের ফলে মেটে, তবে তাহা হইলেও আমাদের লাভ মন্দ হইল না। বৎসগণ, তোমাদের এই সদ্‌বুদ্ধি, আধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও এই জ্ঞানপিপাসার জন্য আমি তোমাদিগের উপর সন্তুষ্ট। আশীর্ব্বাদ করি, এইরূপ তত্ত্বালোচনায় তোমাদের মন নিযুক্ত থাকুক; ফল একদিন ফলিবেই। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

শ্মশানের ছবি।

আমার স্বামী একজন ভাল ডাক্তার। আমার ছেলেবেলা থেকে কেমন ঝোঁক, ফটোগ্রাফ তুলিব, ছবি আঁকিব। ৮ বৎসর বয়সে পাত্র করিয়া নানারকম রং গুলিয়া পশু, পক্ষী, ফুল, পাতা, ঘর, বাড়ী ইত্যাদি আঁকিবার চেষ্টা করিতাম; তাহা দেখিয়া সকলে হাসিলে বুঝিতাম না কেন হাসে? এখন সেই ছবিগুলি দেখিলে নিজেই হাস্য সংবরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। যাহা হউক, আমার আগ্রহ দেখিয়া পিতা আমায় চিত্রকলা শিখাইবার জন্য আর্ট স্কুলের একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ রায় এল এম-এস মহাশয়ের পবিত্র হৃদয়ে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়টী মিশিয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গম শোভা প্রকটিত করে। স্বামী ভবন বাঁকীপুরে আসিয়াও আমার ছবি তোলার ব্যাঘাত হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। পিতৃ-ভবন কলিকাতায় বড় একটা যাই না। সেখানে বিধবা জননী, ভাই হরেন দাদা ও ছোট বোন আশালতা ভিন্ন কেহই নাই। দাদা এখনও বিবাহ করেন নাই। আমরা অনেক অনুরোধ করিয়াছি, কিন্তু সকলই বিফল হইয়াছে। তিনি বলেন—সংসারে বাঁধা পড়িবেন না। কাজেই আমরা নিরস্ত হইয়াছি। সেই কারণে দাদার উপর একটু রাগও হইয়াছিল; আর বলিতে লজ্জা করে, স্বামীকে ছাড়িয়া আমি কোথাও থাকিতে পারিতাম না। এই দুইটি কারণে আজ প্রায় তিন বৎসর আমার কলিকাতায় যাওয়া হয় নাই।

বাঁকিপুরে একটী মনোরম স্থানে আমাদের মাঝারি রকমের তকতকে ঝকঝকে বাড়ীখানি, চতুর্দ্দিকে ফুলের বাগান। বাড়ীর একটা ছবিও আঁকিয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ ভোগে হয় নাই। আমাদের ভাঁড়ার ঘরটায় এত আরসুলা, গণিয়া সংখ্যা করা যায় না। ছবিখানি তাহাদের দ্বারাই নষ্ট হইয়াছিল।

সেদিন তাড়াতাড়ি ছবিগুলা ঠিক করে

পাঁড়েজির হাতে দিয়ে বেশ করে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমার বসবার ঘরে টেবিলের উপর রেখে দেবেন। স্বামীর পরম বন্ধু রামেন্দুবাবুর সহিত তাঁহার নব-পরিণিতা স্ত্রী সরসীবালাকে দেখিতে গেলাম। সেদিন ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল, আহারাদি সেইখানেই হইয়া গিয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়াই প্রথম শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখি চক্ষু মুদিত করিয়া ডাক্তার-বাবু (আমি ডাক্তারবাবু বলিয়া ডাকি) শুইয়া আছেন। দ্বারের অর্গলের শব্দে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি গো জ্যোৎস্না! বৌ দেখ্‌লে কেমন?" আমি কৃত্রিম ক্রোধে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিলাম—"আমায় জ্যোৎস্না বলিবে কেন? ঐ কি আমার নাম?" "তুমি এ অন্ধকার হৃদয়ের জ্যোৎস্না ভিন্ন কি হইতে পার?" আমার আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না। লেডি সু ও জ্যাকেটটা খুলিয়াই একেবারে শয্যায় গিয়া ডাক্তারবাবুর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলাম—"তোমায় বলিতে ভয় পাই।" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"সেই কথার উত্তর বুঝি এখন হল? তা বল্‌তে ভয় কেন?" মেয়েটী বড় সুন্দরী, তাহার রূপ কূলে কূলে উছলিয়া পড়িতেছে। আর আমাদের এখন মরা গাঙ; আমার এই সাধের তরণীখানি যদি ভরা-গাঙে অনুকূল পবনে ভাসিয়া যায়?" ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তুমি বড় দুষ্ট।" "অ্যাঁ, তুমি আমায় দুষ্টু বোল্লে? তুমিও অতি দুষ্টু, যে নিজেকে ভাল বলে জানে, সেই সব চেয়ে দুষ্টু।" "ব্যস্‌ রোকশোধ। এখন কি দেখ্‌লে, কি কথা কহিলে, শিক্ষিতা কি অশিক্ষিতা সব বল?"

রামেন্দুবাবুর স্ত্রী অশিক্ষিতা হ'তে পারেন? মনে নাই কি তাঁর প্রতিজ্ঞা, শিক্ষিতা সুন্দরী নহিলে বিবাহ করিবেন না বলেছিলেন? কথা কার্য্যে পরিণত করেছেন। দিব্য সপ্রতিভ, শান্ত, শিষ্ট, অমায়িক, আমি কিন্তু নব-দম্পতির বিবাহ-বেশে একখানা ফটো লইব।" "ভালই ত কিন্তু স্নেহ, তুমি আমার একটা ফটো লইলে না, এই বড় দুঃখ।" "তোমার ফটো ত অনেক দিন লইয়াছি।" "কবে লইলে?" "বাঃ সেই বিবাহের রাত্রে প্রথম দৃষ্টিতেই? এই আঁখির ক্যামেরা দিয়ে প্রাণের ভিতর তোমার মূর্ত্তি এঁকে নিয়েছি।" স্বামী হাসিয়া বলিলেন—"কথায় ত পারিব না, চিরদিন আমারই হার হয়, আজও হইল। ইহা ত বিচিত্র নহে।"

সোহাগে গলিয়া স্বামীর বাহুবন্ধনের ভিতর নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। প্রাতেঃ উঠিয়াই বসি-বার ঘরে অনুসন্ধান করিলাম ছবিগুলা পাইলাম না। পাঁড়েজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঠাকুর ছবিগুলা কোথায় রাখ্‌লেন?" দাইলের হাঁড়িটায় ঝাঁকানি দিয়া পাঁড়েজি উত্তর করিলেন— "ভাণ্ডার ঘরমে ত রাখ দিয়া জি।" তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দেখি একটা জলচৌকীর উপর তর-কারি পরিপূর্ণ চ্যাঙারি রহিয়াছে, তাহার উপর বাটীর ছবিগুলাও স্থান পাইয়াছে। আমার ত চক্ষুস্থির! আর একটু না দেখিলে বোধ হয় মৎস্য-ভর্জ্জিত কটাহে ইহার স্থান হইত। তাড়া-তাড়ি তুলিয়া দেখি সব রং খানিকটা করিয়া আরসুলায় খাইয়া গিয়াছে। ছবিগুলা খুলিয়া-

মাত্রই দুটা আরসুলার বাচ্ছা আমার লেডিস্থুর ভিতর ঢুকিয়া গেল। চীৎকার শব্দে বলিলাম, দেখুন দেখি ঠাকুর, এত পরিশ্রমের জিনিষগুলা একটু কুড়েমির জন্ম নষ্ট করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"হামি কি করবে মাইজি! বাবুর লুচির ঘি তখন জ্বলিয়া যাতা থা; হামি তুরন্ত সব ছেড়ে চল্ গিয়া। মনে করলো কি পরে বোস্‌বার ঘরে রাখবে। তা হারাণী ভাণ্ডারমে চাবি লাগিয়ে তখন সরকার মশায়কে দিয়ে বাড়ী চলে গইলো; হামার কসুর থোড়াই থা।" পাঁড়েজির আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা দেখিয়া আমার বড়ই রাগ হইল। ছবিগুলা রাগের বশে সেইখানে খণ্ড খণ্ড করিয়া চলিয়া আসিলাম। মনে করিতেছি—আবার দুই চারি খানি আঁকিব। মিসেস্ রায় ও জেঠামহাশয়ের ছোটমেয়ে নলিনী আমার বাড়ীর ছবি এক একখানা চেয়েছেন; নহিলে তত তাড়াতাড়ি ছিল না।

২

প্রত্যহ নিতান্ত-পক্ষে একখানি করিয়া ফটো না তুলিলে বা চিত্রাঙ্কন না করিলে আমি বাঁচিতাম না। কোথাও কিছু না পাইলে, প্রকৃতির ছবি তুলিয়া লইতাম; কিম্বা নাটক-নভেল পড়িয়া যে স্থলের স্বভাব বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী হইত, সেই স্থলের একখানা ছবি আঁকিতে বসিতাম; অথবা মুকুরের সমীপে উপস্থিত থাকিয়া নানা ভঙ্গীতে নিজের ছবি তুলিতাম। সেদিন কোথায়ও কিছু না পাইয়া, বসিবার ঘরের সম্মুখে ভিতর দিকে একটা আরাম চেয়ার লইয়া বসিয়া আছি; নীচের চৌবাচ্চায় লাল মাছ গুলা খেলা করিতেছে—তাহাই দেখিতেছি। আজ সন্ধ্যার সময় ছোট কাকার আসিবার কথা আছে, বেলা অপরাহ্ন হওয়ায় কার্ণিশের টবস্থিত অর্দ্ধস্ফুটন্ত মল্লিকার একটা ডাল নাসিকার নিকট আসিয়া মৃদুমন্দ পবন সঞ্চালনে ইতস্ততঃ দুলিতেছে; মল্লিকার সৌরভে প্রাণটা যেন বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে। এমন সময় হঠাৎ কে ডাকিল—"স্নেহ!" চাহিয়া দেখি, বারান্দার ওধারে আমার পিঞ্জরাবদ্ধ কাকাতুয়াটা টাঙ্গান আছে—তাহার দিকে একটা ফুল ছুড়িয়া বলিলাম—"মণি, ফুল পড়বি?" সে বলিল—"তুই পড়।" মণি আমার সব কথা শিখিয়াছে। আমি বলিলাম—"মণি, কার ফটো তুলি বল্ দেখি?" সে বলিল—"আমার।" আমি হাসিয়া তাড়াতাড়ি ক্যামেরা ইত্যাদি লইয়া আসিলাম। মণিকে নামাইয়া পিঞ্জরটা একটা টুলের উপর রাখিলাম, দুই পার্শ্বে দুইটা ফুলের টব বসাইয়া তাহার ফটো তুলিতে লাগিলাম। অত বড় ব্যাপার দেখিয়া বেচারী ঘাড়টী বাঁকাইয়া নিরীহ ভাল মানুষটীর মত বসিয়া রহিল; একটুও নড়িল না।

এমন সময়ে অদূরে "বল হরি হরি বল" শব্দে চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়া জানালাটা খুলিয়া দেখি—আমাদের বাটীর পাঁচ ছয়খানি ছোট ছোট বাটীর পরে একখানা হলদে রংএর বড় বাড়ী আছে, তাহার সম্মুখে অনেক লোক জমা হয়েছে ও সেই বাড়ীর ভিতর থেকে কান্নার শব্দ আস্‌ছে। বুঝিলাম, সেই বাড়ীর কেহ মারা গিয়াছে, এক্ষণে শব লইয়া যাইবার সময়

উপস্থিত। কি ঝোঁক হইল, ঐ শবদেহের চিত্র লইব। আঁকিয়া লইলেই বেশী চিত্তরঞ্জন ও স্বাভাবিক হইবে; সুতরাং ড্রয়িং বাক্সটা লইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। উহাদের সহিত একটু আধটু পরিচয়ও আছে, আর ছবি তুলিতে আপত্তি কি? সাত পাঁচ ভাবিয়া আমার মণির পিঞ্জরটা টাঙ্গাইয়া কাকা, এলে কোথায় বসাইতে হইবে, কি করিতে হইবে না হইবে কেষ্টাকে সব বলিয়া ড্রয়িং বাক্স লইয়া শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। রিষ্টওযাচটা দেখিলাম, এই সবে পাঁচটা বাজিয়াছে, আষাঢের বেলা, এখনও ঢের সময় আছে, দিন থাকিতে থাকিতেই বোধ হয় কার্য্যশেষ হইবে—ভরসা করা যায়।

ছবি তুলিয়া বাটী ফিরিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারবাবু তখনও ফিরেন নাই; কাকাও আসেন নাই। কোন কারণ বশতঃ হয়ত তিনি আস্‌তে পারেন নাই। তা বলে ডাক্তারবাবুর এত দেরী কেন? আমি ছবি তোলার পর প্রায় আধঘণ্টায় একক্রোশ পথ চলে এসেছি। এমন সুন্দর ছবিটা দেখাইব বলেই না এত তাড়াতাড়ি! গাড়ী আসিবার এখনও নাম নাই? রাগ করিয়া বসিয়া রহিলাম। প্রতিজ্ঞা রহিল আজ কিছুতেই কথা কহিব না।

ক্রমে ৯।১০।১০॥ টা বাজিল। আঃ এখনও কি আসবার সময় হয় না! সেখানে কি ঘর সংসার পাতান হচ্চে নাকি? তা আমার কি। আমি ত কথা কহিব না। দুই হাতে মাথা রাখিয়া বসিয়া বসিয়া এই সব ভাবিতেছি; ঢং ঢং করিয়া ১১টা বাজিয়া গেল। কেষ্টা আসিয়া বলিল,—"দিদিবাবু! বাবু আসিতেছেন।" "তা আমার কি?" হতবুদ্ধি কেষ্টা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। তখন আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ভাবিলাম ওমা কি করিয়াছি, কেষ্টার সাম্নে একি করিলাম! ডাক্তার বাবুর প্রতি ক্রোধের মাত্রা বাড়িল।

ডাক্তার বাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—"ওঃ রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে; এত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বেচারী বোধ হয় বাঁচবে না।" সার্টটা আলনায় রাখিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—"ওঃ আমার এতগুলা কথা তবে বৃথা হইল। স্নেহ!—ও স্নেহ! বসে বসে আবার মানুষ ঘুমায় নাকি? বলি ওগো! ও জ্যোৎস্না!" আমার যদিও ইচ্ছা হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করি, কে গা! কা'র অসুখ করেছে? কিন্তু তখনি প্রতিজ্ঞা মনে পড়াতে চুপ করে বসে রইলাম। আবার ডাকিলেন, "জ্যোতি কথা কবে না?". এবার থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, "কেন? যেখানে ছিলে সেখানে যাওনা।" "ওঃ রাগ হয়েছে! কি করি বল? হারু মিত্তিরের ছোট ছেলে নরেনের কলেরা হয়েছে, রাত কাটে কি না, তাই এত দেরী হল, উপস্থিত একটু সুস্থ করে এসেছি।" সস্নেহে চিবুকে হাত দিয়ে বলিলেন,—"ছি, রাগ করতে আছে কি?" আমি সেই চোখ নীচু করে বসে আছি, যেন কিছু শুন্‌তেই পাচ্চি না। এবার ঈষৎ হাস্যের সহিত করপুটে ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"মহারাণি!

কসুর মাফ্ করুন, অথবা শাস্তি দিউন, দাস হাজির আছে।” এবার আমারও হাস্য ওষ্ঠ ছাড়াইয়া মুখের চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া পড়িল। স্বামীর আদরের আদরিণী, অভিমানিনী আমি—সোহাগে গলিয়া স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া গেঞ্জির বোতামটা খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলাম,—“দেখ দেখি, তোমার জন্য আজ কেষ্টার সাম্নে অপ্রস্তুত হয়েছি। আচ্ছা তোমার কসুর মাফ্ করিলাম, কিন্তু ঐ ছেলেটীকে তোমায় বাঁচিয়ে দিতে হবে নইলে অন্ধকার শাস্তি অর্দ্ধদিন পাইবে। এখন দেখ দেখি, আমি কেমন ছবি এঁকেছি। টেবিলের উপর থেকে সেই ছবিটা তুলিয়া তার হাতে দিলাম। তিনি কৌতুহলপূর্ণ নেত্রে ছবিখানির চতুর্দ্দিক দেখিয়া বলিলেন, -“তাইত, এ যে মৃতের চিত্র দেখিতেছি! লোকটা কে বল দেখি? যেন চেনা চেনা মনে হচ্চে।”

সেই যে গো, সেই ছাদের দিক্কার খড়-খড়ি তুলে আমার দিকে চেয়ে থাক্ত? ঐ সোণার বেণেদের ছেলে? জ্বর-বিকারে আজ দুপুর বেলায় মারা গেছে। আমি কিছু আঁকতে না পেরে শেষে শ্মশানের ছবি তুলে এনেছি।” “চমৎকার হয়েছে, ইহার চারিদিকে যেন একটা করুণ ভাব ফুটে উঠেছে, চিত্রখানির ভাব বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।” আহারাদির পর ছবি-খানা ও ড্রয়িং বাক্সটা একটা কাচের বাক্সের মধ্যে রাখিয়া শয়ন করিতে গেলাম।

স্বপ্ন দেখিলাম,—সেই যে শবদেহের ছবি লইয়াছিলাম, তাহার প্রেতাত্মা আসিয়া আমার শিয়রদেশে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—“স্নেহলতা! আমাকে তুমি বড় কষ্ট দিয়াছ, অন্য কেহ হইলে তাহাকে আমি যোগ্য শাস্তি দিতাম কিন্তু তুমি যে সেই,—তুমি যে আমার শত আদরের চিরবাঞ্ছিত স্নেহ; তোমার কাছে আসিতে পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এমনি অনুগ্রহ যেন চিরদিন থাকে। যত্ন করে এনে যেন পায়ে ঠেলিও না। তুমিও আমায় ভাল বাসিতে, আহা জীবিতাবস্থায় যদি জানিতাম! তোমার জন্যই আমি প্রাণে দারুণ অতৃপ্তি লইয়া মরিয়াছি, এবং তোমার জন্যই আমার আত্মা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্নেহ! তোমার রঙের তুলির মুখ জড়িয়ে আমি এসেছি। সেই ছবিখানাতেই আমার প্রেতাত্মা অবস্থান করছিল, সেখানাকে বাক্সে রাখিয়া বড়ই অন্যায় করেছিলে! যাহা হউক, বাক্সের কাচ ভাঙ্গিয়া আমি বাহির হইয়াছি। তোমার চিত্রখানা আমি টেবিলের উপর রাখিয়া আসিয়াছি। তুমি যেন রাগ করিও না। তোমার সাধের বাক্সটা না ভাঙ্গিলে বড় কষ্ট হ'ত বলেই ভেঙ্গেছি। তুমি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না; কেবল ছায়ার ন্যায় তোমার অনুসরণ করিব। তোমার সঙ্গলাভে আমি স্বর্গ লাভেরও অধিক সুখ পাইয়াছি। ওঃ কি আনন্দ! স্নেহ! স্নেহ! আমি হাসি চাপ্তে পারছি না।” বলিয়া সে যেন হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখি যে, প্রভাত হইয়া গিয়াছে, বাল-সূর্য্যকিরণ জানালা দিয়া শয্যায় আসিয়া পড়িয়াছে।

পার্শ্বে স্বামী নাই। বুঝিলাম, তিনি নিশ্চয়ই কলে গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি বসিবার ঘরে আসিয়া দেখি, সত্য সত্যই কাচের বাক্সটা ভাঙ্গা, ছবিটা টেবিলে রহিয়াছে। একি হইল. স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয়? তাইত এ তবে কে করলে! দাস-দাসী সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তিরস্কার করিলাম, কিন্তু কেহই স্বীকৃত হইল না। ভাবিলাম—হয়ত আমিই ভুলিয়া ছবিখানা টেবিলে রাখিয়াছিলাম; এবং ইন্দুর লাফাইয়া হয়ত বাক্সটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি ভূতের ভয় মোটেই করিতাম না। কিন্তু সেই অবধি গাটা কেমন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। ডাক্তার বাবু আসিবামাত্রই বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"তাইত! তা এতদেশ থাকতে শ্মশানের ছবির উপরই বা কেন এত ঝোঁক হইল? এখন ভূতের ঠেলা সামলাও।" আমি হাসিয়া বলিলাম,—"হাঁ ভূত নাকি! আমাদেরই ত পঞ্চভূতের দেহ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই কয়টী ভূত আমাদের দেহে নিত্য বিরাজমান। ভূতের ভয় আমি করি না। তবে ঘটনাটা কিছু আশ্চর্য্য রকমের বটে।"

সেই দিনই সে ছবিখানা কাচ দ্বারা বাঁধাইয়া আমার শয়ন কক্ষের দেয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিলাম।

আশ্চর্য্য! সেদিন যতগুলি ছবি আঁকিলাম, সবগুলিতেই সেই পূর্ব্ব দিনের শ্মশানের ছবি উঠিল। ভাবিলাম একি হইল! ঠিক হইয়াছে, আমার মনে সর্ব্বদাই সেই শ্মশানের ছবির কথা জাগিতেছে, হয়ত তন্ময়ভাবে তাহার চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়াছি। একখানি, দুইখানি, তিন খানি এইরূপ হওয়ার পর সেদিন আর ছবি আঁকা হইল না। একটা আতঙ্ক আমার চতুর্দ্দিকে যেন বেষ্টন করিয়া রহিল।

(৪)

দিন কতকের মধ্যে আমি যেন উন্মাদ হইয়া গেলাম। সহস্র ডাকের পর একটা উত্তর দিই, কেমন যেন হাবা কালার মতন। সকলেই আশ্চর্য্য, স্বামী চিন্তাকুল! আর আমার মনে হয় যেন রাত্রদিন আমার সঙ্গে কে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রত্যেক হস্তাঙ্কিত চিত্র ও ফটোর মধ্যেই সেই শ্মশানে শায়িত শবদেহ! ওহো! একি হইল! কি কুক্ষণে আমি শ্মশানের ছবি লইতে গেলাম! আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে, সেই মূর্ত্তি যেন আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়! স্বামী ডাক্তারি পুস্তকখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন, যদি কোন শ্রেণীর রোগের মধ্যে ইহা গণ্য হয়। আমায় খুব ঠাণ্ডা করিবার বন্দোবস্ত হইল। তথাপি আমার ছবি তোলার ঝোঁক বন্ধ হইল না। ডাক্তার বাবু বলিলেন, -"যাহা লইয়া মন ভাল থাকে তাহাই করুক।" তাঁহার ধারণা আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

যত দিন যায় তত মনে হয়, ঐ কে আমায় ডাকছে! হাঁ ঐ যে সেই প্রথম রাত্রের স্বপ্নের স্বর, ঐ বলছে,—"স্নেহ এস না! আমরা প্রেতলোকে যাই, তথায় উভয়ে সুখে থাকিব।" ওহো, আমার সে ভরসা কোথায় গেল! আমি এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছি যে, আর উঠিতে পারি না। শয্যায় পড়িয়াই থাকিতাম।" ডাক্তার

বাবুর কলে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। তিনি অহোরাত্র কাতর নয়নে আমার পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁর সে সময়কার করুণ মুখখানি এখনও আমার মনে পড়ে।

যাহা হউক, ক্রমে মা, আশা, দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা কাঁদিয়া বলিলেন,—"ওঝার দ্বারায় ভূত ঝাড়াইয়া দাও।" সকলে হাসিয়া তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলেন। ভূতে পায় নাই, মাথা গরম হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

আমার বেশ মনে আছে, সেদিন মা পাঁচটী মুদ্রা আমার কপালে ছোঁয়াইয়া তুলিয়া রাখিলেন, ভাল হইলে হরির লুঠ দিবেন বলিয়া। ছোট বোন্ আশা নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল,—"ও টাকা কি হইবে মা ?" "তোমার দিদি ভাল হইলে হরির লুঠ দেব।" "তার চেয়ে কেন—দিদি ভাল হ'লে গরীব-দুঃখীকে ঐ টাকা দান করিও না ! তাহা হইলেই ত হরিকে দেওয়া হইবে।" "বকিসনে বাপু, গরীবকে দিলে হরিকে দেওয়া হবে ! কথা শোন একবার ! হে হরি ! স্নেহকে আমার ভাল ক'রে দাও, আমি তোমায় পাঁচ টাকার লুট দেব।" আশা হাসিয়া বলিল,—"বিশ্বনিয়ন্তা হরি ঘুষখোর ! আহা যে এই জগৎ-সংসারটা সৃষ্টি করেছে, তার ঘরে আজ বুঝি খাবার কিছু নেই, তাই দিদিকে ভাল করে মার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে চাল ডাল কিন্‌লে তবু দিন কতক চলবে।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে বাহির হইয়া গেল। মা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"আজ কালকার সব মেয়েগুলোই জ্যাঠা হয়ে পড়েছে। আমাদের কথা, কিম্বা শাস্তর নিয়ম আর থাকবে না। ঘোর কলি, ঘোর কলি ! বলিতে বলিতে তিনি টাকা কটা বাক্সে উঠাইয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

দাদা আমার পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন,—"ওরে স্নেহ ; আমি যে বিয়ে করব সেরে টেরে নে, কলিকাতায় যাবিনে ?" আমি বলিলাম,—মিথ্যা কথা। ঐ দেখ ঐ আমায় প্রেতলোক থেকে নিতে এসেছে।" বলিয়াই অজ্ঞান হইয়া গেলাম। এসকল কথা ভাল হইয়া কতক মার কাছে, কতক স্বামীর কাছে শুনিয়াছিলাম।

সেই শ্মশানের ছবি খানা আমার শয়ন কক্ষে ঠিক শয্যার সম্মুখেই টাঙ্গান ছিল। একদিন ক্রোধের বশে উত্তেজিত হইয়া হাতের একগাছা চুড়ি ছুঁড়িয়া তাহার কাচ খানা ভাঙ্গিয়া ফেলি। তাহার পরই শুনি—"উঃ ! আমায় বড় লেগেছে স্নেহ, আর রাগ করো না, শীঘ্রই তোমায় আমার সঙ্গে নে যাব।" আবার সেই বিকট হাসি ! ওঃ কি জ্বালায় পড়লুম ! !

স্বামী পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন,—"চল স্নেহ, আমরা এ বাড়ী ছেড়ে কলিকাতায় যাই।" সেই দিন সন্ধ্যার সময় দাদা ঐ ছবিখানা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। সেই সময় একটা অস্পষ্ট ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া আমি অজ্ঞান হইয়াছিলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি—আমি কলিকাতার বাটীতে শয়ন করিয়া আছি।

বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়াই হউক, আর সেই ছবি খানা ছিঁড়িয়া ফেলার দরুণই হউক, ক্রমে আমি ভাল হইয়া গেলাম। কিন্তু সময় সময় গাটা কেমন ছম্ ছম্ করিত।

হাঁ, বলিতে ভুলিয়াছি, সেই অবধি আর একটা মহা অসুবিধা হ'য়েছিল। দাদা আমার ক্যামেরাটা একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। আর মা দিবিব দিয়াছিলেন, —আর যেন আমি ছবি না আঁকি। হায় আমার এত সাধের ছবি তোলা! কেন মরিতে শ্মশানের ছবি তুলিতে গেলাম! কিন্তু সেই অবধি আমি ভূতকে খুব বিশ্বাস করি।

শ্রীমতী প্রমীলাবালা মিত্র।

জগন্নাথ।

(প্রার্থনা)

জ-য় হে জগন্নাথ জগদীশ হরি
অ-নুগত দীন প্রণত পদে তোমারি,
হে-র কৃপা-নেত্রে দীনে, দীন-দুঃখহারী ;
জ-প-তপহীন দীন যাচে পদ-তরী ॥
গ-তি-মুক্তি তুমি হে অনাথ নাথ হরি,
ত-রাও নফরে, রাখ পদে কৃপা করি ;
না-রায়ণ বার দীন দুঃখ-বিভাবরী
থ-র থর ভীত দাস দুঃখ-অমা হেরি ॥
জ-নার্দ্দন জগতজীবন জনত্রাণকারী
গ-তিহীনে দাও হে গতি দুঃখ নিবারি,
দী-ননাথ পাতিতপাবন হে মুরারী
শ-ত দোষ ভ্রম মম ক্ষম' দয়া করি
দুঃখ নাশ মোহ পাশ দিয়ে পদতরি,
শরণাগত এ দাস শ্রীপদে তোমারি ॥

শ্রীমিহিরজ্যোতি দাস।

"পাগল মানুষের" চিত্র।

(গীতিকা)

পাগল মানুষ কি করে ?
ও ভাই, দেখ না, দেখ না, ওই রে দেখ না,
মোদের পাগল মানুষ কি করে ?
শুধু চ'খের দেখা দেখলে হবে না,—
হবে নেহারিতে ভাল ক'রে।
আন-চিন্তা কভু নাহি দেখি তার,
গৌর প্রেম-সাগরে দিতেছে সাঁতার,
শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়াছে সার,
সদা গোরা পদ ভাবে অন্তরে।
কর্ম্মের অতীত হ'যেছে পাগল।
ভক্তে দন্ত দানে সন্তুষ্ট কেবল,
দুর্জ্জনের সঙ্গ ত্যজিয়া অচল,
বিরাজে গম্ভীরা ভিতরে।
কি বিশ্বাস তার আত্ম সমর্পণ!
"যা করেন গোরা" এ ভাবে মগন,
এ সংসারে আর নাহি তার মন,
আছে বিরহ-ব্যাকুল-ভাব ভরে।
পাগল, পত্নী পুত্র ত্যাগী নহে ত সন্ন্যাসী,
মুক্ত বৈরাগ্যের সুচিত্র প্রকাশি,
মায়ার প্রভাব, প্রেমেতে বিনাশি
ধরে অনাশক্তির ভাব অন্তরে।
পাগল, কোথাও না যায়, কিছু নাহি চায়,
তার, প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়,
পামরে তারিতে তবু কথা কয়,
নহে নিজোদ্দেশ্য সাধন তরে।
অকপট প্রেমের পাগল পক্ষপাতী,
"এই মহাভাবেতে আছে সদা মাতি'
প্রেমের জগতে বিনিময়ের ভাব—

পাগল দেখিতে কভু না পারে।
অপরাধ শূন্য নাম সংকীর্ত্তন,
আগে চাই তবে রস আস্বাদন,
অধিকার ভেদে শিক্ষা প্রকটন,—
পাগল সচেষ্ট এ সত্য প্রচারে।
না হ'লে পতিত গোরা নাহি মিলে,
পুণ্যবান চায় ঐশ্বর্য্য সকলে,
বিশ্বম্ভর গোরা রাজ্য প্রেম ভরা,
ঐশ্বর্য্যের গন্ধ রয় দূরে।
এ ঐশ্বর্য্য নাই পাগলের কাছে,
মাধুর্য্য লইতে পাগল যে যাবে,
ব্রজ রস সার, বাসনা যাহার,—
আসুক্ সে অনুরাগ ভরে।
রাধা ভাবে পাগল সদা গর গর,
নিবৃত্তির মার্গে পূর্ণ অগ্রসর,
অনুগত জন বুঝতে পারে।
পাগলে পরীক্ষা করিতে বাসনা ?
ঐশ্বর্য্য বিভবে পরীক্ষা ক'র না ;
প্রেমের এ হাটে প্রেমেরি সাধনা,
ক'র না, কুতর্ক সিদ্ধের ঘরে।
ইন্দ্রিয় সুখেতে মহামত্ত জন,
অতীন্দ্রিয়-সুখ বুঝিবে কেমন ?
পাগল মানুষের লইলে শরণ,—
স্মরণ হয় গৌরাঙ্গ সুন্দরে।*

শ্রীরসিকলাল দে।

* এই "পাগল মানুষ" এক অসাধারণ গৌর ভক্ত ; তাঁহার উপাদেয় "ভক্ত-কথামৃত" ক্রমে ক্রমে "আলোচনায়", আলোচিত হইবে। লেখক।

মিনতি।

চাহে মন যাঁরে সতত আমার,
পাইনাত তাঁরে খুজিয়ে ;
জানি না আমি এ ভুবন মাঝার,
কোথা তিনি এবে লুকিয়ে।
যাঁহার আদেশে আকাশের গায়,
রবি, শশী, তারা প্রকাশিত হয়,
যাঁহার আদেশে মৃদুল পবন
ধীরে ধীরে ধীরে বহে অনুক্ষণ ;
মহিমা যাঁহার অপার অসীম
রয়েছে ভুবন ভরিয়ে,
চাহে মন যাঁরে সতত আমার,
পাইনাত তাঁরে খুজিয়ে।
নিরাশা আঁধার এসে সবে মোরে,
করে দেয় দিশাহারা,
মিনতি আমার পাই যেন তাঁ'র,
অপার করুণা ধারা।
যাঁহার কৃপায় ভোজবাজী প্রায়,
আসে জীব ভবে পুনঃ চলে যায়,
ঋষিগণ যাঁর কৃপার আশায়,
যুগ যুগান্তর ধ্যানে ব'সে রয় ;
নিশি দিন তাঁরে পাইবার তরে,
ভেবে ভেবে হই সারা ;
নিরাশার আঁধার তখন মোরে,
ক্রোরে দেয় দিশাহারা।

শ্রীকামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য।

শেষ।

(১)

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, বড় সুন্দর, বড় পরিষ্কার। সেই পরিষ্কার রাত্রিতে ভাগীরথীতীরস্থ বিশাল বটমূলে লাবণ্যের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া হেম-শায়িতা। বায়ু চালিত বটপত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথে জ্যোৎস্না আসিয়া শায়িতা সুন্দরীর অঙ্গে টিপ দিয়া যাইতেছে। সম্মুখে বিপুল প্রসারিতা ভাগীরথী দুলিয়া দুলিয়া সজ্যোৎস্না তরঙ্গ-রাশি-সহ ক্রীড়া করিতেছিল। সবই সুন্দর,—কেবল আকাশ-প্রান্তে একখানি কালো মেঘ জ্যোৎস্না-সমুদ্রে ডুবদৃষ্ট তরণীবৎ ধীরে ধীরে ভাসিতেছিল। লাবণ্য কহিল – "অসুখ কি বড় বেশী ?" হেম মৃদুস্বরে উত্তর দিল—"না, মাথার যন্ত্রণা ; অন্য অসুখ কিছুই নাই।

লাবণ্য। একটু ঘুমাও, ঘুমাইলে সব সারিবে।

হেম। সব সারিবে ? না লাবণ্য, সব সারিবে না, দেহের যাতনা ঘুমাইলে কমিতে পারে। মনের যাতনা কমে কি ? রাত্রি যাইবে, আবার দিন আসিবে, এ ঘুমের পর আবার জাগিতে হইবে। বুঝি সেই এক ঘুম আসিলে সব সারিবে।

লাবণ্য। তাহারও বেশী দেরী নাই, শীঘ্রই ভগবান্ তোমার যাতনার অবসান করিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে লাবণ্যের চক্ষু জলে ভাসিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া হেম একটু বিস্মিত হইল। হেম কহিল—"কাঁদিস্ কেন ? আমি ত এখনও মরি নাই, তুই এখন কাঁদিলে আমি কোথায় যাইব ?" লাবণ্য চক্ষু মুছিল। হেম—মুখে অস্পষ্ট যন্ত্রণা ব্যক্ত করিয়া পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। অনন্তর সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, জ্যোৎস্না-পুলোকিতা প্রসারিতা-বক্ষা ভাগীরথী মৃদু-পবনে লহরী-চঞ্চলা, তাহার উর্দ্ধে কিরণ প্রভাসিত নীল-নভ স্থির অচঞ্চল ও সুমহান্ অথচ উভয়েই এক অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ,লাবণ্যও প্রশান্ত-দৃষ্টিতে আকাশে চাহিয়া দেখিল —এমন সুন্দর জ্যোৎস্না, তার নীচে এমন সুন্দর, বিস্তৃতা ভাগীরথী দুই-ই সুন্দর, দুই দূর-বিস্তৃত, দু-ই মহান্ সৌন্দর্য্য-গম্ভীর। যিনি এমন আকাশ, আকাশে এরূপ জ্যোৎস্না এবং জ্যোৎস্না-তলে এমন তরঙ্গ-কম্পিত ভাগীরথী গড়েন, তিনি মানুষকে এত পাপী করিয়া গড়েন কেন ? অথবা এ সংসারে যিনি পাপী গড়েন, পুণ্যবানকে তিনি গড়েন না। ভাবিল—যিনি আলো গড়িয়া সুখী হন, তিনি আঁধার গড়িবেন কি সুখে ? ধীরে ধীরে হেমের ললাটে হস্তার্পণ করিয়া লাবণ্য কহিল—অতীতের স্মৃতি মনে করিয়া সুখ কি বোন্ ? হেম ! দেখ, দেখ ঐ গঙ্গা-তরঙ্গ কত চঞ্চল, তবু তার বুকে জ্যোৎস্না মাখিয়া যাইতেছে। তরঙ্গের—জ্যোৎস্নায় লাভ কি ?

লাবণ্য। কিছু না।

হেম। কিছু আছে বৈ কি ? জ্যোৎস্না মাখিয়া তরঙ্গ সোণার হাসি হাসে, অতীতের সুখ-স্মৃতি স্মরিয়া মানুষ অতি দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করে। সুখ-স্মৃতি জ্যোৎস্না—যার বুকে পড়ে, তাকে সুন্দর করিয়া তুলে, প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে স্বর্ণ-রঞ্জিত করিয়া তুলে। দুঃখীর ঐ এক সুখ।

লাবণ্য। বুঝিয়াছি বোন্, তুমি এখন কল্পনায় সুখী হ'তে চাও।

হেম। নইলে এতদিন মরিয়া যাইতাম।

লাবণ্য। এরূপ বাঁচিয়া থাকাও মৃত্যুতুল্য। একবার যদি এই জ্যোৎস্নালোকে ভাগীরথী-গর্ভে নিজের আকৃতিখানি দেখ বোন্, বুঝিবে—কি ছিলে কি হইয়াছ; দেখিবে—গৃহলক্ষ্মী কেমন করিয়া শ্মশানশায়িনী হইতে বসিয়াছ।

হেম। আজি নয় কালি নয়—যদি কখনও দেখা পাই, সেদিন দেখিব নইলে এ জন্মে আর দর্পণে মুখ দেখা হইল না। আবার হেম কাঁদিল, সেই সঙ্গে লাবণ্যও কাঁদিল, লাবণ্য মাথার দিব্য দিয়া কহিল, আর কাঁদিও না, একটু ঘুমাও। হেম ধীরে ধীরে নয়ন মুদিল, কি জানি কেন সেই মুদিত নেত্র বহিয়া দুইটী অশ্রু-রেখা অঙ্কিত হইল। সেই উষ্ণ অশ্রু লাবণ্যের জানু স্পর্শ করিল। লাবণ্য বুঝিল,—হেম কাঁদিতেছে, সে বলিল—"আবার কাঁদিতেছ?" রুদ্ধকণ্ঠে হেম উত্তর দিল,—"যদি একবার দেখা পাইতাম—এ মরণকালেও ধন্য হইতাম।" অকস্মাৎ লাবণ্য আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, আকাশের একপ্রান্তে একখণ্ড কালো-মেঘ জুড়িয়া গিয়াছে; তাহা দেখিয়া লাবণ্যের প্রাণ উড়িয়া গেল। হেম তখন একমনে বিপদবারণ সর্ব্ববিঘ্ননাশনকে ডাকিতে লাগিল। মেঘ ক্রমে আকাশ জুড়িয়া সমস্ত জ্যোৎস্না ঢাকিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে মেঘে পৃথিবী আঁধার হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে অল্প বাতাস বহিল। এমত সময় হেম প্রবল যন্ত্রণায় কাতরধ্বনি করিল। লাবণ্য ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল, সহসা প্রবল জ্বরে হেমকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। হেমের আর সংজ্ঞা নাই। আকাশে মেঘ বিদ্যুৎস্ফুরণ করিতে লাগিল। এখনি বৃষ্টি আসিবে, নিরাশ্রয়া ব্যাধি-পীড়িতা হেমের উপায় কি হইবে, নিকটে কোন লোকালয় নাই বা কোন প্রকারে ঝড়-জলের হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপযোগী স্থানও নাই। হতাশে, ক্ষোভে, দুঃখে লাবণ্য চীৎকার করিল—"নারায়ণ! দীনবন্ধু! বিপদের কাণ্ডারী! অভাগিনী হেমের কপালে কি এই শেষে লিখিয়া ছিলে! রাজেশ্বরীকে দীনা-অনাথিনীর মত স্বজন সহায়হীন অবস্থায় তরুমূলে প্রাণত্যাগ করিতে আনিয়াছ। রক্ষা কর প্রভু! হেমের কোন পাপ নাই, নিষ্কলঙ্ক সুবর্ণপ্রতিমা অকালে ডুবাইও না।" সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠিল। সেই সঙ্গে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল কিন্তু ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া সে জলধারা ভূতল স্পর্শ করিল না। এমন সময় আর্ত করুণ-স্বরে কে কহিল—"ভয় কি মা, নারায়ণ চিরদিন অনাথের বন্ধু, তিনি অনাথাকে পরিত্যাগ করিবেন না।" এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। সেই মুহূর্ত্তস্থায়ী আলোকে লাবণ্য দেখিতে পাইল,—তাহাদের সম্মুখে একজন শুভ্র শ্মশ্রু-মণ্ডিত শুভ্রকান্তি দেবপুরুষ। লাবণ্য কাতরে কহিল—"রক্ষা করুন, পতি-বিরহিনী অভাগিনীকে রক্ষা করুন।" শুভ্রকান্তি পুরুষ কহিলেন—"বল মা, জয় দয়াময়, জয় নারায়ণ! চল মা, নিকটেই আমার কুটীর।" লাবণ্য উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিল,—"জয় দয়াময়!" প্রবল বায়ুবেগে সেই স্বর দূরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। "জয়

দয়াময়!" হেমের সংজ্ঞা নাই। মহাপুরুষ উভয় হস্তে লঘুভার দেহখানিকে বুকের মধ্যে রক্ষা করিয়া স্বীয় গন্তব্যপথে চলিলেন। পশ্চাতে অন্ধকারে লাবণ্যও তদনুবর্ত্তিনী হইল।

(২)

হালীসহরের নিকটবর্ত্তী শঙ্করপুর নামে একখানি গ্রাম আছে। সেখানে নরেশচন্দ্র বসু নামে এক সমৃদ্ধিশালী ধনী জমিদার আছেন। গ্রামে তাঁহার মান-সম্ভ্রম প্রতিপত্তি যথেষ্ট। নরেশবাবুর একমাত্র পুত্র অজিৎকুমার হুগলী কলেজে ৩য় বার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া আপাততঃ সরস্বতীকে বিদায় দিয়া বাড়ী বসিয়া আছেন। নরেশবাবুর স্ত্রী কল্যাণীর ইচ্ছা—পুত্রের বিবাহ দিয়া একটী রাঙ্গা টুকটুকে বউ ঘরে আনেন। কিন্তু পুত্র আদৌ বিবাহ করিতে চায় না। কল্যাণী অনেক করিয়া বুঝাইয়া পুত্রকে বিবাহে রাজী করিলেন এবং নরেশবাবুকে মেয়ের সন্ধান করিতে বলিলেন। নরেশ স্ত্রীর অনুরোধে মেয়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু সন্ধানের পর একটী পাত্রী পাইলেন। পাত্রীটী দেখিতে, ঠিক গোলাপফুলের মত, তাহার এক বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত আর কেহ বর্ত্তমান ছিল না। নরেশবাবু এই পাত্রীটী মনোনীত করিয়া বিবাহের সব ঠিক করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অজিতের সহিত হেমনলিনীর বিবাহ হইয়া গেল। কল্যাণী একটী রাঙ্গা বউ ঘরে আনিলেন।

বিবাহের পর কিছু দিনের মধ্যে নরেশ বাবু ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। হেমনলিনীর মাও মেয়েকে সৎপাত্রে দান করিয়া গঙ্গাস্থ হইলেন। সব চলিয়া গেল, অজিৎ এখন পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তিনি সমস্ত কার্য্য নিজে তত্ত্বাবধান করেন, দিন গুলি বেশ সুখে কাটিতে লাগিল।

কিন্তু নির্ম্মল গগনে সহসা মেঘের সঞ্চার হইল, অজিৎএর সুখ-সূর্য্য চিরকালের মত অস্তমিত হইল। সম্পত্তি পাইবার কিছুকাল পরেই তাঁহার কতকগুলি ইয়ার জুটিয়াছিল। তাহাদের সহিত মিশিয়া তিনি ক্রমে অধঃপতনের প্রশস্ত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই ইয়ারের মধ্যে ললিতই প্রধান, ললিতের সহিত অজিৎএর খুব ভাব, ললিতের স্ত্রী লাবণ্যও সর্ব্বদা হেমনলিনীর কাছে থাকে, দুজনে খুব ভালবাসা।

অজিৎবাবু এখন আর প্রায়ই গৃহে আসেন না। সব সময়ই বাহিরে থাকেন, কাজকর্ম্মও কিছু দেখেন না। একমাত্র দেওয়ান রাজীববাবুর কার্য্যদক্ষতা গুণে বিষয়-আশয় এতদিন আছে। নচেৎ থাকিত না কিন্তু তাও আর থাকে না, প্রায় যায় যায় হইয়াছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় অজিৎবাবু দেওয়ানকে বলিলেন—"আপনি বিষয়-সম্পত্তি একটু ভালভাবে দেখিবেন। আমাকে বিশেষ কার্য্যের জন্য একটু দুরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইবে; তথা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইবে।" আর কিছু বলিলেন না। রাজীব বাবু কিছু বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই অজিৎ বাবু বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। পত্নী হেমনলিনীর সহিত পর্য্যন্ত একবার দেখা করিলেন না।

অজিৎ বাবু দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া

রাস্তায় আসিয়া ললিতের সহিত মিলিত হইলেন এবং গল্প করিতে করিতে চলিলেন।

অজিতের বাটী হইতে যাওয়ার পর প্রায় বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, অথচ অজিতের দেখা নাই বা কোন সংবাদ নাই। হেম এখন দিন-রাত কেবল চিন্তা করে; ভাবিতে ভাবিতে তাহার দেহলতা দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিল, রূপের জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া আসিল। অবশেষে আর ভাবিতে না পারিয়া নিজেই লাবণ্যের সহিত কাহাকেও না বলিয়া একদিন রাত্রিশেষে অজিতের সন্ধানে বহির্গত হইয়াছে।

(৪)

সন্ন্যাসী রমণীদ্বয়কে লইয়া নিজের কুটীরে আনিলেন এবং তৃণ-শয্যায় হেমকে শায়িত রাখিয়া একটা ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন, লাবণ্যকেও কিঞ্চিৎ দুগ্ধ খাইতে দিলেন। ঔষধ খাইয়া হেম বেশ সুস্থবোধ করিল, তখন সন্ন্যাসী বলিলেন—"মা, আমি তো বলিয়াছি। নারায়ণ রক্ষা করিবেন। আপনারা কে আমি জানি। ঘরের লক্ষ্মী হইয়া কেন গৃহের বাহির হইয়াছেন, তাহাও জানি।" লাবণ্য বলিল—"ঠাকুর, যদি জানেন—তবে দয়া করিয়া ইহার একটী উপায় করুন; এরূপভাবে এ অভাগিনী আর কতদিন বাঁচিবে?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমি ইহার উপায় করিতেছি, আপনারা এখানে থাকুন, আমি আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি একটী ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। হেম আবার অব্যক্ত যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই সন্ন্যাসী দুইজন হীনাবেশ যুবকের সহিত গৃহে আসিলেন। লাবণ্য উভয়কে চিনিল। সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তোমাদের দুর্ব্যবহারে আজ দুইটী কুসুম অকালে ঝরিয়া যাইতে বসিয়াছে।" অজিৎ তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া হেমের নিকট গেলেন এবং লাবণ্যের কোল হইতে মাথা নিজের কোলে লইলেন।

দুই তিন ডাকের পর হেম চক্ষু উন্মীলন করিয়া, পার্শ্বে আপন ইষ্টদেবকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য তাঁহার মুখ-মণ্ডলে প্রতিভাত হইল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—"হরি হে দয়াময়, তবুও একবার মৃত্যু-সময়ে দেখা পাইলাম। এতদিন পরে বুঝি মনে পড়িল, দাও পদধূলি, আমার মাথায় দাও আমার শরীর পবিত্র হোক্। তোমাকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ বাঁচিয়া আছি। লাবণ্য যাই, স্বামিন্! এই লাবণ্যকে—" আর বলিতে পারিল না, মুহূর্ত্তমধ্যে সব ফুরাইল। অজিৎ একেবারে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিল। লাবণ্য চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন—"মা, আর কাঁদিয়া কি হইবে?" [illegible] অজিৎ ধীরে ধীরে বলিলেন—"হেম! [illegible] এই শোক-সাগরে ভাসাইয়া তুমি কোথায় গেলে?" পরে অজিৎ সেই কনক-প্রতিমা হেমের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া ভাগীরথী-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য-হৃদয়ে কুটীরে ফিরিলেন। তৎপর দেশে গিয়া আপনার সমস্ত সম্পত্তি ললিতকে দিয়া, সেই সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন; এবং যেস্থানে তাহার প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমার প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছিল, তথায় একটী মন্দির

নির্ম্মাণ করিয়া, সেই মন্দির-গাত্রে স্বর্ণাক্ষরে বড় করিয়া "শেষ" এই কথাটী লিখিয়া দিলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

সাধন সঙ্গীত।

আমি ভাবি তাই মুমূর্ষু সময়ে নেত্র কর্ণ
জ্ঞান কেহই ত রবেনা।
থাকিবে তখন প্রাণের সহিত মন, মনপ্রাণে
তোমায় ডাকব শবাসনা॥
দৈবের ছলনে হারায়ে চৈতন্য,
ভাবিতাম দেহে একপ্রাণ ভিন্ন,
মনপ্রাণ কর্ণ, নিত্য ক্রিয়াশূন্য,
নিশ্বাস উচ্ছাস মাত্র প্রাণের সম্ভাবনা॥
শ্বাসোচ্ছ্বাস হংস মন্ত্র সুদীক্ষিত,
দিবারাত্রি একুশ হাজার ছয় শত,
জপে রত তাহে হয়ে অধিষ্ঠিত,
কর মা নাশন ভবের যন্ত্রণা॥
করুণা প্রকাশি ত্যজি মূলাধারে,
হংসীরূপে আসি বসি সহস্রারে,
নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান কর মা আমারে,
দ্বিজ তারিণীর এই শেষ প্রার্থনা॥

শ্রীতারিণীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের উচ্চ সম্মান লাভ।

পাশ্চাত্য-দেশ হইতে প্রশংসার ছাপ না পরিলে, গুণ থাকিলেও এদেশে প্রতিভাবান ব্যক্তির সমাদর লাভ হয় না। মনীষি বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের নামের সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও অনেক নাম সংযোগ করিয়া আমাদের উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জগতে ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্,ডি, মহোদয় পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-সমাজ হইতে উচ্চ সম্মান ও খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বিদেশে তাঁহার এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মূলান্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমজাত ও অনুসন্ধান-প্রসূত দেশীয় গাছ-গাছড়া হইতে কয়েকটী নূতন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আবিষ্কার এবং তাঁহার সুচিন্তিত মৌখিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী। এই ঔষধ আবিষ্কারের জন্য ডাক্তার ঘোষকে কিরূপ প্রাণপাত শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বহুবার পরীক্ষা করিবার পর কিরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস কয়জন অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া থাকে?

ডাক্তার শরৎচন্দ্র ঘোষ, এম্, ডি, আমেরিকান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ হোমিওপ্যাথির এক জন করেস্পণ্ডিং মেম্বর বা প্রবন্ধ-লেখক সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। হোমিওপ্যাথিক জগতে আমেরিকান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ হোমিওপ্যাথি শ্রেষ্ঠতম পরিষৎ; ডাক্তার শরৎচন্দ্র ঘোষ স্বীয় পাণ্ডিত্য-গুণে এই পরিষদের করেস্পণ্ডিং মেম্বর-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষ বিদ্বান্ এবং সুযোগ্য বিচক্ষণ চিকিৎসক; তাঁহার মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। তাঁহার আবিষ্কৃত তিনটী হোমিওপাথিক—"অশ্বত্থ" (Ficus Religiosa), "বাসক" (Justicia Adhatoda) ও "শেফালিকা" (Nyctanthes Arbor-tristis) ইন্‌-

য়োপে ও আমেরিকায় সাদরে গৃহীত হইয়াছে এবং খ্যাতনামা ডাক্তার ক্লার্কের Dictionary of Materia Medica ও ডাক্তার ব্ল্যাক্উড্ ও বোরিকের Materia Medica গ্রন্থাবলীতে সম্মানসূচক স্থান পাইয়াছে। কলেরা, প্লেগ, বেরি-বেরি, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের গৃহ-চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার ঘোষ কতকগুলি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ও স্পেনের বিখ্যাত হোমিও-প্যাথিক পত্রিকা-সমূহেও তাঁহার প্রবন্ধ-নিচয় নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাঁহার সম্পাদিত "হোমিওপ্যাথিক রিপোর্টার" নামক মাসিক পত্র অল্পকাল মধ্যেই বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। স্বনামধন্য ডাক্তার মহেন্দ্র-লাল সরকার মহোদয়ের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি ১৯০৪ সালে ডাক্তার শরৎচন্দ্র ঘোষ, এম্, ডি, কে তাঁহার স্থলে করেস্পণ্ডিং মেম্বর মনোনীত করেন। ডাক্তার শরৎবাবু ফ্রেঞ্চ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল সোসাইটি ও হ্যানিমান্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ অফ্ ব্রেজিলের করেস্পণ্ডিং মেম্বর বা প্রবন্ধলেখক সভ্য এবং সম্প্রতি সেণ্ট্ পিটর্সবর্গ্ (অধুনা পেট্রোগ্রাড্) সোসাইটি অফ্ হোমিওপ্যাথিক ফিজিসিয়ান্সের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য-পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট ডাক্তার শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করি ও আশা করি যে তিনি এইরূপ মৌলিকানুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে বিরত হইবেন না। সম্পাদক।

রাজা নীলাম্বর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জনে।

সরসীবালা দুর্গের একটী প্রকোষ্ঠে বসিয়া কি ভাবিতেছে। এত অল্পবয়সে এত চিন্তা কিসের? একখানা বাঙ্গালা-পুস্তক হস্তে রহিয়াছে, কিন্তু পড়িবার অবসর কোথায়? মনটি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একবার বইখানি হস্তে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, বইখানি "কথা সরিৎ-সাগর", আবার বিরক্ত হইয়া এক পার্শ্বে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সরসীবালা তারপর উঠিল, বাতায়নে গিয়া কি দেখিতে লাগিল? দুর্গের পরিখার জল অনিল সঞ্চালনে অল্প অল্প নাচিতে-ছিল, সরসীবালা মনোযোগের সহিত তাহাই দেখিতে লাগিল। একটা ভেক লম্ফপ্রদানে, পরিখায় পতিত হইল, আবার জল ছাড়িয়া উঠিল। একটি ক্রৌঞ্চ উড়িয়া আসিয়া জলের ধারে বসিল, দেখিল একটি মৎস্যও উঠিতেছে না, তখন নিরাশ হইয়া আবার উড়িয়া চলিয়া গেল। ইহা দেখিয়া সরসীবালা হাসিয়া উঠিল, পৃথিবী এইরূপ স্বার্থপর। কতকক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল, তারপর আসিয়া আবার একটি শয্যায় শয়ন করিল। সরসীবালার মন চঞ্চল হইল, কিছুই ভাল লাগিতেছে না। একবার একপার্শ্বে শয়ন করিল, আবার অপর পার্শ্বে শুইল। কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে। যেদিন অতিথিদ্বয় আসিয়া দুর্গে ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন, সেই দিন হইতেই সরসীবালার মন কি এক

প্রকার হইয়াছে। কনিষ্ঠ অতিথির সুন্দর চেহারা, সলজ্জ ভাব, সকলই তাহার নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে, এবং তাহাদের সেই সব কথা মনে হইতেছিল। যুবক কে? তাঁহারা কি প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন? তাহাও মনে হইল। তাঁহার কি সরসীবালার কথা স্মরণ আছে? বোধ হয় কার্য্যের গোলমালে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। যখন সে পরিবেশন করিতেছি[illegible], তখন যুবক চোরের [illegible]য় তাহাকে দেখিতেছিলেন। এই কথা মনে করিয়া সে বড় লজ্জাবোধ করিতেছিল।

এই সময়ে বেলা প্রায় অবসান হইল, সান্ধ্য-সমীরণ মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল, বিহঙ্গমকুল নিঃশব্দে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহাদের পাখার সঞ্চালনে একরূপ মনোহর ধ্বনি হইতেছিল। এই মনোহর সময়ে সরসীবালা নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা-সাগরে মগ্না। হঠাৎ কে ডাকিল—"মা!" সরসীবালা দেখিল পিতা গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তখন তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল। পিতা বলিলেন—"মা! বেলা গেল, এখন উঠ, দিনে এত ঘুমুলে অসুখ হবে যে?" সরসীবালা বলিল—"না বাবা! অনেকক্ষণ উঠেছি।" শীতলাকান্ত রায় বলিলেন—"এতক্ষণ শুয়ে ছিলে কেন?" এবার বালিকা আর উত্তর করিল না। তিনি পুনরায় বলিলেন—"রাজধানীতে বড় গোলমাল, শুন্‌ছি রাজা নিরুদ্দেশ, মৃগয়ায় গিয়া আর ফিরেন নাই। কে যে রাজা হবে ঠিক নাই। ভগবান করুন, যেন রাজা সুস্থশরীরে ফিরিয়া আসেন। আমার বড় চিন্তা হ'য়েছে। আমি পুরাতন ভৃত্য, অতএব সর্ব্বদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এখনই মন্ত্রী রাজত্ব ক[illegible]চ্ছেন, যদি রাজা না আসেন, তবে তিনিই রাজ্য পরিচালনা কর্‌বেন। আমার একবার রাজধানী যাওয়া উচিত, কিন্তু এই সময়ে দুর্গের ভার কাহার উপর দিয়ে যাই? তেমন উপযুক্ত লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি না।" সরসীবালা সব কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলি[illegible]—"বাবা! আমাকে সঙ্গে নিবে ত?" দুর্গাধ্যক্ষ বলিলেন—"যদি আমি যাই, তোমাকে এখানে রেখে যাবো না, সঙ্গেই নিব; কিন্তু কবে যে যেতে পার্‌বো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। তুমি আহারের উদ্যোগ করগে। একজন অতিথিও উপস্থিত, যত্নের ত্রুটি না হয়।" বালিকা অতিথির কথা শুনিয়াই পূর্ব্বকথা মনে করিল, ব্যাগ্রতার সহিত বলিল—"কে এসেছে?" দুর্গাধ্যক্ষ বলিলেন—"বিশিষ্ট অতিথি, মন্ত্রীপুত্র দেবদাস। কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাচ্ছেন, রাত্রে এখানে থাক্‌বেন।" এই কথা শুনিয়াই কোন অজ্ঞাত ভয়ে সরসীবালার শরীর শিহরিয়া উঠিল, আর কোন কথা বলিলেন না।

রাত্রিতে আহারের উদ্যোগ হইল, বৃদ্ধ অতিথির ভোজনের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। নানাবিধ খাদ্য দেওয়া হইল, দেবদাস অতি পরিপাটিরূপে আহারে প্রবৃত্ত হইল। সরসীবালা পরিবেশন করিতেছিল, দেবদাস ঘন ঘন সে রূপ-সুধা পান করিতেছিল। সে সরসীবালার রূপ দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, ভুবনেশ্বরী অপেক্ষা সরসীবালা অনেক সুন্দরী ইহা তাহার মনে হইল। সরসী-

বালা সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের কন্যা, এ কন্যা লাভ করিলে ক্ষতি কি? সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেভাবে হউক এই কন্যা অধিকার করিতে হইবে। আজকাল আর রাজা নাই, তাহার পিতাই রাজা, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যাইতে পারে। রাজা ত জন্মের মত গিয়াছে, এখন সুবিধা ক'রে নিতে পার্লেই হয়। ভুবনেশ্বরীর কি হবে। যা হ'ক, সেটাকেও রক্ষিতা রাখা যাবে। ভুবনেশ্বরী ত ব্রাহ্মণ নয়, অতএব তাহার সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে না। এই সব কথা দেবদাসের মনে হইল। সে তখন দুর্গাধ্যক্ষকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিল—"চমৎকার আয়োজন হ'য়েছে। আমি আহারাদি ক'রে সন্তুষ্ট হ'লেম। তবে আজকাল রাজধানীতে বড় গোলযোগ, রাজা না থাকাতে আমরা সকলেই শোকে মগ্ন, পিতা আপাততঃ রাজ-কার্য্য চালাচ্ছেন। আমি আবার অদ্য পিতাকে আপনার সৌজন্যতার বিষয় বল্‌বো।" দুর্গাধ্যক্ষ বলিলেন—"তাহা আপনাদের গুণে, আমি সামান্য লোক, কি আর আয়োজন কর্‌তে পার্‌বো। আমার একবার এ সময় রাজধানী যাওয়া দরকার, কিন্তু কার্য্যগতিকে পার্‌ছি না, অবসর মত যাবো।" আহার শেষ হইল, দুই একটি কথাও চলিতে লাগিল। তারপর অতিথিকে সঙ্গে লইয়া শয়ন-প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন, সেস্থানে তাহাকে রাখিয়া, তিনি আহারার্থ অন্তঃপুরে গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উষ্ণীষধারী।

রাজার অনুপস্থিতে রাজধানীতে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হইল। রাজা ফিরিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় সহচর হংসেশ্বরও আসিলেন না। সকলেই চিন্তিত হইলেন, বিশেষতঃ রাণী মলয়াবতীর অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কি উপায় হইবে, দিবানিশি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হংসেশ্বর রায় বনের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাজার কোন চিহ্ন পাইলে না। বহু অনুসন্ধানেও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন কি করিবেন স্থির করিতে অসমর্থ হইলেন। একদিন এই প্রকার ঘুরিতে ঘুরিতে রাত্রি হইল, তিনি বৃক্ষমূলে অশ্বটী বন্ধন করিয়া রাখিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। রজনী দ্বিপ্রহর, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অতএব ঘোর অন্ধকার। বাতাস সোঁ সোঁ শব্দে বৃক্ষ পত্রাবলী কম্পিত করিতেছে। হংসেশ্বর এই নিবীড় বনমধ্যে একাকী বৃক্ষের উপর বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিলেন একটি উষ্ণীষধারী লোক নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইল অস্পষ্ট আলোকে লোকটীর চেহারা ঠিক দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু মস্তকে একটী পাগড়ী দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে আর একটি লোক আসিল, তাহাকেও বৃক্ষের উপর হইতে ঠিক চিনা অসম্ভব। একজন লোক বলিল—"কতদুর"? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল—"প্রায় ঠিক"।

প্র। তোমার চেষ্টায় বড় সন্তুষ্ট হ'য়েছি।

দ্বি। অধীনকে যেন স্মরণ থাকে।

প্র। তোমার পুরস্কার যথেষ্ট হবে।

দ্বি। আমি গোলাম, যা হুকুম কর্‌বেন কর্‌বো।

প্র। তোমার বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা যাবে।

দ্বি। হুজুরের ইচ্ছা।

প্র। মেয়েটার কি হ'ল?

দ্বি। মেয়েটার জন্য ভাবনা নাই, আপনাদের হাতে দিব।

প্র। ঠিক, আর নূতন খবর কি?

দ্বি। রাজার মৃত্যু হ'য়েছে, আর ফিরে আস্‌বার আশা নাই।

প্র। বড় খোস্‌খবর, তুমিই কি এর মধ্যে ছিলে?

দ্বি। হুজুরদের জন্য।

প্র। বেশ কাজ করেছ, তোমার কার্য্যতৎপরতায় বড় খুসী হ'য়েছি। আর কোন চিন্তার কারণ নাই ত?

দ্বি। কোন চিন্তার কারণ থাক্‌লে কি

আপনাকে জানি।

প্র। বেশ, বেশ। আচ্ছা, রাণীটার কি হবে?

দ্বি। সুলতান সাহেবের ভেট হবে।

প্র। বেশ কথা বলেছ, এবার দেখ্‌ছি তোমার খুব অদৃষ্টের জোর।

দ্বি। সব হুজুরের মেহেরবানি।

প্র। সহজে কার্য্যসিদ্ধি হবে ত?

দ্বি। অনায়াসে, কিছু কষ্ট করতে হবে না। অতি সহজে কাজ হবে।

প্র। তোমার পিতাই ত কর্ত্তা, মতামত কি?

দ্বি। তিনি আপনাদের পক্ষে।

প্র। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিবে ত?

দ্বি। এখন নয়। তিনি বড় ভীত, বৃদ্ধ হয়েছেন সাহস বড় কম। আমি সময় মত সাক্ষাৎ করাবো।

প্র। আচ্ছা তাই, তুমি যা বল্‌বে তাই হবে।

হংসেশ্বর এই সব কথা শুনিয়া একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তিনি আরও কথা বার্ত্তা শুনিবার জন্য চুপ করিয়া থাকিলেন।

আবার প্রথম ব্যক্তি বলিলেন—রাজধানীর অবস্থা কি?

দ্বি। রাজধানীতে ভারি গোলযোগ।

প্র। তবে আমি কা'লই চ'লে যাবো, তুমিও আমার অনুসরণ কর।

দ্বি। হুজুর যা আদেশ কর্‌বেন।

প্র। ঘোড়াঘাট দুর্গের কি হবে?

দ্বি। আপনাদের হবে।

প্র। ঘোড়াঘাট এই রাজ্যের দ্বার স্বরূপ।

দ্বি। সে বিষয়ে ভাবনা নাই, আপনাদের হস্তগত হবে।

প্র। ঐ স্থানের দুর্গাধ্যক্ষ কে?

দ্বি। এক বৃদ্ধ।

প্র। কেমন লোক? টাকা নিবে ত?

দ্বি। সম্ভব নয়, সে বড় ধার্ম্মিক।

প্র। তবে কি উপায়?

দ্বি। ছল ক'রে দিতে হবে।

প্র। বেশ, সে ভারও তোমার উপর।

দ্বি। আমি স্বীকৃত আছি।

প্র। আমি শুনেছি তার একটা সুন্দরী মেয়ে আছে।

দ্বি। সে সম্বন্ধে যা হুকুম হয়।

প্র। পরে বুঝা যাবে।

দ্বি। এই সব কার্য্যের জন্য খরচ পত্র দরকার।

প্র। হাঁ, তা আমি শুনেছি, এই নেও।

ইহার পর টাকার ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনা গেল।

তারপর প্রথম ব্যক্তি বলিল—"এতে আপাততঃ চালাও, তুমি ত রাজা হবে, আর ভাবনা কি।

দ্বি। সে সব হুজুরদের মেহেরবানি। গোলাম চিরকাল আপনাদের শ্রীচরণে।

প্র। বড় খুসী হ'লেম, তুমি চল, শীঘ্রই আবার ফিরে আস্‌বে। সে মেয়েটার কথা ভুল না? রাণীটা সুলতান সহরের ভাগে, আর সে মেয়েটা আমার ভাগে, বুঝ্‌লে ত? তোমাকেও একটা দিব। সেই ঘোড়াঘাটের মেয়েটা তোমাকে বক্সিস দিব।

দ্বি। হুজুরদের বহু কৃপা।

প্র। তবে চল, আর রাত্রি ক'রে দরকার নেই। আমি এখনই রওনা হচ্ছি, তুমি সেই উপদেশ মত কাজ করো।

দ্বি। হুজুর যা হুকুম কচ্ছেন, তাই কর্‌বো।

ইহার পর উভয়ে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল. ক্রমে তাহাদের পদশব্দ শূন্যে লীন হইয়া গেল। হংসেশ্বর দেখিলেন—বিশেষ ষড়যন্ত্র চলিতেছে, অতএব আর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক মনে করিলেন। তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন ও অশ্বটিকে খুলিয়া বনমধ্য হইতে বাহির হইয়া রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন। অন্ধকারে এই অশ্বটি যে ঐ লোক দুটির দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তজ্জন্য আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ক্রমশঃ—

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

প্রাপ্তি স্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বঙ্গবাসী, হিতবাদী, আনন্দবাজার, Telegraph, Behar Advocate, রঙ্গপুর-দর্পণ, এডুকেশন গেজেট, সঞ্জয়, বীরভূম বার্ত্তা, বীরভূমবাসী, খুলনাবাসী, মেদিনীপুর হিতৈষী, ত্রিপুরা হিতৈষী, পাবনা হিতৈষী।

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সঙ্কল্প, বিজয়া, নারায়ণ, আর্য্যাবর্ত্ত, উৎসব, হিন্দু-পত্রিকা, কাজের লোক, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিশূল, উপাসনা, ভারতী, মানসী, নব্য-ভারত, বসুধা, সাহিত্য-সংবাদ, বীরভূমি, বিজ্ঞান, পন্থা, ব্রাহ্মণ-সমাজ, গম্ভীরা, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, প্রতিভা, তপোবল, গৃহস্থ, স্বাস্থ্য-সমাচার, জগজ্জ্যোতি, শিশু, নন্দিনী, প্রজাপতি, তাম্বুলি-সমাজ, সাহিত্য-সংহিতা, চিকিৎসা-তত্ত্ব-বিজ্ঞান, সুমতি প্রভৃতি।

নারায়ণ।—মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩৷৷০ টাকা, কার্য্যালয় ২০৮।২ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। সম্পাদক মহাশয় বহু বিষয়ে অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি বঙ্গবাণীর সেবায় ব্রতী হইয়া এই "নারায়ণ" মাসিক পত্রের পরিচালনে অর্থের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। ইহা যে একটী সৎ দৃষ্টান্ত তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমরা এই উপাদেয় মাসিক পত্রের দুই সংখ্যা মাত্র পাইয়াছি। আধুনিক ধরণের চিত্র সৌন্দর্য্য "নারায়ণে" স্থান না পাইলেও সুন্দর এণ্টিক কাগজে তকৃতকে ঝক্‌ঝকে ছাপায় ইহা সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। প্রবন্ধগৌরবে "নারায়ণ" অন্যান্য মাসিক অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বাঙ্গালার যাবতীয় কৃতী লেখকগণ "নারায়ণের" সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, ভাল না হইবে কেন? পাঁচকড়িবাবুর "পৌরাণিকী-কথা" এবং বিপিনবাবুর শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বেশ সুন্দর হইতেছে। "কবিতার কথা" প্রবন্ধটী অতি উচ্চ অঙ্গের এবং নানা তথ্যে পূর্ণ। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আর্য্যাবর্ত্ত।—মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত, বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, কার্য্যালয় ১০৬।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রবন্ধ গৌরবে এবং মুদ্রণ ও চিত্রণ পরিপাট্যে পত্রিকাখানি অতীব মনোজ্ঞ, ইহার অনেক প্রবন্ধ এবং গল্প শিক্ষাপ্রদ সুগভীর তত্ত্বে পরিপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকাখানি প্রকাশ বিষয়ে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ১৩২১ সাল শেষ হইল, এই মাত্র আমরা ১৩২১ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয় এ বিষয়ে একজন পরিপক্ক কর্ম্মী, এদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে, আমরা সুখী হইব।

মন্দার-কুসুম।—শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী সরস্বতী প্রণীত একখানি উপন্যাস, সুন্দর এণ্টিক কাগজে পরিপাটী ছাপা, মূল্য ৷৷০ আনা। পুস্তকের গল্পাংশ বেশ সুন্দর, সরল ও সোজা কথায় অনেক ঘরের নিত্য ঘটনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে, পাঠ করিতে বেশ আনন্দ হয়। লেখিকা সাহিত্য-ক্ষেত্রে নূতন হইলেও তাঁহার উদ্যম

দখল হইয়াছে। পুস্তকখানি কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

ভারত-বিধবা।—শ্রীরাধারমণ দাস প্রণীত। একখানি কবিতা পুস্তক, লেখক নূতন, তবে কবিতা রচনায় তাহার শক্তি আছে, নানা প্রকার ছন্দে সুললিত ভাষায় গ্রন্থকার ভারতনারীর কীর্ত্তিকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ইহা পাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি।

উৎসব।—কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ মল্লিকার মণিলাল কোম্পানীর প্রতি বৎসরের কার্য্যবিবরণী যুক্ত একখানি পুস্তক। উক্ত কোম্পানী প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে দেশের গণ্য-মান্য রাজা, মহারাজা জমীদার, উকীল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির এবং বিখ্যাত সাহিত্যসেবীগণের যে প্রসাদ লাভ করেন; এই পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছে। কয়েকটী সুন্দর সুপাঠ্য প্রবন্ধ ও গল্প লইয়া পুস্তকখানি যে উপাদেয় হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সাধারণের পাঠের জন্য কোম্পানী এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি সুন্দররূপে বাঁধাইয়া মাত্র ।০ আনায় সাধারণে বিতরণ করিতেছেন। মেসার্স মণিলাল কোম্পানীর সত্বাধিকারী বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৪০নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় লিখিলে পাওয়া যায়।

SEVABRATA SRIJUT SASIPADA BANERJEE AND HIS SOCIAL SERVICE WORK :—The 43 Annual report of the Devalaya Movement 1914. ইহা উপহার পাইয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং দেবালয় সমিতির কার্য্যাবলীর বিবরণ পাঠে তাঁহাদের সমিতির বিশেষ উন্নতির অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। শশীপদবাবুর ধর্ম্ম-জীবনে কর্ম্ম-সাধনার উন্নতির বিষয় পাঠ করিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ভগবান এই সমিতির সেবকগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

DR MOHENDROLALL SIRCAR. শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ এম,ডি, প্রণীত। বাঙ্গালা দেশে মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম যেরূপ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কণ্ঠগত, ডাক্তার সরকারের নাম, তদপেক্ষা অধিক না হইলে ন্যূন নহে। ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই চিকিৎসায় তাঁহার মত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। শরৎবাবু একজন সুবিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক, ১নং কেদার বসুর লেন ভবানীপুরে, তাঁহার চিকিৎসালয়। ডাক্তার সরকারের জীবনী সংগ্রহে তিনি বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উক্ত মহাত্মা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঙ্গালা-দেশে এরূপ পুস্তকের যে আদর হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতার বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুরঞ্জিত চিত্র দ্বারা পুস্তকখানি সুশোভিত করিয়াছেন। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। শরৎবাবুর অপরাপর পুস্তক এবং হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্রের সমালোচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

অষ্টাদশ বর্ষ সম্পূর্ণ।